প্রকাশক :
আবদুল কাদির খান
নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ : নবেম্বর, ১৯৭১

প্রচ্ছদ
লুৎফুল হক

মুদ্রণে :
এম. আলম
ইডেন প্রেস
৪২।এ হাটখোলা রোড
ঢাকা-৩

Bangladesher Itihas. Written by M. Abdur Rahim, Abdul Momin Chowdhury, A. B Mahiuddin Mahmood and Sirajul Islam. Published by Abdul Kadir Khan of Nawroze Kitabistan 46, Bangla Bazar, Dacca. 1
Cover Designed by Lutful Hoq and printed from M/s Eden Press 42/A Hatkhola Road, Dacca.

ভূমিকা

জাতীয় জীবন গঠনে ইতিহাস অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইতিহাস জাতির আয়না, ইতিহাসের মুকুরে জাতি নিজের আকৃতি ও রূপ দেখতে পায়। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের পরিচয় পায়, তার অতীতকে জানতে পারে এবং অতীতের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা হতে তার বর্তমান ও ভবিষ্যতের চলার পথের নির্দেশ পায়। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশী জাতির নবজন্ম হয়েছে। বাংলাদেশী জাতি গঠনে বাংলাদেশের ইতিহাস অপরিহার্য।

আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিজেদের দেশের ও জাতির পরিচয় পায় সেজন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠ্যরূপে প্রবর্তন করেছি। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত স্নাতক শ্রেণীর পাঠোপযোগী বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ বই ছিল না। এই অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আমি ও আমার সহকর্মীগণ, ডঃ এ. এম. চৌধুরী, ডঃ এ. বি. এম. মাহমুদ ও ডঃ এম. এস. ইসলাম এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করি। প্রায় দুই বৎসর পরিশ্রমের ফলে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসের বর্তমান গ্রন্থখানি রচনায় ও প্রকাশনায় সমর্থ হয়েছি।

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস এই গ্রন্থখানিতে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসখানি যাতে স্নাতক শ্রেণীর উপযোগী তথ্যপূর্ণ ও সহজপাঠ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ইতিহাসের কলেবর যাতে অযথা বৃদ্ধি না পায় এবং স্নাতক শ্রেণীর উপযোগী নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমিত থাকে, সেজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন নির্বাচিত ঘটনা ও বিষয়ের উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আমরা বাংলা ভাষায় স্নাতক শ্রেণীর পাঠোপযোগী বাংলাদেশের ইতিহাসের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছি। এই প্রয়াস কতটুকু সফল হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও কলেজসমূহে ইতিহাসের আমাদের সহকর্মীগণ তার বিচার করবেন। প্রথম প্রয়াসের মধ্যে অপূর্ণতা

থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই বিষয়ে আমরা তাদের সহযোগিতা ও মূল্যবান উপদেশ কামনা করি, যাতে পরবর্তী সংস্করণে ইতিহাসখানি পূর্ণতা নিয়ে উন্নততর রূপে প্রকাশ পেতে পারে। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার ফলে ও কিছুটা সময়ের তাড়নায় অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে এই দিকে অধিকতর গুরুত্ব দেবার আশা রাখি।

নওরোজ কিতাবিস্তান ইতিহাসখানি প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব বহন করেছে। আমরা প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সঙ্গে ছাপাখানার কর্মচারীদেরকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। প্রুফ দেখার কাজে ডঃ এ. এম. চৌধুরী যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। আমরা তাকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রচুর সাবধানতা সত্বেও বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল। এজন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম. এ. রহিম

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

প্রাচীন যুগ

দ্বিতীয় পর্ব

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন

তৃতীয় পর্ব

আধুনিক যুগ

প্রাচীন যুগে বাংলা
নেপাল
সিকিম
মিথিলা
পূর্ণিয়া
কোচ
মেচ
প্রাগজ্যোতিষ
গোয়ালপাড়া
কামরূপ
ব্রহ্মপুত্র নদ (লোহিত্য)
গৌহাটি
গারো
খাসিয়া
জয়ন্তিয়া
পাটলীপুত্র
তেলিয়াগড়
মুদ্গগিরি
চম্পা
শকরীগলি
রাজমহল
নালন্দা
ওদন্তপুরে
রাজগৃহ
গয়া
বুদ্ধগয়া
লক্ষ্মণাবতী
মালদহ
সোমপুর
পুণ্ড্রবর্ধন
বরেন্দ্র
মিথিলা
দেওপাড়া
রামাবতী
মর্ধুপুর জঙ্গল
আস্রফপুর
শ্রীহট্ট
কজঙ্গল
সাঁওতাল পরগণা
উত্তর রাঢ়
ঝাড়খণ্ড
কর্ণসুবর্ণ
লাখনোর
ময়ূরাক্ষী নং
মানভূম
শুশুনিয়া
দামোদর নং
নবদ্বীপ
সুবর্ণগ্রাম
বিক্রমপুর
কর্মান্ত
লুসাই
বিষ্ণুপুর
অপার মন্দার
হুগলী
সপ্তগ্রাম
বঙ্গ
সমতট
দক্ষিণ রাঢ়
ধলভূম
বঙ্গাল
চন্দ্রদ্বীপ
তাম্রলিপ্ত
দণ্ডভুক্তি
ময়ূরভঞ্জ
উৎকল
বঙ্গোপসাগর

প্রথম পর্ব

প্রাচীন যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশ ও অধিবাসী

মুসলমান আমল হইতে বাংলা ভাষাভাষী ভূভাগ বাঙ্গালী বা বাংলা নামে পরিচিত হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। পশ্চিম বাংলা রাঢ় এবং উত্তর বাংলা বরেন্দ্র, লক্ষ্মণাবতী ও পুণ্ড্রবর্ধন নামে অভিহিত হইত। উত্তর ও পশ্চিম বাংলার কতক অংশ গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বঙ্গ, সমতট, বাঙ্গাল ও বাংলা নামে খ্যাত ছিল। বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ ছিল, আরণ্যক ব্রাহ্মণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে যে ষোলটি জনপদের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাদের মধ্যে বঙ্গ জনপদের নাম আছে। মুসলমান শাসনের প্রথম দিকে মুসলমান শাসক ও ইতিহাস লেখকরা বঙ্গ ও বাঙ্গালা (বাংলা) বলিতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বুঝাইয়াছেন। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ লক্ষ্মণাবতী রাঢ়, বাঙ্গালা প্রভৃতি অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন এবং নিজে শাহ-ই-বাঙ্গালা ও সুলতান-ই-বাঙ্গালা উপাধি ধারণ করেন। এই সময় হইতে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী ভূভাগ বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। ইহার পূর্বে শুধু বাঙ্গালার (পূর্ব বাংলার) অধিবাসীদিগকে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালী বলা হইত। ইলিয়াস শাহের সময় হইতে রাঢ় ও লক্ষ্মণাবতীর লোকেরাও বাঙ্গালী নামে অভিহিত হয়।

বৃটিশ শাসনকালে বাংলা ভাষাভাষী প্রদেশটি ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল এবং ইহা ইংরেজীতে বেঙ্গল (Bengal) নামে অভিহিত হইত। তখন এই প্রদেশটি বাংলা ভাষায় বাংলাদেশ ও বাংলা উভয় নামেই কথিত হইত। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত হয়; পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পশ্চিম বাংলা ভারত রাষ্ট্রে যোগ দেয়। পরে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করিয়া পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বাংলাদেশ নাম

গ্রহণ করিয়াছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বাংলার নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং ইহা এখন বাংলা নামে অভিহিত হয়। এমতাবস্থায়, আমাদের অতীত ও বর্তমানের ইতিহাসের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাস নাম যুক্তিযুক্ত। বাংলাদেশ নাম প্রাচীন, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম ও বৃটিশ সকল যুগের ইতিহাসের জন্য সমভাবে প্রয়োজ্য হইবে এবং ইহা পাকিস্তানী আমল ও স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের নির্দেশ দিবে।

সম্রাট আকবরের ইতিহাস-লেখক আবুল ফজল বাঙ্গালা নামের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই দেশের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ; প্রাচীনকালে ইহার রাজারা ১০ গজ উচ্চ ও ২০ গজ প্রশস্ত প্রকাণ্ড আল (**embankment**) নির্মাণ করিতেন; এইজন্য ইহার বাঙ্গালা নাম হইয়াছে। স্বাধীন সুলতানদের আমলে পূর্বে চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট হইতে রাজমহল অঞ্চল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিস্তৃতি ছিল। কামরূপ ও বিহারের অনেকাংশ বাংলা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা সুবার ভৌগোলিক বিবরণ সম্পর্কে আবুল ফজল লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালা দ্বিতীয় আবহাওয়ায় অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম হইতে গর্হি পর্যন্ত ইহা লম্বায় চার শত ক্রোশ। পূর্ব ও উত্তরে ইহা পাহাড় পরিবেষ্টিত; ইহার দক্ষিণে সাগর এবং পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। ইহার সীমান্তে কামরূপ ও আসাম অবস্থিত। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও তাঁহার আত্মজীবনীতে চট্টগ্রাম হইতে গর্হি পর্যন্ত বাংলা সুবার সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। বৃটিশ শাসনকালেও চট্টগ্রাম হইতে রাজমহল এবং হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বাংলাদেশ বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্ট জিলা কখনও আসামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে ইহা আবার বাংলাদেশের সহিত যুক্ত হয়।

বাংলাদেশের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতশ্রেণী ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বিপুল জলরাশি। পূর্ব দিকে ইহা খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চল দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহার পশ্চিম সীমায় খরস্রোতা গঙ্গা, মহানন্দা ও ইহাদের শাখা-উপশাখা, রাজমহলের পাহাড় ও বীরভূম, সাওতাল পরগণা, ঝাড়খণ্ড ও ময়ূরভুঞ্জের জঙ্গলরাজি অবস্থিত। এই সীমারেখার মধ্যে বহু নদনদী ও নালা-খাল বিধৌত বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, বাংলাদেশে অসংখ্য নদী প্রবাহিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা, করতোয়া, মহানন্দা প্রভৃতি

নদনদী ও ইহাদের শাখা-উপশাখাগুলি বাংলাদেশকে উর্বরা ও শস্যশ্যামলা করিয়াছে এবং ইহার আর্থিক জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

নদীগুলি বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যে সুশোভিত করিয়াছে। বাংলাদেশের জীবনে এইগুলি বহু ভাঙ্গা-গড়ার কাজও করিয়াছে। যুগে যুগে বড় বড় নদীগুলির গতি পরিবর্তিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে সমৃদ্ধ নগর ও জনপদ বিলীন বা বিরান হইয়া পড়িয়াছে এবং নূতন নূতন শহর, বন্দর ও জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। গৌড়, তাণ্ডা, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম ও সোনারগাঁও এক সময় বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ নগর ও বন্দর ছিল। গঙ্গা নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় এই নগর ও বন্দরগুলি অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে এবং কলিকাতার মত নূতন বন্দর গড়িয়া উঠে। প্রাচীনকালে গঙ্গানদীর একটি প্রবাহ রাজমহলের নিকট হইতে সাওতাল পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাম্রলিপ্তির নিকটে বঙ্গোপসাগরে পড়িত। তখন তাম্রলিপ্তি গঙ্গা নদীর তীরে একটি বড় বন্দর ছিল। পরে গঙ্গানদীর এই প্রবাহ পরিবর্তিত হয়; ইহা রাজমহল হইতে বর্তমান মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর গতিপথে প্রবাহিত হয় এবং গৌড় নগরী পশ্চিমে রাখিয়া এবং ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামের নিকট দিয়া অগ্রসর হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইত। ইহা বর্তমানে ভাগীরথী নদী নামে পরিচিত। পদ্মা নামে গঙ্গানদীর আর একটি প্রবাহ গৌড়ের ২৫ মাইল দক্ষিণ হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় এবং রাজশাহীর চলনবিলের মধ্য দিয়া এবং বর্তমান ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গার নদীর গতি বাহিয়া ফিরিঙ্গীবাজারের নিকট মেঘনা নদীর সহিত মিলিত হয় এবং চট্টগ্রাম বন্দরের অনতিদূরে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। ইহার পর আবার পদ্মা নদীর গতি পরিবর্তিত হয়। ইহা গৌড় হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে সরিয়া পড়ে এবং সোজা পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ও গোয়ালন্দের নিকট দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ধাবিত হইয়া চাঁদপুরের নিকট মেঘনার সহিত একত্র হয় এবং ইহাদের প্রবাহ দক্ষিণ শাহবাজপুরের নিকটে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়।

ব্রহ্মপুত্র নদের গতি কয়েকবার পরিবর্তিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র দীউয়ানগঞ্জ ও জামালপুর দক্ষিণে রাখিয়া মধুপুর জঙ্গলের পাশ দিয়া এবং ময়মনসিংহ জিলা ও ঢাকা জিলার পূর্বাঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া লাঙ্গলবন্দের নিকটে গঙ্গার (বর্তমান ধলেশ্বরী) সহিত মিলিত হইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্রের এই প্রবাহ গতি পরিবর্তন

করিয়া ভৈরববাজারের নিকট সুরমা-মেঘনা নদীতে মিলিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাবে ব্রহ্মপুত্রের গতি ময়মনসিংহ হইতে ভিন্ন পথে চলে এবং ইহা যমুনা নদীর গতিপথে প্রবাহিত হয়। পূর্বে যমুনা ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা ছিল। এই পথে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার সহিত মিলিত হয়। মেঘনা নদীর গতির খুব বড় রকমের পরিবর্তন হয় নাই; কিন্তু ইহার ভাঙ্গনের দরুণ বহু সমৃদ্ধ লোকালয়ের ক্ষতি হইয়াছে। করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভবা, মহানন্দা, কুশী প্রভৃতি নদীগুলিরও গতি পরিবর্তন হইয়াছে এবং এই পরিবর্তনের ফলে অনেক ভাঙ্গা-গড়ার কাজও চলিয়াছে।

সীমান্তের প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্নের জন্য সে যুগে বাংলাদেশে প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না। তখন উত্তর ভারত হইতে বাংলাদেশে প্রবেশের দুইটি পথ ছিল, ত্রিহুতের পথ ও তেলিয়া গর্হির পথ। ত্রিহুত বাংলার প্রবেশ পথ ছিল বলিয়া ইহার নাম হয় দ্বার-বাঙ্গা (দ্বার-ই-বঙ্গ)। ত্রিহুতের পথে কুশী, গণ্ডাক, মহানন্দা প্রভৃতি খরস্রোতা নদী পার হইতে হইত; এইজন্য এই পথ অভিযানকারী সৈন্যদের পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল। তেলিয়া গর্হির পথ খুবই সংকীর্ণ ছিল। ইহার একদিকে বিশাল গঙ্গানদী এবং অন্যদিকে রাজমহলের পাহাড়শ্রেণী, বীরভূম, সাওতাল পরগণা, ঝাড়খণ্ড ও ময়ূরভুঞ্জের বিস্তৃত জংগলাকীর্ণ ভূভাগ অবস্থিত ছিল। এই পথেই সাধারণতঃ উত্তর ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করিত। এই সংকীর্ণ পথে বাংলার সৈন্যরা সহজেই আক্রমণকারীকে বাধা দিতে পারিত। ঝাড়খণ্ডের জংগলের মধ্য দিয়া উত্তর ভারতের সৈন্যদল কখনও বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় লোকের সাহায্য ব্যতীত ঘনজঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ খুঁজিয়া বাহির করা খুবই মুস্কিলের কাজ ছিল। সীমান্তের দুর্গম পথ ছাড়াও, বাংলাদেশের বহু নদনদী, খাল-বিল, ঝোপঝাড় ও বর্ষার আবহাওয়া উত্তর ভারতের সৈন্যদের বিরুদ্ধে বাধাস্বরূপ ছিল। এই জন্য বাংলাদেশ উত্তর ভারত হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে কষ্টসাধ্য হইয়াছে এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহা বেশী দিন টিকে নাই। বাংলাদেশ বহু শতাব্দী স্বাধীন জীবন বজায় রাখিয়াছে। ইহার ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়া উঠিতে সুযোগ পাইয়াছে।

বাংলাদেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ ও বাঙ্গাল হইতে ইহার অধিবাসীদের বাঙ্গাল বা বাঙ্গালী নাম হইয়াছে। বঙ্গ ও পুণ্ড্র ইহার আদিম অধিবাসী ছিল। ইহারা দ্রাবিড় ও আর্যদের থেকে পৃথক ছিল এবং ভারতের অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের ন্যায় ইহারা বর্তমানের কোল, ভীল, শবর প্রভৃতি লোকদের আদিপুরুষ ছিল। পণ্ডিতরা বাংলাদেশের অধিবাসী-দেরকে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা অষ্টিক নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা-দেরকে নিষাদ জাতিও বলা হয়। নিষাদ জাতির পর আরও কয়েক জাতীয় লোক বাংলাদেশে আসে। ইহাদের মধ্যে মোঙ্গল দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী লোক ছিল, কিন্তু ইহারা মোঙ্গল ও দ্রাবিড় ছিল না। পরে পামির অঞ্চল হইতে হোমো-আলপাইনাস নামে এক জাতীয় লোক বাংলায় আসে। ইহাদের হইতে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য হিন্দুদের উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা বৈদিক আর্যদের হইতে পৃথক জাতীয় ছিল। পরবর্তী যুগে কিছুসংখ্যক আর্য বাংলাদেশে আসিয়াছিল। ইহার ফলে বাংলার অধিবাসীদের উপর আর্যদের ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি ও রীতিনীতির প্রভাব পড়িয়া-ছিল।

মুসলমানদের পূর্বে কিছু সংখ্যক আরব মুসমান বাণিজ্য উপলক্ষে ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসিয়াছিল। মুসলমানদের শাসনকালে বহু তুর্কী, আরব, ইরানী, হাবসী, আফগান ও মুগল মুসলমান বাংলায় বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুফী ও আলেমরা এদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজ করেন। ইহার ফলে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। মুসলমানরা সাড়ে সাত শত বৎসর বাংলাদেশ শাসন করে। এই সময় নানা বিষয়ে ইহার অধি-বাসীদের উন্নতি হয়। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও ভাষাগত ঐক্য স্থাপিত হয় এবং ইহার জাতীয় জীবনের ভিত্তি রচিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে গুপ্ত শাসন

গুপ্তযুগের পূর্বে বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা কষ্টসাধ্য। উপাদানের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। দেশী ও বিদেশী সাহিত্যিক উপকরণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড উক্তি ও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে আমরা বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের কিছু আলোক পাই। কিন্তু তাহা সময়ে সময়ে এতোই অস্পষ্ট যে সঠিক ইতিহাসের যোগসূত্র স্থাপন করা কঠিন।

সর্বপ্রথম কোন সময়ে বাংলাদেশে মানুষের বসতি শুরু হয়, তাহা সঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে ভূতত্ত্ব বিচারে একথা বলা যায় যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার নদী বিধৌত পলিমাটি দ্বারা গঠিত বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ অপেক্ষাকৃত নবীন। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের পার্বত্যাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ভূভাগ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এই প্রাচীন ভূভাগেরই বিভিন্ন এলাকায় প্রাচীন মানুষের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রত্ন-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগের পাষাণ-অস্ত্রের নিদর্শনসমূহ বাংলাদেশের প্রাচীন ভূভাগে মানুষের অস্তিত্বের চিহ্ন বহন করে। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের শেষের দিকে এবং নব্য-প্রস্তর যুগে মানব সভ্যতার উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায় অগ্নি উৎপাদনের পদ্ধতিতে, পোড়ামাটির বাসন তৈরীর পদ্ধতিতে, রন্ধন প্রণালীর উদ্ভবে এবং কৃষি কার্যের উদ্ভবে। পরবর্তী যুগে মানুষ ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল এবং প্রথমে তাম্রের ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া এই যুগকে তাম্র-প্রস্তর যুগ বলা হয়।

এই তাম্র-প্রস্তর যুগের নিদর্শন ও বাংলাদেশে আবিস্কৃত হইয়াছে। ১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর তীরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এই অঞ্চলে তাম্র-প্রস্তর যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলে, বিশেষ করিয়া বর্ধমান জেলায় অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে, খৃষ্ট জন্মের প্রায় দেড়

হাজার বৎসর আগে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এক উন্নত মানের সভ্যতার নিদর্শন উৎঘাটিত হইয়াছে। আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূহ হইতে অনুমান করা হয় যে এই সভ্যতার স্রষ্টারা ধান চাষ করিত, সম্বর, নীলগাই প্রভৃতি পশু শিকার ও শূকর প্রভৃতি পশু পালন করিত, নানা রকমের চিত্র শোভিত মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রস্তর ও তাম্রের ব্যবহার করিত এবং ধীরে ধীরে লৌহের সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাহারা ইটের ও পাথরের ভিত্তির উপর প্রশস্ত ও আরামপ্রদ গৃহ নির্মাণ করিয়া বসবাস করিত। কোন কোন বাড়ীর দেয়াল নলখাগড়ার সহিত মাটি মিশাইয়া তৈরী হইত।

পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে ষ্টীটাইট (Steatite) পাথরের কতকগুলি চিহ্ন খোদিত একটি গোলাকার সীল পাওয়া গিয়াছে। মনে করা হয় যে সীলটির খোদিত চিহ্নসমূহ চিত্রাক্ষর (pictograph) এবং সীলটি ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট দ্বীপের, প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে নির্মিত। এই সীল ও অন্যান্য নিদর্শনসমূহ হইতে অনুমান করা হয় যে মানব-সভ্যতার প্রাচীন আবাস-স্থল ক্রীট দ্বীপের সহিত বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। অজয় নদী উপত্যকা অঞ্চলে পোড়ামাটির (terracotta) তৈরী বিভিন্ন মূর্তি বাংলাদেশের এই শিল্পের প্রাচীনত্বের প্রমাণ বহন করে। পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ হইতে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রায় তিন হাজার বছর আগে যখন ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে উন্নতমানের সভ্যতার অধিকারী মানব জাতির বাস ছিল সেই সময়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলও উন্নতমানের সভ্যতার দাবী করিতে পারে।

বৈদিক আর্যগণ যখন পঞ্চনদ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে বাংলাদেশের তখনকার অবস্থা সঠিকভাবে জানার কোন উপায় নাই। তবে আর্যদের প্রভাব বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল অনেক পরে। বৈদিক সূত্রে বাংলার কোনও উল্লেখ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনার্য ও দস্যু বলিয়া যে সব জাতির উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে পুণ্ড্রের নাম ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পুণ্ড্রজাতি উত্তরবঙ্গে বাস করিত। ঐতরেয় অরণ্যকেও বাংলাদেশের লোকের নিন্দাসূচক উল্লেখ রহিয়াছে।

বৈদিক যুগের শেষ ভাগে অথবা অব্যবহিত পরপরই বাংলাদেশে আর্য উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতার বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণ, মহাভারত ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতির উল্লেখ

দেখা যায় এবং আর্য প্রভাব বিস্তারের নানান কাহিনী পাওয়া যায়। এইসব উল্লেখ হইতে বাংলাদেশে বিভিন্ন খণ্ড রাজ্যের কথাও অনুমান করা হয়।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখনী হইতে বাংলাদেশের অবস্থা অনেকটা স্পষ্টতার সাথে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে যখন আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ভাগ আক্রমণ করেন, তখন বাংলাদেশে এক পরাক্রান্ত রাজ্য বিরাজমান ছিল তাহার সাক্ষ্য সমসাময়িক গ্রীক ও লাতিন লেখনীতে পাওয়া যায়।

গ্রীক লেখকগণের বর্ণনায় গণ্ডরিডাই বা গঙ্গরিডই নামে যে এক পরাক্রান্ত জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় ঐতিহাসিকদের অনুমান যে তাহারা বাংলাদেশেরই অধিবাসী। তবে এই রাজ্যের অবস্থিতি সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। প্লিনি বলেন যে গঙ্গানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। দিত্তদোরসের লেখনীতে এই গঙ্গরিডাই জাতির বিপুল সৈন্যবাহিনীর ও চারি হাজার রণহস্তির উল্লেখ আছে। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে এই বিপুল সামরিক শক্তি ও সেনাবিন্যাসের উল্লেখ বাংলাদেশের গঙ্গাবিধৌত অঞ্চলে এক বিরাট রাজশক্তির পরিচয়ই বহন করিতেছে।

বিদেশী লেখকগণের কয়েক সম্ভ্রমসূচক উক্তি ছাড়া ইহার পরবর্তী যুগের বাংলাদেশের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। খৃঃ পূঃ তৃতীয় অব্দ হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস প্রায়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন। অবশ্য কিছু কিছু প্রমাণাদি মাঝে মাঝে এক এক ঝলক আলোকপাত করিয়াছে।

আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতবর্ষের বৃহদাংশ সম্বলিত এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। গ্রীক ও বৌদ্ধ লেখনীর উপর ভিত্তি করিয়া বলা হইয়া থাকে যে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল এবং সম্ভবত নদীবিধৌত বদ্বীপ অঞ্চল ও মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। উত্তরবঙ্গে মৌর্য শাসনের প্রমাণ বহন করে বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলাখণ্ড লিপি। ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা এই লিপি হইতে এই কথা প্রতিপন্ন হয় যে উত্তর বঙ্গের ঐ অঞ্চলের মৌর্য শাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল 'পুডনগল' বা পুণ্ড্রনগর এবং ইহাতে মৌর্য প্রাদেশিক শাসক মহামাত্রের উল্লেখ আছে। প্রাচীন পুণ্ড্রনগর যে বর্তমানের মহাস্থান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই লিপি হইতে মনে হয় যে এই অঞ্চলে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সেই সময়ে পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রের প্রতি রাষ্ট্রকেন্দ্র

হইতে দুইটি আদেশ এই লিপিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। লিপিটির কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় প্রথম আদেশটি বোধগম্য নয়, কিন্তু দ্বিতীয় আদেশটি আক্রান্ত প্রজাদের রাজশস্যাগার হইতে ধান্য ও সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গে রাজভাণ্ডার হইতে গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রায় অর্থ সাহায্য করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই লিপিতে যে মুদ্রার নাম করা হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এক ধরণের নানা চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রা (punch-marked) পাওয়া গিয়াছে। মহাস্থান লিপির বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ শাসন ব্যবস্থার ঘোষণা করে। যদি এই শিলা লিপি মৌর্য যুগেরই হইয়া থাকে (লিপি বিচারে তাহাই অনুমান করা হইয়া থাকে) তাহা হইলে মৌর্য শাসনের সুব্যবস্থা উত্তরবঙ্গও ভোগ করিয়াছিল এই কথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। য়ুয়ান্ চোয়াঙের বর্ণনা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করিলে উত্তরবঙ্গ ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য জনপদে মৌর্য শাসন ছিল বলিয়া মনে করিতে হয়। য়ুয়ান্-চোয়াঙ কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলা), তাম্রলিপ্তি (হুগলি জেলা) ও সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) অঞ্চলে মৌর্য সম্রাট অশোক নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার দেখিয়াছিলেন বা তাহাদের বিবরণ নিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মৌর্যোত্তর যুগে বাংলাদেশের ইতিহাস ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। মহাস্থানে প্রাপ্ত শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির মূর্তি মৌর্যোত্তর যুগে পুণ্ড্রবর্ধনের সমৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে। বাংলাদেশের কোন অংশ কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা সে কথা ও সঠিক করিয়া বলা যায় না। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জায়গায় কুষাণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুবর্ণ মুদ্রাও আছে। মহাস্থানের ধ্বংসস্তূপে কনিষ্কের মূর্তি-চিহ্নিত একটি সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে এই মুদ্রাটির নির্দিষ্টিকরণ সন্দেহাতীত নয়। এই মুদ্রাসমূহ কি বাংলাদেশের অঞ্চল বিশেষে কুষাণ সাম্রাজ্যের আধিপত্যের পরিচয় বহন করে? এই প্রশ্নের উত্তর ও সঠিক করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ কেবলমাত্র মুদ্রার উপর ভিত্তি করিয়া এই ধরণের সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। মুদ্রা বাণিজ্যের মাধ্যমেও স্বরাজ্য সীমা পার হইয়া অন্যস্থানে যাইতে পারে।

খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু তথ্য গ্রীক ও লাতিন উৎসসমূহে রহিয়াছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমীর

বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই সময়ে বাংলার স্বাধীন গঙ্গরিডই রাজ্য বেশ প্রবল ছিল। বাংলাদেশের নদীর মোহনায় বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত এই রাজ্যের রাজধানী শহর গঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন*কাপড় এই বন্দর হইতে সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তানি হইত। ইহার সন্নিকটে কোথাও সোনার খনি ছিল বলিয়া গ্রীক লেখনীতে উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে নিম্ন-গাঙ্গেয় ভূমিতে 'ক্যালটিস' নামক এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রা 'চলনের কথাও উল্লেখিত আছে। টলেমী এই গঙ্গে বন্দরের অবস্থিতি তাম্রলিপ্তি বন্দরের আরও দক্ষিণ-পূর্বে কুমার নদীর মোহনায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খুব সম্ভবত প্রাচীন কুমার তালক মণ্ডলে। ইহা ছাড়া ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের এক লিপিতে সুবর্ণবীথির উল্লেখ, ঢাকা জেলার সুবর্ণ গ্রাম, সোনারঙ্গ, সোনাকান্দি ইত্যাদি সব নামই সুবর্ণস্মৃতিবহ। তাই টলেমীর উল্লেখিত সোনার খনি নেহায়েত কাল্পনিক নাও হইতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে গ্রীক-লাতিন লেখকদের গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গরিডই এবং মৌর্যশাসনের পর হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের খুব অল্প তথ্যই আমরা পাই। তবে প্রাপ্ত উপাদান সমূহ বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্য ও তাহার ফলস্বরূপ বাংলাদেশের সমৃদ্ধির সুস্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে গুপ্ত শাসন

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে ও চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমরা গুপ্ত আমলের উপাদানসমূহে পাই। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সমতট রাজ্য ও পশ্চিম বাংলায় পুষ্করণ রাজ্যের উল্লেখ আছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত যখন বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন তখন বাংলাদেশে এই স্বাধীন রাজ্যগুলি বিদ্যমান ছিল। বাঁকুড়ার নিকটবর্তী সুসুনিয়ায় পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত একটি লিপিতে পুষ্করণাধিপ সিংহবর্মা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে। সুসুনিয়ার নিকটবর্তী দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পোখর্না নামক গ্রামই এই রাজবংশের রাজধানী পুষ্করণ বলিয়া অনুমান করা হয়। পোখর্ণায় প্রাপ্ত বহু প্রাচীন নিদর্শন এই গ্রামের প্রাচীনত্বের প্রমাণ বহন করে। পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মাই খুব সম্ভবতঃ এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লেখিত সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত চন্দ্রবর্মা।

দিল্লীতে মেহেরাওলী এলাকায় কুতুব মিনারের সংলগ্ন কুয়াতুল ইসলাম মসজিদের প্রাঙ্গণে অবস্থিত লৌহ স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত লিপি এই সময়কার বাংলার ইতিহাসে কিছু আলোকপাত করে। এই লিপিতে চন্দ্রনামধারী এক রাজার বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার অন্যান্য বিজয়ের সাথে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে তিনি বঙ্গে শত্রু নিধনে গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয়েরা তাঁহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই স্তম্ভলিপিতে উল্লেখিত রাজা চন্দ্র কে এবং কোথায় রাজত্ব করিতেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে গুপ্তবংশীয় রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। যদি প্রথম অনুমান ঠিক হয় তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে সমুদ্রগুপ্তের পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তই বঙ্গ অঞ্চল (সম্পূর্ণ বাংলাদেশ নয়; বঙ্গের অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বলিয়া মনে করাই সঙ্গত) গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত করেন। যদি দ্বিতীয় অনুমান (অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) ঠিক হয় তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গ জয়ের পরও তাঁহার পুত্রকে বঙ্গ পুনর্জয় করিতে হইয়াছিল। তবে

স্তম্ভলিপির রাজা চন্দ্রকে সঠিকভাবে সনাক্ত করার কোন ইঙ্গিতই ঐ লিপিতে নাই। এমনও হইতে পারে যে তিনি গুপ্তবংশ সম্ভূত ছিলেন না। কোন কোন পণ্ডিত তাঁহাকে সুসুনিয়া লিপিতে উল্লেখিত চন্দ্রবর্মা বলিয়া মনে করেন। যদি এই অনুমান ঠিক হয় তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে পশ্চিম বাংলার রাজা চন্দ্রবর্মা বঙ্গের সম্মিলিত শক্তি পরাস্থ করিয়া সমুদ্রগুপ্তের বিজয়ের পথ সুগম করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত সব সিদ্ধান্তই আনুমানিক। তবে মেহেরাওলি স্তম্ভলিপি হইতে এই সিদ্ধান্ত খুবই সমীচিন যে গুপ্তযুগের প্রাক্কালে বা প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং আত্মরক্ষার জন্য সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থাও তাহারা করিত।

কোন কোন ঐতিহাসিক গুপ্তবংশীয় রাজাদের আদি বাসস্থান বাংলাদেশে ছিল বলিয়া মনে করেন। ডি, সি, গাঙ্গুলী প্রমুখ ঐতিহাসিক এইরূপ অনুমান করিয়াছেন চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং এর বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া। ইৎসিং লিখিয়াছেন যে মহারাজা শ্রীগুপ্ত চৈনিক শ্রমনদের জন্য মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো স্তূপের সন্নিকটে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য ২৪টি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত একটি বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপিতে বরেন্দ্রে অবস্থিত মৃগস্থাপন স্তূপের উল্লেখ আছে। ইৎসিং এর বর্ণনায় দূরত্ব ও দিক বিচারে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ইৎসিং এর সি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো স্তূপ ও এই পাণ্ডুলিপির মৃগস্থাপন স্তূপ এক ও অভিন্ন। সুতরাং বরেন্দ্র বা নিকটবর্তী অঞ্চল শ্রীগুপ্তের রাজ্যসীমা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয় তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে গুপ্তদের আদি বাসস্থান বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিল এবং গুপ্তশাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার কিছু অংশ তাঁহাদের অধীন ছিল।

কিন্তু উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে অন্য কোন প্রমাণ প্রদর্শন করা সম্ভব হয়নি। এমন কি ইৎসিং এর বর্ণনার মধ্যে শ্রীগুপ্তের সময়কালের[১] যে

---

(১) ইৎসিং উল্লেখ করিয়াছেন যে যাঁহার প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে শ্রীগুপ্ত রাজা ছিলেন। এই উক্তির যদি আক্ষরিক অর্থ করা হয় তাহা হইলে শ্রীগুপ্তকে দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া গণ্য করিতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে গুপ্তবংশের সাথে তাঁহাকে সম্পর্কিত করা চলে না। কিন্তু ইৎসিং তো এ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন জনশ্রুতি বা প্রচলিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া। সুতরাং সময়কাল সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি খুব একটা সঠিক না হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

উল্লেখ আছে তাহাতে তাঁহাকে গুপ্তবংশীয় শ্রীগুপ্ত মনে নাও করা যাইতে পারে।

তবে গুপ্ত শাসনের প্রাথমিক কালে বাংলাদেশের কোন অংশ তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও সমুদ্রগুপ্ত যে বাংলাদেশের অধিকাংশ অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নাই। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁহার রাজ্যজয়ের যে বিবরণ আছে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব। আর্যাবর্তে যে সমস্ত রাজাকে সমুদ্রগুপ্ত পরাস্থ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে চন্দ্রবর্মার নাম রহিয়াছে। এই চন্দ্রবর্মাকে উপরে আলোচ্য সুসুনিয়া লিপির পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মা মনে করা হয় এবং তাহার পরাজয় পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় গুপ্ত শাসনের সূচনা করিয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। সমুদ্রগুপ্ত যে বাংলাদেশের সমতট ছাড়া অন্য সব জনপদই সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন তাহাও এলাহাবাদ প্রশাস্তির উল্লেখ হইতে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রত্যন্ত রাজ্য ছিল নেপাল, কর্তৃপুর, কামরূপ, ডবাক এবং সমতট। সমতট, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতল অঞ্চল, গুপ্ত সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য ছিল বলিয়া এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে। সমগ্র উত্তর বাংলা ও যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল তাহার প্রমাণ মিলে পরবর্তীকালের গুপ্ততাম্রশাসনসমূহে এবং এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কামরূপ ও (আসাম) করদরাজ্য হিসাবে উল্লেখিত হওয়াতে।

উত্তরবাংলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন লিপিমালা হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে উত্তরবঙ্গ দীর্ঘকাল গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং এই অঞ্চলে গুপ্ত প্রাদেশিক শাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল পৌণ্ড্রনগর (মহাস্থান)। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমার গুপ্তের ধনাইদহ (গুপ্ত সন ১১৩—৪৩২-৩৩ খৃ:আ:), বৈগ্রাম গুপ্ত সন ১২৮—৪৪৭-৪৮ খৃ:আ:), দামোদরপুর (দুইটি—গুপ্ত সন ১২৪—৪৪৩-৪৪ খৃ:আ: ও গুপ্ত সন ১২৮—৪৪৭-৪৮ খৃ: আ:) তাম্রশাসনসমূহ উত্তর বাংলায় সুনিয়ন্ত্রিত গুপ্ত প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় পরিচয় বহন করে। এই অঞ্চলের শাসনভার ছিল একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপর, তাঁহার অধীনে বিভিন্ন এলাকায় অন্যান্য শাসনকর্তাও ছিল।

ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত উত্তর বাংলায় গুপ্ত শাসন অব্যহত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বুধগুপ্তের (৪৭৬—৪৯৫) খৃ:আ:) দামোদর-পুর, ১৫৯ গুপ্তসনের (৪৭৮-৭৯ খৃ: আ:) পাহাড়পুর এবং ২২৪ গুপ্তসনের

(৫৪৪খৃঃ আঃ) দামোদরপুর তাম্রশাসনসমূহে। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতট অঞ্চল প্রথমদিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী করদ রাজ্য হিসাবে থাকিলেও পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে কোন এক সময়ে এই অঞ্চলও গুপ্ত সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ মিলে ১৮৮ গুপ্ত সনের (৫০৭—০৮ খৃঃ আঃ) গুণাইগড় তাম্রশাসনে। এই তাম্রশাসন দ্বারা দ্বাদশাদিত্য উপাধিকারী মহারাজা বৈন্যগুপ্ত ত্রিপুরা জেলায় ভূমিদান করিয়াছেন। তাঁহার রাজধানী ক্রীপুর সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই। সম্ভবত বৈন্যগুপ্ত গুপ্তরাষ্ট্রেরই সামন্ত-রাজরূপে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করিতেন, পরে গুপ্তরাষ্ট্রে দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তিনি স্বাধীন স্বতন্ত্র নরপতি রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবত বৈন্যগুপ্তের রাজত্বকালে পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলে তাঁহার শাসনকর্তা ছিলেন বিজয়সেন। এই বিজয় সেনই গুণাইগড় তাম্রশাসনের দূতক ছিলেন এবং এই শাসনে তাহাকে মহাপ্রতীহার মহা-পিলুপতি পঞ্চাধিকরণোপরিক এবং মহারাজ শ্রীমহাসামন্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিজয় সেন ও অব্যবহিত পরবর্তী যুগের রাজা গোপচন্দ্রের শাসনকালের পশ্চিম বাংলার বর্ধমানভুক্তির শাসনকর্তা বিজয়সেন একই ব্যক্তি বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। তবে এই অঞ্চলে গুপ্তশাসন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার কোন উপায় নাই।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাংলাদেশ গুপ্তাধিকারভুক্ত ছিল। গুপ্ত-শাসনকালে বাংলাদেশে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন প্রায় সর্বব্যাপীই ছিল। সুবর্ণ মুদ্রার বহুল প্রচলন বাংলাদেশের সমৃদ্ধিরই পরিচায়ক। তাছাড়া অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিরও প্রমাণ মিলে সম-সাময়িক লেখনীতে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসার এই সময়ে অব্যাহত থাকিলেও গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময়ে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের—এখন আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলি—অভ্যুত্থান ও প্রসার লাভ ঘটে। ইহার প্রমাণ মিলে গুপ্ত যুগের বিভিন্ন তাম্রশাসনে। এই শাসন সমূহে ভূমিদান প্রধানত ব্রাহ্মণরাই লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য যাগযজ্ঞ ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজার প্রচলন এবং ব্রাহ্মণদের জন্য নূতন নূতন বসতি স্থাপনের সাক্ষ্যও এই লিপিসমূহে পাওয়া যায়। প্রত্যন্তস্থিত বাংলাদেশ এই যুগে উত্তর-ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক

এবং সংস্কৃতির ধারার সাথে যুক্ত হইল। বাংলাদেশ গুপ্তরাজবংশে প্রায় সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। উত্তর ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের যে বিবর্তন গুপ্তযুগে ঘটিয়াছিল বাংলাদেশেও তাহার ছোঁয়া লাগিয়াছিল। উত্তর বাংলায় প্রাপ্ত অল্প সংখ্যক নিদর্শনে এই বিবর্তনের ছাপ লক্ষণীয় এবং পরবর্তী যুগে পাল ভাস্কর্য শিল্পের উদ্ভবে গুপ্তযুগের এই শিল্পের প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুপ্তোত্তর কাল ও শশাঙ্ক

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর সারা উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় রাজবংশের উদ্ভব হয়। সৌরাষ্ট্রে শুরু হয় বলভীর মৈত্রকদের শাসন। উত্তর ভারতের মধ্যাঞ্চল, রাজপুতানা ও পাঞ্জাবের অংশবিশেষে দেখা দেয় এক বিরাট সমরনায়ক ও দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী, যশোধর্মন। থানেশ্বরে পুষ্যভূতি ও কনৌজে মৌখরি রাজবংশের শাসন শুরু হয়। মগধ ও মালব অঞ্চলে 'পরবর্তী গুপ্তবংশ' নামে পরিচিত গুপ্ত উপাধিধারী এক রাজবংশ ক্ষমতা দখল করে। গুপ্তোত্তরকালে সমস্ত উত্তর ভারতব্যাপী এই রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব বাংলাদেশের ইতিহাসে ও লক্ষণীয়। সমসাময়িক অবস্থার সুযোগে বাংলাদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীতে দুইটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রথম স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে। ইহাই প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য। আর দ্বিতীয় স্বাধীন রাজ্য ছিল পশ্চিম ও উত্তর বাংলা ব্যাপী, যাহা সাধারণ ভাবে গৌড় রাজ্য নামে পরিচিত ছিল।

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে সারা উত্তর ভারতে যশোধর্মন তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার করিতে প্রয়াসী হন। মান্দাসোর লিপিতে তাঁহার প্রশস্তিকার তাঁহার রাজ্যসীমা সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছে[১] তাহা যদি সত্য বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে বাংলাদেশের অংশবিশেষও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে হয়। যশোধর্মনের রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এই সময়ে এবং খুব সম্ভবত গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া যাওয়ার

---

(১) যশোধর্মনের রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে আরব সাগর এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্রগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অবশ্যি এই ধরনের প্রশস্তিতে অত্যুক্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবুও যশোধর্মন যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে আঘাত হানিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুযোগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বা বঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত পাঁচখানি, বর্ধমান জেলার মল্লসারুলে প্রাপ্ত একখানি এবং বালেশ্বর জেলার জয়রামপুরে প্রাপ্ত একখানি—মোট সাতখানি তাম্রশাসনে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন এবং এই উপাধি তাঁহাদের সার্বভৌম ক্ষমতারই পরিচায়ক।

বঙ্গের এই স্বাধীন রাজাদের মধ্যে গোপচন্দ্রই প্রথম ক্ষমতাসীন ছিলেন। তাঁহার মল্লসারুল তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে বর্ধমানভুক্তির (পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চল) শাসনকর্তা ছিলেন বিজয়সেন। বৈন্যগুপ্তের গুনাইগড় তাম্রশাসনের দূতক বিজয়সেন এবং এই বিজয়সেন একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে এবং ইহা হইতে আরও অনুমান করা হয় যে বৈন্যগুপ্তের পর পরই, অর্থাৎ ষ. শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, মহারাজা গোপচন্দ্র বঙ্গে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

গোপচন্দ্রের জয়রামপুর তাম্রশাসনে দণ্ডভুক্তির (দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চল) অন্তর্গত একখানি গ্রাম দান করার উল্লেখ হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে ঐ এলাকা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মল্লসারুল শাসনে বর্ধমানভুক্তির উল্লেখও পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাংশে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া প্রমাণ করে। সুতরাং এই কথা বলা চলে যে গোপচন্দ্রের রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা (বঙ্গ) ও পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাংশ ব্যাপী ছিল।

এই রাজ্যের পরবর্তী রাজা ছিলেন যথাক্রমে ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। সমাচারদেবের স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। গোপচন্দ্র ৩৩ বৎসর[১], ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব যথাক্রমে অন্তত ৩ ও ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন।[২] সম্ভবতঃ এই তিনজন রাজার রাজত্বকাল ৫২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ছিল। প্রাপ্ত উপাদানসমূহে এই রাজাদের সম্বন্ধে তেমন বিশদ কোন বিবরণ নাই। এমনকি তিনজন রাজার পারস্পরিক সম্বন্ধও সঠিক করিয়া নিরূপণ সম্ভব নয়। তবে তাম্রশাসনসমূহ হইতে বঙ্গরাজ্যের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

---

(১) মল্লসারুল তাম্রশাসনের তারিখ প্রথমে পড়া হইয়াছিল ৩। পরে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ইহা সংশোধন করিয়া ৩৩ পড়িয়াছেন।

(২) তাঁহাদের প্রাপ্ত তাম্রশাসনের ভিত্তিতে এই উক্তি করা সম্ভব।

এই রাজ্যের ধ্বংস বা পতন কি করিয়া হইয়াছিল তাহাও জানা যায় না। তবে চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মন ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া চালুক্যরাজের প্রশস্তিতে যে দাবী করা হইয়াছে তাহা সঠিক হইলে বঙ্গ রাজ্যের পতনের পথ ইহাতে সুগম হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিংবা স্বাধীন গৌড় রাজ্যের অভ্যুদয় ও ইহার কারণ হইতে পারে।

স্বাধীন গৌড় রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' বলিয়া পরিচিত গুপ্ত উপাধিধারী রাজাগণ উত্তর বাংলায়, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশে ও মগধে ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই অঞ্চলই গৌড় জনপদ রূপে সুপরিচিত ছিল। ৫৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর বাংলা যে গুপ্ত শাসনাধীন ছিল তাহা দামোদরপুরের একটি তাম্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হয়। এই শাসনে বর্ণিত গুপ্ত রাজা এই পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় ছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এই বংশীয় রাজা মহাসেন গুপ্তও উত্তর বাংলায় তাঁহাদের অধিকার বজায় রাখিয়াছিলেন।

মৌখরি ও পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাগণের মধ্যে প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী পুরুষানুক্রমিক বিবাদ চলিয়াছিল। ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজারা হীনবল হইয়া পড়েন। চালুক্যরাজ কীর্তি-বর্মার আক্রমণ তাঁহাদের ক্ষমতার ভিত্তিতে আঘাত হানে। উত্তর দিক হইতে তিব্বতী রাজা শ্রংসান্ এর আক্রমণ ও হয়তো পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজত্বের বিলুপ্তির পথ সুগম করিয়াছিল। এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন শশাঙ্ক, যিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করেন এবং স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

শশাঙ্ক

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একটি বিখ্যাত নাম। এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে শশাঙ্ক শুধু গৌড়েই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন নাই, বরঞ্চ গৌড়রাজ্যের সীমা মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চলে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এমন কি উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার মতো শক্তিও তিনি অর্জন করেন। তাঁহার

নেতৃত্বেই সর্বভারতীয় বা অন্ততঃ উত্তর-ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলাদেশের প্রথম পদক্ষেপ হয়। সুতরাং শশাঙ্ককে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের প্রথম প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ নরপতি বলিলেও ভুল হইবে না।

শশাঙ্কের বংশ বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। কিংবা তিনি কিভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করেন তাহারও কোন সঠিক নিদর্শণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন রোহিতাশ্বরে (রোহতাসগড়) গিরিগাত্রে একটি সীলের ছাঁচ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক' এর নাম ক্ষোদিত আছে। অনুমান করা হয় যে এই মহাসামন্ত শশাঙ্ক ও গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক একই ব্যক্তি। সেই ক্ষেত্রে মনে করিতে হয় যে গৌড়রাজ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করার আগে শশাঙ্ক মহাসামন্ত ছিলেন এবং খুব সম্ভবত পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় মহাসেনগুপ্তই তাঁহার অধিরাজ ছিলেন। কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে এই সিদ্ধান্ত নেহায়েত আনুমানিক, প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে শশাঙ্ক মৌখরিরাজ্যের অধীন সামন্ত ছিলেন। আবার কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে শশাঙ্কের অপর নাম ছিল নরেন্দ্রগুপ্ত এবং তিনি গুপ্তবংশের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। তবে এই ধরনের মতবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় শশাঙ্ককে মহাসেনগুপ্তের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া মতপোষণ করিয়াছেন এবং এই মতের পক্ষেও তেমন কোন প্রমাণ নাই।

যাহা হউক, এই কথা স্পষ্ট যে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন এক সময়ে শশাঙ্ক গৌড় রাজ্যে ক্ষমতাসীন হন। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ—বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'রাঙ্গামাটি'। বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশ শশাঙ্কের রাজ্যাধীন ছিল। এই এলাকায় পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের শাসনের অবসানের পরই শশাঙ্কের উদ্ভব। তবে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা তাহা সঠিক করিয়া বলা সম্ভব নয়; দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সমসাময়িক কালে ভিন্ন রাজবংশের কথা কিছু কিছু তথ্য হইতে চিন্তা করা সম্ভব। (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহের উপর এক পরিচ্ছেদে এই বিষয় আলোচিত হইবে) শশাঙ্কের রাজত্বের প্রথম হইতেই মগধ (দক্ষিণ বিহার) অঞ্চল তাঁহার অধিকার ছিল। শশাঙ্ক প্রথম হইতেই তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দক্ষিণ-

পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যে তাঁহার রাজ্য দক্ষিণে উড়িষ্যার চিল্‌কা হ্রদ পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ৬১৯ খৃষ্টাব্দের গঞ্জম তাম্রশাসনে। এই তাম্রশাসনের সাক্ষ্যে এই কথা বলা চলে যে ঐ সময়ে কঙ্গোদের শাসনকর্তা শৈলোদ্ভব বংশীয় মহারাজ মহাসামন্ত শ্রীমাধবরাজ শশাঙ্ককে অধিরাজ রূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রাচীন কঙ্গোদের সীমা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হইলেও বলা চলে যে চিল্‌কা হ্রদ পার্শ্বস্থ এলাকা, এমনকি গঞ্জাম জেলার অংশ ও কঙ্গোদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং উড়িষ্যার সমগ্র উত্তরাঞ্চল শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। তাহা হইলে বাংলা-উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী এলাকাও শশাঙ্ক মান রাজবংশের নিকট হইতে জয় করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক কর্তৃক দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তারের বিস্তারিত বিবরণের অভাবে এই বিজয় অভিযান সম্বন্ধে আমরা আর বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই।

তবে উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে শশাঙ্কের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সম্বন্ধে জানিবার যথেষ্ট উপাদান রহিয়াছে। উত্তর-ভারতে শশাঙ্কের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মহারাজা হর্ষবর্ধন। তাই বাণভট্টের হর্ষচরিত ও তাঁহার সমসাময়িক চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাং এর বিবরণীতে শশাঙ্কের উত্তর-ভারত অভিযান সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে। শশাঙ্ক কর্তৃক উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মৌখরিদের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ। কারণ গৌড়-মগধের পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের সাথে মৌখরিরাজাদের বংশানুক্রমিক শত্রুতা ছিল। ফলে গৌড়-মগধ রাজ্যের অধিকর্তা হিসাবে শশাঙ্ককে ঐ শত্রুতার জের স্বাভাবিক ভাবেই টানিতে হইবে। তদুপরি সমসাময়িক সময়ে কনৌজের মৌখরি রাজা থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজার সাথে বৈবাহিক সূত্রে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। মৌখরিরাজ গ্রহবর্মন পুষ্যভূতি রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই বন্ধুত্ব মৌখরি রাজার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাঁহার জন্য বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে তিনি ও কূটনৈতিক সূত্রে মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করেন। শশাঙ্ক খুব সম্ভবত তাঁহার রাজ্যসীমা বারানসী পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন। থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের অসুস্থতার সুযোগে মালবরাজ দেবগুপ্ত মৌখরিরাজ গ্রহবর্মনকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহার স্ত্রী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে বন্দী

করেন। দেবগুপ্ত নিজ সাফল্যে উল্লাসিত হইয়া মিত্রশক্তি শশাঙ্কের আগমনের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই পরবর্তী পর্যায়ে থানেশ্বর রাজ্য আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই সংবাদ পাইয়া থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন (প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন) ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে কনৌজের দিকে যাত্রা করিলেন এবং ছোটভাই হর্ষবর্ধনকে রাজধানীতে রাখিয়া যান।

পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করিতে সক্ষম হন, কিন্তু কনৌজের উপর নিজ প্রভুত্ব বিস্তার ও ভগ্নী রাজ্যশ্রীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার আগেই তিনি শশাঙ্কের হাতে মৃত্যু বরণ করেন। খুব সম্ভবত শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সাহায্যের জন্য নিজ সৈন্য লইয়া কনৌজ পর্যন্ত আসিযাছিলেন। শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধনের হত্যা সম্বন্ধে সমসাময়িক তথ্যে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। বাণভট্ট হর্ষচরিতে লিখিয়াছেন যে গৌড়ের রাজার মিথ্যা উপাচারে আশ্বস্ত হইয়া নিরস্ত্র রাজ্যবর্ধন একাকী গৌড়ের রাজার ভবনে গমন করেন এবং তৎকর্তৃক নিহত হন। বাণভট্টের উক্তিতে রাজ্যবর্ধন যে কেন শত্রুর কাছে অসহায় অবস্থায় গমন করিয়াছিলেন তাহার কোন ব্যাখ্যা নাই। হর্ষচরিতের টীকাকার চতুর্দশ শতাব্দীর শঙ্কর শশাঙ্ক কর্তৃক নিজ কন্যাকে রাজ্যবর্ধনের কাছে বিবাহের প্রলোভনের কথা উল্লেখ করিয়া ইহার একটা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় সাতশত বৎসর পর শঙ্কর এই ধরনের প্রলোভনের কথা কোথায় পাইলেন? সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। সমসাময়িক চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাংএর বিবরণেও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর ব্যাপারে একই রকমের স্পষ্টতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। হিউয়েন সাং এর বর্ণনায় এক জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে শশাঙ্কের মন্ত্রীবর্গ রাজ্যবর্ধনকে একসভায় আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন, কারণ শশাঙ্ক প্রায়ই তাহাদিগকে বলিতেন যে সীমান্তবর্তী ধার্মিক রাজা রাজ্যবর্ধনের উপস্থিতি তাঁহার রাজ্যের জন্য কল্যাণকর নয়। এই উক্তিও তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। অন্যত্র হিউয়েন সাং লিখিয়াছেন যে রাজ্যবর্ধনের মন্ত্রীগণের দোষেই রাজ্যবর্ধন শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছেন, মন্ত্রীরাই ইহার জন্য দায়ী। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে যে বাণভট্টের উক্তি ও হিউয়েন্ সাং এর বিবরণে কোন মিল নাই। এই সম্বন্ধে তৃতীয় আর একটি উৎসে উল্লেখ আছে। হর্ষবর্ধনের শিলালিপিতে

বলা হইয়াছে যে 'সত্যানুরোধে' (প্রতিজ্ঞা রক্ষাকল্পে) রাজ্যবর্ধন শত্রু ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই তিনটি তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া অনেক ঐতিহাসিকই শশাঙ্ককে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের দোষে দোষী করিয়া রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বাণভট্ট ও হিউয়েন্ সাং উভয়ই শশাঙ্কের বিপক্ষীয়। সুতরাং তাহাদের উক্তিকে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করিতে হইবে। তাছাড়া তাহাদের উক্তিতেও তেমন কোন মিল নাই এবং উভয়ের উক্তিতেই অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। তাহাদের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া শশাঙ্ককে বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারী রূপে গ্রহণ করা কি যুক্তি সঙ্গত হইবে? রাজ্য-বর্ধন কনৌজেব দিকে অগ্রসর হইবার পথে শশাঙ্কের সাথে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন এমন মনে করাও অসঙ্গত নয়। কিংবা তাঁহার মন্ত্রীবর্গের ষড়যন্ত্রে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন এমনও মনে করা যাইতে পারে। হিউয়েন্ সাং এর উক্তিতে তাহারই উল্লেখ রহিয়াছে। রাজ্য-বর্ধন বৌদ্ধ ছিলেন, সেই কারণে তাঁহার মন্ত্রীবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে এমন মনে করাও খুব অস্বাভাবিক নয়। যাহা হউক আপাততঃ রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণেব কোন উপায় নাই এবং শশাঙ্ককে কলঙ্কিত করাও বোধহয় ঠিক হইবে না।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু শশাঙ্ককে উত্তর-ভারতে ক্ষমতা বিস্তারের পূর্ণ সুযোগ করিযা দিল। কিন্তু তিনি নিজ ক্ষমতা অধিক বিস্তার করিবার অভিলাষ ত্যাগ করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। মৌখরিদের পতন ঘটাইয়া তিনি তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শশাঙ্ককে শাস্তিদান ও পৃথিবী গৌড়শূন্য করিবার শপথ করিয়া বিপুল সমর-সজ্জা শুরু করিলেন। হর্ষ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে সেনাপতি ভণ্ডির কাছে শুনিলেন যে তাঁহার ভগ্নি রাজ্যশ্রী কনৌজের কারাগার হইতে পলাইয়া বিন্ধ্যপর্বতে প্রস্থান করিয়াছেন। এই সময়ে কামরূপরাজ ভাস্কর-বর্মার দূতের সাথে তাঁহার সাক্ষাৎ হয এবং উভয়ের শত্রু শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁহারা একক প্রতিরোধ করিবার এক চুক্তি সম্পাদন করেন। সেনাপতি ভণ্ডিকে সৈন্যসহ অগ্রসর হইবার আদেশ দিয়া হর্ষবর্ধন ভগ্নীর সন্ধানে বিন্ধ্য-পর্বতাঞ্চলে গমন করেন। সেখানে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিয়া তিনি গঙ্গা নদীর তীরে নিজ সৈন্যের সাথে মিলিত হন। ইহার পর হর্ষবর্ধনের

সৈন্যদলের অগ্রগতি, কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সাথে তাঁহার মিত্রতা এবং শশাঙ্কের সাথে তাঁহার সংঘর্ষের ফলাফল বা আদৌ কোন সংঘর্ষ হইয়াছিল কিনা সেই বিষয়ে সঠিকভাবে জানার কোন উপায় নাই। কারণ বাণভট্টের গ্রন্থে পরবর্তী ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। হিউয়েন্ সাং-এর বিবরণীতেও তেমন কোন সূত্র নাই। হিউয়েন্ সাং শুধুমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে ছয় বৎসরকাল যুদ্ধ করিয়া হর্ষ সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। এই উক্তিতে যে অতিরঞ্জন রহিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাহা ঐ বৎসরে উৎকীর্ণ গঞ্জম তাম্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হয়। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত শশাঙ্ক যে স্বীয় রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহার প্রমাণ হিউয়েন্ সাং এর উক্তিতেই রহিয়াছে। হিউয়েন্ সাং বলিয়াছেন যে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল আগে শশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন এবং নিকটবর্তী মন্দির হইতে বুদ্ধ মূর্তি সরাইয়া নিয়াছিলেন। ইহার ফলে শশাঙ্কের সারা দেহে ক্ষত হয়, মাংস পচিয়া যায় এবং অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই উক্তি হইতে এই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অল্পকালপূর্ব পর্যন্ত শশাঙ্ক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অল্পকাল পরেই (অর্থাৎ ৬৩৭ এর অল্পকাল আগে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

শশাঙ্কের সহিত হর্ষবর্ধনের কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কিনা তাহাও নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না। কেবলমাত্র 'আর্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক এক বৌদ্ধ গ্রন্থে যে উল্লেখ আছে তাহাতে এ ব্যাপারে কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি কোন মতেই প্রামানিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করা যায় না। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে কিছু কিংবদন্তীর সমাবেশ। তাছাড়া এই গ্রন্থে ভবিষ্যৎবাণীর আকারে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ আছে এবং সব নামই হয় নামের প্রথম অক্ষর বা সমার্থিক শব্দ দ্বারা লিখা হইয়াছে। এই গ্রন্থের রাজা 'সোম' সম্ভবত শশাঙ্ক এবং তাঁহার শত্রু 'হ' রাজা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'র' রাজা যথাক্রমে হর্ষবর্ধন ও রাজ্যবর্ধন। নাম সম্বন্ধে উপরোক্ত অনুমান ধরিয়া লইয়া আমরা এই গ্রন্থে নিম্নের বিবরণ পাই :

এই সময়ে মধ্যদেশে বৈশ্যজাতীয় রাজ্যবর্ধন রাজা হইবেন। তিনি শশাঙ্কের তুল্য শক্তিশালী হইবেন। নগ্নজাতীয় রাজার হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইবে। অসাধারণ পরাক্রমশালী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন বহু সৈন্যসহ শশাঙ্কের রাজধানী পুণ্ড্রনগরীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি দুর্বৃত্ত শশাঙ্ককে পরাজিত করেন এবং ঐ বর্বর দেশে যথোপযুক্ত সম্মান না পাওয়ায় (মতান্তরে পাইয়া) স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই উক্তিতে সত্য ঘটনা কতখানি আছে তাহা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবুও যদি ইহাকে সত্য বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, হয়তো কিছু সাফল্যও তিনি অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। গঞ্জাম লিপির প্রমাণে দেখা যায় ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক নিজ রাজ্যে অক্ষুণ্ন ছিলেন। আর হিউয়েন্ সাং-এর বিবরণ হইতে মনে হয় শশাঙ্ক ৬৩৭ এর অল্পকাল পূর্ব পর্যন্তও নিজ রাজ্যে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং হর্ষবর্ধন ও তাঁহার মিত্র ভাস্করবর্মার বিরুদ্ধে শশাঙ্ক নিজ অবস্থা অক্ষুণ্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যদি হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিতেন, তাহা হইলে হিউয়েন্ সাং তাহা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতেন।

সামন্ত রূপে জীবন শুরু করিয়া ৬০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শশাঙ্ক স্বাধীন গৌড়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়, মগধ, উৎকল ও কঙ্গোদের উপর তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন এবং দেবগুপ্তের সাথে সহযোগিতায় গৌড়ের শত্রু মৌখরিদের পরাস্থ করিতে সক্ষম হন। ইহার ফলে তিনি উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাজশক্তি ও উহার মিত্র, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের হর্ষবর্ধন ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সাথে সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়েন। তবে এই মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে স্বীয় রাজ্য অক্ষুণ্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবং ইহাও শশাঙ্কের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিবার জন্য তেমন কোন ঐতিহাসিক উৎস বাংলাদেশে নাই। থাকিলে হয়তো তাঁহার কৃতিত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত এবং তাঁহার খ্যাতি সমসাময়িক রাজা হর্ষবর্ধনের ন্যায়ই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত।

শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। হিউয়েন্ সাং তাঁহার বৌদ্ধ বিদ্বেষ ও বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের নানান গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজকের কাহিনীতে কতটুকু সত্যতা আছে বলা কঠিন। তবে শৈব ধর্মাবলম্বী শশাঙ্ক স্বভাবতই শৈব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁহার এই পৃষ্ঠপোষকতা হয়তো বৌদ্ধধর্মের প্রসার কিছুটা রোধ করিয়াছিল। ফলে হিউয়েন্ সাং এর উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তাই তিনি হয়তো শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ বিদ্বেষ ও বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের

অপবাদ রচনা করিয়াছেন। একমাত্র হিউয়েন্ সাং এর উপর ভিত্তি করিয়া শশাঙ্কের উপর অপবাদ চাপাইয়া দেওয়া হয়তো ঠিক হইবে না।

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁহার সম্বন্ধে যদিও আমরা খুব অল্পই জানিতে পারি, তবুও প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি তিনিই ছিলেন এই কথা বলিলে ভুল হইবে না। তাঁহার নেতৃত্বেই বাংলা সর্বপ্রথম উত্তর-ভারতীয় রাজনীতিতে লিপ্ত হইবার মতো ক্ষমতা ও বল সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়। উত্তর-ভারতীয় শক্তির বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হওয়া শশাঙ্কের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অরাজকতার যুগ ও পাল বংশের উদ্ভব

শশাঙ্কের রাজত্বের পর বাংলার ইতিহাস প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিলেও চলে। তথ্যের অভাবে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল হইতে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের পরিলেখ রচনা করাই কঠিন। আনুমানিক ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন্ সাং বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বর্ণনায় কজঙ্গল (রাজমহলের নিকট), পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি—এই পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের কথা উল্লেখিত আছে। আর্য-মঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাষ্ট্রে অন্তর্বিদ্রোহের ফলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। আনুমানিক ৬৪১ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেন এবং ৬৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি কজঙ্গল রাজ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। নিধনপুর তাম্রশাসনের উপর ভিত্তি করিয়া বলা যায় যে হর্ষবর্ধনের মিত্র কামরূপরাজ্য ভাস্করবর্মা গৌড় সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ জয় করিয়াছিলেন। তিনি কর্ণসুবর্ণও স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার বিরোধী মিত্রশক্তিদ্বয় তাঁহার সাম্রাজ্য নিজ নিজ রাজ্যভুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। চৈনিক ও তিব্বতী সূত্রে জানা যায় যে তিব্বতীয় রাজা ওযাং হিওয়েন্ সে (৬৪৭—৪৮ খৃঃ) ও তাঁহার উত্তরাধিকারী স্রন্-সান্-গম্‌পো দুইবার বাংলাদেশে তাহাদের বিজয়াভিযান চালাইয়াছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে দুইটি রাজ বংশের উদ্ভবের কথা জানা যায়। গৌড় ও মগধে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় আদিত্যসেন ও তাঁহার তিনজন উত্তরাধিকারীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বঙ্গে খড়্গ বংশ সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করে।[১] আশরাফপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনসমূহে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়।

(১) দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহের উপর পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

কিন্তু উভয় রাজবংশই বেশীদিন তাঁহাদের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশ যে একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণে পরাভূত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর ভারতীয় শৈল বংশীয় এক রাজা পুণ্ড্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। অল্পকাল পরেই আসে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মার (৭২৫—৭৫২ খৃঃ আঃ) আক্রমণ। এই বিজয়াভিযান বাক্‌পতি রচিত গৌড়বহো গ্রন্থের বিষয়বস্তু। যশোবর্মা গৌড়—মগোধাধিপতিকে হত্যা করেন এবং বঙ্গ জয় করেন। বাক্‌পতির বর্ণনায় বঙ্গরাজের বিপুল শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। খুব সম্ভবত বঙ্গের খড়গ বংশীয় রাজা রাজভট যশোবর্মার হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ের রাজা কে ছিলেন সেই বিষযে মতবিরোধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি শৈল বংশীয় ছিলেন; আবার কেহ কেহ মনে কবেন যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত।

যশোবর্মার গৌড়-বঙ্গে অধিকার খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। কাশ্মীর বাজ ললিতাদিত্য যশোবর্মাকে পরাজিত করেন। তিনি গৌড়ের উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কহ্লন রচিত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় গৌড়ের পাঁচজন বাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং পুণ্ড্র নগরে আসিয়াছিলেন বলিয়া এই গ্রন্থে যে উল্লেখ আছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও ইহাতে কিছু সত্য হয়তো অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। গৌড়ের পাঁচজন রাজাব উল্লেখ খুব সম্ভবত ঐ সময়ে গৌড়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিয়োজিত অবস্থার পরিচয় বহন করে। কোন কেন্দ্রীয় শাসনের অভাবে খণ্ড বিখণ্ড স্থানীয় শাসনের কথা অনুমান করা যাইতে পারে।

ভগদত্ত বংশীয় কামরূপরাজ শ্রীহর্ষ গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার জামাতা নেপালের লিচ্ছবিরাজ জয়দেবের শিলালিপিতে। তবে ললিতাদিত্য বা শ্রীহর্ষের বিজয়াভিযান বঙ্গেও পৌঁছিয়াছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

উপর্যুপরি বিদেশী শত্রুর আক্রমণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভারসাম্য বহুলাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অস্থিরতার প্রমাণ মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষেও মিলে। বৈরাগী ভিটায় খননে পাল ও গুপ্ত যুগের অন্তবর্তী স্তরে স্তূপাকার ধ্বংসাবশেষ এই অস্থির অবস্থারই সাক্ষ্য দেয়।

উপরের আলোচনা হইতে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে শশাঙ্কের পরবর্তী শতাব্দীকাল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক হতাশার যুগ। এই সময়ে কোন স্থায়ী শাসন গড়িয়া উঠার সুযোগ পায় নাই। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ তো ছিলই, তদুপরি বিদেশী আক্রমণ এই সময়ে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাকে আরও বাড়াইয়াছে, এই অরাজকতাই পাল তাম্রশাসনে 'মাৎস্যন্যায়' বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছে। কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে 'মাৎস্যন্যায়' এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ দণ্ডধরের অভাবে যখন বলবান দুর্বলকে গ্রাস করে, অর্থাৎ মাছের রাজত্বের মত, সেখানে বড় মাছ ছোট মাছকে ভক্ষণ করে। প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে বাংলার রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বাংলাদেশে কোন শাসন-ব্যবস্থাই বিদ্যমান ছিল না বলিলেও ভুল হইবে না। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতী ভাষায় লিখিত ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে লামা তারনাথ এই সময়ের বাংলাদেশের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে এই 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায়। তারনাথ লিখিয়াছেনঃ সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্তলোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ গৃহে ও আশেপাশের এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন।

এই অরাজকতার মধ্য হইতেই পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল বাংলার রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ধর্মপালের রাজত্বকালের খালিমপুর তাম্রশাসনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে তিনি 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থার অবসান করিয়াছিলেন। গোপালের ক্ষমতালাভ সম্বন্ধে খালিমপুর তাম্রলিপিতে যে শ্লোকটি আছে তাহা নিম্নরূপঃ তাহার ছেলে শ্রীগোপালকে, যিনি রাজাদের মধ্যে মুকুট মণি ছিলেন, মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটাইবার জন্য প্রকৃতিগণ লক্ষ্মীর হাত গ্রহণ করাইয়াছিল।

তারনাথ গোপালের উত্থান সম্বন্ধে এক রূপকথার কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার কাহিনীর সারমর্ম এই যে দেশে বহুদিন যাবৎ অরাজ-কতার ফলে জনগণের দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া রাজ্যে আইনানুগ শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে একজন রাজা "নির্বাচিত" করেন। কিন্তু নির্বাচিত রাজা রাত্রিতে এক কুৎসিত নাগ রাক্ষসী কর্তৃক নিহত হয়। ইহার পর প্রতি রাত্রিতে একজন করিয়া 'নির্বাচিত' রাজা নিহত হইতে থাকেন। এইভাবে বেশ কয়েক বৎসর গত হইয়া যায়। অবশেষে একদিন চুণ্ডাদেবীর এক ভক্ত এক বাড়ীতে আসে। সেই বাড়ীর

সকলে খুব বিষণ্ন। কারণ ঐদিন 'নির্বাচিত' রাজা হইবার ভার পড়িয়াছে ঐ বাড়ীরই এক ছেলের উপর। আগন্তুক ঐ ছেলের স্থানে রাজা হইতে রাজী হন এবং সকাল বেলা তিনি রাজা 'নির্বাচিত' হন। সেই রাত্রিতে নাগ রাক্ষসী আসিলে তিনি চুণ্ডাদেবীর মহিমাযুক্ত এক লাঠি দিয়া তাহাকে আঘাত করেন, রাক্ষসী মরিয়া যায়। পরের দিন তাহাকে জীবিত দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল। পর পর সাতদিন তিনি এইভাবে রাজা 'নির্বাচিত' হইলেন। অতঃপর তাঁহার অদ্ভুত যোগ্যতার জন্য জনগণ তাঁহাকে স্থায়ী রাজা রূপে 'নির্বাচিত' করিল এবং তাঁহাকে গোপাল নাম দেওয়া হইল।

উপরে উদ্ধৃত খালিমপুর লিপির শ্লোক ও তারনাথের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া অধিকাংশ ঐতিহাসিক গোপালকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাজা বলিয়া মনে করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া আরও বলিয়াছেন: "এই চরম দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তি লাভের জন্য বাঙালী জাতি যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।............এইরূপে কেবলমাত্র দেশের মঙ্গলেব দিকে চাহিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন পূর্বক সর্বসাধারণে মিলিয়া কোন বৃহৎ কার্য অনুষ্ঠান যেমন বাঙালীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না, বর্তমান ক্ষেত্রে এই মহান স্বার্থত্যাগ ও ঐক্যের ফলে বাঙালীর জাতীয় জীবন যে উন্নতি ও গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তও বাংলার ইতিহাসে আর নাই। ১৮৬৭ অব্দে জাপানে যে গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কার্য-কারণ ও পরিণাম বিবেচনা করিলে তাহার সহিত সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে গোপালের রাজপদে নির্বাচনের তুলনা করা যাইতে পারে।"[১]

এই মন্তব্যতে কিছুটা অত্যুক্তি আছে তাহা সহজেই অনুমেয়। অষ্টম শতাব্দীর বাংলাদেশে গণনির্বাচনের কথা চিন্তা করা নিশ্চয়ই কালানুচিৎ হইবে। স্বার্থসংঘাতে জর্জরিত অবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মধ্যে হঠাৎ করিয়া বাংলার জনগণের মধ্যে শুভবুদ্ধি উদয়, এবং বাংলার ইতিহাসে পূর্বেও ঘটে নাই বা পরেও ঘটে নাই এমন এক মহৎ কার্য তাহারা সাধন করিয়াছিল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে—এই রকম চিন্তা

(১) রমেশচন্দ্র মজুমদার: বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৭, পৃঃ ৪০।

করাই হয়তো অনৈতিহাসিক হইবে। প্রশ্ন হইতেছে যে আমাদের কাছে যেসব উৎস রহিয়াছে তাহা হইতে কি এই ধরনের সিদ্ধান্ত করা সম্ভব?

তারনাথের কাহিনী তো শিশুদের রূপকথার গল্পের মতো। এই কাহিনীতে রূপক হলে কিছু ঐতিহাসিক সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু আক্ষরিকভাবে এই কাহিনীর উপর বিশ্বাস করিয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না। তা ছাড়া সমর্থনকারী অন্য কোন উৎস না থাকিলে তারনাথের উক্তিসমূহ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ঐতিহাসিকগণ এই ক্ষেত্রে সমর্থন খুঁজিয়াছেন খালিমপুর লিপির শ্লোক। সুতরাং খালিমপুর লিপির শ্লোকটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থার অবসানের জন্য 'প্রকৃতিগণ' গোপালকে রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। 'প্রকৃতি' শব্দ বিশেষ অর্থে 'জনগণ' বা 'প্রধান কর্মচারী' বুঝায়। কিন্তু অরাজকতার অবস্থায় জনগণের একমত হওয়া ও নির্বাচন অনুষ্ঠানেব কথা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিংবা কেন্দ্রীয় কোন শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে প্রধান কর্মচারীগণেরও নির্বাচন করার প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে আলোচ্য শ্লোকে ব্যবহৃত 'প্রকৃতি' শব্দেব প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করাই কঠিন। মনে হয় এই শব্দের কোন রূপক বা অনাক্ষরিক অর্থ রহিয়াছে এবং তাহা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

এই শ্লোকের অন্য রকম ব্যাখ্যা করা সম্ভব। হয়তো গোপাল কয়েকজন 'প্রকৃতি'র (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা কর্মচারী, যাহারা তাঁহার অনুগামী ছিল) সাহায্য লাভ করিয়া ক্ষমতা দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সাফল্যই অরাজকতার অবসান ঘটাইয়াছিল। অরাজকতার মধ্যে কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোকের সহযোগিতা সংগ্রহ করা এবং তাহাদের সাহায্যে বলীয়ান হইয়া অন্যান্যদের পরাস্ত করিয়া ক্ষমতা দখল করা এবং অরাজকতার অবসান করা খুব অস্বাভাবিক নয়। এই ঘটনাই সভাকবি রূপক ভঙ্গিতে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন খালিমপুর তাম্রশাসনের শ্লোকে। মনে হয় তারনাথের কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ঐতিহাসিকগণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'নির্বাচন' এর পক্ষে। তবে যদি তারনাথের কাহিনীকে আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে প্রতিদিনই একটি নির্বাচনের কথা ভাবিতে হইবে। তাহা খুবই অযৌক্তিক। তারনাথ তিব্বতী ভাষায় যে শব্দ

ব্যবহার করিয়াছেন এবং যে শব্দ ঐতিহাসিকগণ অত্যন্ত সহজভাবে নির্বাচন বলিয়া অর্থ করিয়াছেন, সেই শব্দের অর্থ সাধারণভাবে নিয়োগ করা বা অর্জিত করাও হইতে পারে। তারনাথের রূপক কাহিনীর অন্তর্নিহিত অর্থ ইহাও হইতে পারে যে গোপাল অরাজকতার অনিষ্ঠকর শক্তিকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং এই সাফল্যই তাঁহাকে ক্ষমতাসীন করিয়াছিল এবং তাঁহার সমর্থক সৃষ্টি করিয়াছিল। তারনাথের কাহিনীর এইরূপ অর্থকরা এবং খালিমপুর তাম্রশাসনের শ্লোকের আমরা উপরে যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহা উভয়ই খুব অসঙ্গত নয়। সুতরাং গোপাল একজন সমর নেতা হিসাবে কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহায়তায় অরাজকতার অশুভ শক্তিগুলিকে পরাস্ত করিয়া ক্ষমতাসীন হইয়াছিলেন। তাঁহার সাফল্যই তাঁহার জন্য বিপুল সমর্থন যোগাইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে গণনির্বাচনের কথা চিন্তা করা যেমন অযৌক্তিক তেমনি উপরে আলোচিত উৎস সমূহে এমন কোন স্পষ্ট ইংগিত নাই যাহা হইতে আমরা নির্বাচনের কথা ভাবিতে পারি। নির্বাচন ঘটিয়া থাকিলে পাল শাসনাবলীতে প্রাপ্ত প্রশস্তিসমূহে ইহা আরও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হইবে—এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক এবং ইহার প্রতিধ্বনি পুরুষানুক্রমে ঘোষণা করা হইতো সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উল্লেখে স্পষ্টতার অভাব এবং পরবর্তী কালে এই ঘটনার কোন উল্লেখের অনুপস্থিতি এই কথাই প্রমাণ করে যে এই ঘটনা খুব সম্ভবত ঘটে নাই।

বরঞ্চ গোপালের উদ্ভব সম্বন্ধে আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহার পক্ষে পরবর্তী পাল রাজাগণের বিভিন্ন তাম্রশাসনে প্রাপ্ত একটি শ্লোকের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্লোকটিতে[১] বলা হইয়াছে যে গোপাল, যেই সব লোক তাহাদের নিজ নিজ ইচ্ছা মতো কাজ করিতেছিল তাহাদের শক্তি খর্ব করিয়া, শাশ্বত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে গোপাল কর্তৃক অরাজকতার অশুভ শক্তিসমূহকে পরাস্ত করিবার ইঙ্গিত রহিয়াছে। তিব্বতী ঐতিহাসিক বুস্তন বলিয়াছেন যে গোপাল সমগ্র রাজ্যে রাজ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন নিজ গুণবলে। এই উক্তিতে আমাদের মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

(১) এই শ্লোকটি প্রথম দেখা যায় নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে। পরে একই শ্লোক মহীপালের বানগড়, তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি ও মদনপালের মনহলি তাম্রশাসনসমূহে স্থান পাইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার জনগণ কর্তৃক এক নির্বাচনের মাধ্যমে গোপাল ক্ষমতাসীন হইয়াছিলেন এইরূপ মনে করার পক্ষে তেমন কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। বরঞ্চ উৎসসমূহে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব এবং এই ব্যাখ্যা কালের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

গোপালের বংশ পরিচয় বা পালবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা সঠিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি না। একমাত্র খালিমপুর তাম্রলিপিতে গোপালের পিতা বপ্যট (যাঁহাকে 'শত্রু ধ্বংসকারী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে) এবং পিতামহ দয়িতবিষ্ণুর (যাঁহাকে বলা হইয়াছে 'সর্ববিদ্যা—বিশুদ্ধ') নাম উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ হইতে মনে হয় যে গোপালের পিতা বপ্যট যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন এবং খুব সম্ভবত গোপালও পিতার ন্যায় সুনিপুণ যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কারণ অরাজকতার অবসান করিয়া ক্ষমতা দখল করিতে হইলে যুদ্ধবিদ্যারই প্রয়োজন বেশী। তবে পরবর্তী পালরাজাগণ তাঁহাদের তাম্রলিপিসমূহে গোপালের পিতা বা পিতামহের কথা আর উল্লেখ করেন নাই। খুব সম্ভবত গোপাল ও তাঁহার বংশধরদের তুলনায় তাঁহাদের তেমন কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন নাই।

পাল রাজাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যেমন কোন সঠিকতা নাই, তেমনি তাঁহাদের আদি রাজ্য, যেখানে তাঁহারা প্রথম ক্ষমতা বিস্তার করেন, সে সম্বন্ধেও কোন সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। প্রায় চারিশত বৎসর পরে সন্ধ্যা-করনন্দী বিরচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে বরেন্দ্র (উত্তর বাংলা) পাল রাজাদের 'জনকভূ' (পিতৃভূমি) বলিয়া উল্লেখ আছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্র লিপিতে ও ঐ একই ইঙ্গিত আছে। প্রথম মহীপালের বানগড় তাম্র-লিপিতে যে 'রাজ্যম্‌পিত্র্যম্‌' এর উল্লেখ আছে তাহাও উত্তরবঙ্গ বলিয়া মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই সব তথ্য হইতে ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে যে উত্তরবঙ্গ পালবংশের বা গোপালের আদি বাসস্থান ছিল এবং এই অঞ্চলেই তাঁহারা প্রথম ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিক সাধারণ ভাবে উক্তি করিয়াছেন যে পালগণ বঙ্গ অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল এবং সমস্ত বাংলাদেশে তাঁহাদের আধিপত্য প্রথম হইতেই ছিল। যে সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে উৎসের অভাবে তেমন কোন স্পষ্টধারণা করা সম্ভব ছিলনা

সেই সময়ে এই ধরণের সাধারণ উক্তি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করা যাইত। কিন্তু ইদানিং কালে, বিশেষ করিয়া ময়নামতীতে প্রাপ্ত উপাদান-সমূহ হইতে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে অনেকটা স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। বর্তমানে অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেব রাজ-বংশের অবস্থিতি প্রমাণিত হইয়াছে। ফলে ঐ ধরণের সাধারণ উক্তি এখন আর গ্রহণযোগ্য মনে করা যায় না। তাহা ছাড়া প্রাথমিক পাল রাজাদের যে সমস্ত লিপি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সবই বিহার হইতে প্রকাশিত এবং ঐ সব লিপিতে যে সব ভূমিদানের উল্লেখ আছে সব ভূমিই হয় বিহার, না হয় উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত। দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালের আগে কোন পালরাজার কোন লিপিই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কোন জায়গায় পাওয়া যায় নাই। এমন কি এই লিপি ক্ষোদিত মূর্তি বহিরাগত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। (এই সম্বন্ধে পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইবে) সুতরাং পালবংশের প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় (বঙ্গে) তাঁহাদেব আধিপত্য ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করার পিছনে তেমন কোন যুক্তি নাই। দেব রাজবংশের অবস্থিতি ঐ অঞ্চলের পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে। 'রামচরিত' গ্রন্থ, বাণগড় ও কমৌলি তাম্রলিপির সাক্ষ্যে বলা যায় যে পালদের আদি বাসস্থান ছিল উত্তর বাংলায়। আর্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে পরবর্তী গুপ্তদের অধীন গৌড় রাজ্যেই অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম বাংলায় গোপালের উত্থান হইয়া-ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ের তাম্রশাসনে এই অঞ্চলে ভূমিদান এই কথাই প্রমাণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ের সব কয়টি তাম্রশাসনই প্রকাশিত হইয়া-ছিল বিহারে অবস্থিত জয়স্কন্ধবারসমূহ হইতে। সুতরাং মনে হয় উত্তর উত্তর-পশ্চিম বাংলা ও বিহারের দক্ষিণাংশ (অর্থাৎ মগধাঞ্চল) প্রাথমিক পর্যায়ে পাল-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এই সময়ে পাল আধিপত্যের কোন নিঃসন্দেহ প্রমাণ নাই।

পালবংশের বিভিন্ন তাম্রশাসনে গোপাল সম্বন্ধে তেমন কোন বিশদ বর্ণনা নাই। তাঁহাকে কেবল অরাজকতার অবসান করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পালবংশের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশংসা করা হইয়াছে। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনের তিনটি শ্লোকে গোপালকে সাধারণভাবে প্রশংসা করা হইয়াছে এবং তাঁহার সামরিক শক্তির উল্লেখ আছে। তারনাথ গোপাল কর্তৃক মগধ জয়ের কথা বলিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দী বা কিছুকাল পূর্ব

হইতেই মগধ ও গৌড় অঞ্চল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এতো অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে গৌড়ের অধিপতি স্বাভাবিকভাবেই মগধাধিপতি হইবেন। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে উল্লেখিত গৌড়তন্ত্রের মধ্যে মগধ অঞ্চল ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী পালরাজা গোপালের পুত্র ধর্মপাল উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে বলিষ্ঠ অবদান রাখিয়াছিলেন। সুতরাং মনে হয় যে গোপালই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। অবশ্যি এমনও হইতে পারে যে ধর্মপাল তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে মগধ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গোপাল কতৃক মগধ জয়ের যেমন কোন বিবরণ পাল লিপিমালায় নাই, তেমন ধর্মপাল কতৃক এই অঞ্চল বিজয়েরও কোন ইঙ্গিত নাই।

গোপাল কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন তাহাও সঠিকভাবে জানিবার কোন উপায় নাই। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তিনি ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। আনুমানিকভাবে তাঁহার রাজত্বকাল ২০ বা ২৫ বৎসরব্যাপী ছিল বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। তিনি আনুমানিক ৭৫৬ হইতে ৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।[১]

আমরা গোপাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারি না। বাংলাদেশে অরাজকতার অবসান ঘটাইয়া দৃঢ় প্রতিষ্ঠ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাই তাঁহার প্রধান কীর্তি। তিনি পালবংশের শাসনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহার পুত্র ধর্মপাল বাংলার বাহিরে আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন। গোপাল কতৃক প্রতিষ্ঠিত পালবংশীয় শাসন প্রায় চারি শতাব্দীকাল ধরিয়া অব্যাহত ছিল।

(১) পাল রাজাগণেব কাল-নির্ণয় বর্তমানে অনেকটা সঠিক। শেষ পালরাজা মদনপালের অষ্টাদশ রাজ্যাঙ্কে ও ১০৮৩ শকাব্দে উৎকীর্ন বালগুদার লিপির আবিষ্কার এখন এই কালনির্ণয় অনেকটা সুবিধাজনক করিয়াছে। এই গ্রন্থে আমরা বিভিন্ন পালরাজাগণের রাজত্বকাল উল্লেখের ক্ষেত্রে উপরোক্ত লিপির প্রমানে সংকলিত কাল-নির্ণয় ব্যবহার করিয়াছি। দ্রষ্টব্য : **Abdul Momin Chowdhury : Dynastic History of Bengal, Dacca, 1967, Appendix-I, 271-275.**

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাল সাম্রাজ্য—উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ

ভূমিকা

গোপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাসনের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার পরবর্তী দুই উত্তরাধিকারী পাল সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি উন্নতির শিখরে পেঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রায় চারিশত বৎসর ব্যাপী সতর পুরুষ ধরিয়া এই বংশের শাসন চলিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ শাসনকালে এই বংশের ইতিহাসে বিভিন্ন ভাগ্য বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং উত্থান ও পতনের তিনটি পর্যায় নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম পর্যায়কে উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ বলা যাইতে পারে এবং ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকাল এই পর্যায়ভুক্ত করা যায়। ইহার পরই দেখা দেয় উদ্যমের অভাব এবং তাহার ফলস্বরূপ দেখা দেয় সাম্রাজ্যের অবনতি। কিন্তু অবস্থার উন্নতি ও সাম্রজ্য পুনরুদ্ধারে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন প্রথম মহীপাল। এই দ্বিতীয় পর্যায়কে অবনতি ও পুণরুদ্ধারের পর্যায় বলিয়া আখ্যায়িত করা যাইতে পারে। মহীপালের পুণরুদ্ধার কার্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে সাম্রাজ্য ঘোর বিপদের সম্মুখীন হয়। যদিও রামপাল এই বিপদ হইতে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পর পাল বংশীয় শাসন আর বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। এই তৃতীয় পর্যায়কে অবনতি ও বিলুপ্তির পর্যায় বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

পাল সাম্রাজ্যের প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করার পূর্বে ইহা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে সাহিত্যিক উপাদানের অভাবে এই সময়ের বাংলার ইতিহাসের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উৎস হইতেছে বিভিন্ন লিপিমালা। সৌভাগ্যের বিষয় যে পালরাজাদের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাম্রশাসনসমূহে ভূমিদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আদেশাবলী লিপিবদ্ধ করার আগে প্রায় সব ক্ষেত্রেই একটি প্রশস্তি রহিয়াছে। প্রশস্তি অবশ্যই কবিতায় এবং পালরাজাদের কৃতিত্ব ও সাফল্যই এই প্রশস্তির বিষয় বস্তু। প্রশস্তিতে ব্যবহৃত শ্লোকসমূহের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠিন এবং ফলে ঐসব শ্লোক সমূহ হইতে ইতিহাস উদ্ধার করা

খুব সহজসাধ্য নয়। তদুপরি সভাকবি কর্তৃক রচিত প্রশস্তিতে অতিরঞ্জন থাকা খুবই স্বাভাবিক। পৃষ্ঠপোষক রাজার গুণকীর্তন করিতে গিয়া প্রায় ক্ষেত্রেই কবি সম্ভাব্য সব গুণের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার কৃতিত্ব বর্ণণাকালে কবি তাহার জানা প্রায় সব দেশই তাহার পৃষ্ঠ-পোষককে হয় কর দিয়াছিল না হয় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গুণাবলী বা দেশের নাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্লোকের ছন্দের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই ধরনের প্রশস্তির শ্লোকে অন্তর্নিহিত সত্য উদ্‌ঘাটন করা ঐতিহাসিকের দুরূহ কাজ। মনে রাখিতে হইবে যে শ্লোকসমূহকে অভিহিত মূল্যে খুব অল্প সময়ই গ্রহণ করা যায়। অন্য কোন সূত্রে সমর্থন ব্যতীত প্রশস্তিতে উল্লেখিত সব তথ্য ঐতিহাসিক বলিয়া মনে করা সমীচীন হইবে না। সুতরাং এই ধরনের অতিরঞ্জনপূর্ণ উৎস হইতে ইতিহাস পুনরুদ্ধার করিতে গিয়া ঐতিহাসিককে সব সময়ই অতিরঞ্জনের প্রতি সজাগ থাকিতে হইবে। যুক্তি বুদ্ধিতে যতটুকু সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় এবং সমসাময়িক অন্যান্য সূত্রের আলোকে যতটুকু গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয় ততটুকুই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের মূল উপাদান তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ প্রশস্তি-সমূহ। সুতরাং প্রাচীনকালে বাংলাদেশের ইতিহাস পুনর্গঠনে ও বিশ্লেষণে আমাদিগকে এই কথা মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

ধর্মপাল

গোপালের পর তাঁহার ও দেদ্দদেবীর পুত্র ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। পাল সাম্রাজ্যের উত্থান ও ইহার প্রতিপত্তি বিস্তারে ধর্মপাল বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাম প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত। খুব সম্ভবত গোপালই বাংলা ও বিহারে পাল বংশের শাসন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। ফলে ধর্মপাল উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিবার মতো নিজেকে শক্তিশালী বোধ করিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতের সমসাময়িক অবস্থা ধর্মপালকে উদ্যোগী হইতে ও আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিতে সহায়তা করিয়া-ছিল।

পাল বংশ যে সময়ে বাংলা ও বিহারে ক্ষমতা অধিকার করে, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে চালুক্যদিগকে পরাস্ত করিয়া রাষ্ট্রকূট বংশ ক্ষমতালাভ

করে। একই সময়ে মালব ও রাজস্থানে গুর্জর প্রতীহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু উত্তর ভারতের মধ্যাঞ্চলে সেই সময়ে তেমন কোন প্রভাবশালী শক্তি ছিল না। কান্যকুব্জ ছিল এই অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল। কান্যকুব্জে একরকম রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করিতেছিল বলিলেও চলে। বিশেষ করিয়া যশোবর্মা ও ললিতাদিত্যের বিজয়াভিযানের পর এই অঞ্চলে এই অবস্থা চলিতেছিল। সুতরাং অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া কান্যকুব্জের রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য পার্শ্ববর্তী শক্তিবর্গের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্যম লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতের গুর্জর-প্রতীহার ও পাল রাজাগণ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজাগণ প্রায় একই সময়ে মধ্যদেশ অধিকার করিবার প্রয়াসী হন। ফলে এক ত্রিশক্তিয় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ধর্মপাল মধ্যদেশের আধিপত্যের জন্য এই ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং অল্পকালের জন্য হইলেও কিছু সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাফল্য বাংলার রাজনৈতিক শক্তিরই পরিচয় দেয়।

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে এই ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষের যবনিকা উত্তোলিত হয়। প্রথম দৃশ্যের অবতারণা হয় প্রতীহার ও পাল সংঘর্ষে। ধর্মপাল যেই সময়ে পশ্চিমদিকে বিজয়াভিযান করেন, সেই সময়ে প্রতীহার রাজা বৎসরাজও মধ্যদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় পূর্বদিকে অগ্রসর হন। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু বৎসরাজ মধ্যদেশে অধিকার বিস্তার করিবার আগেই তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব হয়। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব ধারাবর্ষ (৭৮০—৭৯৪খৃঃ আঃ) ঐ সময়েই আর্যাবর্তে বিজয়াভিযানে আসেন। তিনি প্রথম বৎসরাজকে পরাজিত করেন এবং ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাষ্ট্রকূট সূত্রে জানা যায় যে তিনি গৌড়রাজকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পরাজিত করেন। এই উক্তি হইতে ধর্মপালের রাজ্যসীমা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়। খুব সম্ভবত ধর্মপাল বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করিয়া গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। এই রাজ্য বিস্তারের গতি অব্যাহত রাখিয়া তিনি মধ্যদেশের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে যদিও ধর্মপাল উভয় শত্রুশক্তি কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন তবুও তাঁহার তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ

ধ্রুব তাঁহার বিজয় সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না করিয়াই দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে ধর্মপাল পরাজিত হইয়াও ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ পাইলেন। ধ্রুব ধারাবর্ষের মৃত্যু হয় ৭৯৩—৯৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষের এই প্রথম পর্যায় সংঘটিত হইয়াছিল আনুমানিক ৭৯০ খৃষ্টাব্দে বা নিকটবর্তীকালে। প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটসূত্রে আমরা ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষের এই প্রথম পর্যায় সম্পর্কে জানিতে পারি। পাল বংশীয় কোন সূত্রে এই প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নাই। কারণ খুব সহজেই অনুমান করা যায়। বৎসরাজের পরাজয়ের পর প্রতীহারদের আবার শক্তি সঞ্চয় করিতে বেশ কিছুটা সময় লাগিয়াছিল। সুতরাং ধ্রুবের প্রত্যাবর্তনের পর ধর্মপাল প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই মধ্যদেশে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ধর্মপাল যে কান্যকুব্জে তাঁহার প্রতিনিধি বসাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রলিপির একটি শ্লোকে। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ধর্মপাল ইন্দ্ররাজকে (ইন্দ্রায়ুধ) পরাজিত করিয়া মহোদয় (কান্যকুব্জ) অধিকার করেন এবং চক্রায়ুধকে শাসনভার অর্পণ করেন। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রলিপিতেও এই ঘটনার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এই লিপিতে ঘটনাটি নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে: "তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি বিকাশে (অর্থাৎ চোখের ইঙ্গিত দ্বারা) কান্যকুব্জের রাজ অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন; ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতির নরপালগণ প্রণতি-পরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া ইহার সমর্থন করিয়াছিল এবং হৃষ্টচিত্ত পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক স্ব অভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়াছিল।"[১] এই শ্লোকের উপর ভিত্তি করিয়া ঐতিহাসিকগণ মত পোষণ করিয়াছেন যে এই শ্লোকে উল্লেখিত সকল নরপতিকে ধর্মপাল পরাজিত করিয়াছিলেন এবং প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত পদানত করিয়াছিলেন। উপরোক্ত শ্লোকে উল্লেখিত প্রায় সবকয়টি দেশেরই অবস্থান নির্দিষ্ট করা সম্ভব। গন্ধার হইতেছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ, মদ্র মধ্য

---

১ খালিমপুর লিপির দ্বাদশ শ্লোকের এই অর্থ আমরা কিলহর্নের ইংরেজী অনুবাদের উপর ভিত্তি করিয়া করিয়াছি। কিন্তু মূল সংস্কৃতে রাজাভিষেকের কথা মোটেই স্পষ্ট নয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার অর্থ করিয়াছেন, "কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।" (দ্রষ্টব্য বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ ৪৩) কিন্তু মূল শ্লোকে ইহাও মোটে স্পষ্ট নয়।

পাঞ্জাব, কীর উত্তর পাঞ্জাব এবং কুরু পূর্ব পাঞ্জাব। অবন্তি মালবের এবং মৎস্য আলওয়ার ও জয়পুরের প্রাচীন নাম ভোজ ও যদু একাধিক রাজ্যের নাম ছিল। সম্ভবত ভোজ রাজ্য বর্তমান বেরার ও যদুরাজ্য পাঞ্জাবে অথবা সুরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল। যবন সিন্ধুনদের তীরবর্তী কোন মুসলমান রাজ্য বুঝাইতে পারে। এই রাজ্য সমূহের অবস্থিতি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জয়ের কথাই ঘোষণা করে।

দেবপালের মুঙ্গের তাম্রলিপির সপ্তম শ্লোকেও এই ধরনের রাজ্যজয়ের উল্লেখ আছে। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ধর্মপাল দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া কেদার ও গোকর্ণ এই দুই তীর্থ এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গম দর্শন করিয়াছিলেন। কেদার হিমালয়ে অবস্থিত সুপরিচিত তীর্থ। গোকর্ণের অবস্থিতি লইয়া মতবিরোধ আছে। কাহারও মতে ইহা বোম্বাইর অন্তর্ভুক্ত আবার কেহ কেহ ইহার অবস্থিতি নেপালে ছিল বলিয়া মত পোষণ করেন।

উপরের শ্লোকদ্বয়ে ধর্মপালের রাজ্যজয়ের যে বিবরণ রহিয়াছে তাহার উপর পুরাপুরি বিশ্বাস করিলে বলা যায় যে ধর্মপাল পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতে রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ধরনের প্রশস্তিমূলক উক্তির সামগ্রিক সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহার সমর্থনে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলে এই ধরনের উক্তিতে নিঃসন্দেহ বিশ্বাস আরোপ করা খুব সঙ্গত হইবে না।

ঐতিহাসিকগণ সমর্থন খুঁজিয়াছেন একাদশ শতাব্দীর গুজরাটি কবি সোড্ঢল প্রণীত 'উদয়সুন্দরী কথা' চম্পুকাব্যে। সোড্ঢল ধর্মপালকে উত্তরপথস্বামী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সোড্ঢলের এই উক্তি কতখানি সত্যভিত্তিক বলা কঠিন। কারণ সোড্ঢল তাঁহার গ্রন্থে বলভীরাজ শিলাদিত্য কর্তৃক ধর্মপালের পরাজয়ের কথাও বলিয়াছেন। এমনও হইতে পারে যে বলভীরাজের বিজয়কে অধিক গৌরবময় করিয়া ব্যক্ত করিবার প্রয়াসে গুজরাটি কবি তাঁহার শত্রুশক্তিকে উত্তরপথস্বামী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যদি সোড্ঢলকে বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলেও ইহাও বিশ্বাস করিতে হয় যে ধর্মপাল শিলাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সেই ক্ষেত্রে ধর্মপালের বিপুল শক্তির কথা মনে করা যায় না। এমনও হইতে পারে যে কান্যকুব্জ উত্তরপথস্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ সেই সময়ে কান্যকুব্জই আর্যাবর্তের কেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হইত।

তাছাড়া ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষের দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মপাল প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। যদি তিনি সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষে এইরূপ বিপর্যয় হওয়া অসম্ভব না হইলেও খুব স্বাভাবিক নয়। সুতরাং মনে হয় যে তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ প্রশস্তিতে কিছু অত্যুক্তি নিশ্চয়ই রহিয়াছে এবং থাকাই খুব স্বাভাবিক।

ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ের পর ধর্মপাল রাজ্যবিস্তারে কিছু সাফল্য নিশ্চয়ই অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া স্বীয় প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে সেখানে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ রাষ্ট্রকূট ও প্রতীহার উৎস-সমূহে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁহার এই সাফল্য লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া সভাকবিগণ স্বভাবতই কিছুটা অতিরঞ্জনে লিপ্ত হইয়াছেন এবং পশ্চিমাঞ্চলে যে কয়টি দেশের নাম তাহাদের অবগতিতে ছিল এবং যে কয়টি দেশের নাম কবিতার ছন্দে মিল খায় তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্য-দেশে সাফল্য সভাকবির জন্য কম গৌরবের কথা ছিল না। সুতরাং এই গৌরবজনক ঘটনাকে আরও অধিকতর গৌরবে পরিণত করিতে তাহাদের প্রয়াসী হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যদি সত্যিই কান্যকুব্জে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সমাগম হইয়াছিল তাহা হইলে এমনও হইতে পারে যে কান্যকুব্জের সহিত যে সব রাজ্যের সম্পর্ক ছিল সে সব রাজাগণ কান্য-কুব্জের পরিবর্তনের সময় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কিংবা কূটনৈতিক কারণে তাঁহারা কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুঙ্গের লিপিতে কেদার ও গোকর্ণের উল্লেখও খুব স্বাভাবিক, কারণ দুইটিই সুপরিচিত তীর্থস্থান এবং সভাকবি তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে এই কথা বলা চলে যে ধর্মপাল কান্যকুব্জে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া নিজ প্রতিনিধি অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাম্রলিপির প্রশস্তিতে যে অন্যান্য জয়ের উল্লেখ আছে তাহা কতদূর সত্যভিত্তিক না কল্পনা প্রসূত বলা কঠিন। উহাদের মধ্যে অত্যুক্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। যদি ধর্মপাল উত্তরপথস্বামী হইতে সক্ষম হইতেন তাহা হইলে তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের তাম্রশাসনে এই বিষয়ে আরও বিশদ ও স্পষ্ট উল্লেখ আশা করা অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং কাব্যিক ছলে আলোচ্য

লিপিদ্বয়ে যে সব উক্তি করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নাও হইতে পারে। কান্যকুব্জের পশ্চিমে কতদূর ধর্মপাল রাজ্যসীমা পরিবর্ধনে সক্ষম হইয়াছিলেন বা আদৌ সেই দিকে কোন রাজ্য জয় করিয়াছিলেন কিনা আমরা সেই বিষয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। কান্যকুব্জের সাফল্যও বাংলার ইতিহাসে কম গৌরবের কথা নয়। মধ্যদেশে বাংলার নরপতির এই হয়তো প্রথম ক্ষমতা বিস্তার। সুতরাং সেই গৌরবের জন্য ধর্মপালকে অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হইবে।

কান্যকুব্জে ধর্মপালের আধিপত্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। প্রতীহার শক্তি বৎসরাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় নাগভট্টের নেতৃত্বে আবার নতুন জীবন লাভ করে। নাগভট্ট নতুন মৈত্রীর মাধ্যমে স্বীয় শক্তি বাড়াইতে সক্ষম হন। প্রতীহার উৎসে দাবী করা হইয়াছে যে তিনি চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। চক্রায়ুধের পরাজয়ের পর তাঁহার অধি-কর্তার সহিত প্রতীহার রাজার সংঘর্ষ খুবই স্বাভাবিক। গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে ধর্মপালের সহিত যুদ্ধে নাগভট্টের বিজয়ের যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে ধর্মপালের বিপুল শক্তি সমারোহ থাকা সত্ত্বেও নাগভট্ট তাঁহাকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অন্য এক লিপির প্রমাণে বলা যায় যে এই যুদ্ধ মুঙ্গের বা নিকটবর্তী কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল। মুঙ্গের পর্যন্ত (অর্থাৎ পাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে) প্রতীহার শক্তির অগ্রসর এই কথাই প্রমাণ করে যে নাগভট্ট পশ্চাদধাবমান চক্রায়ুধকে অনুসরণ করিয়া মুঙ্গের অবধি আসিয়াছিলেন। চক্রায়ুধ খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁহার অধিকর্তার নিকট আশ্রয় পাইবার জন্য পাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলের দিকে আসিয়াছিলেন।

কিন্তু আগের বারের মতো এইবার ও প্রতীহার রাজের ভাগ্যে মধ্য-ভারতে ক্ষমতা বিস্তার করার সুযোগ হইল না। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর-ভারতে আগমন করেন এবং নাগভট্টকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার অনুমান করিয়াছেন যে গোবিন্দ ধর্মপালের আহ্বানে তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন। নাগভট্টের পরাজয়ের পর ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ উভয়ই স্বেচ্ছায় গোবিন্দের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই আত্মসমর্পণ হইতে মনে করা যাইতে পারে যে গোবিন্দ ধর্মপালের আহ্বানে উত্তর-ভারতে আসিয়াছিলেন। তবে এই বিষয়ে কোন নিঃসন্দেহ প্রমাণ নাই। গোবিন্দকেও তাঁহার পিতার ন্যায়

দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। খুব সম্ভবত ৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

গোবিন্দের প্রত্যাবর্তনের পর কান্যকুব্জের অবস্থা কি হইয়াছিল সেই বিষয়ে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। এমনও হইতে পারে যে ধর্মপাল আবার তাঁহার প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার ও চক্রায়ুধের আত্মসমর্পণ তাহাদিগকে এই সুযোগ দিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তবে প্রমাণের অভাবে এই কথাও খুব জোর দিয়া বলা যায় না। তবে ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ হইতে প্রতীহাররাজ ভোজের লিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং ৮০১ ও ৮৩৬ এর মধ্যে কোন এক সময়ে কান্যকুব্জ প্রতীহারদের হাতে গিয়াছিল এবং ভোজই মধ্যদেশে প্রতীহার সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

গোবিন্দের প্রত্যাবর্তনের পর ধর্মপাল আর কোন বিপদের সম্মুখিন হন নাই বলিয়াই মনে হয়। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে যে দেবপালের সিংহাসন আরোহণ কালে রাজ্যে কোন প্রকার বিপদ ছিলনা।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষের দুই পর্যায়ের মধ্যবর্তী সময়ে ধর্মপাল পাল সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিমাঞ্চলে বেশ কিছুদূর বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং কান্যকুব্জে নিজ প্রতিনিধি বসাইয়াছিলেন। তাঁহার এই সাফল্যই তাম্রশাসনের প্রশস্তি সমূহে অতিরঞ্জিত আকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তিনি সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করিযাছিলেন এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন—এই ধরনের উক্তি সমর্থক প্রমাণের অভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষের উভয় পর্যায়েই ধর্মপাল খুব একটা কৃতিত্বের পরচয় দিতে পারেন নাই। তবে দুই পর্যায়ের অন্তরবর্তী কালে তাঁহার অধীনে বাংলা সর্বপ্রথম উত্তর-ভারতীয় রাজনীতিতে স্বল্পকালের জন্য হইলেও কিছু সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। ফলে পাল-সভাকবিগণ যে তাহাদের প্রশস্তি রচনায় কিছুটা অতিরঞ্জন করিবেন ইহাই খুব স্বাভাবিক। ধর্মপালের অধীন বাংলার নূতন শক্তি ও উদ্দীপনার পরিচয় এই প্রশস্তিসমূহে মিলে। এই প্রসঙ্গে খালিমপুর তাম্রশাসনে রাজধানী পাটলীপুত্র নগরের বর্ণনা উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ "এখানে গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য বিশাল রণতরীর সমাবেশ সেতুবন্ধ রামেশ্বরের শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া মনে হইত। এখানকার

অসংখ্য রণহস্তী দিনশোভাকে ম্লান করিয়া নিবিড় মেঘের শোভা সৃষ্টি করিত; উত্তরাপথের বহু সামন্ত রাজা যে অগণিত অশ্ব উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদের ক্ষুরোত্থিত ধুলিজালে এই স্থানের চতুর্দিকে ধুসরিত হইয়া থাকিত এবং রাজারাজেশ্বর ধর্মপালের সেবার জন্য সমস্ত জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ) হইতে যে সমস্ত রাজগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের অনন্ত পদাতিক সেনার পদভরে বসুন্ধরা অবনত হইয়া থাকিত।" এই বর্ণনা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য খুবই সঙ্গত। তিনি লিখিয়াছেন, "শক্তি, সম্পদ ও ঐশ্বর্যের এই বর্ণনার মধ্যে যে আতিশয্য আছে, তাহা বাঙালীর তৎকালীন জাতীয় মনোভাবের পরিচায়ক।"[১]

পিতার ন্যায় ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন এবং পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সর্বোচ্চ সার্বভৌম উপাধি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্বে তিনি এইটি বৌদ্ধ বিহার বা বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহা তাঁহার দ্বিতীয় নাম বা উপাধি বিক্রমশীল অনুসারে বিক্রমশীল-বিহার নামে খ্যাত ছিল। নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা সমগ্র ভারতে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হইত। বরেন্দ্র অঞ্চলে সোমপুর নামক স্থানে তিনি আর একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে যে বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহাই সোমপুর বিহার। পাহাড়পুরের নিকটবর্তী ওমপুর গ্রাম এখনও এই প্রাচীন নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষে এইটি খুব সম্ভবত সর্ববৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার। তারনাথের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে ধর্মপাল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

নিজে বৌদ্ধ হইলেও ধর্মপাল হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না বরঞ্চ তিনি ঐ ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। নারায়ণের মন্দিরের জন্য তিনি নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রানুশাসন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং প্রতি বর্ণের লোক যাহাতে স্ব স্ব নীতি মানিয়া চলে তিনি তাঁহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবপালের মুঙ্গের তাম্র-শাসনে উল্লেখ আছে। এই সব তাঁহার ধর্মীয় উদারতারই পরিচায়ক। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রজ্ঞাজনিত কারণেও পাল সম্রাটগণ ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করিতেন। সমস্ত পালযুগেই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া

(১) বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীনযুগ, ৪৬।

যায়। রাজা হিসাবে সকল ধর্মাবলম্বী প্রজার প্রতি সমান পৃষ্টপোষকতা পালযুগের একটা বৈশিষ্ট্য। পাল তাম্রশাসনসমূহের অধিকাংশ ভূমিদানের গ্রহীতাই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার বংশধরেরা কয়েক পুরুষ ধরিয়া পাল-রাজাগণের প্রধানমন্ত্রীপদ অধিকার করিয়াছিল।

খালিমপুর তাম্রশাসন ধর্মপালের বিজয়রাজ্যের ৩২ সম্বৎসরে লিখিত। তারনাথ ধর্মপালের রাজত্বকাল ৬৪ বৎসর ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলে এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ধর্মপাল ৩৫।৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে এবং তাঁহার রাজত্বকাল ৭৮১ হইতে ৮২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

দেবপাল

ধর্মপালের পর তাঁহার ও রন্নাদেবীর পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। খালিমপুর তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবন পাল ও যুবরাজ দেবটের উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ দেবপাল নামে রাজা হইয়াছিলেন বা কোন কারণে ইহাদের মৃত্যুর পর দেবপাল সিংহাসন অধিকার করেন সেই বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়।

পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ দেবপাল পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং পাল সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাল-রাজাদের লিপিমালায় দেবপালের কৃতিত্বের গুণগান অতীব উচ্চস্বরে করা হইয়াছে। অনেকক্ষেত্রে ধর্মপাল সম্বন্ধে যে গুণকীর্তন রহিয়াছে তাহাও ম্লান হইয়া যায়। সুতরাং মনে হয় যে দেবপাল পিতা কর্তৃক অনুসৃত নীতি অবলম্বন করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সাফল্য সভাকবিগণকে প্রশস্তি রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। নাগভট্টের পরে প্রতীহার সাম্রাজ্য দুর্বল উত্তরাধিকারী ও যুবক রাষ্ট্রকূটরাজা অমোঘ-বর্ষের নিষ্প্রভতা দেবপালকে রাজ্যবিস্তারের জন্য পূর্ণ সুযোগ দিয়াছিল।

দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে রাজ্যজয় উপলক্ষে তাঁহার সৈন্যদল বিন্ধ্যপর্বত ও কম্বোজ (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) অঞ্চলে বিচরণ করিয়াছিল এবং তিনি উত্তরে হিমালয় হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত এবং পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র বেষ্টিত সমগ্র ভূভাগ শত্রুমুক্ত

করিয়া শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী দর্ভপানি ও কেদারমিশ্রের বংশের বাদল শিলালিপিতে দেবপালের রাজ্যজয়ের প্রায় একইরকম বিবরণ রহিয়াছে। কেবলমাত্র দক্ষিণের রাজ্যসীমা সেতুবন্ধের পরিবর্তে বিন্ধ্য-পর্বত পর্যন্ত বলা হইয়াছে। এই লিপিতে আরও বলা হইয়াছে যে দেবপাল উৎকলকুল ধ্বংস, হুণ গর্ব খর্ব এবং দ্রবিড় ও গুর্জর রাজাদের দর্প চূর্ণ করিয়া দীর্ঘকাল আসমুদ্র পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন। নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনেও দেবপালের রাজ্য জয়ের বিবরণ রহিয়াছে। দেব-পালের পিতৃব্য বাক্‌পালের পুত্র জয়পাল তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। ভাগলপুর লিপিতে বলা হইয়াছে যে ভ্রাতার আদেশে জয়পাল রাজ্যজয়ে অগ্রসর হইলে উৎকলের রাজা দূর হইতে তাঁহার নামমাত্র শুনিয়াই অবসন্ন হইয়া নিজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং প্রাগ্‌ জ্যোতিষের (আসাম) রাজা তাঁহার আজ্ঞায় যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিয়া বন্ধুপরিবেষ্টিত অবস্থায় বাস করিয়াছিলেন।

রাজ্য বিস্তারে দেবপালের কৃতিত্ব উপরে উল্লিখিত বিবরণ হইতে নিরূপণ করিতে হইবে। সেই চেষ্টা করার আগে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। দেবপালের নিজস্ব মুঙ্গের তাম্রশাসনে রাজ্যজয়ের যে বিবরণ রহিয়াছে তাহার তুলনায় পরবর্তী যুগের দুই খানি লিপিতে অধিকতর স্তুতিবাচক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে যে বিবরণ রহিয়াছে তাহা ভারতীয় মানসে বহুদিন হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী চক্রবর্তীক্ষেত্রের বা উত্তর-ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিবরণ। উত্তর-ভারতের বহু নরপতির সাম্রাজ্য সম্বন্ধে এই ধরনের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং সর্বক্ষেত্রে ঐ বিবরণ সঠিক নয়। সুতরাং এই ধরনের বিবরণের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক হইবে না। উপমহা-দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কম্বোজদেশ পর্যন্ত দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল এই কথা সমসাময়িক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ৮৩৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে প্রতীহার সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি ও কান্যকুব্জে তাহাদের রাজধানী স্থাপন এবং পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শাহি রাজাদের সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দেবপাল কর্তৃক সমগ্র উত্তর-ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের দাবীকে অবিশ্বাসযোগ্য করে। সুতরাং মনে হয় পাল লিপিমালায় নিশ্চয়ই কিছু অতিরঞ্জন বা অত্যুক্তি রহিয়াছে। তাই দেবপালের কৃতিত্ব নিরূপণ করিতে সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে।

পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে গোবিন্দের দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তনের পর খুব সম্ভবত ধর্মপাল কান্যকুব্জে আবার ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং দেবপালের রাজত্বের প্রারম্ভে ঐ অঞ্চলে তাহাদের ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রতীহাররাজ মিহির ভোজ কান্যকুব্জে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দেবপাল কতৃক গুর্জর রাজার দর্পচূর্ণের যে উল্লেখ পাল লিপিতে আছে তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে মনে হয় দেবপাল ও গুর্জরদের মধ্যে সংঘর্ষের প্রথমদিকে দেবপাল কিছু সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। নাগভট্টের দুর্বল উত্তরাধিকারী রামভদ্রের শাসনকালে এই সাফল্য অর্জন করা খুব অসম্ভব নয়। তবে প্রতীহার উৎসে প্রতীহাররাজ ভোজের সাফল্য দাবী করা হইয়াছে। ভোজ কর্তৃক কান্যকুব্জ অধিকারের প্রমাণ থাকায় মনে হয় যে এই দাবী একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু ভোজ তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে রাষ্ট্রকূটরাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় রাজ্য হইতেও বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সুতরাং দেবপাল এই সময়ে, খুব সম্ভবত ৮৪০ হইতে ৮৫০ এর মধ্যবর্তীকালে, তাঁহার বিরুদ্ধে আঘাত হানিয়া থাকিতে পারেন।

দেবপাল কর্তৃক উড়িষ্যা জয়ের উল্লেখ বাদললিপি ও ভাগলপুর তাম্রশাসনে আছে। তারনাথ ও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। সীমান্তবর্তী রাজ্যে বিজয়াভিযান প্রেরণ খুবই স্বাভাবিক। ভঞ্জ বংশীয় রাজা রণভঞ্জের পরবর্তী কোন সময়ে দেবপাল উড়িষ্যা অধিকার করিয়া থাকিবেন। এই সাফল্যের পর তাঁহার সৈন্যদল বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলেও অগ্রসর হইতে পারে। এমনকি আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া পাণ্ড্যরাজার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াও খুব অস্বাভাবিক নয়। পাললিপিমালায় বিন্ধ্য পর্বত অঞ্চলে সৈন্যদলের বিচরণ এবং দ্রবিড় রাজার দর্পচূর্ণের কথা বলা হইয়াছে। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকগণ দ্রবিড়রাজ্য বলিতে রাষ্ট্রকূট রাজ্য মনে করিয়াছেন এবং দেবপালের সহিত রাষ্ট্রকূটরাজের সংঘর্ষের কথা চিন্তা করিয়াছেন। কিন্তু দ্রবিড় বলিতে সাধারণত দাক্ষিণাত্য বুঝায় না, ইহা দক্ষিণ ভারত সুতরাং লিপিতে উল্লেখিত দ্রবিড় রাজা পাণ্ড্যরাজা হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয় এবং উড়িষ্যা জয়ের পর আরও দক্ষিণে সৈন্যদলের অগ্রসর ও পাণ্ড্যরাজার সহিত সংঘর্ষ ঘটাও সম্ভব। বৌধহয় ইহাই অতিরঞ্জিত আকারে

মুঙ্গের তাম্রলিপিতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত রাজ্যসীমা প্রসারিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

আগেই বলিয়াছি যে উড়িষ্যা হইতে বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলে দেবপালের সৈন্যদলের অগ্রসর হওয়াও খুব অসম্ভব নয়। মুঙ্গেরলিপিতে ইহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে কম্বোজদেশের (উত্তর-পশ্চিম সীমান্তাঞ্চল) উল্লেখ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ সম্বন্ধেও আগে আলোচনা করিয়াছি। তবে এই উল্লেখের একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা সম্ভব। মুঙ্গের লিপিতে বলা হইয়াছে যে রাজ্য জয়কালে দেবপালের সৈন্যদলের হস্তীদল বিন্ধ্যপর্বতাঞ্চলে তাহাদের প্রাক্তন সঙ্গীদের সাথে মিলিত হইয়াছিল। তারপর প্রশস্তিকার দেবপালের সৈন্যদলে ব্যবহৃত ঘোড়াদের জন্য সঙ্গী পাইবার স্থান খুঁজিতে গিয়া কম্বোজদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে কম্বোজদেশে ঘোড়া পাওয়া যায়। যেমন বিন্ধ্য অঞ্চলে হাতী পাওয়া যায়। তবে এই সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও কম্বোজদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং খুব সম্ভবত এই দিককার কম্বোজদেশ বলিতে তিব্বতকে বুঝাইত। তাহা হইলে দেবপালের সহিত তিব্বতের সংঘর্ষের কথা চিন্তা করিতে হয়।

দেবপাল কর্তৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষ বিজয়ের কথা ভাগলপুর তাম্রশাসনে উল্লেখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে প্রাগ্‌জ্যোতিষের (আসাম) রাজা দেবপালের সেনাপতি জয়পালের আদেশে যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই উল্লেখ হইতে মনে হয় যে দেবপাল সীমান্তবর্তী প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের বিরুদ্ধে ও সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন; তবে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা পাল রাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল কিনা সঠিক করিয়া বলা যায় না। হয়তো তিনি যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। লিপির শ্লোকে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। এমনও হইতে পারে যে কামরূপরাজ (খুব সম্ভবত হর্জর) পাল সাম্রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু জয়পালের সাফল্যে শঙ্কিত হইয়া তিনি যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিয়া পাল সাম্রাজ্যের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাদল স্তম্ভলিপিতে হূণদের সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে সে বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। হূনরাজ্য কোথায় ছিল বা কোন অঞ্চলের হূনদের দেবপাল পরাজিত করিয়াছিলেন তাহা নির্দেশ করার কোন উপায় নাই। বিভিন্ন ঐতিহাসিক হিমালয়ের পাদদেশে হূনরাজ্যের

অবস্থিতি সম্বন্ধে অনুমান করিয়াছেন। প্রমানাভাবে সেই অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়।

উপরের আলোচনা হইতে রাজ্যবিস্তারে দেবপালের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দেবপাল পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং পিতার ন্যায় তিনিও বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সীমান্তবর্তী রাজ্য উড়িষ্যা ও আসামে বিজয়াভিযান খুবই স্বাভাবিক। উড়িষ্যার সাফল্যের পর তাঁহার সৈন্যদল দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। বিন্ধ্যপর্বতাঞ্চলে অভিযান ও হয়তো উড়িষ্যা অভিযানের পরবর্তী পর্যায় ছিল। উভয় অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। সমসাময়িক ঘটনাবলী হইতে মনে হয় যে প্রতীহারদের বিরুদ্ধে তিনি স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তবে লিপিমালায় দেবপালের যে বিশাল উত্তর-ভারতীয় সাম্রাজ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহার কবির কল্পনায় হওয়া সম্ভব। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহার সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা সঠিক করিয়া নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়।

দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনে পাঁচটি গ্রাম দানের উল্লেখ আছে। জাভা ও সুমাত্রার শৈলেন্দ্র মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপালের নালন্দা তাম্র-শাসনে এই দানই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা আরও প্রমাণ করে যে বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দার খ্যাতি নবম শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল এবং ভারতের বাহিরেও ইহা সুপরিচিত ছিল। নালন্দা বিহারের প্রতি যে দেবপাল যত্নবান ছিলেন তাহার প্রমাণ অন্য আর একটি লিপিতে পাওয়া যায়। বীরদেব নালন্দার পরিচালনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ঘোস্‌রাওয়া লিপিতে ঘোষণা করা হইয়াছে। বীরদেবের পিতা ইন্দ্রগুপ্ত 'রাজসখ' বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছেন।

দেবপালের রাজত্বকাল ও দীর্ঘ ছিল। নালন্দা তাম্রশাসন তাঁহার ৩৫ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বাদল শিলা লিপিতে দেখা যায় যে গুর-বমিশ্রের বংশের তিন পুরুষের তিনজন মন্ত্রী তাঁহার অধীনে কার্যরত ছিলেন সুতরাং দেবপালের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আনুমাণিক ৮২১ হইতে ৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার রাজত্বকাল নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালকে পালবংশের ইতিহাসে উত্থানের যুগ বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলা ও বিহারে পাল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে বলিষ্ঠ অবদান রাখিবার মতো শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। মধ্যদেশে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় পাল সাম্রাজ্য এক ত্রিশক্তীয় সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়। অল্প কালের জন্য হইলেও মধ্যদেশে তাঁহাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাই বোধহয় বাংলার প্রথম সাফল্য। পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে তাঁহাদের বিজয়াভিযান ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এককথায় বলা যাইতে পারে যে ধর্মপাল ও দেবপালের অধীনে পাল সাম্রাজ্য স্বীয় ক্ষমতা উত্তর-ভারতীয় রাজনীতিতে প্রদর্শন করিবার মতো শক্তিশালী হইয়াছিল।

অরাজকতার যুগের অবসান ঘটাইয়া গোপাল পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধর্মপালও দেবপাল সাম্রাজ্যের জন্য অধিকতর গৌরব অর্জন করেন। প্রায় এক শতাব্দীকাল ব্যাপী এই তিনজনের রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে পাল বংশের ও বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় যুগের সূচনা করিয়াছিল। তবে সভাকবিদের বর্ণনায় সেই গৌরব যতখানি উজ্জ্বলভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ততখানি সাফল্য অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে পাল রাজাদের সাফল্যেই কবিগণ অতিরঞ্জনের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাল সাম্রাজ্য--অবনতি ও পুনরুদ্ধারের যুগ

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটে। দুর্বল উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে উদ্যম ও নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সময়ে সময়ে পাল সাম্রাজ্যের সংকোচন ঘটাইয়াছিল। প্রথম মহীপালের আগমন পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্যের যথেষ্ট সংকোচন ঘটিয়াছিল, এমন কি তাঁহাদের আদি বাসস্থান উত্তর বাংলায় ভিন্ন রাজশক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথম মহীপাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অংশ পুনরুদ্ধার করিয়া পাল সাম্রাজ্যকে আবার নূতন জীবন দান করিয়াছিলেন। তাই পাল বংশের ইতিহাসে মহীপালের নাম বিখ্যাত।

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সিংহাসনে কে বসিয়াছিলেন তাহা নিয়া মতবিরোধ আছে। দেবপাল ও নারায়ণপালের মধ্যবর্তী সময়ে পাল সিংহাসন অধিকারীর দুইটি নাম আমরা দুইটি উৎস হইতে পাই। বাদল স্তম্ভলিপিতে শূরপালের নাম ও নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে বিগ্রহপালের নাম পাওয়া যায়। বিগ্রহপাল ছিলেন জয়পালের পুত্র এবং ধর্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের পৌত্র। অধিকাংশ ঐতিহাসিক শূরপাল ও বিগ্রহপালকে এক ও অভিন্ন মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগকে এক ও অভিন্ন মনে করার কোন প্রমাণ নাই। এবং সেই কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়া দেবপালের পর উত্তরাধিকার যুদ্ধের কথাও অনুমান করিয়াছেন। বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপাল হইতে পাল সিংহাসন যাঁহারা অধিকার করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিগ্রহপালের বংশধর অর্থাৎ ধর্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের বংশের। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দয়িতবিষ্ণু হইতে দেবপাল পর্যন্ত যে সরাসরি উত্তরাধিকার চলিয়া আসিতেছিল তাহা পরিবর্তিত হইয়া বাক্‌পালের বংশের হাতে ক্ষমতা চলিয়া গিয়াছিল। এই ধরনের পরিবর্তন স্বাভাবিকত উত্তরাধিকার যুদ্ধের ফলস্বরূপই হইয়া থাকে। এই যুক্তির উপরই শূরপাল ও বিগ্রহপালকে ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়া এক উত্তরাধিকার যুদ্ধের কথা অনেক ঐতিহাসিক মনে করিয়াছেন। তবে শূরপাল ও বিগ্রহপালকে

এক ও অভিন্ন মনে করার পিছনে যেমন কোন প্রমাণ নাই, তেমনি তাহা-দিগকে ভিন্ন মনে করিয়া উত্তরাধিকার যুদ্ধের কথাও আনুমানিক। সুতরাং এই ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

এই সময়কার আর একটি সমস্যা হইতেছে যুবরাজ হারবর্ষের সনাক্ত-করণ। অভিনন্দ বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে যুবরাজ হারবর্ষের উল্লেখ আছে। অভিনন্দ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক যুবরাজ হারবর্ষকে 'পালকুল চন্দ্র', 'পালকুল প্রদীপ', 'পালবংশ প্রদীপ', 'শ্রীধর্মপাল কুলকৈরব কাননেন্দু', 'বিক্রমশীল নন্দন' ও 'বিক্রমশীল জন্যা' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যে যুবরাজ হারবর্ষ পালবংশ সম্ভূত ছিলেন এবং খুব সম্ভবত ধর্মপালের পুত্র ছিলেন। এমনও হইতে পারে যে দেবপালের অন্য নাম ছিল হারবর্ষ। তাঁহার মাতা রাষ্ট্রকূট বংশীয় ছিলেন এবং রাষ্ট্রকূট বংশে এই ধরনের নাম প্রচলিত ছিল। তবে হারবর্ষকে সঠিক করিয়া সনাক্ত করাও সম্ভব নয়।

বিগ্রহপাল ও শূরপাল অল্প ।ময় রাজত্ব করেন। শূরপালের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের লিপি পাওয়া গিয়াছে। ভাগলপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে বিগ্রহপাল শান্তিপ্রিয় ও সংসার বিরাগী ছিলেন এবং অল্পকাল রাজত্ব করিয়া তিনি পুত্র নারায়ণপালের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। সুতরাং হয় শূরপাল ও বিগ্রহপাল একই ব্যক্তি ছিলেন বা সমসাময়িক রাজা ছিলেন। তাহাদের রাজত্বকাল পাঁচ বৎসর ধরা যাইতে পারে। ৮৬১ হইতে ৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহাদের রাজত্বকাল নির্দিষ্ট করা যায়।

পরবর্তী পাল রাজা নারায়ণপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার ৫৪ রাজ্যাঙ্কের একখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে এবং তিনি ৮৬৬ হইতে ৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ধরা হয়।

নারায়ণপাল ও পিতার ন্যায় শান্তিপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার উদ্যমের অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁহার রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য বহিঃ-শত্রুর আক্রমণে অনেকাংশে সংকোচিত হইয়াছিল। নারায়ণপালের রাজত্বের ১৭ বৎসর পর্যন্ত বাংলা ও বিহারে তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, ঐ সময় পর্যন্ত উৎকীর্ণ বিভিন্ন লিপি হইতে। কিন্তু ইহার পুর তাঁহার ৫৪ রাজ্যাঙ্কের আর একটি লিপি পাওয়া গিয়াছে। মনে হয় এই সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে পাল সাম্রাজ্য বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাদল স্তম্ভলিপি বা তাঁহার নিজস্ব

ভাগলপুর তাম্রশাসনে তাঁহার কোন সমর সাফল্যের উল্লেখ নাই। উভয় লিপিই তাঁহার ধর্মীয় মনোভাব ও উদারতার কথা উল্লেখ করিয়াছে।

রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের অধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার লিপিতে উল্লেখ আছে। মনে হয় নারায়ণ পালই অমোঘবর্ষ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূট বিজয়ের-ফলে পালসাম্রাজ্যের কোন অংশ রাষ্ট্রকূট রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু প্রতীহার রাজাদের আক্রমণের ফলে পাল সাম্রাজ্যের যথেষ্ট সংকোচন হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। মগধ ও উত্তর বাংলা প্রতীহার রাজা মহেন্দ্রপালের (৮৮৫—৮৯০ খৃঃ) সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মহেন্দ্র-পালের রাজত্বকালের ছয়টি লিপি বিহারের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গিয়াছে। দিখ্ওয়া-দুবাওলি তাম্রশাসনের প্রমাণে বলা যায় যে উত্তর বিহারেও প্রতীহার সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মহেন্দ্রপালের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের একটি লিপি পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে উত্তর বাংলায় ও প্রতীহার সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মহেন্দ্রপালের সভাকবি রাজশেখর রচিত 'কর্পূরমঞ্জরি' গ্রন্থেও এই বিজয়ের উল্লেখ আছে। বিহারে প্রাপ্ত মহেন্দ্রপালের বিভিন্ন লিপি তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকের এবং পাহাড়পুরের লিপি ও পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের। সুতরাং মনে হয় যে মধ্যদেশে প্রতীহারদের প্রতিপত্তি বিস্তার শুরু হইয়াছিল ভোজের রাজত্বের শেষের দিকে। পালরাজা দেবপালের জীবিতাবস্থায় প্রতীহারগণ তেমন সাফল্য অর্জন না করিতে পারিলেও দেবপালের মৃত্যুর পর তাঁহারা এই সুযোগ পাইয়াছিল। ভোজের রাজত্বের শেষে এবং মহেন্দ্রপালের রাজত্বের প্রথম দিকেই প্রতীহারদের এই সাফল্য হইয়াছিল অর্থাৎ ৮৮৩ হইতে ৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ভোজ কর্তৃক এই সাফল্যের সূচনা হইয়াছিল এবং মহেন্দ্রপাল তাঁহার রাজত্বের পঞ্চম বর্ষের মধ্যেই উত্তর বাংলা পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নারায়ণপালের রাজত্বের ১৭ বৎসরের পর (৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পর) পাল সাম্রাজ্য পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়।

নবম শতাব্দীর শেষের দিকে পাল সাম্রাজ্য দুর্দশার চরমে পৌঁছিয়া-ছিল। দেবপালের দুর্বল উত্তরাধিকারীগণের উদ্যমের অভাবই এই বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। নারায়ণপাল অবশ্য তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে বিহারে

তাহাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মহেন্দ্রপালের পর প্রতীহার সাম্রাজ্য উত্তরাধিকার সমস্যা তাঁহাকে সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। রাষ্ট্রকূটরাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণ (৮৮০—৯১৪) ও তৃতীয় ইন্দ্র (৯১৫—৯১৭) কর্তৃক প্রতীহার সাম্রাজ্য আক্রমণও প্রতীহার শক্তিকে অনেকাংশে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। দ্বিতীয় কৃষ্ণ গৌড়ের রাজাকেও পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তবে এমনও হইতে পারে যে নারায়ণপাল শীঘ্রই রাষ্ট্রকূটদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র রাজ্যপালের সহিত কৃষ্ণের ভ্রাতা জগত্তুঙ্গের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। অবশ্যি এই বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্পর্কে সঠিক হওয়া সম্ভব নয়, কারণ রাজ্যপালের স্ত্রী ভাগ্যদেবীর পিতার নাম পাল লিপিতে তুঙ্গ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। তবে তুঙ্গ ও জগত্তুঙ্গ অভিন্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাহা হইলেআগেকার মত এইবারও রাষ্ট্রকূট আক্রমণ প্রতীহারদের বিরুদ্ধে পালরাজাদের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল এবং ফলে নারায়ণপাল বিহারে ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন।

নারায়ণপালের পর যথাক্রমে তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল (আঃ ৯২০—৯৫২ খৃষ্টাব্দ) ও তৎপুত্র দ্বিতীয় গোপাল (আঃ ৯৫২—৯৬৯ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। পালতাম্রশাসনসমূহে যে সব প্রশাস্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের সম্বন্ধে তেমন কোন বিজয়-কাহিনীর উল্লেখ নাই; আছে সমুদ্রের ন্যায় গভীর জলাশয় খনন ও পর্বতপ্রমাণ উচ্চ মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা। সুতরাং মনে হয় যে তাঁহাদের রাজত্বকালে নূতন কোন বিজয় সূচিত হয় নাই এবং প্রশংসা করার মতো তেমন কিছু ছিল না। তবে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ভাতুরিয়ায় প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে রাজ্যপাল সম্বন্ধে বেশ কিছু স্তুতিবাচক শ্লোক আছে। এই শিলালিপি রাজ্যপালের মন্ত্রী যশোদাসের প্রশস্তি এবং প্রসঙ্গক্রমে রাজা রাজ্যপালের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই লিপির অষ্টম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে যশোদাসের প্রভুর আজ্ঞা ম্লেচ্ছ, অঙ্গ, কলিঙ্গ, বঙ্গ, ওড্র, পাণ্ড্য, কর্ণাট, লাট, সুহ্ম, গুর্জর, ক্রীত ও চীনদেশীয়গণ শিরোধার্য করিত। এই শ্লোকে আমরা পূর্বে আলোচিত খালিমপুর লিপি ও মুঙ্গের লিপির শ্লোকের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যে ইহাতে যথেষ্ট অতিরঞ্জন রহিয়াছে। আলোচ্য শ্লোকে উল্লেখিত বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের অবস্থানই ইহাকে পুরাপুরি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিতে দেয় না। হয়তো

পার্শ্ববর্তী দুই একটি রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল সাফল্য অর্জন করিয়া থাকিতে পারেন এবং তাহা উল্লেখ করিতে গিয়া প্রশস্তিকার নিশ্চয়ই কল্পনার আশ্রয় নিয়াছেন। সুতরাং এই শ্লোকের উপর ভিত্তি করিয়া রাজ্যপালকে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি মনে করা ঠিক হইবে না।

রাজ্যপালের পরবর্তী দুইজন উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের (আঃ ৯৬৯—৯৯৫ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে পালসাম্রাজ্য চন্দেল্ল ও কলচুরি বংশীয় রাজাদের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তর-ভারতে প্রতীহার সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির পর চন্দেল্ল ও কলচুরি বংশের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে চন্দেল্লরাজ যশোবর্মা গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া লিপি প্রমাণ আছে। যশোবর্মার পুত্র ধঙ্গ ৯৫৪ হইতে ১০০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার লিপিতে উল্লেখ আছে। প্রায় সমসাময়িক কালে কালচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ এবং লক্ষণ-রাজও পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। উপর্যুপরি বিদেশী আক্রমণ পাল শাসনের দুর্বলতার কথাই প্রমাণ করে। বারংবার আক্রমণের ফলে পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তিই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে এই সময়ে পাল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে, উত্তর ও পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষে, কাম্বোজ রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এই রাজবংশ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বের প্রথম দিকে বিহার এবং উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় পাল আধিপত্য বজায় ছিল। বিভিন্ন লিপির প্রমাণে এইকথা বলা যায়। সুতরাং কাম্বোজদের উত্থান তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে বা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের প্রথম দিকে হইয়াছিল বলিয়া মনে করাই সঙ্গত। কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার অন্তর্গত মন্দুকে গোপালের প্রথম রাজ্যাঙ্কের একটি মূর্তিলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপির ভিত্তিতে অনেক ঐতিহাসিক মনে করিয়াছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ঐ সময়ে পাল আধিপ্যত ছিল। পূর্ববর্তী এক পরিচ্ছেদে আমরা মত পোষণ করিয়াছি যে পাল সাম্রাজ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় তাঁহাদের আধি-পত্যের কোন প্রমাণ নাই। বরঞ্চ এই অঞ্চলে ভিন্ন রাজনৈতিক সত্বার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস আলোচনা করিব। মন্দুক মূর্তিলিপির প্রমাণে পাল সাম্রাজ্য

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়ও বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এই কথা মনে করা সমীচীন হইবে না। কারণ এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। গোপালের সমসাময়িক চন্দ্ররাজা মহারাজা শ্রীচন্দ্র অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। এমনকি চন্দ্রলিপিতে শ্রীচন্দ্র কর্তৃক গোপালকে সাহায্য করার কথাও আছে। সুতরাং মন্ধুক লিপিটি বহিরাগত মনে করাই সঙ্গত। কালো কষ্টিপাথরে তৈরী গণেশ মূর্তিটি খুবসম্ভবত পরবর্তী কোন সময়ে কুমিল্লায় আনয়ন করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বের শেষের দিকেও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের প্রথম দিকে যখন পাল সাম্রাজ্য বৈদেশিক আক্রমণে জর্জরিত সেই সুযোগেই পাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে, উত্তর ও পশ্চিম বাংলায়, কাম্বোজ বংশ সম্ভূত পাল রাজাদের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। মনে হয় কাম্বোজ বংশীয়েরা পাল রাজ্যের মধ্য হইতেই ক্ষমতা দখল করিয়াছিল; তাঁহারা বাহির হইতে আসিয়া ক্ষমতা দখল করিয়াছিল এমন মনে করার কোন কারণ নাই। কাম্বোজদের অভ্যুত্থান পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও নিশ্চলতার কথাই ঘোষণা করে।

কাম্বোজ পাল রাজবংশ

উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কাম্বোজদের রাজত্বের প্রমাণ পাওয় যায় দুইটি লিপি হইতে। দিনাজপুরে প্রাপ্ত স্তম্ভ লিপিতে (এই স্তম্ভটি বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরের প্রাঙ্গণে সংরক্ষিত আছে) কাম্বোজ বংশীয় গৌড়পতি কতৃক একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা লিপিবদ্ধ আছে। লিপিতত্ব বিচারে এই লিপিটির দশম শতাব্দীতে কালনির্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় লিপিটি নয়পাল নামক এক রাজা কতৃক প্রকাশিত একটি তাম্রশাসন (ইর্দা তাম্রশাসন)। নয়পালের পিতা এবং পূর্ববর্তী রাজা রাজ্যপালকে কাম্বোজ বংশতিলক বলিয়া এই তাম্রশাসনে অভিহিত করা হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা দণ্ডভুক্তি মণ্ডলে (মেদিনীপুর ও বালাশোর জেলা অঞ্চল) ভূমি দান করা হইয়াছে। লিপিতত্ব বিচারে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ইর্দা তাম্রশাসন ও দিনাজপুর স্তম্ভলিপি সমসাময়িক। ইর্দা তাম্রশাসনে উল্লেখিত রাজধানী প্রিয়ঙ্গু সঠিক করিয়া সনাক্ত করা সম্ভব নয়।

প্রথম মহীপালের বেলওয়া ও বাণগড় তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে কাম্বোজ রাজাদের উত্থানের পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। এই শ্লোকে

বলা হইয়াছে যে মহীপাল শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। পালরাজাদের পিতৃরাজ্য উত্তরবঙ্গ ছিল বলিয়া মনে করাই যুক্তি সঙ্গত। রামচরিত গ্রন্থে উত্তরবঙ্গ পালদের 'জনকভু' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। সুতরাং এই উত্তর বাংলা অঞ্চল অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছিল মহীপালের রাজত্বের পূর্ববর্তী কোন সময়ে এবং মহীপাল এই অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। এই অনধিকারীগণই খুবই সম্ভবত কাম্বোজ গৌড়পতিগণ ছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সময়ে কাম্বোজদের অদ্ভুত কার্যের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। এই উল্লেখ হইতেও মনে হয় যে কাম্বোজদের উত্তর বাংলা অধিকারই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় 'কাম্বোজদের অদ্ভূত বার্তা' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। ত্রৈলোক্যচন্দ্র দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সময়েই কাম্বোজদের উত্থান শুরু হয় বলিয়া মনে করা যায়। উপরোক্ত প্রমাণসমূহ হইতে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে দশম শতাব্দীর প্রথমদিকে কাম্বোজ-দের উত্থান শুরু হয়। দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরের পর (ঐ বৎসরে প্রকাশিত জাজিলপাড়া তাম্রশাসন উত্তর বাংলায় তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ন ছিল বলিয়া প্রমাণ করে) উত্তর বাংলায় কাম্বোজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে পশ্চিম বাংলায়ও তাহাদের শাসন বিস্তার লাভ করিয়া-ছিল। ঐ সময়ে পাল সাম্রাজ্য অঙ্গ ও মগধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। আমরা এই বংশের তিনজন রাজার নাম পাই ইর্দা তাম্র-শাসন হইতে—রাজ্যপাল (যাঁহাকে কাম্বোজবংশ তিলক বলা হইয়াছে), তাঁহার দুই পুত্র, নারায়ণপাল ও নয়পাল, যাঁহারা একের পর এক রাজত্ব কবেন।

কাম্বোজবংশ-তিলক মহারাজাধিরাজ রাজ্যপালের রাণীর নাম ছিল ভাগ্যদেবী। পূর্বে উল্লেখিত পাল সম্রাট নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের রাণীর নামও ছিল ভাগ্যদেবী। রাজা ও রাণীর নামের সাদৃশ্য থাকায় এই দুই রাজ্যপালকে অনেক ঐতিহাসিক অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। তবে নামের সাদৃশ্য ও প্রায় কাছাকাছি রাজত্বকাল (লিপি তত্ত্বের ভিত্তিতে) ছাড়া এই অভিন্নতা প্রমাণ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। তবে পাল লিপিমালায় নারায়ণপাল ও পরবর্তী রাজাগণের যে বংশ তালিকা পাওয়া যায় তাহা ইর্দা তাম্রশাসনের বংশতালিকা হইতে

সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্যই দুই রাজ্যপালকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করে। তদুপরি ইর্দালিপিতে রাজ্যপালকে স্পষ্টভাবে কাম্বোজবংশ তিলক বলিয়াছে সুতরাং পালবংশীয় রাজ্যপালের সহিত তাঁহাকে এই মনে করা যায় না। তাতুরিয়া শিলালিপিতে উল্লেখিত রাজ্যপাল এই কাম্বোজ রাজ্যপাল হওয়ার সম্ভাবনাও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না।

এই কাম্বোজরা কাহারা বা কি করিয়া তাঁহারা ক্ষমতা দখল করিয়াছিল তাহার কোন সঠিক নির্দেশ কোন উৎসেই নাই। তবে ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে নানান অনুমান করিয়াছেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কাম্বোজ জাতি আসিয়া বাংলায় ক্ষমতা দখল করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বাংলার কাছাকাছি কোন অঞ্চলে কাম্বোজদের সন্ধান করিতে হইবে। তিব্বতীয়েরা কোন কোন গ্রন্থে কাম্বোজ নামে অভিহিত হইয়াছে এবং লুসাই পর্বতের নিকটবর্তী বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কাম্বোজ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে 'কাম্বোজ' 'কোচ' শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর। সুতরাং সুপরিচিত কোচ জাতিই প্রাচীন কাম্বোজ জাতির বংশধর।

কাম্বোজরা যে বাংলাদেশ জয় করিয়া তাহাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন মনে করার কোন কারণ নাই। তবে কাম্বোজ জাতির লোক পাল সাম্রাজ্যে কোন রাজকার্যে নিযুক্ত থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয় এবং তাহাদের মধ্যেই কেহ পাল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে স্বকীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এমন মনে করা খুব অস্বাভাবিক নয়। যাহা হউক, কাম্বোজদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক না হইতে পারিলেও মনে হয় যে তাহারা পাল সাম্রাজ্যের ভিতর হইতেই সাফল্যজনক অভ্যুত্থানের ফলে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় তাহাদের শাসন প্রবর্ত্তনে সক্ষম হইয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর প্রথমদিকে তাহাদের এই উত্থান শুরু হয়, শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে তাহাদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনজন রাজার নাম ছাড়া আর বিশেষ কিছু আমরা কাম্বোজ শাসন সম্বন্ধে জানিতে পারি না। দশম শতাব্দীর শেষের দিকেই নয়পাল রাজত্ব করিতেন বলিয়া লিপি প্রমাণে মনে হয়। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দণ্ডভুক্তি অঞ্চলে ধর্মপাল নামে একজন রাজার কথা আমরা দাক্ষিণাত্যের চোল বংশীয় সূত্রে জানিতে পারি। চোলরাজা রাজেন্দ্র চোল ১০২১—২৪ খৃষ্টাব্দে যে বিজয়াভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সৈন্যদল দণ্ডভুক্তিতে

ধর্মপালকে পরাজিত করিয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে এই ধর্মপাল কাম্বোজ পালদের সহিত সম্পর্কিত ছিল। তবে ইহা একান্তই আনুমাণিক। তবে এমন ও হইতে পারে যে প্রথম মহীপাল কর্তৃক উত্তর বাংলায় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর হয়তো কিছুদিন কাম্বোজ পালরাজাগণ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় তাহাদের শাসন বজায় রাখিয়াছিল। রাজেন্দ্র চোলের অভিযান তাহাদিগকে নিঃশেষ করিয়াছে হয়তো।

প্রথম মহীপাল

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর তাঁহার পুত্র প্রথম মহীপাল পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময়ে পাল সাম্রাজ্য অঙ্গ ও মগধে (বিহারের দক্ষিণাংশ) সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। মহীপাল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে প্রকাশিত বেলওয়া ও নবম রাজ্যাঙ্কে প্রকাশিত বাণগড় তাম্রশাসনে এই পুনরুদ্ধারের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। এই লিপিদ্বয়ে উক্ত হইয়াছে যে, মহীপাল "রণক্ষেত্রে বাহুদর্পপ্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া, অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া, অবনিপাল হইয়াছিলেন।" আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে কাম্বোজবংশ সম্ভুত পালরাজাগণ উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় তাঁহাদের অধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ফলে পালদের পিতৃরাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং মহীপাল এই অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। বেলওয়া ও বাণগড় তাম্রশাসন দ্বারা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে (উত্তর বাংলা) ভূমিদান ঐ অঞ্চলে পাল আধিপত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

কুমিল্লা জেলার বাঘাউরা ও নারায়ণপুরে প্রাপ্ত দুইটি মূর্তিলিপির প্রমাণে অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়ও মহীপালের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই অনুমানের স্বপক্ষে তেমন কোন প্রমাণ নাই। কারণ এই মূর্তিলিপিদ্বয়ে উল্লেখিত মহীপাল প্রথম মহীপাল না হইয়া দ্বিতীয় মহীপালও হইতে পারে। অল্প সময়ের ব্যবধানে দুই মহীপাল রাজত্ব করিয়াছেন, ফলে লিপি বিচারেও কোন সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। দীনেশ চন্দ্র সরকার এই মূর্তিলিপিদ্বয় দ্বিতীয় মহীপালের সময়কার বলিয়া মত পোষণ করিয়া-

ছেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শাসন এই সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজেন্দ্র চোলের অভিযানের সময় (১০২১—২৪) দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় গোবিন্দচন্দ্র ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় মহীপালের নাম চোল লিপিতে উল্লেখিত আছে। সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অব্যাহত চন্দ্রশাসন বজায় থাকায় সেই অঞ্চলে প্রথম মহীপালের আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনা কম। চন্দ্রদের পতনের পর (গোবিন্দচন্দ্রই চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজা) ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মবংশের উত্থানের পূর্বে কোন এক সময়ে দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় পাল আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে প্রথম মহীপাল ও দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে (আঃ ১০৪৩ ও ১০৭৫ এর মধ্যে) পাল আধিপত্য) দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং বাঘাউরা ও নারায়ণপুর লিপিতে উল্লেখিত রাজা মহীপাল ঐ নামের দ্বিতীয় রাজা।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রথম মহীপালের আধিপত্য প্রমাণ করা না গেলেও মগধ অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্যের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে তিনি উত্তর বিহার অঞ্চলেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তবে অনেক ঐতিহাসিক বাংলা ও বিহারের বাহিরেও মহীপাল সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন। বারানসীর নিকটবর্তী প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ সারনাথে প্রাপ্ত মহীপালের রাজত্বকালে ১০৮৩ বিক্রম সম্বতে (১০২৬ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি লিপির প্রমাণে অনুমান করা হইয়া থাকে যে বারাণসী পর্যন্ত মহীপালের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র এই একটি লিপির প্রমাণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তি-সঙ্গত কিনা তাহা বিচার সাপেক্ষ। সারনাথ লিপির প্রকৃতি ধর্মীয়, কারণ ইহাতে গৌড়াধিপ মহীপালের আদেশে শ্রীমান স্থিরপাল ও শ্রীমান বসন্তপাল কর্তৃক নূতন নূতন মন্দির নির্মাণ ও পুরাতন মন্দিরাদির সংস্কার সাধনের কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই লিপিতে মহীপাল কর্তৃক কাশীর জনৈক গুরব-বামরাশীর পাদ আরাধনার কথাও আছে। বৌদ্ধ সম্রাট হিসাবে বিখ্যাত বৌদ্ধ তীর্থে মহীপাল কর্তৃক ধর্মীয় গুরুর পাদ আরাধনা এবং ধর্মরাজিকা ও ধর্মচক্রের সংস্কার সাধন তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। একমাত্র এই লিপির প্রমাণে এই কথা বলা কিছুতেই ঠিক হইবে না যে বারানসী পর্যন্ত মহীপালের রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। যদি বাস্তবিকই রাজ্যের এই সম্প্রসারণ হইত তাহা হইলে পাল লিপিমালায় লিপিবদ্ধ

প্রশস্তিসমূহে এই বিষয়ে আরোও প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকা খুবই স্বাভাবিক। মহীপাল বা পরবর্তী রাজাদের তাম্রলিপিতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। উল্লেখ না থাকায় ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে সারনাথ লিপি মহীপালের ধর্মকর্মের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছে; সারণাথে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তারের প্রমাণ হিসাবে এই লিপিকে ধরা মোটেই যুক্তি সঙ্গত হইবে না।

৯৯৮ খৃষ্টাব্দে চন্দেল্লরাজা ধঙ্গ বারানসী হইতে একটি লিপি প্রকাশ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ সকলেই পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। বারানসী অঞ্চল তাহাদের অধিকারেই ছিল বলিয়া মনে করা সঙ্গত। চন্দেল্লদের পর এই অঞ্চলে কলচুরিবংশের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। ১০৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন আহমদ নিয়াল্‌তিগীন বারানসী আক্রমণ করেন তখন বারানসী কলচুরিরাজা গাঙ্গেয়দেবের অধীন ছিল। সুতরাং ১০২৬ খৃষ্টাব্দে বারানসীর হয় চন্দেল্ল না হয় কলচুরি বংশীয় রাজাদের অধীন থাকাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং একমাত্র সারনাথে প্রাপ্ত লিপির উপর নির্ভর করিয়া এই কথা বলা ঠিক হইবে না যে মহীপাল বারানসী পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন।

চোলরাজ রাজেন্দ্রচোলের তিরুমুলাই লিপি মহীপালের সমসাময়িক বাংলার ইতিহাসের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত ভারতের পূর্ব উপকূল সমস্তই চোলদের অধীন ছিল। তিরুমুলাই লিপিতে রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক এক বিজয়াভিযানের কথা উল্লেখ আছে। তাঁহার সেনাপতি "বঙ্গের সীমান্তে উপস্থিত হইয়া প্রথমে দণ্ডভুক্তিরাজ ধর্মপাল ও পরে লোকপ্রসিদ্ধ দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে পরাজিত করিয়া এই দুই রাজ্য অধিকার করেন এবং বঙ্গাল দেশ আক্রমণ করিয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। তারপর শক্তিশালী মহীপালের সহিত যুদ্ধ হইল। মহীপাল ভীত হইয়া রণস্থল ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার দুর্মদ রণহস্তী, নারীগণ ও ধনরত্ন লুন্ঠনপূর্বক চোল সেনাপতি উত্তর রাঢ় অধিকার করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন।" এই বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে মহীপাল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় রাজত্ব করিতেন। দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব বিদ্যমান ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজা গোবিন্দচন্দ্র যে চন্দ্রবংশীয় রাজা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহীপালের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের পশ্চিম ভাগে মুসলমানদের আক্রমণ শুরু হয়। গজনীর সুলতানদের বারংবার ভারত আক্রমণের ফলে পরাক্রান্ত

সাহী ও প্রতীহার বংশের ধ্বংস হয়, অন্যান্য রাজবংশ বিপর্যস্ত হয়, একের পর এক প্রসিদ্ধ মন্দির ও নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য মহীপাল কোন সাহায্য প্রেরণ করেন নাই, এইজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক মহীপালের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। অনেকে এমনও বলিয়াছেন যে সম্রাট অশোকের ন্যায় মহীপাল উত্তর বাংলা পুনরুদ্ধারের পর সমরযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মীয় ও জনহিতকর কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহীপালের ইতিহাস সম্যক আলোচনা করিলে এই প্রকার অভিযোগ সমর্থন করা যায় না। পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারকার্য সম্পাদন করিয়া মহীপাল যথেষ্ট শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়াছেন। তারপর রাজেন্দ্র চোলের অভিযানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় তাঁহাকে বেশ বিব্রত করিয়াছিল। এই অবস্থায় সুদূর পঞ্চনদ অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ তাঁহার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। তদুপরি মুসলিম আক্রমণ তাঁহার স্বরাজ্যসীমা পর্যন্ত পেঁছায় নাই। ফলে তাঁহার উদ্বেগের কোন কারণ ঘটে নাই। সেই সময় সমগ্র উত্তর ভারত ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের শাসনাধীনে খণ্ড বিখণ্ড ছিল। সেই সময়কার ইতিহাসে সর্বভারতীয় সম্মিলিত প্রতিরোধের কথা চিন্তাই করা যায় না। আক্রান্ত রাজ্যসমূহ হয়তো অবস্থার চাপে সম্মিলিত ভাবে মুসলমানদের প্রতিরোধ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের পূর্ব সীমান্তের পালরাজ্যের পক্ষে এই প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এই কথা মনে রাখিয়া এবং মহীপালের নিজস্ব সমস্যাদির কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে ভীরু কাপুরুষ অথবা দেশের প্রতি কর্তব্য পালনে উদাসীন ইত্যাদি দোষে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা উচিত হইবে না।

পাল সাম্রাজ্যকে আসন্ন বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করাই মহীপালের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। বিহার, উত্তর বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া মহীপাল পাল সাম্রাজ্যকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন। রাজত্বের শেষের দিকে তিনি মিথিলা (উত্তর বিহার) অঞ্চলেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বারাণসী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তার লাভ করিয়াছিল এমন মনে করিবার কোন প্রমাণ নাই। সারনাথ লিপি বিখ্যাত বৌদ্ধ তীর্থে মহীপাল কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মীয় কীর্তি রক্ষণ ও নির্মাণের পরিচয় দান করে।

মহীপালের ধর্মীয় ও জনহিতকর কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। বাংলার অনেক দীঘি ও নগরী এখনও তাঁহার নামের সহিত

বিজড়িত হইয়া আছে। রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ, বগুড়া জেলার মহীপুর, দিনাজপুর জেলার মাহীসন্তোষ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল নগরী; দিনাজপুরের মহীপালদীঘি ও মুর্শিদাবাদের মহীপালের সাগরদীঘি—এই সবই মহীপালের স্মৃতিবহ এবং প্রমাণ করে যে বাংলার জনগণের কাছে মহীপালের নাম কতখানি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবত জনহিতকর কার্যাবলীর মাধ্যমেই মহীপাল এই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। অসংখ্য লোক গাঁথায় মহাপালের নাম জড়িত ছিল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভগবতে বলা হইয়াছে যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহীপালের এই সব গীতিকা খুবই জনপ্রিয় ছিল। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে মহীপালের জনপ্রিয়তা বহুকাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। দুঃখের বিষয় এইসব গীতিকা আজকাল শোনা যায় না। কিন্তু 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' প্রভৃতি লৌকিক প্রবাদের অদ্যাবধি প্রচলন তাঁহার জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক।

মহীপালের ধর্মীয় কীর্তি সংরক্ষণ ও নির্মাণের বহু প্রমাণ রহিয়াছে। সারনাথ লিপিতে বৌদ্ধতীর্থে বিভিন্ন নির্মাণ কার্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ছাড়া অগ্নিদাহে বিনষ্ট নালন্দা মহাবিহারে জীর্ণোদ্ধার এবং বুদ্ধগয়ায় দুইটি মন্দির তিনি নির্মাণ করেন। পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষও মহীপালের সময়ে এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও নির্মাণ কার্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে পাল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার পর মহীপাল ধর্মীয় ও জনহিতকর কার্যে মনোনিবেশ করেন এবং সেই কারণেই তাঁহার এতো জনপ্রিয়তা।

মহীপালের ইমাদপুরে প্রাপ্ত লিপি তাঁহার রাজত্বের ৪৮ বৎসরের। সুতরাং প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল, ৯৯৫—১০৪৩ খৃষ্টাব্দ, তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাব এই দীর্ঘ রাজত্বকাল পাল সাম্রাজ্যকে নবজীবন দান করিয়াছিল। দেবপালের পর শতাব্দীকাল উদ্যমের অভাবে পাল সাম্রাজ্যে যে অবনতি আসিয়াছিল, তাহা অব্যাহত থাকিলে পালবংশের শাসন চারি শতাব্দীকাল ব্যাপী বিরাজমান থাকা খুবই অসম্ভব ছিল। মহীপালের রাজত্বের প্রারম্ভে যে পালসাম্রাজ্য দক্ষিণ বিহারে সীমাবদ্ধ ছিল, উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় সেই সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাই মহীপালের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তাঁহার এই পুনরুদ্ধার এবং ধর্মীয় ও জনহিতকর কার্যাবলী তাঁহাকে ইতিহাসে তাঁহার এই পুনরুদ্ধার ধর্মীয় ও জনহিতকর কার্যাবলী তাঁহাকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাল সাম্রাজ্য—অবনতি ও বিলুপ্তির যুগ

প্রথম মহীপালের পুনরুদ্ধার কার্য বেশীদিন টিকিয়া থাকে নাই। মহীপালের পরবর্তী প্রায় শতবর্ষকাল পাল সাম্রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ক্রমশই দুর্বল হইয়া পড়ে, ধীরে ধীরে অবনতি ও বিলুপ্তির পথে আগাইয়া যায়। পরবর্তী পাল রাজাদের মধ্যে একমাত্র রামপালই কিছুটা শৌর্য ও বীর্যের পরিচয় দেন এবং অবনতির গতিকে ক্ষণকালেব জন্য রোধ করিতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁহার পর বিলুপ্তি আব বেশীদিন ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার ইতিহাসে সুদীর্ঘ চারি শতাব্দী ব্যাপী পাল শাসনের অবসান হয়।

প্রথম মহীপালের পর তাঁহার পুত্র নয়পাল ও পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল একের পর এক রাজত্ব করেন। নয়পাল ১৫ বৎসর (আঃ ১০৪৩—১০৫৮ খৃঃ) ও বিগ্রহপাল ১৭ বৎসর (আঃ ১০৫৮—১০৭৫ খৃঃ) রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা ছিল কলচুরিরাজ কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণের উপর্যুপরি আক্রমণ। তিব্বতী গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কর্ণ প্রথমবার মগধ আক্রমণ করিয়া নয়পালকে পরাজিত করেন। তবে শেষ পর্যন্ত নয়পাল কর্ণকে পরাজিত করেন এবং বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় বিরোধের মীমাংসা হয়। তৃতীয় বিগ্রহপালের শাসনকালে কর্ণ দ্বিতীয়বার পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধেও কর্ণ প্রথমে জয়লাভ করেন। বীরভূম জেলার পাইকোরে প্রাপ্ত কর্ণের শিলাস্তম্ভলিপি হইতে মনে হয় যে তিনি পাল সাম্রাজ্যের কিছু অংশ অধিকারও করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে অবশেষে বিগ্রহপালের বিজয়ের কথা আছে এবং বিগ্রহপাল কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয় যে বৈবাহিক সম্বন্ধের মাধ্যমে উভয় পক্ষের বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। কলচুরি সাম্রাজ্য চন্দেল্ল, চালুক্য ও পরমারগণ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় লক্ষ্মীকর্ণকে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সুতরাং পালদের

সহিত বিরোধের মীমাংসা করিয়া কন্যাকে বিগ্রহপালের নিকট বিবাহ দিয়া কর্ণ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

কলচুরি সূত্রে জানা যায় যে কর্ণ বঙ্গের রাজাকেও পরাস্ত করিয়াছি-ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ কর্ণ পালদের বিরুদ্ধে সাফল্যের পর আরোও পূর্ব-দিকে অগ্রসর হন এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজাকে পরাজিত করেন। চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রই বোধহয় পরাজিত বঙ্গপতি। রাজেন্দ্র-চোলের অভিযান গোবিন্দচন্দ্রের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব করিয়াছিল এবং কর্ণের আক্রমণ চন্দ্রশাসনের অবসান ঘটাইয়াছিল। কর্ণের এই বিজয় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পাল শাসন বিস্তারের পথ সুগম কবিয়াছিল। পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা মত পোষণ করিয়াছি যে পাল শাসন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বের অল্পকাল পূর্বে এবং বাঘাউরা ও নারায়ণপুর লিপি দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালের। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে কর্ণের আক্রমণের পর বিগ্রহপালের সহিত সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পালশাসন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বিস্তার লাভ করে। অবশ্যি এই অঞ্চলে তাঁহাদের অধিকার বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে উত্তর বাংলায় বিদ্রোহের সুযোগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মবংশীয় রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কলচুরি আক্রমণ ছাড়াও পালসাম্রাজ্য অন্য এক বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকার হইয়াছিল। কল্যাণের চালুক্য বংশীয় রাজা প্রথম সোমেশ্বর, দ্বিতীয় সোমেশ্বর ও ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে একাধিকবার গৌড় আক্রমণের কথা চালুক্য লিপিমালায় আছে। বিলহন বিরচিত 'বিক্রমাঙ্ক-দেব চরিত' গ্রন্থেও বিক্রমাদিত্য কতৃক গৌড়রাজ্য আক্রমণের উল্লেখ আছে। এইসব প্রমাণ হইতে মনে হয় যে ১০৪২ ও ১০৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একাধিক-বার চালুক্যরাজ কতৃক পাল সাম্রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল।

পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে উড়িষ্যার রাজাগণও বাংলা আক্রমণ করেন। সোমবংশীয় রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি গৌড় ও রাঢ়ে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা উদ্যোতকেশরী গৌড়ের সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া লিপি প্রমাণ আছে। উভয় রাজারই সঠিক কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। খুব সম্ভবত তাঁহারা একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করিতেন।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কামরূপ রাজ রত্নপালও বাংলা আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে নয়পাল ও বিগ্রহপালের রাজত্বে পাল সাম্রাজ্য চতুর্দিক দিয়া আক্রান্ত হইয়াছিল। এই অবস্থা তাঁহাদের দুর্বলতার কথাই প্রমাণ করে। রাজ্যাভ্যন্তরেও এই দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। দুর্বলতার সুযোগে বাংলা ও মগধে স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হয়। ঢেক্করীতে (সম্ভবত বর্ধমান জেলায়) মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ ও গয়ার পার্শ্ববর্তী ভূভাগে শূদ্রক নামক এক সেনানায়ক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মগধে মান বংশীয় রাজারাও প্রায় স্বাধীন ছিলেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে বিভিন্ন দিক হইতে বৈদেশিক আক্রমণ পাল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করিয়া ফেলে এবং এই সুযোগে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের উদ্ভব হয়। তবে এই দুরাবস্থা আসন্ন ঘোরতর বিপদের পূর্বাভাস মাত্র।

দ্বিতীয় মহীপাল ও বরেন্দ্রে সামন্ত-বিদ্রোহ

তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র ছিল, দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল। বিগ্রহপালের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহীপাল প্রায় পাঁচ বৎসরকাল (আঃ ১০৭৫—১০৮০ খৃঃ) রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা উত্তর বাংলার সামন্ত-বিদ্রোহ, যাহার ফলে কৈবর্তনায়ক দিব্য (বা দিব্বোক) বরেন্দ্র অধিকার করেন এবং নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই বিদ্রোহ ও বিদ্রোহোত্তর ঘটনাবলীর সবিস্তার বর্ণনা আমরা সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত' কাব্যে পাই। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য অপরসীম। কারণ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ইহাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক উপাদান এবং ইহাতে আমরা সমসাময়িক এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাই। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা উচ্চরাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, ফলে সন্ধ্যাকর নন্দীর এই ঘটনা সম্বন্ধে জানিবার সুযোগ ছিল। তিনি নিজেও অধিকাংশ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং 'রামচরিত' এই সময়কার ইতিহাসের অতি মূল্যবান উপাদান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থের কাব্যিক শ্লোকসমূহ হইতে অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন করা দুরূহ কাজ, এমনকি শ্লোকসমূহের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করাই কঠিন। ইহার প্রধান

কারণ কাব্যখানি দ্ব্যর্থবোধক, প্রতিটি শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ। এক অর্থে রামায়ণে বর্ণিত কাহিনী, অন্য অর্থে পালরাজাগণের, বিশেষ করিয়া রামপালের ইতিহাস। দ্ব্যর্থবোধক শ্লোক রচনা করিতে গিয়া কবি শব্দ-যোজনা এমনভাবে করিয়াছেন যে তাহা সহজে বিশ্লেষন করা যায় না। আমাদের সৌভাগ্য যে কবির জীবিতাবস্থায় বা অল্পকাল পরে, এই কাব্যের একটি টীকা রচিত হইয়াছিল। এই টীকা থাকার ফলে সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধীয় অর্থ বোঝা অনেকাংশে সহজ হইয়াছে। কিন্তু এই টীকা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫ শ্লোক পর্যন্ত। বাকি যেই অংশের টীকা নাই, সেই অংশের শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা করা কঠিন, বিশেষ করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহার প্রকৃত অর্থ করা সর্বত্র সম্ভবপর নয়। তবে টীকার সাহায্য নিয়া বরেন্দ্রের বিদ্রোহ ও রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্র পুনরাধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী যে সব ক্ষেত্রে সত্য ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন এইরূপ মনে করাও ঠিক হইবে না। কারণ তাঁহার বর্ণনায় রামপালের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

মহীপাল তাঁহার অন্য দুই ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, কারণ দুষ্ট লোকের কথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং রামপাল রাজক্ষমতা অধিকার করিবেন। দুর্বল পাল সাম্রাজ্যে উত্তরাধিকার নিয়া বিবাদ ও ষড়যন্ত্র মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তবে সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনায় মনে হয় যে মহীপাল নিছক অহেতুক সন্দেহের ফলে ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। নন্দী মহীপাল সম্বন্ধে 'কুট্টিম কঠোর', 'দুর্নয়ভাজ' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক উক্তি করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে মনে হয় যে বরেন্দ্রে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল তাহা মহীপালের এই অন্যায় আচরণেরই ফল। মহীপালের যথেষ্ট পরিমাণ সমরসজ্জা ছিল না, তবুও তিনি মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মহীপাল পরাস্ত ও নিহত হন। কৈবর্ত জাতীয় নায়ক দিব্য বরেন্দ্র অধিকার করেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বরেন্দ্র (উত্তর বাংলা) এই বিদ্রোহের, যাহার ফলে ঐ অঞ্চলে পাল শাসনের বিলুপ্তি ঘটে, কারণ, উৎপত্তি ও প্রকৃতি নিরূপণ করা কঠিন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কেহ মনে করেন যে অত্যাচারী মহীপালের রাজত্বে বিরাজমান অসন্তোষের মধ্যে দিব্য স্বজাতীয় কৈবর্ত প্রজাদের নিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবার

কেহ কেহ এই বিদ্রোহকে ধর্মীয় প্রকৃতি দান করিয়া মত পোষণ করিয়াছেন যে মৎস্যজীবি কৈবর্তদিগকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজারা সামাজিক নির্যাতনের বশবর্তী করিয়াছিলেন কারণ কৈবর্তদের জীবিকা বৌদ্ধধর্ম বিরোধী ছিল। মহীপালের রাজত্বের প্রারম্ভে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের কারারুদ্ধ-করণের ফলে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সুযোগেই দিব্য বিদ্রোহ করেন এবং মহীপালকে হত্যা করেন। এই ধরনের ব্যাখ্যা নেহায়েতই আনুমানিক। রামচরিতে এই ধরনের ব্যাখ্যা করার পক্ষে কোন ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয় না। অনেকে আবার মত পোষণ করিয়াছেন যে রামপাল সর্বসম্মত রাজা ছিলেন। মহীপাল জ্যেষ্ঠত্বের দাবীতে সিংহাসন অধিকার করিলে রামপালের পক্ষ সমর্থনকারীদের উত্থানই এই বিদ্রোহের মূল কারণ। কিন্তু এই মতও গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। এই বিদ্রোহেব ফলে রামপাল তাঁহার রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারাইয়াছিলেন, এই ক্ষতি তাহার যথেষ্ট মনোকষ্টের কারণ হইয়াছিল এবং তিনি রাজা হইয়া উত্তর বাংলা পুনরধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং এই বিদ্রোহের সহিত রামপাল বা তাঁহার সমর্থনকারীদের কোন সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয় না।

রামচরিত কাব্যের বিভিন্ন শ্লোক হইতে এই বিদ্রোহের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। রামচরিতে এই বিদ্রোহকে 'অনীকম্ ধর্মবিপ্লবম্' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। টীকাকার 'অনীকম্' এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'অলক্ষ্মীকম্, (অশুভ বা অপবিত্র) কিন্তু ধর্মবিপ্লবের কোন ব্যাখ্যা দান করেন নাই। অনেকে ইহার অর্থ করিয়াছেন বেসামরিক বিদ্রোহ। ধর্মবিপ্লবে কিছুটা ধর্ম বা নীতি হইতে বিচ্যুতির বা কর্তব্য বিচ্যুতির অর্থ নিহিত আছে। মহীপাল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ হারান। সেই যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া রামচরিতের টীকাকার মিলিত সামন্তচক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কাহারা এই মিলিত সামন্তচক্রে ছিল তাহাব কোন উল্লেখ নাই। রামচরিতের একটি শ্লোকে ইঙ্গিত আছে যে দিব্য মহীপালের অধীনে উচচ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাম চরিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে দিব্য মহীপালের মৃত্যুর পর বরেন্দ্রভূমি অধিকার করেন। সুতরাং পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে দিব্য এই বিদ্রোহ ও মিলিত সামন্তচক্রের সহিত জড়িত ছিলেন, এইরূপ মনে করাই সঙ্গত। রামচরিতে দিব্যকে 'দস্যু' ও 'উপধিব্রতী' বলা

হইয়াছে। টীকাকার 'উপধিব্রতী'র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে অবশ্য কর্তব্য পালন করিবার ভানকারী বা 'ছদ্মানিব্রতী'। এই ব্যাখ্যায় যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে দিব্য রাজকর্মচারী হিসাবে বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন এই ভান করিয়া যে কর্তব্যবশে তিনি রাজার পক্ষেই বরেন্দ্র অধিকার করিতেছেন। কিন্তু পরে তাহার স্বাধীনতা ঘোষণায় বিদ্রোহকারী সামন্তচক্রের সহিত তাঁহার যে গোপন সম্পর্ক ছিল তাহাই প্রকাশ পায়। দিব্যের এই আচরণ স্বভাবতই সন্ধ্যাকর নন্দীর কাছে কুৎসিত ও নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে, এবং ন্যায়নীতির বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল বলিয়া হয়তো তিনি ইহাকে 'ধর্মবিপ্লব' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে মহীপাল মিলিত সামন্ত-চক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং উত্তর বাংলা তাঁহার হাত ছাড়া হইয়াছিল। দিব্য, যিনি খুব সম্ভবত রাজকর্মচারী ছিলেন, বরেন্দ্র স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করেন এবং ইহা হইতেই মনে হয় যে সামন্তচক্রের সহিত দিব্যের নিশ্চয়ই পূর্বসম্বন্ধ ছিল। সামন্তদের স্বাধীনতা ঘোষণার কিছু কিছু লক্ষণ আমরা মহীপালের রাজত্বের কিছুকাল আগেও লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং বরেন্দ্রের মিলিত সামন্তচক্রের বিরোধিতা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কেন্দ্রীয় শাসনের বিন্দুমাত্র দুর্বলতার সুযোগে সামন্ত-রাজগণ বিদ্রোহী হইবে ইহাই স্বাভাবিক। মহীপালের সিংহাসন আরো-হণের সাথে সাথে তাঁহার অন্য দুই ভ্রাতার ষড়যন্ত্র ও ইহার ফলস্বরূপ ভ্রাতৃদ্বয়ের কারারুদ্ধকরণে পাল শাসনের দুর্বলতা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। এই সুযোগে উত্তর বাংলার সামন্তবর্গ বিদ্রোহী হয় এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মহীপালের মৃত্যু হয়। এই অভ্যুত্থানকে নিপীড়িত কৈবর্ত-জাতির বিদ্রোহ বা মহাপুরুষ দিব্য কর্তৃক অত্যাচারী পালশাসনের অবসান বলিয়া মনে করার কোনই কারণ নাই।

উত্তর বাংলায় দিব্য ও তাঁহার বংশের শাসন বেশ কিছু দিন চলিয়া-ছিল। দিব্যের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রুদোক ও তাঁহার পর রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্র শাসন করেন। রামচরিতে ভীমকে প্রশংসা করিয়া কয়েকটি শ্লোক আছে এবং তাঁহার রাজ্যের শক্তির ও সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে। দিনাজপুরের কৈবর্তস্তম্ভ অদ্যাবধি এই রাজবংশের স্মৃতি বহন করিতেছে।

মহীপালের মৃত্যু ও বরেন্দ্রে বিদ্রোহের সুযোগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এক নূতন রাজশক্তির (বর্মবংশের) উদ্ভব হয়। এই বংশীয় রাজা জাতবর্মা

দিব্যকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন। দিব্য রামপালের বিরুদ্ধেও সাফল্যজনক আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। অবশিষ্ট পরে রামপাল পালশক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়া বরেন্দ্র উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রামপাল

দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় শূরপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। শূরপাল ও রামপাল কিভাবে কারাগার হইতে মুক্তি পায় তাহা জানা যায় না। সীমিত পাল সাম্রাজ্যে, খুব সম্ভবত মগধ ও পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষে, শূরপাল রাজত্ব করেন। তাহার রাজ্যকালের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। মনে হয় তিনি দুই এক বৎসর (আ: ১০৮০—১০৮২ খৃঃ) রাজত্ব করেন।

শূরপালের পর রামপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজত্বের প্রারম্ভে তাঁহার রাজ্যও বিহার এবং পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল। বিহারে তাঁহার শাসনকালের বহু লিপিপ্রমাণ আছে। পশ্চিম বাংলায় তাঁহার অধিকারের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারে রামপাল যে সমস্ত সামন্তরাজের সাহায্য নিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করিত। তবে মনে রাখিতে হইবে যে পশ্চিম বাংলায় রামপালের আধিপত্য অত্যন্ত দুর্বল ছিল। কারণ রাম-চরিতে উল্লেখ আছে যে রামপাল ঐসব সামন্তরাজাদের নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় যে কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় সামন্তদেরই বেশী দাপট ছিল।

রামপাল রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই বরেন্দ্র উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হন। সম্ভবত তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকে দিব্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া-ছিলেন। ফলে রামপাল শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভালভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সৈন্য সংগ্রহ ও সাহায্যের জন্য তিনি সামন্তগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। অর্থ ও সম্পত্তির প্রলোভনে তিনি অনেক সামন্তরাজার সাহায্য গ্রহণে সক্ষম হইলেন। যেসব সামন্তরাজা তাঁহাকে সাহায্য করিয়া-ছিল তাহাদের নাম রামচরিতে পাওয়া যায়। টীকাকারের ব্যাখ্যা হইতে তাঁহাদের অনেকের রাজ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়। আবার

অনেকগুলির অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। সাহায্যকারী সামন্তদের নাম নীচে দেওয়া হইল :

(১) মগধ ও পীঠীর অধিপতি ভীমযশ।
(২) কোটাটবীর রাজা বীরগুণ। কোটাটবী সম্ভবত বাঁকুড়া জেলার কোটেশ্বর।
(৩) দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলায়।
(৪) দেবগ্রামের রাজা বিক্রমরাজ।
(৫) অরণ্য প্রদেশস্থ অপরমন্দারের (হুগলী জেলার মন্দারান) লক্ষ্মীশূর।
(৬) কুঞ্জবটির (সাঁওতাল পরগণা) শূরপাল।
(৭) তৈলকম্পের (মানভূম) রুদ্রশিখর।
(৮) উচ্চালের ভাস্কর বা ময়গলসিংহ।
(৯) ঢেক্করীরাজ (বর্ধমান জেলা) প্রতাপসিংহ।
(১০) কয়ঙ্গল মণ্ডলের (রাজমহলের নিকটবর্তী কজঙ্গল) নরসিংহার্জুন।
(১১) সংকটগ্রামের চণ্ডার্জুন।
(১২) নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ।
(১৩) কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্ধন। ইহার অবস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক হওয়া যায় না। তবে ইহার অবস্থান রাজশাহী বা বগুড়া জেলায় ছিল বলিয়া অনেকে মত পোষণ করেন। সেই ক্ষেত্রে মনে করিতে হইবে যে উত্তর বাংলার দুই একজন সামন্ত রামপালের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল।
(১৪) পদুবন্বার রাজা সোম।

এই সমস্ত সামন্তরাজা ছাড়াও রামপালের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁহার মাতুল রাষ্ট্রকূটকুলতিলক মথন বা মহন। তিনি তাঁহার দুই পুত্র, কাহ্নরদেব ও সুবর্ণদেব, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজকে সঙ্গে লইয়া রামপালকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন। রামপাল প্রথমে শিবরাজের অধীন এক অগ্রগামী সৈন্যদল বরেন্দ্র অভিযানে পাঠান। এই সৈন্যদল গঙ্গানদী পার হইয়া বরেন্দ্রভূমি বিধ্বস্ত করিয়া ফিরিয়া আসে। শিবরাজ সম্ভবত গঙ্গার তীরে ভীমের সীমান্তবর্তী ঘাটিসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া মূল সৈন্যবাহিনীর গঙ্গা অতিক্রমের পথ সংরক্ষিত করেন। রামপালের নেতৃত্বে মূল সৈন্যদল গঙ্গা অতিক্রম করিলে ভীমের সহিত এক তুমুল যুদ্ধের সূচনা হইল। রামপাল

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা হইতে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া বরেন্দ্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। রামচরিতের নয়টি শ্লোকে এই যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধে রামপাল ও ভীম উভয়ই বিশেষ বিক্রম প্রদর্শন করেন। কিন্তু হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ দৈববিড়ম্বনায় ভীম বন্দী হইলেন। ফলে ভীমের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। হরি নামক ভীমের এক সুহৃদ পুনরায় সৈন্যদলকে একত্রিত করিয়া আবার প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। রামপাল বা তাঁহার পুত্র সমরকালে স্বর্ণকলস উজাড় করিয়া উপঢৌকনের মাধ্যমে হরিকে নিজের পক্ষভুক্ত করেন। ফলে প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া পড়িল ও রামপাল জয়ী হইলেন। পরে হরির সহিত রামপাল ও পরবর্তী পালরাজাদের সৌহার্দ্য বজায় ছিল। বরেন্দ্র হস্তগত করিবার পর রামপাল ভীমের কঠোর দণ্ড বিধান করিলেন। বধ্যভূমিতে নিয়া প্রথমে ভীমের সম্মুখে তাঁহার পরিজনবর্গকে হত্যা করা হইল এবং পরে ভীমকে হত্যা করা হয়।

বহুদিন কৈবর্তশাসনে থাকিবার পর রামপাল বরেন্দ্রে পালশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হন। কৃষির উন্নতি ও প্রজার করভার লাঘব প্রভৃতি পুনর্বাসনমূলক কার্যে তিনি মনোনিবেশ করেন। তারপর তিনি রামাবতী নামক এক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী পাল রাজাদের শাসনকালে রামাবতীই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিক রামাবতী মালদহের নিকটবর্তী ছিল বলিয়া মনে করেন।

পিতৃভূমি বরেন্দ্র পুনরধিকার করিয়া রামপাল নিকটবর্তী রাজ্যসমূহে প্রভাব বিস্তার করিয়া পালসাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হন। রামচরিতে বলা হইয়াছে যে পূর্বদেশীয় বর্মরাজ উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ উপঢৌকন দিয়া রামপালকে তুষ্ট করিয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় নবপ্রতিষ্ঠিত বর্মরাজাগণ উত্তর বাংলায় রামপালের সাফল্যে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নিজরাজ্য রামপালের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপঢৌকন প্রেরণের মাধ্যমে পালরাজার তুষ্টি ও বন্ধুত্ব আদায় করিয়াছিলেন। বর্মরাজ কর্তৃক রামপালের তুষ্টিসাধন তাহাদের আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা পাল সাম্রাজ্যের অধীন হইয়াছিল এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই।

রামচরিতে রামপালের মিত্ররাজা কর্তৃক কামরূপ জয়ের উল্লেখ আছে। কামরূপ বা কামরূপরাজ্যের অংশ বিশেষ যে পাল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনেও পাওয়া যায়।

রামপাল উড়িষ্যার রাজনীতিতেও সাফল্যজনক ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ হইতে গঙ্গরাজগণ উড়িষ্যা বারংবার আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত করিতেছিল। এই সুযোগে রামপালের সামন্ত দণ্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহ উৎকলরাজ কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। গঙ্গরাজগণ উৎকল অধিকার করিলে পাল সাম্রাজ্যের জন্য সমূহবিপদ এই আশঙ্কা কবিয়া রামপাল নিজের মনোনীত একজনকে উৎকলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একই কারণে হয়তো অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গা রাজ্যচ্যুত উৎকলরাজকে আশ্রয় দেন। এইরূপ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার রক্ষক রূপে রামপাল ও অনন্তবর্মার মধ্যে বহুদিনব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। রামরচিত অনুসারে রামপাল উৎকল জয় করিয়া কলিঙ্গদেশ পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন। অনন্তবর্মার লিপি হইতে জানা যায় যে ১১৩৫ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পূর্বে তিনি উড়িষ্যা জয় করিয়া রাজ্যভুক্ত করেন। সুতরাং মনে হয় যে রামপালের মৃত্যু পর্যন্ত উড়িষ্যায় তাঁহার আধিপত্য বজায় ছিল।

উত্তর ভারতীয় শক্তি গাহড়বাল বংশীয় রাজাদের সাথে রামপালের বিরোধ হইয়াছিল। কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের মৃত্যুর পর ১০৯০ খৃষ্টাব্দে গাহড়বাল বংশ বারাণসী ও কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া পাল সাম্রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ফলে তাঁহাদের সহিত পাল সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ খুবই স্বাভাবিক। তাঁহাদের লিপি হইতে জানা যায় যে গাহড়বাল রাজ মদনপালের রাজত্বকালে (১১০৪—১১১১ খৃঃ) তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র গৌড়রাজের বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান করিয়াছিলেন। যুদ্ধে গোবিন্দচন্দ্র পাল সাম্রাজ্যের কোন অংশ অধিকার করিয়াছিলেন এমন কোন কথা তাঁহার প্রশস্তিকার বলেন নাই। হয়তো রামপাল স্বরাজ্য সংরক্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইহাই রামচরিতে উল্লেখিত হইয়াছে এই বলিয়া যে রামপাল মধ্যদেশের রাজ্যবিস্তারে বাধা দান করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন রামপালের মাতুল মহনের দৌহিত্রী। সম্ভবত এই বৈবাহিক মৈত্রী কিছুকালের জন্য দুই বংশের বিরোধিতার অবসান করিয়াছিল। তবে রামপালের মৃত্যুর পর পালসাম্রাজ্যের অনেকাংশ গাহড়বাল রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

রামপাল বেশ প্রৌঢ় অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার রাজত্বকালেই তিনি শৌর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া মনহলি· তাম্র-লিপিতে উল্লেখ আছে। তাছাড়া অগ্রজ দুই ভ্রাতার রাজত্বের পর তিনি রাজা হন। লিপি প্রমাণে বলা যায় যে তিনি অন্ততঃ ৪২ বৎসর (আঃ ১০৮২—১১২৪ খৃঃ) রাজত্ব করেন। সুতরাং শেষের দকে বার্ধক্য তাঁহাকে রাজ্যশাসন ভার পুত্রদের উপর অর্পণ করিতে হয়তো বাধ্য করিয়াছিল। রামচরিতে এই ধরনের ইঙ্গিত আছে। তবে বৃদ্ধ বয়সে মাতুল মহনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি এতো শোকাবিষ্ট হয়া পড়েন যে গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

রামপালের রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে সাফল্যপূর্ণ ছিল। সীমিত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া তিনি বিলুপ্ত গৌরব অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। উত্তর বাংলা পুনরায় পাল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া রামপাল শৌর্য, বীর্য ও বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই কৃতিত্বপূর্ণ কার্যের জন্যই তিনি পাল-বংশের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাজত্বের প্রারম্ভে তাঁহার অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে তাঁহাকে অধীনস্থ সামন্ত রাজাগণের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। সামন্তবর্গের সাহায্যে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া বরেন্দ্র আক্রমণ ও পুনরুদ্ধারে সাফল্য তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়সংকল্পের প্রমাণ দেয়। রাজত্বের শেষের দিকে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্য কামরূপ ও উড়িষ্যায় সাফল্য অর্জন করেন। ঐ দুই রাজ্যে পাল প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণের চোড়গঙ্গ ও উত্তরের গাহড়বাল শক্তির বিরুদ্ধেও তিনি স্বরাজ্য অক্ষুণ্ন রাখেন। রাজত্বের শুরুর তুলনায় রাজত্বের শেষে পাল-শক্তির যে উন্নতি তাহাই রামপালের কৃতিত্বের মাপকাঠি। তাঁহার রাজত্বকালে পালসাম্রাজ্য শেষবারের মতো উজ্জীবিত হইয়াছিল--বিলুপ্তির পূর্বে শেষ বিচ্ছুরণ। তাঁহার মৃত্যুর পরই অবনতি দ্রুতগতিতে বিলুপ্তির পথে আগাইয়া নিয়া যায়। তাই রামপালকে পালবংশের শেষ 'মুকুটমণি' বলা যাইতে পারে।

পাল সাম্রাজ্যের ধ্বংস

রামপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কুমারপাল রাজা হন। রামচরিতে রামপালের দুই পুত্র বিত্তপাল ও রাজ্যপালের উল্লেখ আছে এবং তাঁহারা বরেন্দ্রে বিদ্রোহ দমনে পিতাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। রামপালের আর

এক পুত্র মদনপাল পরে পাল সিংহাসন অধিকার করেন। রামপালের এই চারিপুত্রের মধ্যে কে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন, বা কুমারপাল কোন অধিকারে রাজা হন তাহা জানিবার উপায় নাই।

কুমারপালের রাজত্বকালে (আ: ১১২৪—১১২৯ খৃ:) দুইটি ঘটনা বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে। বৈদ্যদেব ছিলেন কুমারপালের মন্ত্রী এবং পরে কামরূপে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রথম ঘটনাটি হইতেছে যে কুমারপালের রাজত্বকালে বৈদ্যদেব অনুত্তরবঙ্গে এক নৌযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। তাই বিপক্ষ শক্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ নানান অনুমান করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার বর্মবংশীয় রাজাকে বৈদ্যদেব নৌযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে এক বর্মরাজা উপঢৌকনের মাধ্যমে রামপালের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। এমনও হইতে পারে যে রামপালের সিংহাসন ত্যাগের পর বর্মরাজা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং ফলে বৈদ্যদেবের যুদ্ধাভিযান।

তবে অনুত্তরবঙ্গ বলিতে যদি পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাংশ ধরা যায় তাহা হইলে মনে হয় যে বৈদ্যদেব হয়তো গঙ্গরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গঙ্গরাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের লিপিতে উল্লেখ আছে যে তিনি ১১৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হুগলী জেলার মন্দার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং বৈদ্যদেবের নৌযুদ্ধ গঙ্গরাজার বিরুদ্ধে হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

তাছাড়া পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাংশে এই সময়ে সেনরাজবংশের উদ্ভব হয়। হইতে পারে যে বৈদ্যদেবের আক্রমণ তাহাদের বিরুদ্ধে ছিল।

বৈদ্যদেবের অন্য কীর্তি ছিল কামরূপে সামন্তরাজ তিম্‌গ্যদেবকে পরাজিত করা। তিম্‌গ্যদেব বিদ্রোহী হইলে কুমারপালের প্রধান আমাত্য বৈদ্যদেব তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং সেই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। সম্ভবত কুমারপালের মৃত্যুর পর তিনি কামরূপ স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, কমৌলি তাম্রলিপি এই স্বাধীনতার কথাই প্রমাণ করে।

কুমারপালের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজগণও পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলেই এই অঞ্চলে হয়তো সেন বংশের উত্থানের পথ সুগম হইয়াছিল। গাহড়বাল রাজাগণও মগধ আক্রমণ

করিয়া পাটনা পর্যন্ত অধিকার করেন। সুতরাং মনে হয় যে কুমারপালের রাজত্বেই পাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি শুরু হয়।

কুমারপালের পর রাজা হন তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোপাল। সন্ধ্যাকর নন্দী মাত্র একটি শ্লোকে গোপাল সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে গোপাল 'শত্রুঘোপায়ে স্বর্গে গমন করেন' অর্থাৎ কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি মারা যান। গোপালের নিমদীঘি শিলালিপিতেও এই রকম ইঙ্গিত আছে। গোপাল অন্তত ১৪ বৎসর (আঃ ১১২৯—১১৪৩ খৃঃ) রাজত্ব করেন।

তৃতীয় গোপালের পর রামপালের অন্য আর এক পুত্র মদনপাল সিংহাসন অধিকার করেন। রাজত্বের শুরু হইতেই তাঁহাকে চতুর্দিকে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্র ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গের অধিকার করেন। সুতরাং বিহারের অধিকাংশ গাহড়বাল রাজ্যভুক্ত হয়। তবে মদনপাল বিহারের কিয়দংশ শত্রুমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া লিপি প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্রের পর বিজয়চন্দ্র (আঃ ১১৫৫—৭০) আবার আক্রমণ চালাইয়া ক্রমশ বিহারের অধিকাংশ এলাকা অধিকার করেন। রামচরিতের একটি শ্লোক হইতে অনুমিত হয় যে মদনপাল অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গার সহিত যুদ্ধে কিছু সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন।

মদনপাল যাঁহার রাজত্বের অষ্টম বৎসরের পর উত্তর বাংলায় প্রভুত্ব হারান। অষ্টম বৎসর পর্যন্ত এই অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় মনহলি তাম্রশাসনে। তবে সেনরাজাদের উত্থান পশ্চিম বাংলায় শুরু হয় এবং তাঁহারা গৌড়ের রাজাকে পরাজিত করিয়া উত্তর পশ্চিম বাংলাও অধিকার করে। ইহার প্রমাণ তাঁহাদের লিপিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে সেনবংশের উত্থান বিস্তারিত আলোচনা করিব। রামচরিতে উল্লেখিত আছে যে মদনপাল এক প্রবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেন, তাঁহার বহু সৈন্য ক্ষতি হইলেও তিনি ঐ শত্রুরাজাকে কালিন্দী নদীর তীর পর্যন্ত হঠাইয়া দেন। এই নদী সম্ভবতঃ মালদহের নিকটবর্তী কালিন্দী নদী। মনে হয় যে মদনপালের এই শত্রুরাজা সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন। উত্তর-পশ্চিম বাংলা অধিকারের প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো বিজয়সেন মদনপাল কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি বাংলায় পাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি

ঘটাইয়া সেন বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় সফল হন। মদনপালের রাজত্বকালের বিস্তারিত ঘটনা জানিতে না পারিলেও এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তাঁহার মৃত্যুকালে দক্ষিণ-পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বাংলায় তাঁহার কোন অধিকারই ছিল না। তাঁহার শেষ সময়ে পালসাম্রাজ্য মগধের মধ্য ও পূর্ব ভাগে সীমাবদ্ধ ছিল।

মদনপাল ১৮ বৎসর (আঃ ১১৪৩—১১৬১ খৃঃ) রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসর ১১৬১ খৃষ্টাব্দে ছিল তাহা বক্তদর লিপির প্রমাণে সঠিক করিয়া বলা যায়। মদনপালই সম্ভবত শেষ পাল সম্রাট।

বিহারে প্রাপ্ত কিছু পাণ্ডুলিপি ও শিলালিপিতে গোবিন্দপাল, পলপাল ও ইন্দ্রদ্যুম্নপাল নামক রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের পালবংশের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল কিনা সঠিক করিয়া বলা যায় না। এমনকি ইহাদের অনেকের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করা যাইতে পারে। এমনও হইতে পারে মূল পাল বংশের পতনের পর পাল নামধারী কয়েকজন ক্ষুদ্র স্থানীয় রাজা গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন। গৌড়-রাজ্যে কোন অধিকার না থাকিলেও তাঁহাদের এই উপাধি গ্রহণ হয়তো পূর্ব গৌরবসূচক এবং ইহার তেমন কোন গুরুত্ব নাই।

অধুনা আবিষ্কৃত রামপালের রাজত্বের ৫৩ রাজ্যাঙ্কে লিখিত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে পাল বংশের কাল নির্ণয়ে কিছু পরিবর্তন আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের দীর্ঘ রাজত্বকালের (২৬ বৎসর) প্রমাণ সন্দেহজনক বলিয়া মনে করা হইয়াছে। অন্যদিকে তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল ২৬ বৎসর ছিল বলিয়া মনে করা হয়। আমরা আমাদের বর্ননায় যে কালনির্ণয় গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে রামপালের রাজত্বকাল ৪২ বৎসর ধরা হইয়াছে। সুতরাং রামপালের রাজত্বকাল ১০৭০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১১২৪ খ্রীস্টাব্দ বলিয়া ধরিলে পূর্ববর্তী রাজাদিগের রাজ্যলাভের তারিখ ১০।১১ বৎসর পিছাইয়া দিতে হইবে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় সম্ভব নয়।

নবম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশ সমূহ

অধুনা প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে এখন স্পষ্টতর ধারণা করা সম্ভব এবং এই অঞ্চলের পৃথক রাজনৈতিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের পর হইতে সেন-বংশের উদ্ভব পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা খুব অল্প সময়ের জন্যই উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার সহিত জড়িত ছিল। এতদিন উপাদানের অভাবে এই অঞ্চলের ইতিহাস উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার ইতিহাসের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন আর ঐরূপ ধারণা পোষণ করা যায় না। সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত উপাদান সমূহ হইতে এখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠন করা সম্ভব।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার পৃথক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় কয়েকটি তাম্রশাসন হইতে। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। শশাঙ্কের রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল কিনা সঠিক করিয়া বলা যায় না। ঐ সময়ে এই অঞ্চলে ভদ্ররাজবংশের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুপ্রমাণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাং উল্লেখ করিযাছেন যে নালন্দার বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত শিলভদ্র (সপ্ত শতাব্দীর প্রথমভাগে) সমতট অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ সম্ভূত ছিলেন। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থের তিব্বতী সংস্করণে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পূর্ববর্তীকালে রাজভদ্র নামে এক রাজার নাম উল্লেখিত আছে। খালিমপুর তাম্রশাসনে ধর্মপালের মাতা দেদ্দদেবীকে 'ভদ্রাত্মজা' বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে করা হয় যে দেদ্দদেবী কোন এক ভদ্ররাজার কন্যা ছিলেন। এইসব উল্লেখ হইতে ঐতিহাসিকগণ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এক ভদ্ররাজবংশের অবস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা করেন।

সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন মগধ ও গৌড়ে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাগণ প্রভুত্ব স্থাপন করে সেই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় খড়গ বংশের উদ্ভব হয়। ঢাকা জেলার আশরাফপুরে প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রশাসন ও কুমিল্লার

দেউল বাড়িতে প্রাপ্ত একখানি মূর্তিলিপি হইতে খড়্গোদ্যম জাতখড়্গ ও দেবখড়্গ নামে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তাম্রশাসনদ্বয় ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এই রাজবংশ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিবার উপায় নাই। তাঁহাদের রাজধানী ছিল কর্মান্ত-বাসক। কুমিল্লা জেলার বাড়কামতাই সম্ভবত কর্মান্ত-বাসক।

লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন ও শ্রীধারণ রাটের কৈলান তাম্রশাসন হইতে আমরা দুই সামন্ত রাজবংশের অবস্থিতি জানিতে পারি। উভয় সামন্তরাজবংশ ত্রিপুরা-নোয়াখালি অঞ্চলে সামন্তরাজা হিসাবে শাসন করিত এবং পরে প্রায়-স্বাধীন অবস্থা অর্জন করিয়াছিল। খুব সম্ভবত খড়্গ-রাজাগণই তাঁহাদেব অধিকর্তা ছিলেন।

লামা তারনাথ ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে বঙ্গে এক চন্দ্ররাজবংশের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোন প্রমাণ না পাইলে এই সময়ে চন্দ্রবংশের অবস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তবে এমনও হইতে পারে যে তারনাথ কালনির্দেশ করিতে ভুল করিয়াছেন। দশম শতাব্দী হইতে আমরা বঙ্গে চন্দ্ররাজবংশের অবস্থিতি সম্বন্ধে লিপি-প্রমাণ পাই।

সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা-দেশ উপর্যুপরি বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা স্বাভাবিক ভাবেই এই আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। ফলে ঐ অঞ্চলে মাৎস্যন্যায়ের উদ্ভব হয়। কিন্তু নদী বিধৌত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এই সব উত্তর-ভারতীয় আক্রমণের কবলে খুব সম্ভবত পড়ে নাই এবং এই অঞ্চলে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান ছিল।

খড়্গ বংশের শাসনের পর অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে এই অঞ্চলে দেবরাজবংশের উদ্ভব হয়। তিনখানি তাম্রশাসন ও কিছু সংখ্যক মুদ্রা হইতে দেবরাজবংশের অবস্থিতি প্রমাণিত হয়। এই তিনখানি তাম্র-শাসনের মধ্যে দুইখানি পাওয়া গিয়াছে ময়নামতিতে। একখানি তাম্র-শাসনের পাঠোদ্ধার সম্ভব হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা মহারাজা শ্রীআনন্দদেব ভূমিদান করিয়াছেন এবং পরবর্তী রাজা শ্রীভবদেব এই দান অনুমোদন করিয়াছেন। তৃতীয় তাম্রশাসনটিতে মহারাজা শ্রীভবদেব কর্তৃক ভূমিদান লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই তাম্রশাসনসমূহ হইতে দেবরাজবংশের চারিপুরুষের নাম পাওয়া যায়—শ্রীশান্তিদেব, শ্রীবীরদেব, শ্রীআনন্দদেব ও শ্রীভবদেব। সব কয়জন রাজাই পরম সৌগত, পরম ভট্টারক, পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন এবং ইহা তাঁহাদের সার্বভৌমত্বের পরিচয় দেয়। শ্রীভবদেবের একটি তাম্রশাসনে তাঁহাদের রাজধানী দেবপর্বতে ছিল বলিয়া উল্লেখিত আছে। দেবপর্বতের যে বর্ণনা আমরা এই তাম্রশাসন ও শ্রীধারণ রাটের কৈশান তাম্রশাসনে পাই তাহা হইতে মনে হয় যে কুমিল্লার লালমাই পাহাড়েই দেবপর্বত অবস্থিত ছিল। দেবরাজাদের রাজ্যসীমা নির্ধারণ সম্ভব নয়। তবে সমতট অঞ্চলে তাঁহাদের প্রভুত্ব ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। দেববাজাদের সময়কাল সম্বন্ধে জানিবারও কোন সঠিক প্রমাণ নাই। তবে তাম্রশাসন ও মুদ্রার লিপি বিচারে বলা যায় যে তাঁহারা অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাজত্ব করিত (আনুমানিক ৭৫০—৮০০ খৃষ্টাব্দ)। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে খড়গ রাজবংশের পর পরই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতট অঞ্চলে দেবরাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় যে সময়ে পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা দেব রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। দেবরাজাদের তাম্র-শাসনসমূহের প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থার জন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিবার কোন উপায় নাই।

চট্টগ্রামে প্রাপ্ত শ্রীকান্তিদেবের তাম্রশাসন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার আর এক রাজবংশের পরিচয় দান করে। এই তাম্রশাসনে কান্তিদেব, তাঁহার পিতা ধনদত্ত ও পিতামহ ভদ্রদত্তের নাম আছে। তবে সম্ভবত কান্তিদেবই বংশেব প্রথম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। লিপিতত্ত্ব বিচারে কান্তিদেবের তাম্রশাসনখানিকে নবম শতাব্দীতে নির্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং কান্তিদেন দেবরাজগণের পরবর্তী কালে রাজত্ব করেন বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু দেবরাজগণের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা বলা সম্ভব নয়।

মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব হরিকেলে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল বর্ধমানপুর। প্রাচীন ভৌগোলিক নাম 'হরিকেল' এর সঠিক সীমানা নির্দিষ্ট করা যায় না। অন্যান্য সব প্রাচীন ভৌগোলিক নামের মতোই ইহার সীমাও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হইয়াছে। তবে সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে 'বঙ্গ ও 'হরিকেল' প্রায় সমার্থ-বোধক এবং সম্ভবত শ্রীহট্ট অঞ্চলও হরিকেলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং

কান্তিদেবকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার (বঙ্গের) কোন অংশ বিশেষের নরপতি বলিয়া মনে করিতে হইবে। বর্ধমানপুরের অবস্থিতি নির্ধারণ সম্ভব নয়। তবে বর্ধমানপুর যদি সুপরিচিত বর্ধমান নগরী হয় তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে কান্তিদেবের রাজ্য পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষেও বিস্তৃত ছিল। তবে অন্য কোন প্রমাণের অভাবে এই সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত হইবে না।

কান্তিদেব বৌদ্ধ ছিলেন। তবে তাঁহার বা তাঁহার বংশের বিস্তারিত ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। কান্তিদেব বা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের পর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রবল পরাক্রান্ত চন্দ্রবংশের উদ্ভব হয়। হরিকেল রাজাদের হাত হইতেই চন্দ্রবংশ ক্ষমতা অধিকার করে বলিয়া ধারণা করা সম্ভব। সুতরাং দেবরাজবংশ ও চন্দ্ররাজবংশের মধ্যবর্তী সময়ে নবম শতাব্দীতে কান্তিদেব ও তাঁহার বংশধরগণ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেন। ইহার অধিক কিছু বলা আপাততঃ সম্ভব নয়।

চন্দ্র রাজবংশ

প্রাপ্ত তাম্রশাসনসমূহ হইতে বর্তমানে চন্দ্রবংশের ইতিহাস পুনর্গঠন সম্ভব। ময়নামতীতে প্রাপ্ত তিনখানি, ঢাকায় প্রাপ্ত একখানি ও সীলেটের পশ্চিমভাগে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন হইতে এখন এই বংশের শাসন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা সম্ভব। পূর্বে কয়েকখানি তাম্রশাসন হইতে শ্রীচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন রাজার নাম জানা সম্ভব ছিল। কিন্তু বিস্তারিত ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার এই শক্তিশালী রাজবংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় এই অঞ্চলের ইতিহাস উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার ইতিহাসের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া সাধারণভাবে সারা বাংলাদেশে পাল বংশীয় শাসন প্রবর্তিত ছিল বলিয়া মনে করা হইত। এখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকাংশে স্পষ্ট।

চন্দ্ররাজাদের প্রাপ্ত লিপিসমূহ ও সমসাময়িক অন্যান্য তথ্য হইতে চন্দ্রবংশের তালিকা ও চন্দ্ররাজাদের কাল নির্ণয় করা সম্ভব। চন্দ্ররাজবংশের তালিকা ও বিভিন্ন রাজার শাসনকালে প্রাপ্ত বিভিন্ন লিপি হইতে তাঁহাদের রাজত্বকালের উর্ধতন সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল:—

পূর্ণচন্দ্র

সুবর্ণচন্দ্র

১।	ত্রৈলোক্যচন্দ্র	....	রাজত্বকাল জানা যায় নাই।
২।	শ্রীচন্দ্র	....	৪৪
৩।	কল্যাণচন্দ্র	....	২৪
৪।	লডহচন্দ্র	....	১৮
৫।	গোবিন্দচন্দ্র	....	২৩

শেষের চার জন রাজার রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে ১১০।১১৫ বৎসর ব্যাপী ছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমরা পূর্ববর্তী এক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি যে দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল যে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই অভিযান বাঙ্গালদেশে গোবিন্দচন্দ্র নামক এক রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন। তিরুমুলাই লিপির গোবিন্দচন্দ্র যে চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্র সেই বিষয়ে খুব বেশী সন্দেহের অবকাশ নাই। ১০২১—২৪ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রচোলের এই অভিযান সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ১০২১—২৪ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেন এবং তিনি পালরাজা প্রথম মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন। কারণ ঐ চোল লিপিতেই উত্তর-পশ্চিম বাংলায় মহীপালের নাম উল্লেখিত আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে ১০২১—২৪ সন গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বের প্রথম ভাগে না শেষ ভাগে? 'শব্দপ্রদীপ' নামক চিকিৎসা শাস্ত্রের এক গ্রন্থের কিছু তথ্য এই ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে। এই গ্রন্থ প্রণেতার পিতা রামপালের এবং তাঁহার পিতামহ গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভায় চিকিৎসক ছিলেন। তাহা হইলে দেখা যায় যে রামপাল ও গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে এক পুরুষের ব্যবধান ছিল। এই সূত্র হইতে ধরা যাইতে পারে যে ১০২১—২৪ সন গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বের প্রথম দিকে ছিল। এই সমীকরণের উপর নির্ভর করিয়া মোটামুটিভাবে ধরা যাইতে পারে যে গোবিন্দচন্দ্র ১০২০ হইতে ১০৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইবার পিছন দিকে হিসাব করিয়া চন্দ্ররাজাদের রাজত্বকাল নিম্নরূপ ধরা যাইতে পারে :—

লডহচন্দ্র—১০০০—১০২০ খৃষ্টাব্দ
কল্যাণচন্দ্র— ৯৭৫—১০০০ খৃষ্টাব্দ
শ্রীচন্দ্র— ৯৩০—৯৭৫ খৃষ্টাব্দ

চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজত্বকালের কোন লিপি পাওয়া যায় নাই এবং তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। তবে

যেহেতু ত্রৈলোক্যচন্দ্র স্ববংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন সেহেতু তাঁহার রাজত্ব-কাল আনুমানিক ২৫।৩০ বৎসরকাল ধরা যাইতে পারে এবং তাঁহার রাজত্ব-কাল ৯০০—৯৩০ খৃষ্টাব্দ।

তবে উপরের কালপঞ্জি শব্দপ্রদীপের ভিত্তিতে রামপাল ও গোবিন্দ-চন্দ্রের মধ্যে এক পুরুষের ব্যবধান, এই সমীকরণের উপর নির্ভরশীল। তবে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই সমীকরণ সম্পূর্ণ নির্ভুল এইরূপ দাবী করা যায় না। তবে এই সমীকরণ ভুল হইলেও চন্দ্র-রাজাদের কালপঞ্জি ২৫ বৎসর পিছাইয়া দিতে হইবে মাত্র। ফলে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজত্বকাল দশম শতাব্দীর প্রারম্ভের পরিবর্তে নবম শতাব্দীর শেষে মনে করিতে হইবে। সুতরাং মোটামুটিভাবে ধরা যাইতে পারে যে দশম শতাব্দীর শুরু হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

চন্দ্রবংশের ক্ষমতালাভ সম্পর্কে তাঁহাদের তাম্রলিপিতে কিছু আভাস পাওয়া যায়। তাম্রশাসনসমূহে এই বংশের প্রথম ভূপতি পূর্ণচন্দ্রকে রোহিতাগিরির ভূস্বামী (ভূজাম) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র সুবর্ণচন্দ্রও সম্ভবত পিতার ন্যায় ভূস্বামী ছিলেন। সুবর্ণ-চন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রই বংশের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া মনে হয়। তাম্রশাসনসমূহের একটি শ্লোকে ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেল রাজার ক্ষমতার আধার বা প্রধান অবলম্বন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সেই অবস্থান হইতে তিনি চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি হইয়াছিলেন। এই শ্লোক হইতে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রথমে হরিকেল রাজের অধীন সামন্তরাজা ছিলেন এবং তিনি এতই ক্ষমতাশালী ছিলেন যে তাঁহাকে হরিকেল রাজার ক্ষমতার প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করা হইত। এই অবস্থা হইতে তিনি চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি হন। ইহাই হয়তো তাঁহার সার্ব-ভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ।

রোহিতাগিরির সনাক্তকরণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেহ কেহ রোহিতাগিরিকে বিহারের রোহ্তাসগড় বলিয়া মনে করিয়াছেন। তবে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতবাদ অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। তিনি রোহিতাগিরি কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত ছিল বলিয়া মত পোষণ করিয়াছেন। খুব সম্ভবত কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলেই চন্দ্রবংশীয় রাজারা প্রাথমিক পর্যায়ে ভূস্বামী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের

অবস্থার উন্নতি হয় এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্র এতো ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন যে হরিকেল রাজার শক্তির প্রধান অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত হন। খুব সম্ভবত কান্তিদেব বা তাঁহার পরবর্তী কোন হরিকেল রাজার অধীন কুমিল্লা অঞ্চলে চন্দ্রদের এই উত্থান শুরু হয়। পরবর্তী কোন এক সময়ে ত্রৈলোক্য-চন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের (বরিশাল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা) নৃপতি হন। ধীরে ধীরে তিনি সমতট অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তার করেন এবং সমস্ত বঙ্গে (দক্ষিণ পূর্ব বাংলায়) স্ববংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্র কর্তৃক সমতট জয়ের উল্লেখ আছে। পূর্ববর্তী দেবরাজাদেব শাসনকেন্দ্র দেবপর্বত তাঁহার ক্ষমতার উৎস ছিল এবং ঐ স্থানের সৈন্যদল নিয়াই তিনি সমতট অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায়। লডহচন্দ্রের ময়নামতী তাম্রশাসনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বঙ্গ ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শাসনকালে অভ্যুন্নতিশালী ছিল। সুতরাং মনে হয় হরিকেল রাজার অধীন প্রতাপশালী সামন্তরাজার অবস্থা হইতে সার্বভৌম ক্ষমতালাভের নায়ক ছিলেন ত্রৈলোক্যচন্দ্র। মুদ্রার ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে বাংলার এই চন্দ্রবংশীয় রাজারা আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সহিত সম্পর্কিত ছিল। চট্টগ্রাম-কুমিল্লা অঞ্চলে আরাকানের প্রভাবের বহু প্রমাণ আছে। সুতরাং আরাকানের চন্দ্রবংশীয় কোন এক ব্যক্তি কুমিল্লা অঞ্চলে ভূস্বামী হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে এই বংশেরই একজন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন—এমন মনে করা খুব অস্বাভাবিক নয়।

পূর্ণচন্দ্র ও সুবর্ণচন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা, রামপাল ও মদনপুর তাম্রশাসনে সুবর্ণচন্দ্রকে বৌদ্ধ বলা হইয়াছে। হইতে পারে তিনিই প্রথম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তী সব রাজাই বৌদ্ধ ছিলেন।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র সম্বন্ধে প্রায় সব তাম্রশাসনেই সাধারণভাবে প্রশংসা করা হইয়াছে। কল্যাণচন্দ্রের ঢাকা তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্র কর্তৃক গৌড়দের পরাস্ত করিবার কথা আছে। খুব সম্ভবত এই সময়ে গৌড় কাম্বোজদের অধিকারে ছিল এবং গৌড় বলিতে সম্ভবত তাহাদিগকেই বুঝাইয়াছে। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কোন তাম্রশাসন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আনু-মানিকভাবে তাঁহাকে ২৫।৩০ বৎসরের রাজত্বকাল (৯০০—৯৩০ খৃষ্টাব্দ) বরাদ্দ করা যাইতে পারে।

সমতট ও বঙ্গে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাই ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। সামন্তরাজার অবস্থা হইতে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কম কৃতিত্ব-পূর্ণ কাজ নয়।, সুতরাং চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র। তাম্র-শাসনসমূহ তাঁহার গুণকীর্তনে ভরপুর। তাম্রশাসনসমূহে নিবন্ধকৃত উক্তি-সমূহ হইতে ধারণা করা যায় যে শ্রীচন্দ্রের শাসনকালে চন্দ্রবংশের প্রতিপত্তি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায় এবং তিনি নিঃসন্দেহে বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। তিনি পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিয়া বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রায় ৪৫ বৎসর (আঃ ৯৩০—৯৭৫ খৃষ্টাব্দ) শৌর্য বীর্যের সহিত রাজত্ব করেন।

শ্রীচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া ছিলেন। শ্রীহট্ট অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁহার পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের-পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন শ্রীহট্টমণ্ডলে ভূমিদানের পরিচয় বহন করে। তিনি আরও উত্তর-পূর্বে কামরূপ রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান প্রেরণ করিয়া-ছিলেন বলিয়া ঐ তাম্রশাসনেই উল্লেখিত আছে। ময়নামতীতে প্রাপ্ত লডহচন্দ্রের দুইটি তাম্রশাসনেও এই বিজয়ের উল্লেখ আছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য কামরূপ আক্রমণ করা শ্রীচন্দ্রের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কামরূপ বিজয়াভিযানে তাঁহার সৈন্যদল লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদী অতিক্রম করিয়া গৌহাটির অদূরবর্তী পার্বত্যাঞ্চল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া প্রশস্তিকার উল্লেখ করিয়াছে। তবে এই দাবী কতখানি সত্যি তাহা যাচাই করিবার কোন উপায় নাই। কামরূপরাজ বলবর্মার পরবর্তীকালে রাজ্যে যে দুর্বল শাসন ছিল সেই সুযোগে শ্রীচন্দ্রের সাফল্যজনক অভিযান খুব অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। তবে কামরূপ রাজ্যের কোন অংশ বাংলার শাসনাধীনে আসিয়াছিল কিনা তাহা সঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে কামরূপের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক অভিযান শ্রীচন্দ্রেব অধীন বাংলার শক্তি, শৌর্য ও বীর্যের পরিচয় দান করে।

লডহচন্দ্রের ময়নামতী তাম্রলিপিতে গৌড়ের বিরুদ্ধেও শ্রীচন্দ্রের সাফল্যের কথা বলা হইয়াছে। খুব সম্ভবত গৌড় এই সময়ে কাম্বোজ বংশীয় গৌড়পতিদের অধীন ছিল। দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালেই উত্তর পশ্চিম বাংলা হইতে পাল শাসন বিলুপ্ত হইয়া কাম্বোজবংশের শাসন

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীচন্দ্রের গৌড়ের বিরুদ্ধে সাফল্য কাম্বোজদের বিরুদ্ধে সাফল্য হওয়াই স্বাভাবিক। কল্যাণচন্দ্রের তাম্রশাসনে উল্লেখিত হইয়াছে যে শ্রীচন্দ্র গোপালকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রের সমসাময়িক পালরাজা দ্বিতীয় গোপাল গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সুতরাং কাম্বোজদের বিরুদ্ধে শ্রীচন্দ্রের সাফল্য দ্বিতীয় গোপালের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছিল। তবে কাম্বোজদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল এমন মনে করার কোন কারণ নাই। এমনও হইতে পারে যে কাম্বোজদের উত্থানকালে গোপাল রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং শ্রীচন্দ্র কাম্বোজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া গোপালকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে হয়তো সম্পূর্ণ পাল সাম্রাজ্যই কাম্বোজদের হস্তগত হইত বা গোপাল নিজ অস্তিত্বই বজায় রাখিতে সক্ষম হইতেন না। এই ক্ষেত্রে মনে করা যাইতে পারে যে এক বৌদ্ধ রাজবংশ অন্য বৌদ্ধ রাজবংশের দুঃসময়ে সাহায্য করিয়াছিল।

শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রলিপিতে তাঁহার অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্যের ও উল্লেখ রহিয়াছে। এই লিপিতে বলা হইয়াছে যে তিনি যমন (খুব সম্ভবত যবন), হুন ও উৎকলদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তবে এই উক্তিতে কতখানি সত্যতা আছে বা উল্লেখিত জনপদগুলির উপর শ্রীচন্দ্রের আধিপত্য কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা নির্ণয়ের কোন উপায় নাই।

সমর ক্ষেত্রে শ্রীচন্দ্রের সাফল্যের যে প্রমাণ আমরা লিপিমালা হইতে পাই তাহা হইতে মনে হয় যে শ্রীচন্দ্র চন্দ্রসাম্রাজ্য প্রসারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কামরূপ ও গৌড়ের বিরুদ্ধে তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য দিকেও হয়তো তিনি ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে চন্দ্রবংশের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার ভূমিকা অনেকাংশে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ধর্মপালের ভূমিকার অনুরূপ।

শ্রীচন্দ্রের শাসনকালের মোট ছয়টি তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহারা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় তাঁহার পরাক্রমশালী শাসনের পরিচয় দান করে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা-ফরিদপুরের পদ্মা তীরবর্তী এলাকা, শ্রীহট্ট অঞ্চল ও কুমিল্লা নোয়াখালীর সমতট অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এই কথা লিপি প্রমাণে বলা যায়। সুতরাং প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার

চন্দ্রবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রৈলোক্যচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য সংপ্রসারণ ও দৃঢ়িকরণে শ্রীচন্দ্রের বলিষ্ঠ ভূমিকা সীমিত উপাদান-সমূহ হইতে পুরাপুরি ও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব না হইলেও তিনি যে চন্দ্রবংশের সবশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন তাহা বিভিন্ন তাম্রশাসনে নিবদ্ধকৃত প্রশস্তিসমূহের স্বর হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

শ্রীচন্দ্রের পর তাহার পুত্র কল্যাণচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করেন এবং প্রায় ২৫ বৎসরকাল (আ: ৯৭৫—১০০০ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। তাহার সময়েও চন্দ্রশাসনের শৌর্যবীর্য অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার রাজত্বকালের একটিমাত্র তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে এবং এই লিপিতে তাঁহার নিজ রাজত্বকাল সম্বন্ধে তেমন কোন বিস্তারিত বর্ণনা নাই। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের তাম্রশাসনে তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি কামরূপের ম্লেচ্ছদিগকে (খুব সম্ভবত আসামের কোন উপজাতীয় লোক বুঝাইতেছে) পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহার সমসাময়িক গৌড়রাজ কোন এক কাম্বোজ গৌড়পতি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং এমনও হইতে পারে যে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে তাহার সাফল্য পরোক্ষ-ভাবে পাল সম্রাট মহীপালকে সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার কার্যে সাহায্য করিয়া-ছিল। পিতার ন্যায় তিনিও হয়তো পালরাজাদের সাহায্যে আগাইয়া গিয়াছিলেন এবং কাম্বোজ গৌড়পতিদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া মহীপাল কর্তৃক পুনরুদ্ধারের পথ সুগম করিয়াছিলেন।

কল্যাণচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তাহাকে 'কলা-নিলয়' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং দানে বলী, সত্যবাদিতায় যুধিষ্ঠির ও বীরত্বে অর্জুনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

কল্যাণচন্দ্রের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাহার পুত্র লডহচন্দ্র। ময়না-মতীতে লডহচন্দ্রের দুইটি ও তাহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় চন্দ্রবংশে তাহাদের স্থান সম্বন্ধে এখন আর কোন সন্দেহ নাই। পূর্বে ভারেল্লা মূর্তিলিপি হইতে লডহচন্দ্রের নাম জানা থাকিলেও চন্দ্রবংশের সহিত তাহার সম্পর্কের বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল।

লডহচন্দ্রের নিজের ও তাঁহার পুত্রের তাম্রশাসনে নিবদ্ধ প্রশস্তিতে তাঁহার শৌর্যবীর্যের তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে শান্তিকালীন কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রশস্তিতে তাঁহার 'বিদ্যানদী অতিক্রম' বারানসীতে

ধর্মীয় কারণে স্নান এবং কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য খ্যাতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। লডহচন্দ্র নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বারানসীতে গঙ্গা-স্নানের প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহার ময়নামতী তাম্র-শাসনদ্বয়ে ভূমিদান করা হইয়াছিল বাসুদেবের (বিষ্ণু) উদ্দেশ্যে। সুতরাং বৌদ্ধ হওয়া সত্বেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁহার উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবেল্লায় তাঁহার শাসনকালের নর্তেশ্বর শিবের যে মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এই আকৃতিতে শিবের উপাসনা বাংলাদেশে তখন হইতেই প্রচলিত ছিল। সাধারণত মনে করা হয় যে এই ধরনের শিব উপাসনা দাক্ষিণাত্য হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিল সেন আমলে। কিন্তু সেন বংশের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বেই এই ধরনের উপাসনার প্রচলন ছিল। লডহচন্দ্র প্রায় ২০ বৎসরকাল (আঃ ১০০০—১০২০ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন।

লডহচন্দ্রের পর চন্দ্র সিংহাসন অধিকার করেন তাঁহার পুত্র গোবিন্দ-চন্দ্র। গোবিন্দচন্দ্রের নাম দুইটি মূর্তিলিপি তিরুমলাই লিপি ও শব্দ-প্রদীপ গ্রন্থ হইতে পূর্বেই জানা ছিল। কিন্তু ময়নামতীতে প্রাপ্ত তাঁহার তাম্রশাসন তাঁহার বংশপরিচয় ও কালানুক্রমিক সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দান করে। তাঁহার তাম্রশাসনে তাঁহার অঘাত পাণ্ডিত্য ও গুণাবলীর কথা উল্লেখিত হইয়াছে এবং আশা পোষণ করা হইয়াছে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহার রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করিবে। ইহা হইতে মনে হয় যে এই তাম্র-শাসন তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরেই তাঁহাকে রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণের ধকল সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই আক্রমন তাঁহার শক্তি অনেকাংশে হ্রাস করিয়াছিল। আমরা পূর্ববর্তী এক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি যে ১০৪৮—৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কলচুরিরাজ কর্ণ বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবত চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রই তখন বঙ্গের রাজা ছিলেন। এই দুই বৈদেশিক আক্রমণ চন্দ্ররাজার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং তাঁহাদের শাসনের পতন ঘটায়। আমরা আগেই মত পোষণ করিয়াছি যে কর্ণ ও বিগ্রহপালের মধ্যে যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারই সুযোগে হয়তো দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পাল শাসন সম্প্রসারিত হয়।

গোবিন্দচন্দ্রই চন্দ্রবংশের শেষ রাজা। পিতার ন্যায় তাহারও অন্য ধর্মের প্রতি উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে চন্দ্রবংশীয়

রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও বাংলায় বহুল প্রচলিত লোকগাঁথার গোপিচন্দ্র বা গোবিচন্দ্রকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'গোবিচন্দ্রের গান', 'মানিকচন্দ্রের গান', 'ময়নামতীর গান' প্রমুখ লোকগাঁথার সঠিক কাল নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সন্যাস গ্রহণকারী লোকগাঁথার গোবিন্দচন্দ্রের যে পিতৃপরিচয় পাওয়া যায় তাহা চন্দ্রবংশীয় রাজার পিতৃপরিচয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং কেবলমাত্র নামের মিলের উপর নির্ভর করিয়া এই মতবাদ গ্রহণ করা যায় না।

গোবিন্দচন্দ্র ২৫ বৎসর (আঃ ১০২০—১০৪৫ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিকালে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবংশের শাসন লোপ পায় এবং খুব সম্ভবত পাল শাসন এই অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। তবে এই অঞ্চলে পাল শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর বাংলায় সামন্ত বিদ্রোহের সুযোগে এই অঞ্চলে বর্মরাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রায় দেড় শতাব্দীকাল চন্দ্রবংশের শাসন বিরাজমান ছিল। ত্রৈলোক্যচন্দ্র এই বংশের অভ্যুত্থানের নায়ক, শ্রীচন্দ্রের রাজত্বকালে তাঁহাদের ক্ষমতা উন্নতির উচ্চশিখরে উঠে, কল্যাণচন্দ্র ও লডহচন্দ্রের শাসনকালেও তাঁহাদের গৌরব বজায় ছিল। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে বৈদেশিক আক্রমণের ফলে তাঁহাদের ক্ষমতা হীনবল হইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের শাসনের অবসান ঘটে।

বর্ম রাজবংশ

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাল শক্তির দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্ম উপাধিধারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ঢাকা জেলার বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত ভোজবর্মার তাম্রশাসন, ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর শিলালিপি, ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে প্রাপ্ত সামলবর্মার তাম্রশাসন ও হরিবর্মার সামন্তসার তাম্রশাসন হইতে এই বংশের ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি তাম্রশাসনের প্রথমটির মাত্র একখণ্ড পাওয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয়টি অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাওয়ায় তেমন বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে বেলাব তাম্রশাসনই বর্মরাজাদের ইতিহাসের প্রধান উৎস। এই তাম্রশাসন ও ভবদেবের লিপির উপর নির্ভর করিয়া বর্মরাজবংশের বিস্তারিত ইতিহাস পুনর্গঠন সম্ভব নয়।

বর্মরাজগণ পৌরাণিক যাদব বংশের সহিত সম্পর্কের দাবী করে এবং তাহারা সিংহপুরে রাজত্ব করিত। সিংহপুর কোথায় ছিল, এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ সিংহপুর পাঞ্জাবে ছিল বলিয়া মনে করেন। কলিঙ্গেও এক সিংহপুর রাজ্য ছিল। বর্তমানে চিকাকোল ও নরাসন্নপেতার মধ্যস্থলে সিঙ্গুপুরমই প্রাচীন সিংহপুর বলিয়া মনে করা হয় এবং এইখানেই বর্মরাজাদের আদি রাজত্ব ছিল। আবার কেহ কেহ রাঢ়দেশে এক সিংহপুরের কথা বলিয়াছেন। এই সিংহপুর সম্ভবত হুগলী জেলার সিঙ্গুর। পাঞ্জাবের সিংপুরের চাইতে রাঢ়ের বা কলিঙ্গের সিংহপুরে বর্মরাজবংশের রাঢ়ের বা কলিঙ্গের সিংহপুরে বর্মরাজ-বংশের আদি রাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে এই বিষযে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়।

সম্ভবত কলচুরি কর্ণের বঙ্গে বিজয়াভিযানের সময় বর্মরাজারা বঙ্গে আসে এবং পরে সুযোগ বুঝিয়া ক্ষমতা দখল করেন। বর্মদের বঙ্গে ক্ষমতা দখল সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ সূত্র বেলাব তাম্রশাসনে নাই। তবে পরোক্ষভাবে এই বিষয়ে কিছু অনুমান করা সম্ভব। বেলাব তাম্রশাসনে জাতবর্মার কৃতিত্ব বর্ণনা করিয়া যে শ্লোক আছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে 'বেণের পুত্র পৃথুর গৌরবকে ম্লান করিয়া, কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, অঙ্গে তাঁহার অধিকার বিস্তার করিয়া, কামরূপরাজের সম্মান ক্ষুন্ন করিয়া, দিব্যের বাহুবলের খ্যাতিকে লজ্জা দিয়া, গোবর্ধনের সৌভাগ্যকে খর্ব করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্ন দিয়া জাতবর্মা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।' এই শ্লোক হইতে মনে হয় যে জাতবর্মাই বংশের প্রথম রাজা যিনি সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় কলচুরিরাজ কর্ণের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করা হয় যে কর্ণের অভিযানের সময়ই হয়তো বর্মরাজগণ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। এই অনুমান যদি সত্যি হয় তাহা হইলে ১০৪৮—৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে অর্থাৎ কর্ণের আক্রমণের সময় বর্মগণ বঙ্গে আগমন করিয়াছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। দিব্যর সাথে জাতবর্মার যে সংঘর্ষের কথা উপরিলিখিত শ্লোকে আছে তাহা সম্ভবত দিব্য কর্তৃক উত্তর বাংলায় ক্ষমতা অধিকারের পর। সুতরাং জাতবর্মার উত্থানের সময়কাল একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্ধারণ করা যাইতে পারে। উত্তর বাংলায় সামন্ত বিদ্রোহ ও পাল-শাসনের

দুর্বলতার সুযোগে জাতবর্মা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

বেলাব তাম্রশাসনের শ্লোকে জাতবর্মার অন্যান্য যে সব বিপক্ষদলের উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে অঙ্গ খুবসম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব বিহারের পাল সাম্রাজ্যকে বুঝায়। রামপালের রাজত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন সে নিজে উত্তর বাংলার বিদ্রোহ নিয়া ব্যতিব্যস্ত ছিলেন সেই সুযোগে জাতবর্মা পাল সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ আক্রমন করিয়াছিলেন, এনন হওয়া খুব অসম্ভব নয়। শ্লোকে উল্লেখিত কামরূপরাজ ও গোবর্ধনকে শনাক্ত করা সম্ভব নয়।

বজ্রযোগিনী ও সামন্তসার তাম্রশাসনের ভিত্তিতে মনে হয় যে জাতবর্মার পর তাঁহার পুত্র হবিবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে বিস্তারিত কিছু জানার আর কোন উপায় নাই। ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে হরিবর্মার নাম উল্লেখিত আছে। ভবদেব হরিবর্মার অধীন মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা ছাড়া এই প্রশস্তিতে হরিবর্মার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ নাই। এই প্রশস্তিতে ভবদেবের গুণকীর্তন করা হইয়াছে। ভবদেব সেই যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাব মীমাংসা ও স্মৃতি বিষয়ক গ্রন্থ এখনও প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। রামচরিত গ্রন্থে পূর্বদেশীয় একরাজা কতৃক রামপালের তুষ্টি সাধনের যে উল্লেখ আছে (এই সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে) সেই পূর্বদেশীয় রাজা সম্ভবত হরিবর্মা। কারণ রামপাল কতৃক উত্তর বাংলা পুনরুদ্ধারের পর বর্মরাজা স্বভাবতই তাঁহার রাজ্যের উপর রামপালের আক্রোষের কথা চিন্তা কবিয়া এই তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। এবং ইহা তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক আচরণ।

হরিবর্মার পর তাঁহার এক পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহার পর জাতবর্মার অপর পুত্র সামলবর্মা রাজা হন। তাঁহার সামন্তসার তাম্রশাসন অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় বিস্তারিত জানা সম্ভব নয়। বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কুলজী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে সামলবর্মার আমন্ত্রণে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ১০০১ শকে বাংলাদেশে আগমন করেন। অন্য কুলজী মতে হরিবর্মাই বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কুলজী গ্রন্থের তারিখ ১০০১ শত (১০৭৯ খৃষ্টাব্দ) একেবারে সঠিক না হইলেও মোটামুটিভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ জাতবর্মার দুই পুত্র একাদশ শতাব্দীর শেষে বা

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজত্ব করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সামলবর্মার পর তাঁহার পুত্র ভোজবর্মা রাজত্ব করেন। তাঁহারই পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে বেলাব তাম্রশাসন তাঁহার রাজধানী বিক্রমপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনে ভোজবর্মার পরম বৈষ্ণব, পরমেশ্বর পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ উপাধি তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতারই পরিচয় বহন করে। ভোজবর্মা সম্বন্ধেও বিস্তারিত জানা যায় না। ভোজবর্মার পর এই বংশের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেনবংশীয় বিজয়সেন বর্ম শাসনের অবসান ঘটাইয়া দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সেন বংশের শাসনের সূচনা করেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সেন রাজবংশ

একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে এক নূতন রাজবংশের উদ্ভব হয়। উত্তর বাংলায় সামন্তচক্রের বিদ্রোহের সময় পালসাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন ধীরে ধীরে নিজ ক্ষমতার উন্নতি সাধন করেন। পালসম্রাট মদনপালের রাজত্বকালে তাঁহারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। পশ্চিম ও উত্তর বাংলা হইতে পালশাসন এবং দক্ষিণ পূর্ব বাংলা হইতে বর্মশাসনের অবসান ঘটাইয়া তাঁহারা প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশে একক স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় সেনরাজবংশের শাসনাধীনেই। সেই দিক দিয়া সেন শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সেনরাজগণের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাটদেশের অধিবাসী ছিলেন। বর্তমানের মহারাষ্ট্র ও হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের দক্ষিণ ও মহীশূর রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমভাগ প্রাচীন কর্ণাটদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেন রাজাদের লিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন। ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনপরিবারের পূর্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ করেন। এই ধরণের বৃত্তি পরিবর্তনের উদাহরণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে আরও পাওয়া যায়।

কর্ণাটদেশের ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনবংশ কোন্ সময়ে এবং কিভাবে বাংলাদেশে আগমন করেন সেই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব না হইলেও সেনলিপিমালার ভিত্তিতে কিছুটা ধারণা করা যায়। কোন্ সময়ে সেনবংশ বাংলায় আসে; এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সেন লিপিমালার দুইটি উক্তিতে। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে বলা হইয়াছে যে সামন্তসেন রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত যুদ্ধাভিযান করিয়া এবং দুর্বৃত্ত কর্ণাটলক্ষ্মী লুন্ঠনকারী শত্রুদিগকে ধ্বংস করিয়া শেষ বয়সে গঙ্গাতটে পুণ্যাশ্রমে জীবনযাপন করিয়াছিলেন। এই উক্তিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে সামন্তসেন প্রথমজীবনে কর্ণাটে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে বাংলাদেশে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্র-

শাসনে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রবংশজাত অনেক রাজপুত্র রাঢ়দেশের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহাদের বংশে সামন্তসেন জন্ম গ্রহণ করেন। এই উক্তি হইতে মনে হয় যে সামন্তসেনের পূর্বেই তাঁহার কোন পূর্বপুরুষ বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। এই দুই উক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে বলিতে হয় যে, কর্ণাটের এক সেনবংশ বহুদিন যাবৎ বাংলাদেশে বসবাস করিতেছিল এবং তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের আদিবাসস্থান কর্ণাটের সম্বন্ধ ছিল। এই বংশের সামন্তসেন যৌবনে কর্ণাটে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে রাঢ়ে আসিয়া জীবন যাপন করেন। তাঁহারই পরবর্তী পুরুষে এই বংশ বাংলাদেশে রাজক্ষমতা অধিকার করেন।

সেন বংশের উদ্ভবের সহিত জড়িত অন্য প্রশ্নটি হইতেছে—কিভাবে সুদূর কর্ণাট হইতে আসিয়া তাঁহারা বাংলাদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবার মতো কোন সূত্র সেন লিপিমালায় নাই। তবে এই বিষয়ে আনুমানিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা যাইতে পারে। সুদূর কর্ণাট হইতে আসিয়া বিজয়ের মাধ্যমে সেনবংশ বাংলায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। বরঞ্চ কর্ণাটদেশীয় সেনবংশ কোন এক সময়ে আসিয়া বাংলায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল (তাহা খুব সম্ভবত সামন্তসেনের সময়ে) এবং ধীরে ধীরে ক্ষমতা সঞ্চার করিয়া প্রথমে হয়তো সামন্তরাজা এবং পরে সার্বভৌম স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এমন মনে করাই স্বাভাবিক। এই কথা মনে রাখিয়া সেনবংশের আগমন সম্বন্ধে দুইটি সম্ভাবনার কথা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। পালরাজগণের সৈন্যদলে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক ছিল। পাল তাম্রশাসনে প্রাপ্ত কর্মচারী তালিকায় নিয়মিতভাবে' গৌড়-মালব-খশ-হূন-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাট-ভাট' পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে কর্ণাটবাসীও পাল রাজসৈন্য দলে ছিল। তাহাদের মধ্যেই একজন সেনবংশীয় কোন কর্মচারী শক্তি সঞ্চয় করিয়া পশ্চিম বাংলায় এক রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং পরে পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই হইতে পারে যে সেনরাজবংশের পূর্বপুরুষ কোন আক্রমণকারী সৈন্যদলের সহিত দাক্ষিণাত্য হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। কর্ণাটের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ১০৪২ ও ১০৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একাধিকবার উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলা আক্রমণ করেন। এই

আক্রমণসমূহের সহিত কর্ণাটদেশীয় লোকজন বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে এবং পরে ইহাদের মধ্যে কেহ স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। কর্ণাটের চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বর উত্তর ভারতে পরমার ও কলচুরি বংশের ক্ষমতা খর্ব করিয়া চালুক্য প্রাধান্য বিস্তার করে। এই প্রাধান্যের পরোক্ষ ফল উত্তর বিহার ও নেপালে কর্ণাটদেশীয় নান্যদেবের ও উত্তর ভারতে গাহড়বাল বংশের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। বল্লালসেনের সহিত চালুক্য-রাজকন্যা রামদেবীর বিবাহ সেনবংশের সহিত চালুক্যদের সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। সুতরাং এমনও হইতে পারে যে চালুক্যরাজের অভিযানের সাথে সেনবংশ বাংলায় আগমন করে এবং ধীরে ধীরে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে।

উপরোক্ত দুইটি সম্ভাবনাই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেন লিপিতে এই বিষয়ে কোন আভাস না থাকায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

সামন্তসেনের পূর্বে সেনবংশের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সামন্ত-সেনই বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তাঁহার কর্ণাটদেশে যুদ্ধে যশোলাভ এবং বৃদ্ধবয়সে রাঢ়দেশে গঙ্গাতীরে বাস স্থাপন ছাড়া আমরা বিশেষ কিছুই জানিতে পারি না। তিনি কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না কারণ তাঁহার পৌত্র বিজয়সেনের লিপিতে তাঁহার নামের সহিত কোন রাজত্ব-সূচক উপাধি ব্যবহার করা হয় নাই।

সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেনের সময়ে সেনবংশ রাঢ়ে ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিল। বিজয়সেনের লিপিতে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এই উপাধি হইতে মনে হয় যে হেমন্ত সেনই এই বংশের প্রথম রাজা। তবে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্র-লিপিতে তাঁহাকে 'রাজরক্ষা সুদক্ষ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে তিনি পাল সাম্রাজ্যের রাঢ় অঞ্চলে সামন্তরাজা ছিলেন এবং অধিরাজের সাম্রাজ্য রক্ষার্থে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেনই স্ববংশীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হইয়াছিলেন—সামন্তরাজ্য হইতে স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বিজয়সেন

বিজয়সেনের শাসনকালের একখানি তাম্রশাসন ও একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার তাম্রশাসনখানিতে যে রাজ্যাঙ্ক লিখিত আছে তাহার পাঠ ৬২ বলিয়া সাধারণভাবে গৃহীত হইয়া থাকে এবং ১০৯৮ হইতে ১১৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।[১] তাঁহার এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই সেনবংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনিই সম্ভবত সামন্তরাজা হইতে নিজেকে স্বাধীন রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

পালরাজ রামপালের রাজত্বকালে বিজয়সেন খুব সম্ভবত রাঢ় অঞ্চলে প্রথমে সামন্তরাজা ও পরে ক্ষুদ্রভূখণ্ডের অধিপতি হইয়াছিলেন। তবে সেনবংশীয় কোন লিপিতে এই বিষয়ে তেমন স্পষ্ট ইংগিত নাই। তবে সমসাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। যে সমস্ত সামন্তরাজা রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এক জনের নাম ছিল নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ। মনে হয় এই বিজয়রাজই সেনরাজা বিজয়সেন। কবি উমাপতিধর বিরচিত দেওপাড়া প্রশস্তির উনবিংশ শ্লোকে এই ধরনের ইংগিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে বিজয়সেন দিব্যভূমি বিপক্ষ-দলীয় নরপতিকে দান করিয়াছিলেন এবং প্রতিদান স্বরূপ পৃথিবীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শ্লোকে ব্যবহৃত 'দিব্যভুবঃ' এক অর্থে স্বর্গ ও অন্য অর্থে দিব্য কতৃক শাসিত ভূমি অথাৎ বরেন্দ্রকে বুঝাইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে এই শ্লোক হইতে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে বরেন্দ্র উদ্ধারে তিনি পাল রাজাকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং প্রতিদানে তিনি রাঢ়ে স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। শ্লোকে পালরাজাকে বিপক্ষদলীয় রাজা বলিয়া আখ্যায়িত এইজন্য হয়তো করা হইয়াছে যে পরবর্তীকালে তাঁহারা বিরুদ্ধদলীয় হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বিজয়সেন গৌড় ও উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। দেওপাড়া শিলালিপির পরবর্তী শ্লোকেই গৌড়ের বিরুদ্ধে বিজয়সেনের সাফল্যের কথা বলা হইয়াছে। বরেন্দ্র উদ্ধারে রামপালকে সাহায্য করার পরিবর্তে বিজয়সেন স্বস্বাধীনতার

(১) সেনরাজবংশের কালনির্ণয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: A. M. Chowdhury, Dynastic History of Bengal, ২১২-২২০; রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৪৪৬—৪৪৯।

স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন এমন মনে করা অযৌক্তিক নয়, কারণ রামচরিতের বিবরণ হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে রামপাল বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও উপঢৌকনের বিনিময়ে সামন্তদের সাহায্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত অনুমানের ভিত্তিতে রামচরিতে উল্লেখিত নিদ্রাবলীকে বর্তমানে বীরভূম জেলার সালার ও কাট্‌ওয়ার নিকটে গঙ্গাতীরবর্তী নিড়োল বলিয়া মনে করা হয়। সুতরাং দেওপাড়া প্রশস্তির উপরোক্ত শ্লোকের উপর ভিত্তি করিয়া বিজয়সেনের ক্ষমতা সম্প্রসারণের প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে অনুমান করা হয়। তিনি রাঢ়ে সামন্তরাজা ছিলেন, রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্যের বিনিময়ে তিনি স্বীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি পান এবং পরবর্তীকালে ক্ষমতা সম্প্রসারণ করিয়া সমগ্র বাংলাদেশে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে বিজয়সেন কর্তৃক স্বীয় ক্ষমতার ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। মনে হয় শূরবংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ তাঁহার ক্ষমতা সম্প্রসারণে সাহায্য করিয়াছিল। এই বিবাহের কথা তাঁহার ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে উল্লেখিত হইয়াছে। দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে রামপালকে সাহায্যকারী সামন্তবর্গের চূড়ামণি অপর মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূরের উল্লেখ রামচরিতে আছে। রাজেন্দ্র চোলের অভিযান-কালে এই অঞ্চলে রণশূর নামক এক রাজার উল্লেখও পাওয়া যায়। সুতরাং একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ়ে শূরবংশীয় রাজাদের শাসন ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। সম্ভবত বিলাসদেবী এই শূরবংশীয় ছিলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়া বিজয়সেন সমগ্র রাঢ়দেশে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। বিজয়সেন উড়িষ্যা রাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গার ও সাহায্য লাভ করিয়া থাকিতে পারেন। বল্লালচরিত গ্রন্থে বিজয়সেনকে 'চোড়গঙ্গসখ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

দেওপাড়া শিলালিপিতে বিজয়সেনের ক্ষমতা সম্প্রসারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, নান্য, বীর, রাঘব ও বর্ধন নামক রাজগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হন; তিনি কামরূপরাজকে দূরীভূত, কলিঙ্গরাজকে পরাজিত ও গৌড়রাজকে দ্রুত পলায়নে বাধ্য করেন, এবং গঙ্গার স্রোত ধরিয়া এক 'পাশ্চাত্যচক্রের' বিরুদ্ধে নৌ অভিযান প্রেরণ করেন। এই লিপির রচয়িতা কবি উমাপতিধর ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন নাই। সুতরাং বিভিন্ন দিকে বিজয়সেনের অভিযান কোন্‌টির পর কোন্‌টি সংঘটিত হইয়াছিল

তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সম্ভাব্য ঘটনানুক্রম সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে।

দেওপাড়া প্রশস্তিতে উল্লেখিত রাজগণের মধ্যে দুই একজন ছাড়া প্রায় সকলকেই সনাক্ত করা যায়। নান্য ছিলেন মিথিলার রাজা নান্যদেব। তিনিও কর্ণাটদেশীয় ছিলেন। বীর সম্ভবত কোটাটবীর রাজা বীরগুণ ও বর্ধন কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন কিংবা মদনপাল কতৃক পরাজিত গোবর্ধন। সুতরাং বীর ও বর্ধনের বিরুদ্ধে বিজয় সেনের যুদ্ধ ছিল এক সামন্তরাজা কতৃক অন্যান্য সমসাময়িক সামন্তরাজদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ। রাঘব ও কলিঙ্গরাজ সম্ভবত একই ব্যক্তি। রাঘব ছিলেন উড়িষ্যারাজ চোড়গঙ্গের পুত্র, যিনি ১১৫৭ হইতে ১১৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং বিজয়সেনের রাজত্বের শেষভাগে রাঘবের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইতে পারে। রাঘবের পিতা চোড়গঙ্গের সহিত বিজয়সেনের বন্ধুত্ব থাকলেও রাঘবের সহিত সংঘর্ষ উপনীত হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। বিজয়সেন কর্তৃক বাংলাদেশে ক্ষমতা বিস্তারের পর পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান খুবই স্বাভাবিক।

বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত কামরূপরাজের সঠিক সনাক্তকরণ সম্ভব নয়। তবে কুমারপালের মন্ত্রী, যিনি পরবর্তীকালে কামরূপে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, বৈদ্যদেব এই কাম্যরূপরাজ হইবার সম্ভাবনা আছে।

বিজয়সেন যে গৌড়রাজকে দ্রুত পলায়নে বাধ্য করিয়াছিলেন তিনি যে পালরাজা মদনপাল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। রামপাল কৈবর্তদের হাত হইতে বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া ঐ অঞ্চলে পাল প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামপালের রাজত্বের শেষের দিকে বিজয়সেন রাঢ় অঞ্চলে নিজ অধিকার বিস্তার করেন এবং ধীরে ধীরে ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। রামপালের পরবর্তী দুই দুর্বল পালরাজ্যের শাসনকালে বিজয়সেন ক্ষমতা বৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ পান। মদনপালের রাজত্বকালে তিনি পাল সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানিবার মতো ক্ষমতা সঞ্চার করেন। মদনপালের অষ্টম রাজ্যাঙ্ক পর্যন্ত অর্থাৎ ১১৫২—৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর বাংলায় পাল আধিপত্যের প্রমাণ মনহলি তাম্রশাসন হইতেই পাওয়া যায়। সুতরাং এই সময়ের পরেই বিজয়সেন উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা হইতে পাল শাসন বিতাড়িত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। রাজশাহীর ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত দেওপাড়া নামক স্থানে বিজয়সেনের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে

তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি ঐ স্থানে প্রদ্যুম্নেশ্বরের এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই লিপি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে বরেন্দ্রে বিজয়সেনের প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং ১১৫২—৫৩ পর কোন এক সময়ে বিজয়সেন উত্তর বাংলা অধিকার করেন। রামচরিত গ্রন্থে মদনপাল কর্তৃক আক্রমণকারী সৈন্যদলকে কালিন্দী পর্যন্ত হটাইয়া দিবার যে উল্লেখ আছে তাহাতে সম্ভবত বিজয়সেনের আক্রমণের কথাই বলা হইয়াছে। মদনপাল প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করিলেও বিজয়সেন অবশেষে পাল শাসনের অবসান ঘটাইতে সক্ষম হন। মদনপালের অষ্টম রাজ্যাঙ্কের পর কোন পাল লিপি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় পাওয়া যায় নাই। পাল-লিপির অনুপস্থিতি বিজয়সেন কর্তৃক এই অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তারের কথাই প্রমাণ করে।

পাল শক্তির বিরুদ্ধে সাফল্যের পর বিজয়সেন গঙ্গার স্রোত ধরিয়া কোন এক পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান প্রেরণ করিবেন, ইহা খুব অস্বাভাবিক নয়। খুব সম্ভবত গাহাড়বালরাজই এই পাশ্চাত্য শক্তি, কারণ ঐ সময়ে বিহার পর্যন্ত গাহাড়বাল শক্তি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তবে এই নৌ অভিযানে বিজয়সেনের সাফল্য সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়।

বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন হইতে অন্য আর একদিকে বিজয়সেনের সাফল্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসন বিক্রমপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে চন্দ্র ও বর্ম-রাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর সেন সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিকাল পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মরাজাদের শাসন বজায় ছিল। বিজয়সেন বর্মরাজাদের শাসনের অবসান ঘটাইয়া এই অঞ্চলেও সেনপ্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সরকার অনুমান করিয়াছেন যে দেওপাড়া প্রশস্তির বীর খুব সম্ভবত বীরবর্ম নামক ভোজবর্মার উত্তরাধিকারী। তবে এইরূপ অনুমানের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

বিজয়সেনের সাফল্যের উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়সেন প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে এক অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালরাজগণ মগধে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে মুসলিম আক্রমণ তাঁহাদের বিলুপ্তি আনিয়া-

ছিল। তবে বিজয়সেনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিযানসমূহের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়। কারণ কবি উমাপতিধর তাঁহার বর্ণনায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন নাই। সম্ভাব্য কালানুক্রম সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে। খুব সম্ভবত নিড়োলে সামন্তরাজা হিসাবে বিজয়সেনের উত্থান শুরু হয়। উত্তর বাংলার সামন্ত বিদ্রোহের সময় তিনি শক্তি বৃদ্ধি আরম্ভ করেন। কৈবর্তদের বিরুদ্ধে রামপালের সাফল্য কিছুদিনের জন্য তাঁহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অভিযান স্থগিত রাখিতে বাধ্য করে এবং তিনি সুযোগের সন্ধানে থাকেন। রামপালের রাজত্বের অবসানের পূর্বে তিনি হয়তো এই প্রচেষ্টায় হাত দেন নাই। তবে ইতিমধ্যে শূরপরিবারে তাঁহার বিবাহ রাঢ় অঞ্চলে তাঁহাব ক্ষমতা দৃঢ় করিতে সাহায্য করে। রামপালের দুই দুর্বল উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে তিনি ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। অন্যান্য সামন্তরাজাদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন। বীর, বর্ধন প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁহার সাফল্য এই পর্যায়ের।

মিথিলার রাজা নান্যদেবের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধ ১১৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ ১১৪৭ই নান্যদেবের রাজত্বের শেষ বৎসর। সুতরাং মনে হয় যে নান্যদেব ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর বিহারে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার দিকে হয়তো নজর দিয়াছিলেন এবং ফলে বিজয়-সেনের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধে। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে সাফল্য তাঁহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

সুতরাং রাঢ় অঞ্চলে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিকালে বিজয়সেন প্রতাপ-শালী হইয়া উঠেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মরাজবংশের ক্ষমতার অবসান ঘটাইয়া সেন প্রভুত্ব ঐ অঞ্চলে বিস্তার করেন। খুব সম্ভবত একই সময়ে উত্তর বাংলা হইতে পাল শাসনেরও অবসান ঘটে এবং সমগ্র বাংলাদেশে সেনশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিঙ্গ ও কামরূপের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধ বা পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার নৌ অভিযান স্বাভাবিক ভাবেই বাংলায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায় বলিয়া ধরিতে হইবে। এই সব অভিযান ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর ক্ষমতা সম্প্রসারণের চেষ্টার অভিব্যক্তি।

বিজয়সেন সুদীর্ঘ ৬২ বৎসর (আঃ ১০৯৮—১১৬০ খৃষ্টাব্দে) রাজত্ব করেন। বিজয়সেন কর্তৃক পালসাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া সমগ্র বাংলা-দেশে স্ববংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেনবংশের অধীনই সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশ দীর্ঘকালব্যাপী একাধিপত্যে

ছিল। ইহার পূর্বে সমগ্র বাংলা কখনও দীর্ঘকাল ধরিয়া একাধিপত্যে থাকে নাই। এই একাধিপত্যের ফল বাংলার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় এবং এই কারণেই সেনযুগের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাধারণ একজন সামন্তরাজার পদ হইতে নিজ বুদ্ধি ও বাহুবলে বিজয়সেন বাংলার সার্বভৌম রাজার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিজয়সেন শৈব ছিলেন। তিনি পরম মাহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর' গৌরবসূচক নামেও পরিচিত ছিলেন। কবি উমাপতিধর রচিত দেওপাড়া প্রশস্তিতে অত্যুক্তি থাকিলেও প্রশস্তির সুর এই কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে বিজয়সেনের অধীন বাংলা এক গৌরবজনক স্থান অর্জন করিয়াছিল। বিজয়সেনের কৃতিত্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া কবি শ্রীহর্ষ তাঁহার 'বিজয়-প্রশস্তি' ও 'গৌড়োর্বীশ কুল-প্রশস্তি' রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কবি উমাপতিধর দেওপাড়া প্রশস্তিতে বিজয়সেন কর্তৃক অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সব যাগযজ্ঞ হইতে অনুমিত হয় যে বিজয়সেন বৈদিক ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে ব্রাহ্মণগণ বিত্তশালী ও ধনবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং একদিকে বিজয়সেন যেমন সমরাঙ্গণে সাফল্য অর্জন করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তেমন অন্যদিকে ধর্মকর্মের দিকেও তিনি যত্নবান ছিলেন। তাই তাঁহার চারিত্রিক গুণাবলীর কীর্তনে কবি উমা-পতিধর স্বভাবতই পঞ্চমুখ।

বল্লালসেন

বিজয়সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র বল্লালসেন। নৈহাটিতে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন, ভাগলপুর জিলার কহলগ্রাম হইতে ১১ মাইল দূরে সনোখার গ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্তিলিপি, বল্লালসেন রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক দুইখানি গ্রন্থ এবং আনন্দভট্ট রচিত 'বল্লালচরিত' গ্রন্থ হইতে বল্লালসেনের রাজত্বকালের ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব। 'বল্লালচরিত' গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রামাণিকতার প্রশ্ন তুলিয়া বল্লালচরিতকে একেবারে বাদ দেওয়াও ঠিক হইবে না। কারণ এই গ্রন্থ (এই নামের আবার দুই-

খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি অকৃত্রিম সেই সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে।) ষোড়শ/সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া লিখিত এবং কতকগুলি বংশাবলী ও জনপ্রবাদের সমষ্টি। বল্লালচরিত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও ইহার মধ্যে যে সমসাময়িক কালের, বিশেষ করিয়া সামাজিক ইতিহাসের কিছু তথ্য অন্তর্নিহিত আছে সেকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে পরবর্তীকালে সংকলিত যে কোন গ্রন্থের মতোই বল্লালচরিতের তথ্যকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে।

নৈহাটি তাম্রশাসনে বল্লালসেনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তেমন কোন বিবরণ নাই। তবে সনোখারে প্রাপ্ত মূর্তিলিপি বল্লালসেন কর্তৃক পূর্ব মগধাঞ্চল জয়ের কথা ঘোষণা করে। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে উত্তর ও পশ্চিম বাংলা হইতে বিতাড়িত হইয়া মদনপাল মগধে আশ্রয় নিয়াছিলেন এবং ১১৬১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার রাজত্বের শেষ বর্ষ পর্যন্ত মগধ তাঁহার অধিকারে ছিল। অবশ্যি গাহাড়বাল শক্তি পশ্চিম দিক হইতে মগধের উপর চাপ দিতেছিল। মদনপালের পর গোবিন্দপাল মগধের রাজা হন। খুব সম্ভবত তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বল্লালসেন মগধের পূর্বাঞ্চল (ভাগলপুর জিলা) অধিকার করেন। গোবিন্দপালের গৌড়ের উপর কোন অধিকার না থাকিলেও তিনি 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিতেন। সুতরাং 'অদ্ভুতসাগর' এ গৌড়রাজের সহিত বল্লালসেনের যে যুদ্ধের কথা আছে তাহা গোবিন্দপালের বিরুদ্ধে মগধের পূর্বাঞ্চল অধিকার কল্পে যুদ্ধ সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বল্লালচরিতেও বল্লালসেন কর্তৃক মগধ জয়ের উল্লেখ আছে।

এই গ্রন্থে আরও উক্ত হইয়াছে যে পিতার জীবদ্দশায় তিনি মিথিলা জয় করেন। মিথিলার রাজা নান্যদেবের বিরুদ্ধে বিজয়সেন যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। (এই বিষয়ে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি) সুতরাং পিতার অভিযানকালে বল্লালসেন মিথিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তবে মিথিলা সেনসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল কিনা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। নান্যদেবের উত্তরাধিকারীগণ মিথিলায় রাজত্ব করিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে রমেশচন্দ্র মজুমদার জনপ্রবাদ ও মিথিলায় লক্ষ্মণসংবৎ এর প্রচলনের উপর ভিত্তি করিয়া মিথিলা সেন সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল

বলিয়া মনে করিয়াছেন। কয়েক শতাব্দীকাল পরে সংকলিত জনপ্রবাদ, যে মিথিলা বল্লালসেনের রাজ্যের পাঁচটি প্রদেশের একটি ছিল, সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহা ছাড়া উত্তর বিহারে প্রচলিত 'লক্ষণ-সংবৎ' এর সহিত বাংলার সেনবংশের কোন সম্বন্ধ আদৌ ছিল কিনা তাহা আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। কারণ যদি 'লক্ষ্মণ-সংবৎ' সেনরাজা লক্ষ্মণসেনের নামের সাহিত জড়িত হইয়া থাকে তাহা হইলে বাংলার কোন জায়গায় এই 'সংবৎ' এর প্রচলন থাকা স্বাভাবিক কিংবা সেনরাজাদের, বিশেষ করিয়া লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের, সরকারী দলিলে এই 'সংবৎ' এর ব্যবহার থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেন দলিলে সর্বক্ষেত্রেই রাজ্যাঙ্কের প্রচলন। সুতরাং 'লক্ষ্মণসংবৎ' এর প্রচলনের ভিত্তিতে কিছুতেই বলা যায় না যে মিথিলা সেনরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় কুলজী গ্রন্থসমূহে কৌলিণ্য প্রথার উৎপত্তির সহিত বল্লালসেনের নাম অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। বল্লালসেনকে প্রচলিত কুলীন প্রথার প্রবর্তক মনে করা হয়। তবে এই বিষয়ে ইদানিং কালে গবেষণা হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কুলীন প্রথার সহিত বল্লালসেনের সম্পর্কের তেমন কোন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নাই। কুলীন প্রথা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় অগণিত কুলজী গ্রন্থ বা কুলজী শাস্ত্র হইতে এবং এই গুলি প্রায় সবই পাঁচ বা ছয় শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে কুলীন প্রথার বহুল প্রচলন দেখা যায় এবং এই প্রথার উদ্যোক্তা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজেদের দাবী জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে ইহাকে ঐতিহাসিক ভিত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ফলে বিগত হিন্দু শাসনকালে অর্থাৎ সেনযুগে, এই প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল, এই ধরনের মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

যদি এই প্রথা সেনযুগে প্রবর্তিত হইত তাহা হইলে সেই যুগের সাহিত্য ও লিপিমালায় ইহার উল্লেখ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার উল্লেখ তো দূরের কথা ইহা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কোন ইংগিতও সেনযুগের সাহিত্য বা লিপিমালায় পাওয়া যায় নাই। ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ মিত্র, অনিরুদ্ধ প্রমুখ সেনযুগের পণ্ডিতগণ বহুবিধ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিন্তু কুলীন প্রথা সম্বন্ধে কোন রচনাতো নাই-ই, বরঞ্চ কোন উক্তি ও তাহাদের লেখনীতে নাই। সুতরাং কুলীন প্রথার সহিত বল্লালসেনকে সম্পর্কিত করার কোন ভিত্তিই নাই বলিলেও চলে। বাংলায় সামাজিক প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই ধরণের একটি কল্পিত উপকথার প্রচার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় করিয়াছে, এইরূপ মনে করাই বোধহয় যুক্তি সঙ্গত।

বল্লালসেন বিদ্বান পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্বানমণ্ডলীর চক্রবর্তী ছিলেন, প্রশস্তিকারের এই উক্তিতে যে সত্যতা আছে বল্লালসেন রচিত দুইখানি গ্রন্থই তাহা প্রমাণ করে। দানসাগরের উপসংহার হইতে জানা যায় যে গুরু অনিরুদ্ধের নিকট বল্লালসেন বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যায়ন করিয়াছিলেন। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে বল্লাল-সেন 'দানসাগর' রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন এবং ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার পুত্র লক্ষণসেন এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

পিতার ন্যায় বল্লালসেনও শৈব ছিলেন এবং অন্যান্য উপাধির সহিত 'অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'অদ্ভুতসাগরের' একটি শ্লোকে আমরা বল্লালসেনের মৃত্যুর বিবরণ পাই। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষণসেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বল্লাল সেন সস্ত্রীক ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া শেষজীবন অতিবাহিত করেন। তবে এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করা যায়—বৃদ্ধরাজা ও রাণী স্বেচ্ছায় গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে দেহত্যাগ করেন।

বল্লালসেন তাহার ১৮ বৎসর (আঃ ১১৬০—১১৭৮ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে পিতৃরাজ্য অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন এবং মগধে সম্প্রসারিত ও করিয়াছিলেন। তবে জ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসাবে তাহার খ্যাতি বাংলায় তাহার নাম চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

লক্ষ্মণসেন

বল্লালসেনের পর তাহার পুত্র লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার রাজত্বকালের আটখানি তাম্রশাসন, তাহার সভাকবিগণ রচিত কয়েকটি স্তুতিবাচক শ্লোক, তাহার পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসন ও মুসলমান ঐতি-হাসিক মিনহাজুদ্দীন রচিত তথকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থ হইতে আমরা তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারি। মাধাইনগর ও ভাওয়াল তাম্র-শাসন ব্যতীত অন্যসব কয়টি তাম্রশাসন তাঁহার রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরের মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং ঐগুলিতে লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রশংসা-

সূচক শ্লোক আছে; তাঁহার কৃতিত্বের তেমন কোন সঠিক বর্ণনা নাই; কিন্তু মাধাইনগর ও ভাওয়াল তাম্রশাসনে তাঁহার কৃতিত্বের অতিস্তুতিবাচক বর্ণনা পাওয়া যায়। এই দুইখানি তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে তিনি কৌমারে উদ্ধত গৌড়েশ্বরের শ্রী হরণ ও যৌবনে কলিঙ্গদেশে অভিযান করিয়াছিলেন, তিনি যুদ্ধে কাশীরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ভীরু প্রাগ্‌জ্যোতিষের (কামরূপ আসাম) রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মাধাইনগর তাম্রশাসনে তাঁহাকে অতি উচ্চ সম্মানসূচক উপাধি 'বীর চক্রবর্তী সার্বভৌম-বিজয়ী' দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসনে আরো অধিক প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে যে তিনি পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগে 'সমরজয়স্তম্ভ' স্থাপিত করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত শ্লোকসমূহের উপর বিশ্বাস করিলে মনে করিতে হইবে যে লক্ষ্মণসেন বিজয়াভিযান কালে গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ ও কাশীর রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তবে মাধাইনগর ও ভাওয়াল তাম্রশাসনে ব্যবহৃত 'কৌমারকেলী পদটি নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং যেই সব বিজয়ের কথা বলা হইয়াছে তাহা লক্ষ্মণসেনের যৌবনে ঘটিয়াছিল এইরূপ মনে করাই সঙ্গত। খুবসম্ভবত তাঁহার পিতামহের রাজত্বকালে যে সব বিজয়াভিযান সংঘটিত হইয়াছিল লক্ষ্মণসেন সেই সব অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে বিজয়সেন গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ এবং সম্ভবত গাহাড়বাল বংশীয় কাশীরাজের বিরুদ্ধে সমরে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই সব অভিযানে লক্ষ্মণসেনের অংশগ্রহণ মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মিনহাজের বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে বখতিয়ার খল্‌জীর আক্রমণকালে লক্ষ্মণসেন আশী বৎসরের বৃদ্ধ ছিলেন। সুতরাং পিতামহের রাজত্বকালে তাহার যৌবনকাল চলিতেছিল।

ভাওয়াল তাম্রশাসন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ২৭ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং সম্ভবত মুসলিম আক্রমনের পর। মাধাইনগর তাম্রশাসনও কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ মুসলিম আক্রমনের অব্যবহিত পূর্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ এই তাম্রশাসনে ঐন্দ্রিমহাশান্তি যজ্ঞের উল্লেখ আছে এবং সম্ভবত যজ্ঞঅনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের উত্তর বাংলার ভূমিদান করিবার উদ্দেশ্যেই এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। ঐন্দ্রিমহাশান্তি যজ্ঞ কোন আগতবিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যেই করা হয়। মুসলমান আক্রমণই হয়তো এই আগত বিপদ। সুতরাং ভাওয়াল ও

মাধাইনগর উভয় তাম্রশাসনই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষের দিকের, যখন সেন সাম্রাজ্য হয় মুসলমান আক্রমণের অপেক্ষা করিতেছিল বা আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই হারাইয়াছে। এমন এক বিপদের সময় বিগত গৌরব ও কৃতিত্বের কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। এই প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই প্রশস্তিকার লক্ষ্মণসেনের যৌবনকালের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথম দিকের তাম্রশাসনসমূহে এইসব কৃতিত্বের কথা মোটেই উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসনে এইসব কৃতিত্বকে অধিকতর গৌরবময় করিবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, কারণ এইসব তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেন কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে 'সমরব্যয়স্তম্ভ স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে।

তাহা ছাড়া সমসাময়িক গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্র (১১৭০—১১৯৩) পরাক্রমশালী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে উত্তর বিহার ও মগধের পশ্চিমাংশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। কাশী ও প্রয়াগ তো নিশ্চয়ই তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সুতরাং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কাশী ও প্রয়াগে লক্ষ্মণসেন জয়স্তম্ভ স্থাপন করিবেন এমন মনে হয় না।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে লক্ষ্মণসেনের যে সব কৃতিত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহা তাঁহার যৌবনকালে পিতামহের রাজত্ব-কালের কৃতিত্ব। ভাওয়াল ও মাধাইনগর তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেন গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু বিজয়সেন ও বল্লালসেন এই উপাধি ব্যবহার করেন নাই; কিংবা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথম দিকে উৎকীর্ণ তাম্র-শাসনসমূহেও এই উপাধি ব্যবহার করা হয় নাই। আবার লক্ষ্মণসেনের পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসনে 'গৌড়েশ্বর' উপাধি বিজয়সেন হইতে লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত সব রাজার নামের সাথেই ব্যবহার করা হইয়াছে। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনও এই উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। বিজয়সেন ও বল্লালসেনের তাম্রশাসনে 'গৌড়েশ্বর' উপাধির অনুপস্থিতি এবং লক্ষ্মণসেনের তাম্র-শাসনে এই উপাধির প্রথম ব্যবহার হইতে অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করিয়াছেন যে গৌড় লক্ষ্মণসেনের শাসনকালেই পুরাপুরিভাবে সেন সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল; অর্থাৎ গৌড় বিজয় অসমাপ্ত ছিল এবং লক্ষ্মণসেন এই কার্য সমাপ্ত করিয়া 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন। এইরূপ অনুমান

খুব একটা যুক্তিসঙ্গত নয়। মদনপালের পর বাংলার কোন অংশে পাল শাসনের কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে বিজয়সেন উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় পাল শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। মগধাঞ্চলে মদনপালের পর গোবিন্দপাল ক্ষীণ পাল শাসনের অস্তিত্ব কিছুদিন রক্ষা করিয়াছিলেন। পশ্চিম দিক হইতে গাহাড়বালরাজ ও পূর্বদিক হইতে সেনরাজা বল্লালসেন মগধে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মগধের অংশবিশেষে রাজত্ব করিয়া গোবিন্দপাল ও পলপাল নামক রাজাদ্বয় গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গৌড় অঞ্চলে লক্ষ্মণসেনের প্রভুত্ব তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম বৎসর হইতেই ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে তাহার অভিষেক উপলক্ষে গৌড়াঞ্চলে ভূমিদান করা হইয়াছিল এবং তাহার ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের শক্তিপুর তাম্রশাসন দ্বারাও গৌড়াঞ্চলে ভূমিদান করা হইয়াছিল। সুতরাং লক্ষ্মণসেন কর্তৃক গৌড় বিজয় সমাপ্ত করিবার প্রশ্নই উঠে না। 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণের তাৎপর্য অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মুসলিম আক্রমণের ফলে গৌড়াঞ্চল হাতছাড়া হইবার পর বা হাত ছাড়া হইতে চলিয়াছে এই সময়ে 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন, যাঁহারা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করিত, কর্তৃক গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ বা তাঁহাদের তাম্রশাসনে সকল সেনরাজার জন্য এই উপাধি ব্যবহার এই কথাই প্রমাণ করে যে গৌড়াঞ্চল হাতছাড়া হইবার পর পূর্ব গৌরব বজায় রাখা ও তাহা ঘোষণা করিবার ইচ্ছার তাড়নায়ই এই উপাধির ব্যবহার। গোবিন্দপাল ও পলপাল কর্তৃক গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণও এই প্রবণতারই ফল।

লক্ষ্মণসেন নিজ রাজত্বকালে সমরক্ষেত্রে কোন সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন কিনা সেই সম্বন্ধে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে 'প্রবন্ধকোশ' ও 'পুরাতন-প্রবন্ধ-সংগ্রহ' প্রভৃতি জৈন গ্রন্থ হইতে মনে হয় যে লক্ষ্মণসেন তাঁহার মন্ত্রী কুমারদেবের বুদ্ধি ও কৌশলের ফলে গাহড়বালরাজের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের দুই সভাকবি 'উমাপতিধর ও শরণ রচিত কয়েকটি শ্লোকে এক রাজার বিজয় কাহিনীর উল্লেখ আছে। শ্লোকসমূহে রাজার নাম নাই। সেই রাজা প্রাগ্জ্যোতিষ, গৌড়, কলিঙ্গ, কাশী, মগধ প্রভৃতি

জয় করিয়াছিলেন এবং চেদি ও ম্লেচ্ছরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। চেদি ও ম্লেচ্ছরাজ ব্যতীত অন্যান্য বিজয় লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে সমুদয় শ্লোক লক্ষ্মণসেনকে উদ্দেশ্য করিয়াই রচিত। রতনপুরের কলচুরিরাজগণের (চেদি) সামন্ত বল্লভরাজ গৌড়রাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন, মধ্যপ্রদেশের একখানি শিলালিপিতে এইরূপ উল্লেখ আছে। সুতরাং লক্ষণসেনের সহিত চেদিরাজের সংঘর্ষ সম্ভবত ঐতিহাসিক ঘটনা। তবে ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক হওয়া যায় না।

শরণ একটি শ্লোকে লক্ষণসেন কতৃক এক ম্লেচ্ছ রাজার পরাজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নীহার রঞ্জন রায় অনুমান করিয়াছেন যে বখ্তিয়ার কর্তৃক নদীয়া জয়ের পূর্বে বা পরে লক্ষণসেন তাঁহার বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং শরণ ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে অনেকে আবার ম্লেচ্ছ বলিতে আরাকানের মঘদের বুঝিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, মঘগণ হয়তো বাংলায় আগমন করিয়াছিল এবং লক্ষ্মণসেন তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষের দিকে যখন তিনি বার্ধক্যের কারণে নিশ্চয়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন সাম্রাজ্যে আভ্যন্তরিক বিপ্লবের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। সুন্দরবণ এলাকায় ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে ডোম্মনপাল নামক এক স্বাধীন রাজার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ধরণের আভ্যন্তরিক বিপ্লব সেন শাসনের দুর্বলতার পরিচয় দেয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির আবির্ভাব হয় এবং শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সেনসাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত মুসলিম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে, খুব সম্ভবত ১২০৪ খৃষ্টাব্দে, মুসলিম সেনাপতি বখ্তিয়ার খল্জী নদীয়া আক্রমণ করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা তখন নদীয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রতিরোধ না করিয়া নদীপথে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চলিয়া আসেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা বখ্তিয়ার অধিকার করেন এবং লক্ষ্মণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করিয়া বাংলার মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। (মুসলিম বিজয় সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।)

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থান করিয়া লক্ষ্মণসেন আরও ২।৩ বৎসর রাজত্ব করেন। খুব সম্ভবত ১২০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু হয়। তাঁহার রাজত্বকাল (১১৭৮—১২০৫) খৃষ্টাব্দ) সেন শাসনের চরম উন্নতি ও চরম অবনতি উভয়ই পরিদর্শন করিয়াছিলেন। রাজত্বের প্রথম দিকে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি লক্ষ্মণসেন শান্তিকালীন কার্যকলাপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভা সেই যুগের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। আবার রাজত্বের শেষে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা মুসলমানদের নিকট হারাইয়া দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সীমাবদ্ধ রাজ্যের অধিপতি হইবার দুর্ভাগ্যও লক্ষ্মণসেনের হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসেন নিজে সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। অসমাপ্ত 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ তিনি সমাপ্ত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজসভায় বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিত। ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলায়ুধ তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্বস্ব এবং মৎস্যসূক্ত ভিন্ন মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব, পুরাণসর্বস্ব ও পণ্ডিত সর্বস্ব রচনা করেন। তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে পুরুষোত্তম, পশুপতি ও ঈশান বিখ্যাত। কবিদের মধ্যে গোবর্ধন আর্যাসপ্তশতী, জয়দেব গীতগোবিন্দ ও কবীন্দ্র ধোয়ী পবনদূত কাব্য রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্র ব্যতীত শিল্পক্ষেত্রেও এই সময় বাংলা উন্নতির উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল।

লক্ষ্মণসেন নিজে বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। পিতা ও পিতামহের শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পিতা ও পিতামহের 'পরম মাহেশ্বর' উপাধির পরিবর্তে তিনি 'পরমবৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার দানশীলতা ও ঔদার্য মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজুদ্দীনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মিনহাজ তাঁহার দানশীলতার সুখ্যাতি ও শাসনরীতির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে হিন্দুস্তানের রায়গণের পুরুষানুক্রমিক খলিফা স্থানীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই যুগের হাতেম কুতবুদ্দীনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে তিনি পরলোকে লক্ষ্মণসেনের শাস্তি লাঘব করেন।

সেনরাজ্যের পতন

লক্ষ্মণসেনের পর তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই দুই রাজারই তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বিশ্বরূপসেন 'অরিরাজ বৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর' ও কেশবসেন 'অরিরাজ অসহ্যশঙ্কর গৌড়েশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। উভয়েই সূর্যের উপাসক ছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে সেনরাজগণ যথাক্রমে শৈব, বৈষ্ণব ও সৌর সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন।

এই দুই রাজার রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তাহাদের তাম্রশাসন বিক্রমপুর ও বঙ্গ অঞ্চলে ভূমিদান করিয়াছিল। সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় তাঁহাদের রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। নদী বিধৌত এই অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আসিতে আরো প্রায় এক শতাব্দীকাল লাগিয়াছিল। অশ্বারোহী তুর্কী সৈন্যবাহিনী যে অঞ্চলে ঘোড়া চালাইয়া যাইতে পারিয়াছে সেই অঞ্চলই পদানত করিয়াছে। ফলে পশ্চিম ও উত্তর বাংলায় প্রথম তাঁহাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা জয় করিতে প্রয়োজন নৌবাহিনীর এবং নৌবাহিনী গড়িতে তাঁহাদের সময় লাগা খুবই স্বাভাবিক।

বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন উভয়েই 'যবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র' বলিয়া তাম্রশাসনে অভিহিত হইয়াছেন। মনে হয় তাঁহারা মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পশ্চিম ও উত্তর বাংলা অধিকারের পর মুসলমানগণ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দিকেও নজর দিবে, ইহাই স্বাভাবিক। সুতরাং বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন তাঁহাদের আক্রমনের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন, এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এই দুই ভ্রাতার মোট রাজত্বকাল প্রায় ২৫ বৎসর ছিল (আঃ ১২০৫—১২৩০ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া অনুমান করা হয়। বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে কুমার সূর্যসেন ও কুমার পুরুষোত্তমসেনের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ রাজত্ব করিয়াছিল কিনা জানা যায় না। তবে মিনহাজ যে সময়ে তাঁহার গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন (আঃ ১২৬০ খৃষ্টাব্দ) বা অন্তত যে সময়ে তিনি লক্ষ্মণাবতীতে আসিয়া বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন (আঃ ১২৪৪—৪৫)খৃঃ তখনও লক্ষ্মণসেনের বংশধর বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিল বলিয়া মিনহাজ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং

কেশবসেনের পরেও একাধিক সেনরাজা বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তবে তাঁহাদের ইতিহাস এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই।[১]

'পঞ্চরক্ষা' নামক একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে ১২১১ শকবর্ষে (১২৮৯ খৃ:) মধুসেন নামক এক গৌড়েশ্বরের নাম পাওয়া যায়। মধুসেনের রাজ্য কোথায় ছিল বা সেনবংশের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা সঠিক করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিক্রমপুর অঞ্চলে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল এবং এক দেব রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আদাবাড়ি তাম্রশাসন হইতে দশরথদেব নামক এক রাজার নাম পাওয়া যায় এবং এই তাম্রশাসন বিক্রমপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। দশরথদেব পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ অরিরাজ দনুজমাধব উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবত দিল্লী সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন তাঁহার বাংলা অভিযান কালে 'রায় দনুজ' নামক যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন তিনিই এই দশরথদেব।

সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে সেন রাজবংশের শাসন ত্রয়োদশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধে কোন এক সময়ে শেষ হয় এবং দেবরাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দেবরাজবংশই এই অঞ্চলের শেষ হিন্দু রাজবংশ কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতেই এই অঞ্চলে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

---

(১) দীনেশচন্দ্র সরকার সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাস্তবিক কেশব সেন নামে কোন রাজা ছিল না—এবং মদনপাড়া ও ইদিলপুর তাম্রশাসন প্রকৃতপক্ষে বিশ্বরূপসেনের পুত্র সূর্যসেনের রাজত্বকালে প্রদত্ত হয়। অসুস্থতার কারণে বিশ্বরূপসেন কিছুদিনের জন্য রাজ্যশাসন করিতে অসমর্থ হন এবং সেই সময় তাহার পুত্র সূর্যসেন রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং তাম্রশাসকদ্বয় সেই সময়ে প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে বিশ্বরূপসেন পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ কালে তাম্রশাসকদ্বয়ে সূর্যসেনের নাম চাছিয়া ফেলিয়া বিশ্বরূপসেনের নাম খোদাই করা হয়। তবে দীনেশচন্দ্র সরকারের এই মত এখনও গৃহীত হয় নাই।

অতিরিক্ত পাঠের জন্য গ্রন্থপঞ্জী :

R.C. Majumdar (ed): History of Bengal, Vol I, (Dacca University Publication)

A.M. Chowdhury : Dynastic History of Bengal, Dacca 1967

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, কলিকাতা, ১৩৭৭.

নীহার রঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা ১৯৪৯

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭১

দ্বিতীয় পর্ব

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে মুসলমান আগমন ও বখ্‌তিয়ার খলজী

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কী বীর মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজী বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটাইয়া মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। মুসলমানদের এই বিজয় সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের এক পর্যায় হিসাবেই ধরিতে হইবে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুরু হয় মুসলমানদের ভারতে আধিপত্য বিস্তারের অভিযান এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত মুসলিম আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং বাংলাদেশের সেন সাম্রাজ্যও মুসলিম বিজয়াভিযানের তরঙ্গে আক্রান্ত হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে মুসলিম অভিযানের নায়ক ছিলেন তুর্কী বীর ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজী। তবে বখ্‌তিয়ারের বিজয় সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে বাংলাদেশের সহিত মুসলমানদের প্রাথমিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। কারণ বখ্‌তিয়ারের বিজয়ের বহু পূর্ব হইতেই বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সহিত আরবদেশীয় মুসলমানদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কোন কোন সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া আবার অনেকে মনে করেন যে বখ্‌তিয়ারের বিজয়ের পূর্ব হইতে বাংলাদেশের সহিত মুসলমান-দের কেবলমাত্র বাণিজ্যিক সম্পর্কই ছিল না। বাংলাদেশের কোন কোন জায়গায় মুসলিম বসতিও ছিল। এমনকি অনেকে মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্যের কথাও চিন্তা করে। তাই বাংলাদেশের সহিত মুসলমানদের প্রাথমিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন এবং এই সম্পর্কের প্রকৃতি নিরূপণ করা প্রয়োজন।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, আরব ভৌগোলিক ও বণিকদের লেখনী ও প্রচলিত কিংবদন্তি ও লোক কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া এই সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

পাহাড়পুর ও ময়নামতীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আব্বাসীয় খলিফা-দের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটি আব্বাসীয় খলিফা হারুনর-রশিদের। ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়া এই কথা মনে করা ঠিক

হইবে না যে ইহারা বাংলাদেশে মুসলমানদের অবস্থিতি প্রমাণ করে। কারণ মুদ্রা পরবর্তীকালে বা বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্রে বাংলাদেশে আসিয়া থাকিতে পারে এবং সুদূর উত্তর বাংলায় পরবর্তী কোন এক সময়ে যাওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং এই মুদ্রার আবিষ্কার আরব মুসলমানদের সহিত বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথাই প্রমাণ করে।

আরব ভৌগলিকদের লেখনী হইতে এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সুলায়মান, ইবন খুর্দাদবেহ্, ইদ্রিসি ও মাসুদীর লেখনীতে আরবদের পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের, বাণিজ্য পথের ও পণ্যদ্রব্যের যে বিবরণ আছে তাহা হইতে এই কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে আরব বণিকগণ সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ-সমূহের সহিত বাণিজ্য করিত এবং তাহাদের যাত্রাপথে তাহারা বাংলা-দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আসিত। বাংলাদেশের বন্দরে তাহারা পণ্য-দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করিত। আরবদের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে বঙ্গো-পসাগরীয় বন্দর চট্টগ্রামে তাহাদের বাণিজ্যতরী ভিড়িত। ফলে আরবদের সহিত বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান সুফি-সাধকের জীবন সম্বন্ধে প্রচলিত লোককাহিনী ও কিংবদন্তির উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মনে করেন যে বখ্‌তিয়ারের পূর্বে এইসব সুফি-সাধক বাংলাদেশে আসিয়া ইসলাম প্রচার ও মুসলিম বসতি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে সুফি-সাধকদের জীবন ও কার্যাবলীকে কেন্দ্র করিয়া নানান অলৌকিক কাহিনী সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহাদের সম্পর্কে তেমন কোন প্রামানিক উপাদান নাই। সুতরাং তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত লোককাহিনী ও জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

যে সমস্ত সুফি বখ্‌তিয়ারের পূর্বে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলা-দেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয় তাঁহাদের মধ্যে ঢাকা জেলার রামপালের বাবা আদম শহীদ, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরের শাহ্ সুলতান রুমী, বগুড়ার মহাস্থানের শাহ্ সুলতান মাহিসাওয়ার এবং পাবনার শাহজাদ-পুরের মখদুম শাহ দৌলা শহীদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত সুফি-সাধক সম্বন্ধে যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা হইতে মনে হয় যে

তাঁহারা সকলেই বখতিয়ারের পূর্বে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন এবং বাংলা-দেশের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করিয়া ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়া যদি প্রচলিত কাহিনী সমূহ নিরীক্ষণ করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে তাঁহাদের বাংলাদেশে আগমনের সঠিক তারিখ নিরূপণ করা সম্ভব নয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রমাণ করা সম্ভব যে তাঁহারা বখ্‌তিয়ারের পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। প্রচলিত কাহিনীতে যে সব সূত্র রহিয়াছে তাহা হইতেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব।[১] সুতরাং অপ্রামাণিক কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না যে বখ্‌তিয়ারের পূর্বে এই সব সুফি-সাধক বাংলাদেশে মুসলিম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

আরাকানের রাজাদের সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তী 'রাজ্‌ওয়েং' এর উপর নির্ভর করিয়া আবার অনেকে মনে করেন যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে দশম শতাব্দীতে এক মুসলিম রাজ্য ছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পিছনেও তেমন অকাট্য যুক্তি নাই। বরঞ্চ অন্য কোন প্রমাণের অভাবে এই ধরণের সিদ্ধান্ত নেহায়েত অনৈতিহাসিক বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বখ্‌তিয়ারের পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশে মুসলমানদের বসতি ছিল বা মুসলমান রাজ্য ছিল এমন মনে করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। প্রচলিত কিংবদন্তী বা লোক কাহিনীর উপর নির্ভরশীল এই সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই নিরীক্ষণের ফলে ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয় বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে এই সিদ্ধান্ত করাই অধিক সমীচীন যে আরব মুসলমানদের সহিত বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সম্পর্কের ফলে এমনও হইতে পারে যে উপকূলীয় অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে, কিছু কিছু আরব বসতি স্থাপিত হইলেও হইতে পারে এবং এই অঞ্চলে আরব প্রভাবের বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়াও সম্ভবপর। তবে বাংলাদেশের কোন অংশে মুসলমানদের বসতি ছিল এমন মনে করিবার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সহিত মুসলমানদের সম্পর্কের প্রকৃতি মূলতঃ বাণিজ্য ভিত্তিক ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্তই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

(১) এই সব সুফিদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ; Abdul Karim, Social History of the Muslims of Bengal, পৃঃ ৮৬ হইতে।

বখ্‌তিয়ার খলজী

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজী। বখ্‌তীয়ার কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য আমরা একমাত্র মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-উদ্দীন সিরাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল। মিনহাজ বখ্‌তিয়ারের প্রায় ৪০ বৎসর পর বাংলায় গিয়া বাংলা জয়ের যে কাহিনী শুনিয়াছিলেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রচলিত কাহিনীকেই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে অন্য কোন সূত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। ফলে ঐতিহাসিকগণ মিনহাজের উপরই নির্ভরশীল। তবে মিনহাজের সব কথাই যে সত্য বা বিশ্বাসযোগ্য এমন কথা বলা যায় না। অন্য কোন উপাদানের অভাবে মিনহাজের বর্ণনার উপরে নির্ভর করিয়াই বখ্‌তিয়ার ও তাহার বাংলা বিজয়ের ইতিহাস পুনর্গঠন করিতে হইবে।

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন মুহাম্মদ বখ্‌তিয়াব খলজী ছিলেন জাতিতে তুর্কী এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গের অধিবাসী। তাহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে মনে হয দারিদ্র্যের পীড়নে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন এবং স্বীয় কর্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহার অগণিত দেশবাসীর ন্যায় ভাগ্যান্বষণে বাহির হন। গজনীতে সুলতান ঘোরীর সৈন্যবিভাগে চাকুরীর প্রার্থী হইয়া তিনি ব্যর্থ হন। খাট, লম্বা হাত ও কুৎসিত চেহারার বখ্‌তিয়ার নিশ্চয়ই সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। গজনীতে ব্যর্থ হইয়া বখ্‌তিয়ার দিল্লীতে আসেন এবং দিল্লীর শাসনকর্তা কুতুব্‌-উদ্দীনের দরবারে হাজির হন। এইবারও তিনি চাকুরী পাইতে ব্যর্থ হইলেন। অতঃপর তিনি বদাউনে যান এবং সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবর-উদ্দীন বখ্‌তিয়ারকে নগদ বেতনে চাকুরীতে ভর্তি করেন। বখ্‌তিয়ারের ন্যায় উচচাভিলাষী ব্যক্তি সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের পদে তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। অল্পকাল পরে তিনি বদাউন ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় যান এবং সেখানকার শাসনকর্তা হুসাম-উদ্দীনের অধীনে পর্যবেক্ষণের কার্যে নিযুক্ত হইলেন। বখ্‌তিয়ারের সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া হুসাম-উদ্দীন তাহাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ভাগবত ও ভিউলী নামক দুইটি পরগণার জায়গীর প্রদান করেন।

এইখানে বখ্‌তিয়ার তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির উৎস খুঁজিয়া পান এবং ভাগবত ও ভিউলী তাহার শক্তিকেন্দ্র হইয়া উঠিল।

বখ্‌তিয়ার অল্প সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য আক্রমন ও লুন্ঠন করিতে থাকেন। এই সময়ে তাহার বীরত্বের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান তাহার সৈন্যদলে যোগদান করেন। ফলে বখ্‌তিয়ারের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণ চালাইয়া একদিন তিনি এক প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গের মত স্থানে আসেন এবং আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষ কোন বাধাই দিল না। দুর্গজয়ের পর তিনি দেখিলেন যে দুর্গের অধিবাসীরা সকলেই মুণ্ডিত মস্তক এবং দুর্গটি বইপত্রে ভরা। জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি জানিতে পারিলেন যে তিনি এক বৌদ্ধ বিহার জয় করিয়াছেন। এইটি ছিল ওদন্দ বিহার বা ওদন্তপুরী বিহার। এই সময় হইতেই মুসলমানেরা ঐ স্থানের নাম দিলেন বিহার এবং আজ পর্যন্ত শহরটি বিহার বা বিহার শরীফ নামে পরিচিত।

বিহার জয়ের পর বখ্‌তিয়ার খলজী অনেক ধনরত্নসহ কুত্‌ব্‌-উদ্দীন আইবকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং কুত্‌ব্‌-উদ্দীন কর্তৃক সম্মানিত হইয়া বিহারে ফিরিয়া আসেন। অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পরের বৎসর তিনি নদীয়া আক্রমণ করেন। এই সময় বাংলাদেশের রাজা লক্ষ্মণসেন 'রাজধানী নুদীয়া'তে অবস্থান করিতে ছিলেন। মিনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিহার জয়ের পর সেন সাম্রাজ্যে গভীর ভীতি বিদ্যমান ছিল। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে ঐন্দ্রিমহাশক্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উল্লেখ এই ভীতির কথাই প্রমাণ করে। (এই সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে) এমনকি দৈবজ্ঞ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ রাজা লক্ষ্মণ-সেনকে এই বলিয়া রাজধানী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছিল যে তাহাদের শাস্ত্রে তুরস্কসেনা কর্তৃক বঙ্গজয়ের স্পষ্ট ইংগীত আছে এবং বিজয়ীর যে বর্ণনা শাস্ত্রে আছে তাহার সহিত বখ্‌তিয়ারের দেহের বর্ণনা একেবারে মিলিয়া যায়। রাজা লক্ষ্মণসেন তবুও নদীয়া ত্যাগ করেন নাই।

নদীয়া অভিযানকালে বখ্‌তিয়ার ঝাড়খন্দ অরণ্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া এত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে যখন তিনি নদীয়া পৌছেন তখন মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে আসিতে পারিয়াছিল, মূল বাহিনী পশ্চাতে ছিল। তিনি সোজা রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদদ্বারে

উপস্থিত হন এবং প্রাসাদরক্ষীদের হত্যা করেন। শহরের অভ্যন্তরে সোরগোল পড়িয়া যায়। রাজা লক্ষ্মণসেন সেই সময়ে মধ্যাহ্ন ভোজে ব্যস্ত ছিলেন। খবর শুনিয়া তিনি পশ্চাৎদ্বার দিয়া পলায়ন করেন এবং নৌপথে বিক্রমপুরে যাইয়া আশ্রয় নেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজের বিবরণে বখ্‌তিয়ার কর্তৃক 'নুদীয়া' জয়ের উপরোক্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য না হইতে পারে, তবে ইহা ছাড়া অন্য কোন বর্ণনা কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না। ফলে এই বর্ণনার উপব নির্ভর করিয়া যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক নদীয়া জয়ের ইতিহাস পুনর্গঠন করিয়া থাকেন। মিনহাজের বর্ণনার উপর ভর করিয়াই আমাদের দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে সতরজন (বা আঠারজন) অশ্বারোহী বাংলাদেশ জয় করেন। মিনহাজের বর্ণনা একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলেই এই ধরণের মতবাদের অসত্যতা প্রমাণিত হয়। মিনহাজ পরিষ্কার বলিয়াছেন যে বখ্‌তিয়ার নদীয়া আক্রমণকালে এত ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন যে মাত্র ১৮জন অশ্বারোহী তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিয়াছিল এবং তিনি যখন নদীয়া পৌছেন তখন অন্যান্য সৈন্যরা পিছনে ছিল। সুতরাং এই ধরনের মতবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তবে বখ্‌তিয়ারের জয়ের ইতিহাস পুনর্গঠনে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম প্রশ্নটি হইতেছে যে রাজা লক্ষ্মণসেন আক্রমণকালে নদীয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন এবং মিনহাজ 'নুদীয়া'কে রাজধানী বলিয়াছেন। কিন্তু সেন যুগের তাম্রশাসন সমূহ হইতে এই কথা স্পষ্ট যে তাহাদের রাজধানী ছিল ঢাকা জেলাব বিক্রমপুরে। তবে রাজা যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানে সাময়িক রাজধানী হইতে পারে। নদীয়া ছিল গঙ্গাতীরে পবিত্র তীর্থ স্থান। এমনও হইতে পারে যে বৃদ্ধ বয়সে রাজা লক্ষ্মণসেন সপারিষদে পবিত্র তীর্থস্থান নদীয়ায অবস্থান করিতেছিলেন। ফলে বখ্‌তিয়ার কর্তৃক নদীয়া আক্রমণ।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হইতেছে যে সুদক্ষ যোদ্ধা রাজা লক্ষ্মণসেন আসন্ন মুসলমান আক্রমণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সজাগ ছিলেন, এমনকি ব্রাহ্মণদের দেওয়া পলায়ন করিবার উপদেশ উপেক্ষা করিয়া তিনি নদীয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন; সুতরাং তিনি কি তাহার সাম্রাজ্য সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই? এই প্রসঙ্গে কিছু যুক্তি প্রদর্শন করা যায়। পশ্চিম-

দিক হইতে বাংলায় প্রবেশের স্বাভাবিক পথ ছিল রাজমহলের নিকটবর্তী তেলিয়াগড় গিরিপথ। তেলিয়াগড়ের দক্ষিণে বাংলার পশ্চিম সীমাব্যাপী অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। মিনহাজ এই জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাকেই ঝাড়খন্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তেলিয়াগড়ের উত্তর পশ্চিমে ছিল খরস্রোতা নদী, প্রবেশের জন্য অযোগ্য। সুতরাং বাংলার রাজার পক্ষে তেলিয়াগড় গিরিপথ সংরক্ষণ করাই স্বাভাবিক এবং লক্ষ্মণসেন হয়তো তাহা করিয়াছিলেন। কিন্তু বখ্‌তিয়ার দুর্গম অরণ্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সেনরাজার প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করেন। অরণ্যাঞ্চলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়াতেই বখ্‌তিয়ারের সৈন্যদল খণ্ড খণ্ড ভাবে অগ্রসর হয়। বখ্‌তিয়ার যখন নদীয়ার প্রাসাদে আক্রমণ চালান তখন রাজা লক্ষ্মণসেনের পক্ষে ইহা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে তেলিয়াগড়ের প্রতিরক্ষা ভেদ করিয়াই মুসলমানগণ নদীয়ায় আসিয়াছে; সুতরাং পলায়ন করা ছাড়া কোন উপায় নাই। ঝাড়খন্দ অরণ্যাঞ্চলের ভিতর দিয়া কোন আক্রমণকারী বাহিনী আসিতে পারে তাহা হয়তো কল্পনাতীত ছিল। উপরের এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয় যে বখ্‌তিয়ার সেনরাজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়াইয়া দুর্গম অরণ্যাঞ্চল দিয়া আক্রমণ চালাইয়া নদীয়ায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণসেনকে হতবাক করিয়া দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের পলায়ন ও অতি সহজে বখ্‌তিয়ারের নদীয়া জয় আমাদের নিকট বোধগম্য হইয়া উঠে।

বখ্‌তিয়ার কর্তৃক নদীয়া জয়ের সঠিক তারিখ নির্ধারণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ মিনহাজের বর্ণনায় এই ঘটনার কোন তারিখ দেওয়া হয় নাই। মিনহাজ বখ্‌তিয়ারের জীবনের মাত্র দুইটি তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন: দিল্লীতে কুতবউদ্দীনের দরবারে উপস্থিত হওয়ার এবং তাহার মৃত্যুর। ফলে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন সূত্র হইতে এই ঘটনার তারিখ নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন তারিখ নির্দেশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এই বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে বর্তমানে ১২০৪ খৃষ্টাব্দই নদীয়া জয়ের তারিখ হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে।[১]

---

(১) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: A. M. Chowdhury : Dynastic History of Bengal, পৃঃ ২৫২—২৫৮,
Indian Historical Quarterly, XXX, পৃঃ ১৩৪ হইতে।

মিনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে বখ্‌তিয়ার তিনদিন ধরিয়া নদীয়া লুঠ করেন ও বিপুল ধনসম্পত্তি হস্তগত করেন। অতঃপর বখ্‌তিয়ার নদীয়া ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণাবতীর (গৌড়) দিকে যান। তিনি লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া সেইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই লক্ষ্মণাবতীই মুসলমান আমলে লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। বখ্‌তিয়ার কর্তৃক লখনৌতি বিজয়েব কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত লক্ষ্মণসেনের বিক্রমপুবে প্রস্থানের পর তাঁহার সৈন্যদল যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে বখ্‌তিয়ার বিনা যুদ্ধেই লখনৌতি জয় করেন।

গৌড় জয়েব পর বখ্‌তিয়াব আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলায় নিজ অধিকাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বখ্‌তিয়ার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। অধিকৃত এলাকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগে একজন সেনাপতিকে শাসনভার অর্পণ করেন। বখ্‌তিয়ারের সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে তিনজনেব নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আলী মর্দান খলজী বরসৌলে'র এবং হুসাম-উদ্দীন ইওজ খলজী 'গঙ্গতরীর' শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 'বরসৌল'কে বর্তমান দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত ঘোড়াঘাট এলাকায় নির্দেশ করা হয়। এই স্থানটি বগুড়া, রংপুর, ও দিনাজপুর এই তিনটি জিলার মিলনস্থল। 'গঙ্গতরী'র সঠিক নির্দেশ-করণ সম্ভব নয়। তবে খুব সম্ভবত তাণ্ডার গঙ্গকোয়ারই 'গঙ্গতরী'। মুহাম্মদ শীরান খলজী নামক অপর সেনাধ্যক্ষের শাসনভার ছিল খুবসম্ভবত লখনৌতির দক্ষিণে পদ্মার তীরে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে।

বখ্‌তিযার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলায় মুসলিম রাজ্যের সঠিক সীমা সম-সাময়িক সূত্রে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও প্রায় নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে বখ্‌তিয়ারের রাজ্য পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হইয়া রংপুব শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বখ্‌তিয়ারের পূর্ব অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বখ্‌তিয়ারের জীবনের শেষ কার্য তিব্বত আক্রমণ। বাংলাদেশের বৃহদাংশ তাহার রাজ্যের বাহিরে ছিল। ঐ সব অঞ্চল জয়ের চেষ্টা না করিয়া সুদূর দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল তিব্বত আক্রমণ করিবার কারণ সহজে অনুধাবন করা যায় না। হয়তো বখ্‌তিয়ার তাহার দুঃসাহসিক কর্মপ্রীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, বা হয়তো তুর্কীস্তানের সহিত সোজা যোগাযোগ

স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি তিব্বত আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি তিব্বত আক্রমণের পরিকল্পনা করিয়া পথঘাটের খোজ খবর নিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে বিভিন্ন উপজাতির বাসছিল এবং তিব্বত হইতে টাট্টু ঘোড়া আমদানী করিয়া তাহারা উত্তর বাংলার বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় করিত। মেচ উপজাতির একজন বখ্‌তিয়ারের সংস্পর্শে আসে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তাহার নাম ছিল আলী মেচ। বখ্‌তিয়ার আলী মেচের নিকট হইতে তিব্বতের রাস্তা ও আনুসঙ্গিক বিষয়ে খোজ খবব নিয়াছিলেন এবং আলী মেচ তাহার পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করিতে রাজী হয়। তিব্বত অভিমুখে যাত্রার পূর্বে বখ্‌তিয়ার মুহাম্মদ শীরাণ খল্‌জী ও তাহার ভ্রাতা আহাম্মদ শীরাণ খল্‌জীকে লখনৌর (বর্তমান বীরভুম জেলার নগোর) আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। তবে এই অভিযানের কি ফলাফল হইয়াছিল সেই বিষয়ে মিনহাজ কোন উল্লেখ করেন নাই।

সকল প্রস্তুতির পব বখ্‌তিয়ার প্রায় দশ হাজার সৈন্যসহ লখনৌতি ত্যাগ করেন। উত্তব-পূর্ব দিকে কয়েকদিন চলিবার পব তাঁহারা বর্ধনকোট নামক একটি শহরে পেঁাছেন। এই শহবের পূর্বদিকে বেগমতী নামক গঙ্গা নদীর তিনগুণ বড় একটি নদী ছিল। বখ্‌তিয়ার নদী অতিক্রম না কবিয়া উত্তর দিকে অগ্রসব হনএবং দশদিন চলিবার পর একটি পাথরের সেতুর নিকটে আসেন। সেতু পার হইয়া তিনি তাঁহাব দুইজন সেনাপতিকে ঐ স্থানে সেতু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মোতায়েন করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। আলীমেচ ঐ স্থানে বখ্‌তিয়ারকে ত্যাগ করেন। কামরূপের রাজার নিকট হইতে তিনি সংবাদ পাইলেন যে ঐ সময়ে তিব্বত আক্রমণ করা সমীচীন হইবে না। কামরূপরাজ বখ্‌তিযারকে ফিরিয়া যাইতে বলেন এবং পরের বৎসর আবার আসিলে তিনিও বখ্‌তিয়ারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। বখ্‌তিয়ার এই কথায় কান না দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পনর দিন পথ চলিবার পর শস্য-শ্যামলা এক স্থানে আসিয়া পেঁাছিলেন। সেখানে একটি কেল্লাও ছিল। ঐ স্থানে স্থানীয় সৈন্যরা বখ্‌তিয়ারের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বখ্‌তিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাঁহার যথেষ্ট সৈন্য ক্ষতি হয়। বন্দী শত্রু সৈন্যদের নিকট বখ্‌তিয়ার জানিতে পারিলেন যে ঐ স্থানের অদূরে করমবত্তন নামক শহরে কয়েক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

হইয়া আছে। বখ্‌তিয়ার আর অগ্রসর না হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরিবার পথে তাঁহার সৈন্য অসীম কষ্ট সহ্য করিল। অনেক কষ্টের পর পাথরের সেতুর নিকট পৌঁছিয়া বখ্‌তিয়ার দেখিলেন তাঁহার দুই সেনাপতি সেখানে নাই এবং সেতুটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পার্বত্যলোকেরা চারিদিক হইতে তাঁহার সৈন্যদলের উপর আক্রমন চালায়। অবশেষে মরিয়া হইয়া বখ্‌তিয়ার সসৈন্যে নদী সাঁতার কাটিয়া পার হন। বখ্‌তিয়ারের বিশাল সৈন্যবাহিনী ঐ স্থানে বিধ্বস্ত হয়। অল্প সংখ্যক সৈন্য বখ্‌তিয়ারের সহিত ফিরিতে সক্ষম হয়। বখ্‌তিয়ার দেবকোটে ফিরিয়া আসেন। গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে কানাই বরশী বোয়া নামক স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিতে ১১২৭ শকাব্দে (১২০৬ খৃষ্টাব্দে) ঐ স্থানে তুরস্ক সেনাদলের বিধ্বস্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইভাবে বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা দুর্দম্য সাহসী তুর্কী বীরের তিব্বত অভিযান বিফল হয়। প্রকৃতপক্ষে তিব্বত পর্যন্ত তিনি যাইতেই পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। কামরূপের পার্বত্যাঞ্চলে কামরূপ সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। বখ্‌তিয়ারের এই ব্যর্থতা ও তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনীর ধ্বংস বাংলার মুসলমান শাসনের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইহার ফলে মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। লখনৌতি রাজ্যের মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্বিরোধের সূচনাও ঐ সময়েই হয়। ফলে দিল্লীর সহিত আসন্ন বিরোধে লখনৌতির মুসলমানগণ সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।

বখ্‌তিয়ার খলজী দেবকোটে অবস্থানকালে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। বিপুল সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হওয়ার শোকে ও ব্যর্থতার গ্লানিতে বখ্‌তিয়ার ভাঙ্গিয়া পড়েন। শয্যাশায়ী অবস্থায় ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুতে আলী মর্দান খলজীর হাত ছিল।

বখ্‌তিয়ারের জীবন অনেকটা রূপকথার মত। নিঃস্ব সৈনিক হিসাবে জীবন আরম্ভ করিয়া তিনি নিজ ক্ষমতা ও সাহসিকতার ফলে সুদূর আফ-গানিস্তান হইতে আসিয়া বাংলাদেশে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার জীবনের পরিসমাপ্তিও ঘটিয়াছিল দুর্দম্য সাহসেরই প্রতিফলে। তবে

বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁহার স্বল্পকালীন শাসন নিঃসন্দেহে নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াই তিনি শাসন ব্যবস্থার দিকে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি মস্‌জিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্‌ তৈরী করাইয়াছিলেন। তবে বখ্‌তিয়ারের কোন কীর্তি আমাদেব সময় পর্যন্ত আসিয়া পেঁাছে নাই। তিনি মুদ্রা ব্যবস্থার ও প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া মিনহাজ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কোন মুদ্রা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

দিল্লীর সহিত বখ্‌তিয়ারের সম্পর্কের সঠিক রূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সুলতান মোহাম্মদ ঘোরী জীবিত ছিলেন। সুতরাং দিল্লীর মুসলমান সাম্রাজ্য ঘোরীর অধীনই ছিল; কুতব-উদ্দীন দিল্লীতে মোহাম্মদ ঘোবীর প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন। তবকাৎ-ই-নাসিরী হইতে জানা যায় যে বখ্‌তিয়ার সুলতান ঘোরীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বিহার জয়ের পর উপঢৌকন সহ কুতব-উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নদীয়া জয়ের পরও তাঁহাকে ধনরত্ন পাঠাইয়াছিলেন। বখ্‌তিয়ার কাহার নামে খুত্‌বা পাঠ করাইয়াছিলেন বা মুদ্রা কাহার নামে প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। সুতরাং তিনি দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে এই কথা স্পষ্ট যে তিনি বাংলা জয় করিয়াছিলেন নিজ প্রেরণায়, কেহ তাঁহাকে জয়ের জন্য প্রেরণ করে নাই। লখনৌতিতে আভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যাপারে বখ্‌তিয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনই ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তবে কুতব্‌-উদ্দীনের সহিত তাঁহার একটা সমঝোতা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বখ্‌তিয়ার জীবিত থাকা কালীন কুতব-উদ্দীন লখনৌতির কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সুতরাং বখ্‌তিয়ার বাংলা জয়, বিজীত রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও যুদ্ধ বিগ্রহ স্বাধীন ভাবেই করিয়াছিলেন। দিল্লীর অধীনতা না হইলেও দিল্লীর সহিত একটা সমঝোতা হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খলজী মালিকদের অধীনে বাংলাদেশ

বখ্‌তিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর তাঁহার তিনজন সহচর একের পর এক বাংলার মুসলিম রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেন। ১২০৬ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে খলজী মালিকদের অধীনে বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্যের ইতিহাস অন্তর্বিরোধের ইতিহাস। বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁহার সহচরদের মধ্যে ক্ষমতা হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এই অন্তর্বিরোধের সুযোগে দিল্লীর মুসলিম সুলতান বাংলাদেশে ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ পায়।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে দেবকোটে বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর সাথে সাথেই অন্ত-বিরোধের সূচনা হয়। অনেকে মনে করেন যে বখ্‌তিয়ার আলী মর্দান কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সেই ক্ষেত্রে মনে করিতে হইবে যে আলী মর্দানের এই আচরণই অন্তর্বিরোধের সূচনা করে। বখ্‌তিয়ারের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মুহাম্মদ শীরাণ খলজী লেখনোর (নগোর) হইতে তাড়াতাড়ি দেবকোটে চলিয়া আসেন। দেবকোটে উপস্থিত খলজী আমীর ও সৈনিক-বৃন্দ তাঁহাকে নেতা নির্বাচন করেন এবং তিনি লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আলী মর্দানকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে আলী মর্দানের শাসনকেন্দ্র বরসৌল আক্রমণ করেন। আলী মর্দান যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। শীরাণ লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইলেন। চারিদিকে এক গভীর অন্তর্বিরোধের অবস্থা বিরাজ করিতেছিল। কারণ বখ্‌তিয়ারের সকল আমীরগণই মনে করিত যে বাংলার সিংহাসনে তাহাদের সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। তাহারা সকলেই বাংলা বিজয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকার সমান অধিকারের দাবীই অন্তর্বিরোধের সূত্রপাত করে। এই অবস্থায় শীরাণ দক্ষতার সহিত শাসন আরম্ভ করিলেন। বখ্‌তিয়ারের সহকর্মী সকল আমীরকে তিনি স্ব স্ব পদে বহাল রাখিলেন এবং খলজী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন। এই ঐক্য রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি আলী মর্দানের সমর্থক-দিগকে কোন শাস্তি প্রদান করিলেন না। দিল্লীর সহিতও শীরাণ বখ্‌তি-

য়ারের নীতি অনুসরণ করেন। প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা না করিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিতে থাকেন। বখতি-য়ারের মৃত্যুর পর বিহারে তাঁহার অধিকারের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা সমসাময়িক ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জানা যায় না। মনে হয় বিহার এই সময়ে দিল্লীর সুলতানের অধীনে চলিয়া যায়। কারণ পরবর্তীকালে বিহারে দিল্লী কতৃক নিযুক্ত শাসনকর্তার কথা জানা যায়।

মুহম্মদ শীরাণ দীর্ঘকাল শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই। আলী মর্দান তাঁহার কারারক্ষী হাজী বাবা ইস্পাহানীকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিয়া পলায়ন কবেন এবং দিল্লীতে যাইয়া সুলতান কুতব্-উদ্দীন আইবকের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। আলী মর্দান কুতব্-উদ্দীনকে লখনৌতি আক্রমণ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। আধিপত্য বিস্তারের এই সুযোগ কুতব্-উদ্দীন সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তা কায়েমাজ রুমীকে লখনৌতি আক্রমণ করিয়া খলজী আমীরদের বিরোধের মীমাংসা করিতে ও প্রত্যেক আমীরকে স্ব স্ব ইক্‌তায় বহাল করিতে আদেশ দেন। সম্ভবত ১২০৭ খৃষ্টাব্দে কায়েমাজ রুমী লখনৌতির দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হন। বখ্‌তিয়ারের অন্যতম সহচব গঙ্গতরীর (খুব সম্ভব সনকার তাণ্ডার গঙ্গকোয়ার) শাসনকর্তা হুসামউদ্দীন ইওজ খলজী কায়েমাজ রুমীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। হুসাম-উদ্দীনের আত্মসমর্পণ শীরানকে দুর্বল করিয়া ফেলে। সে রুমীর সহিত যুদ্ধ নিরর্থক মনে করিয়া দেবকোট ছাড়িয়া উত্তর-পূর্ব দিকে সরিয়া পড়িলেন। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যদিও লখনৌতিকে বখ্‌তিয়ার তাঁহার রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বা রাজধানী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে দেবকোটই বাংলার মুসল-মান রাজ্যের শাসন কেন্দ্র হইয়াছিল। কায়েমাজ রুমী বিনা যুদ্ধে দেবকোট অধিকার করেন এবং হুসাম-উদ্দীন ইওজ খলজীকে দেবকোটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া অযোধ্যার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। রুমীর প্রত্যাবর্তনের কথা শুনিয়া শীরান অন্যান্য খলজী আমীরের সহযোগিতায় দেবকোট পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। পথে এই সংবাদ পাইয়া রুমী দেবকোটের দিকে ফিরিয়া আসেন এবং শীরাণকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে শীরাণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন এবং সন্তোষ (দিনাজপুর) ও মসেদার (বগুড়া) দিকে পলায়ন করেন। ইহার পর শীরাণ সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। মিনুহাজ উল্লেখ করিয়াছেন যে মসেদা সন্তোষে আশ্রয়

নিবার পর খলজী আমীরদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় এবং শীরাণ এক আমীরের হাতে শহীদ হন। প্রচলিত স্থানীয় কিংবদন্তী মতে পার্শ্ববর্তী হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শীরাণ নিহত হইয়াছিলেন। কিংবদন্তী সত্য হইলে বলিতে হয় যে পলায়নের পর শীরাণ পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য জয় করিয়া ভিন্ন রাজ্য গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিহত হইয়াছিলেন। আত্রেয়ী নদীর তীরে সন্তোষে মুহাম্মদ শীরাণ খলজী সমাহিত আছেন। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে প্রায় এক বৎসরকাল শাসন করিবার পর শীরাণ খলজীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

শীরাণের পরাজয় ও পলায়নের পর কায়েমাজ রূমী ইওজ খলজীকে দেবকোটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া ফিরিয়া আসেন।

হুসাম-উদ্দীন ইওজ খলজী দিল্লীর অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে লাখ-নৌতির মুসলিম রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এইভাবে বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্য দিল্লীর অধীনস্থ একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ইওজ এই পদে দুই বৎসরকাল (১২০৮—১২১০ খৃষ্টাব্দ) বহাল থাকেন। দুই বৎসর পর আলী মর্দান খলজী আবার বাংলায় আসেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আলী মর্দান বাংলা হইতে দিল্লীতে যাইয়া কুতব্-উদ্দীনকে লখনৌতি আক্রমণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে অবস্থান কালে আলী মর্দান কুতব্-উদ্দীনের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তাঁহার অসীম সাহস কুতব্-উদ্দীনকে আকৃষ্ট করে। আলী মর্দান কুতব্-উদ্দীনের সাথে গজনীতে যান এবং সেখানে বন্দী হন। কিন্তু সেখান হইতেও তিনি পলাইয়া আসেন, কুতব্উদ্দীন তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করেন এবং লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। আলী মর্দান অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে লখনৌতিতে যাইয়া শাসন করা খুব সহজ ব্যাপার নাও হইতে পারে। কারণ তাঁহার বিগত কার্যকলাপ লখনৌতির আমীরগণ নিশ্চয়ই ভুলিয়া যায় নাই। ফলে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া তিনি লখনৌতি অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এইভাবে বখ্‌তিয়ারের পর আবার বাংলাদেশে অধিক সংখ্যক মুসলমান সৈন্য আগমন করিল।

বাংলার শাসনকর্তা হুসাম-উদ্দীন ইওজ খলজী সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন। আলী মর্দানের সহিত শক্তিদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়া অসমীচীন বিবেচনা করিয়া তিনি আলী মর্দানকে বাধা প্রদানের কোন চেষ্টাই করিলেন না। বরঞ্চ কুশী নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং

নিজে তাঁহার পুরাতন জায়গীর গঙ্গতরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আলী মর্দান বিনা বাধায় বাংলার কর্তৃত্ব লাভ করিলেন।

শাসনভার গ্রহণ করিয়া আলী মর্দান অত্যন্ত দৃঢ়হস্তে শাসনকার্য চালাইতে থাকেন। অল্পদিন পরেই দিল্লীর সুলতান কুতব্-উদ্দীন আইবকের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর দিল্লীতে উত্তরাধিকাব লইয়া বিবোধ দেখা দেয়। এই সুযোগে আলী মর্দান তাঁহার প্রভুর মৃত্যুতে নিজেকে দায়মুক্ত মনে করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। বখ্‌তিযার খলজী ও শীরাণ খলজী আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন-ভাবে শাসন করিলেও প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই। এই বিবেচনায় আলী মর্দানকেই বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সুলতান বলিতে হয়। মিনহাজ আলী মর্দান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। * তিনি আরও বলিয়াছেন যে আলী মর্দান নিজ নামে খুত্‌বা পাঠ ও মুদ্রা প্রচার আরম্ভ করিযাছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহাব কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই।

ক্ষমতালাভ করিয়া সুলতান আলাউদ্দীন কঠোরতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বখ্‌তিয়ারের সমসাময়িক খলজী আমীরদের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই তাঁহার সন্দেহ ছিল। তাই তিনি ঐ আমীরদের প্রতি নির্মম ব্যবহার শুরু করেন। স্বাধীনতা ঘোষণাব পর তিনি কিছুটা কাণ্ড-জ্ঞানহীন হইয়া পড়েন এবং ধবাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিলেন। মিনহাজ উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি বাংলাদেশে বসিয়া নিজেকে সারা বিশ্বের সুলতান রূপে কল্পনা করিতেন এবং সেই কল্পনা মতে কাজ করিতেন। তাঁহার রাজ্যবহির্ভুত অঞ্চলে, এমনকি সুদূর খোরাসান, গজনী ও ঘোরে তিনি জায়গীর দান করিতে শুরু করেন। এক কথায় বলা যায় যে সুলতান আলাউদ্দীন খলজী আমীরদেব উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন এবং যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে থাকেন; তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া খলজী আমীরগণ হুসাম-উদ্দীন ইওজের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হইতে থাকেন। তাঁহারা ১২১২ খৃষ্টাব্দে গোপনে সুলতান আলাউদ্দীনকে হত্যা করিয়া হুসাম-উদ্দীন ইওজ খলজীকে নেতা নির্বাচন করেন। হুসামউদ্দীন ইওজ সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী উপাধি ধারণ করিয়া লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এইভাবে আলী মর্দানের দুই বৎসরকাল (১২১০-১২১২ খৃষ্টাব্দ) শাসনের অবসান ঘটে। তাঁহার শাসনকালে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

না ঘটিলেও একদিক হইতে তাঁহার শাসনকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলী মর্দান দিল্লীর অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে ক্ষমতাসীন হন, কিন্তু তাঁহার স্বাধীনতা ঘোষণা বাংলার মুসলিম রাজ্যের উপর দিল্লীর স্বল্পকালীন অধীনতার অবসান ঘটায়। তাঁহার পতনের পর ইওজ খলজী স্বাধীন সুলতান হিসাবেই শাসন আরম্ভ করেন। তাঁহার শাসনকালে বাংলার মুসলিম রাজ্যে বেশ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। দিল্লীর সুলতান ইলতুত্‌মিশ তাঁহার রাজত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যান্য গোলযোগের জন্য বাংলার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নাই, ফলে ইওজ তাঁহার শাসনকালের প্রথম দিকে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী

বাংলার খলজী মালিকদের মধ্যে সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজীর নামই বিখ্যাত। বাংলার মুসলিম রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠায় ও বিস্তারে তিনি বিশেষ অবদান রাখিয়াছিলেন। লখনৌতিতে তাঁহার দরবার দিল্লীর সুলতানের দরবারের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অধীনে বাংলার মুসলিম রাজ্যের ক্ষমতার উন্নতি দিল্লীর সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সুলতান ইলতুত্‌মিশ দুইবার আক্রমণ করিয়া গিয়াসউদ্দীন ইওজকে পদানত করিতে সক্ষম হন। ইওজের প্রায় ১৫ বৎসর শাসনকাল (১২১২—১২২৭ খৃষ্টাব্দ) বাংলার মুসলিম রাজ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটাইয়া, রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিয়া এবং রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া ইওজ অবশ্যই কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন।

ইওজ ছিলেন বখ্‌তিয়ারের একজন বিশিষ্ট সহচর এবং বখ্‌তিয়ারের ন্যায় তিনিও ছিলেন একজন ভাগ্যান্বেষী। আফগানিস্তানের গরমশিরের অধিবাসী হুসেনে পুত্র ইওজ জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন অতি সাধারণভাবে। গর্দভপৃষ্ঠে ভারবাহীর বৃত্তি অনুসরণ করিয়া তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন। কথিত আছে যে একদিন দুইজন দরবেশ তাঁহার নিকট আহার ভিক্ষা করে। ইওজ তাহাদিগকে রুটি ও পানি দেন। দরবেশদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হিন্দুস্তানে যাইতে উপদেশ দেন এবং বলেন যে তাঁহারা তাঁহাকে হিন্দুস্তানের যে অংশে একজন মুসলমান আছে সেই অংশ দান করিলেন। ইওজ সস্ত্রীক হিন্দুস্তানের পথে রওয়ানা হইলেন। এই গল্পের সত্যতা

যাঁচাই করা নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা হইতে এই কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে সাধারণ জীবিকাধারী ইওজ অসংখ্য স্বদেশবাসীর পথ অনুসরণ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষের দিকে আসেন এবং কালক্রমে বখ্‌তিয়ারের সৈন্য-দলে যোগদান করেন।

বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর পরবর্তীকালে খলজী মালিকদের অন্তর্বিরোধের মধ্যে ইওজের আচরণ তাঁহার বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দেয়। কায়েমাজ রুমীর আক্রমণকালে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এককভাবে বাধা-প্রদান সুবিধাজনক হইবে না মনে করিয়া তিনি আত্মসমর্পণ করিয়া নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে আলী মর্দানের আবির্ভাবের সময় তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া সরিয়া পড়িয়াও তিনি বুদ্ধির পরিচয় দেন এবং তাঁহার পরবর্তী আচরণ দেখিয়া মনে হয় যে তিনি উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে উভয় ক্ষেত্রে তাঁহার আচরণ কিছুটা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ঐ সময়ে প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় যে খুব একটা লাভ হইবে না, এই কথা স্মরণ করিয়া ইওজকে বাস্তব উপলব্ধির কৃতিত্ব নিশ্চয়ই দিতে হইবে। পরবর্তীকালে আলী মর্দানের বিরুদ্ধে যখন খলজী আমীর সম্প্রদায় একতাবদ্ধ হইয়াছিল, তখন তাহাদিগকে নেতৃত্ব দান করিয়া তিনি সহজেই ক্ষমতা দখল করেন। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে গরমাশিরের গাধাচালক নিজ বুদ্ধি, সাহস ও চরিত্রবলে লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের সুলতান হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী নিঃসন্দেহে খলজী মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। বখ্‌তিয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলায় মুসলিম রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করিতে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি লখনৌতিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে বসনকোট নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। বখ্‌তিয়ার খলজী লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করিলেও দেবকোটে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তখন হইতে দেবকোটই শাসনকেন্দ্র হইয়াছিল। দেবকোট উত্তর বাংলায় উচ্চস্থানে অবস্থিত হওয়ায় দিল্লী হইতে আক্রমনের আশঙ্কা কম ছিল। কিন্তু লখনৌতির দিল্লীর সৈন্যদল কর্তৃক সহজে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকা সত্বেও লখ্‌নৌতিতে রাজধানী স্থানান্তরের কারণ ছিল। লখ্‌নৌতি নদী তীরে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা। তাহা ছাড়া ইওজ খলজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নৌবাহিনী ছাড়া অশ্বারোহী তুর্কী

বাহিনীর পক্ষে নদী মাতৃক বাংলাদেশে রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হইবে না এবং বাংলাদেশে শাসন বজায় রাখিতে হইলেও নৌবাহিনীর প্রয়োজন। ফলে রাজধানী নদীর সন্নিকটে হইলে নৌবাহিনী গড়িয়া তুলিতে সুবিধা হইবে। বাংলার মুসলিম শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজীই নৌবাহিনীর গোড়া পত্তন করিয়াছিলেন। লখনৌতিতে রাজধানী পরিবর্তন এই কথাও প্রমাণ করে যে ইওজ এত শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে লখনৌতিতে দিল্লীর আক্রমণের আশঙ্কা থাকা সত্বেও তিনি ঐস্থানে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং নৌবাহিনী গঠন ও দুর্গ তৈয়ার করিয়া ইহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সামরিক কারণে ও প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি রাজধানী লখনৌতির সহিত উত্তরে দেবকোট ও দক্ষিণে লখ্নৌর (বীরভূম জেলার নগোর), এই দুই সীমান্তবর্তী শহরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য একটি দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেন। এই রাজপথটি একদিকে যেমন সৈন্য চলাচলের সুবিধা করিয়াছিল অন্য দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও ব্যবসা বাণিজ্যেরও সুবিধা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া এই রাজপথ দেশের লোকের নিকট আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল; কারণ, এই রাজপথ বার্ষিক বন্যার করালগ্রাস হইতে তাহাদের গৃহ ও শস্যক্ষেত্রাদি রক্ষা করিত। ইওজ খলজী লখনৌতির তিন পার্শ্বে সুগভীর ও সুপ্রশস্ত পরিখা খনন করাইয়াছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করিয়া লখনৌতি ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বার্ষিক বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ফলে কৃষিকার্যেরও সুবিধা হইয়াছিল।

উপরোক্ত কার্যাবলী গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজীকে একজন সুশাসক হিসাবে প্রতিপন্ন করে। তিনি রাজ্য বিস্তারের দিকেও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। মিনহাজের বর্ণনায় তাঁহার রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নাই। মিনহাজ লিখিয়াছেন যে পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজারা, যেমন কামরূপ, উড়িষ্যা, বংগ্ (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) এবং ত্রিহুতের রাজারা, তাঁহার নিকট কর পাঠাইতে বাধ্য হন এবং লখনৌতির দক্ষিণ সীমান্তস্থ লখ্নৌর শহর প্রথমে শত্রু কবলে পড়ে, কিন্তু পরে ইওজ তাহা পুনরধিকার করেন, অনেক হাতী ঘোড়া এবং অন্যান্য সামগ্রী তাঁহার হস্তগত হয় এবং সেখানে তিনি নিজ আমীর নিযুক্ত করেন। মিনহাজের বর্ণনায় লখ্নৌর পুনর্বিজয়ের কথা স্পষ্টভাবে আছে, আর কামরূপ, উড়িষ্যা, ত্রিহুত ও বঙ্গের হিন্দুরাজ্য-

সমূহ হইতে কর আদায়ের কথা আছে। এই কর আদায় সম্ভবত পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য সমূহের সহিত ইওজের সংঘর্ষের ফল।

উড়িষ্যার সহিত সংঘর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় উড়িষ্যারাজ তৃতীয় অনঙ্গভীমের রাজত্বকালে (১২১১—১২৩৩ খৃষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ চট্টেশ্বর শিলা লিপিতে। ইহা হইতে জানা যায় যে আনুমানিক ১২২০ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার সেনাপতি বিষ্ণু 'যবন' রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসীম সাহসের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ লখ্‌নৌর শহর শত্রুহস্তে পতিত হইবার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয় যে লখ্‌নৌর মুসলমানদের অধিকারে পূর্বেই আসিয়াছিল এবং বখ্‌তিয়ারোত্তর কালের পরিস্থিতির সুযোগে পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যার রাজা ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল। ইওজ লখ্‌নৌর পুনরধিকার করেন এবং পরিত্যক্ত হাতী ঘোড়া ও অন্যান্য সম্পদ হস্তগত করেন। ইওজ লখনৌরে নিজ আমীর নিযুক্ত করিয়া ঐ অঞ্চল স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজের বিবরণ হইতে জানা যায় যে ইওজ খলজী মুসলিম রাজ্যসীমা দক্ষিণ দিকে অজয় নদ হইতে দামোদর নদ ও বিষ্ণুপুরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ আরোও বলিয়াছেন যে উড়িষ্যার রাজা ইওজ খলজীকে কর প্রদান করিয়াছিলেন। মনে হয় মুসলিম সেনাদলের দামোদর পর্যন্ত অগ্রগতীর ফলে তৃতীয় অনঙ্গভীমের অধীনস্থ সামন্ত বিষ্ণু ইওজকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মিন্‌হাজ ইওজ কর্তৃক ত্রিহুত (মিথিলা বা উত্তর বিহার) হইতে কর আদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোন সূত্রে ইওজের ত্রিহুত অভিযানের উল্লেখ নাই। তবে ত্রিহুতের ভৌগলিক অবস্থান ও সমসাময়িককালে আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে ইওজের সাফল্য খুব অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। ত্রিহুত পশ্চিমে দিল্লীর মুসলিম সাম্রাজ্য ও পূর্বে লখনৌতির মুসলিম রাজ্য—উভয়দিকে মুসলমান শত্রু দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কর্ণাটরাজ অরিমল্লদেবের মৃত্যুর পর ত্রিহুতে অন্তর্বিরোধও লাগিয়াছিল। এমতাবস্থায় ত্রিহুতের পূর্বাংশে অবস্থিত সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহাই খুব স্বাভাবিক। সুতরাং তাঁহার অভিযান ত্রিহুতরাজ হইতে কর আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল, এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

মিন্‌হাজের মতে কামরূপও সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজীকে কর প্রদান করিয়াছিল। করতোয়া নদীর পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্যে

অনেকগুলি সামন্তরাজার অস্তিত্ব ছিল এবং তাহারা সকলেই বারভূঁয়া রূপে পরিচিত ছিল। তাহাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ লাগিয়াই ছিল। ইওজ হয়তো তাহাদের মধ্যে কোন কোন সামন্তরাজাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন এবং কর আদায় করেন।

ইওজ কর্তৃক বঙ্গ (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) হইতে কর আদায় ও খুব অসম্ভব নয়। ইওজ নৌবাহিনী গঠন করিয়া ঐ অঞ্চলে অভিযান চালাইবেন এমন অনুমান করাই স্বাভাবিক। ১২২৬—২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আমাদের অনুমানের স্বপক্ষে পরোক্ষ প্রমাণ আছে। হবি মিশ্রের কুলজী গ্রন্থ কারিকায় জানা যায় যে লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশব সেন 'যবনরাজার' ভয়ে সর্বদা আতঙ্কিত ছিলেন এবং তিনি গৌড়দেশ পরিত্যাগ করেন। তখন বিশ্বরূপ সেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার সময়ে ইওজ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা আক্রমণ করিয়া কর আদায় করিতে সক্ষম হইলেও হইতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বোঝা যায় যে বখ্‌তিয়ারের পর গিয়াস-উদ্দীন ইওজই প্রথম রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সকল দিকেই তিনি অভিযান চালান। দক্ষিণে লখ্‌নৌর পুনরধিকার ও দামোদর পর্যন্ত সীমান্ত বর্ধিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য দিকে অভিযান চালাইয়া কোন অঞ্চল রাজ্যভুক্ত না করিয়া থাকিলেও স্বীয় শৌর্য ও বীর্য প্রদর্শন করিয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্য সমূহ হইতে কর আদায়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। লখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে বাংলার মুসলিম রাজ্যে পরিণত করিবার স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন। দিল্লীর সুলতান ইলতুত্‌মিশ তাঁহাকে বাধা দান না করিলে হয়তো তাঁহার স্বপ্ন সফল হইত।

দিল্লীর সুলতান ইলতুত্‌মিশ গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজীর অধীনে লখ্‌নৌতির মুসলিম রাজ্যের প্রতিপত্তি বিস্তার কখনও ভাল চোখে দেখেন নাই। কিন্তু রাজত্বের প্রারম্ভে অন্যান্য আশু বিপদ ও সমস্যার সমাধান করিবার পূর্বে বাংলার দিকে তিনি নজর দিতে পারেন নাই। অন্যদিকে লখনৌতির খলজী আমীরেরা মনে করিত বাংলার মুসলিম রাজ্য তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চল, সুতরাং শাসন করিবার ন্যায় সঙ্গত অধিকার তাঁহাদের রহিয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে বখ্‌তিয়ারোত্তর কালে অন্তর্বিরোধের সুযোগে সুলতান কুতব্‌উদ্দীন আইবক বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু আইবকের মৃত্যুর পর আলী মর্দান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা দিল্লীর আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী আলী মর্দানের নিকট হইতে এই স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতারই অধিকারী হইয়াছিলেন। অনেকে ইলতুতমিশের নামাঙ্কিত মুদ্রা বাংলাদেশে প্রাপ্তির উপর নির্ভর করিয়া মত পোষণ করিয়াছেন যে ইওজ তাহার রাজত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে ইলতুতমিশের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং পরে ধীরে ধীরে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিলেন। এই মতবাদ এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। ইওজের মুদ্রা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রথম হইতেই তিনি স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং মুদ্রায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপাধি তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতারই পরিচয় দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বাংলার মুসলমান শাসকদের মধ্যে সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজই প্রথম সুলতান যাঁহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মুদ্রায় বাগদাদের খলিফার নাম অঙ্কন এবং 'নাসির আমীরুল মোমেনিন' ও 'কাসিম আমীরুল মোমেনিন' উপাধির ব্যবহার হইতে আবার অনেকে মনে করিয়াছেন যে গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী নিজ সার্বভৌম ক্ষমতা দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে সনদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুদ্রা বিশ্লেষণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সূত্র পর্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে তাঁহার সনদ প্রাপ্তির পক্ষে তেমন কোন প্রমাণ নাই। বরংচ বলা যাইতে পারে যে সুলতান গিয়াস-উদ্দীন ইওজ গজনীর ঘোরী সুলতানদের মুদ্রার অনুকরণে আব্বাসীয় খলিফার সনদ না পাইয়াও খলিফার নাম অঙ্কন করিয়া মুদ্রা প্রচলন করিয়া-ছিলেন। সমসাময়িক দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশ ও খলিফার নিকট হইতে সনদ প্রাপ্তির পূর্বেই খলিফার নাম মুদ্রায় ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। হয়তো রাজনৈতিক কারণেই ইওজ মুদ্রায় খলিফার নাম ও সংশ্লিষ্ট উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে দিল্লীর সুলতান তাঁহার স্বাধীনতাকে সুনজরে দেখিবেন না। তাই অন্ততঃ বাহ্যিক ভাবে নিজের ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব প্রদর্শনই হয়তো তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

সুলতান ইল্‌তুত্‌মিশের প্রাথমিক বিপদ সমূহ কাটাইয়া উঠিতে বেশ কিছুদিন সময় লাগিয়াছিল। তারপর আসন্ন মোঙ্গল আক্রমনের আশঙ্কা কাটিতেও সময় লাগিয়াছিল। তাই ১২২৪ খৃষ্টাব্দের পর ইলতুতমিশ

পূর্বদিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ পাইলেন। আনুমানিক ১২২৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইলতুত্‌মিশ ইওজের বিরুদ্ধে প্রথমে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন এবং পরে বিপুল সৈন্যবাহিনীসহ নিজে বিহার ও বাংলা জয়ের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। ইওজ খলজী সৈন্যবাহিনী ও রণতরী লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং তেলিয়াগড় গিরিপথের নিকট বাধা প্রদান করেন। যুদ্ধের ফলাফল সঠিকভাবে জানা যায় না। মিন্‌হাজ শুধু উল্লেখ করিয়াছেন যে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়, যাহার ফলে ইওজ ইলতুত্‌মিশকে ৮০ লক্ষ টাকার সম্পদ এবং ৩৮টি হাতী দিতে স্বীকৃত হন; ইওজ ইলতুত্‌মিশের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ইলতুত্‌মিশের নামে খুত্‌বা পাঠ ও মুদ্রা জারী করিতে রাজী হন। মালিক আলাউদ্দীন জানীকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া ইলতুত্‌মিশ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ইলতুত্‌মিশের প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই ইওজ বিহার হইতে মালিক আলাউদ্দীন জানীকে তাড়াইয়া দিয়া নিজ অধিকার পুনর্বিস্তার করেন। তিনি সন্ধির অন্যান্য শর্তও মানিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

ইওজ লখনৌতিতে ফিরিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইলতুতমিশ আবার আক্রমণ করিবেন। তিনি প্রায় এক বৎসরকাল প্রস্তুতি নিয়া রাজ-ধানীতে অবস্থান করেন এবং পাল্টা আক্রমনের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। ইতিমধ্যে অযোধ্যায় হিন্দুদের বিদ্রোহের ফলে এক ঘোরতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ইলতুত্‌মিশ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদকে বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ অযোধ্যার গোলযোগ থামাইবার জন্য পাঠান। ইওজ মনে করিলেন যে অযোধ্যায় ব্যাতিব্যস্ত দিল্লী বাহিনীর পক্ষে ঐ সময় বাংলাদেশ আক্রমন করা সম্ভব হইবে না। তাই তিনি এই অবসরে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিবার মনস্থ করেন। কথিত আছে যে ইওজ লখনৌতির প্রাথমিক প্রতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত সৈন্য না রাখিয়া তাঁহার বিশাল বাহিনী সহ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেন। ইলতুত্‌মিশ যুবরাজ নাসিরউদ্দীনকে অযোধ্যার বিদ্রোহ দমনের পর বাংলা আক্রমনের আদেশ দিয়াছিলেন। ইওজের দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থান কালে নাসিরউদ্দীন মাহমুদ লখনৌতি আক্রমণ করেন। খবর পাইয়া ইওজ লখনৌতি অভিমুখে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু পৌঁছিবার পূর্বেই রাজধানী শত্রু কবলিত হইয়া পড়ে। ইওজ শত্রু সৈন্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে আমীর ওমরাহসহ ইওজ বন্দী হইলেন। পরে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়।

এইভাবে ইওজের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং বাংলার মুসলিম রাজ্য আবার দিল্লীর অধীনে চলিয়া যায়। এই কথা বলিলে বোধহয় ভুল হইবে না যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা আক্রমণকালে রাজধানী প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না রাখিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতি না নিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ইওজ খুব একটা সমর কৌশলের পরিচয় দেন নাই।

গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী প্রজা হিতৈষী নরপতি ছিলেন। মিনহাজ বলিয়াছেন যে ইওজ আলেম, সৈয়দ ও সুফীদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাহাদের ভরণ পোষণের জন্য বৃত্তি ও জায়গীরের ব্যবস্থা করিতেন। মিনহাজ নিজে যখন বাংলায় আসিয়াছিলেন তখন তিনি ইওজ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ দেখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ইওজের কোন স্থাপত্য কীর্তির চিহ্নমাত্র নাই। মিনহাজ এই কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে সুলতান ইলতুত্‌মিশ প্রকাশ্যে বলিতেন যে ইওজের মত প্রজানুরঞ্জক সুলতানকে সম্মান না করিয়া পারা যায় না। মিনহাজ গিয়াসউদ্দীনকে প্রিয়দর্শন, প্রিয়বাক ও প্রিয়ব্যবহারী বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মামলুক সুলতানদের রাজ-ইতিহাস লেখক হইয়া মিনহাজ প্রতিদ্বন্দ্বী গিয়াসউদ্দীনের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, ইহা গিয়াস-উদ্দীনের চারিত্রিক গুণাবলীরই নিঃসন্দেহ প্রমাণ।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় বুদ্ধি, সাহস ও কূটনীতিজ্ঞানের সাহায্যে লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাহা হইতে বোঝা যায় যে তিনি সুশাসক ছিলেন। নৌবাহিনী গঠন তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। বাংলার শিশু মুসলিম রাজ্যে অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটাইয়া ও ইহার সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া তিনি রাজ্যসীমা বিস্তারেও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার শাসনকাল বাংলাদেশে মুসলিম রাজ্যের জন্য অবশ্যই মঙ্গলকর হইয়াছিল। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী বাংলার খলজী মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তিনিই বাংলাদেশে মুসলিম রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে তুর্কী শাসন ও বলবনের বাংলা অভিযান

১২২৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজীর পরাজয় ও মৃত্যুর পর বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্য দিল্লীর মুসলিম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের মৃত্যু পর্যন্ত মোটামুটিভাবে লখ্নৌতি দিল্লীর অধীনেই ছিল। বাংলার মুসলিম রাজ্যের জন্য এই ষাট বৎসরের (১২২৭—১২৮৭) ইতিহাস তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়কার ইতিহাসে বিশেষ কয়েকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। ইলতুত্মিশের পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে বাংলায় মুসলমান শাসনকর্তাদের মধ্যে বারংবার বিদ্রোহী হইবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিল্লী কর্তৃক প্রেরিত লখ্নৌতির শাসনকর্তা হয় প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে বা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে এই ধরণের স্বাধীনতা ঘোষণাকারী শাসনকর্তাগণ বেশ কিছুদিন বিনা বাধায় শাসন করিবার সুযোগ পাইতেন। সময়ে সময়ে দিল্লীর সুলতান প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় বিদ্রোহীভাবের আবির্ভাব বন্ধ করিতে পারেন নাই। এই সময়ের ইতিহাসে আরেকটি সাধারণ ধারা লক্ষ্য করা যায় যে, পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের শাসনকর্তাগণ লখ্নৌতির শাসনকর্তা হওয়াকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করিতেন। দিল্লী হইতে লখ্নৌতির দূরত্ব ও লখ্নৌতির ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিত বলিয়া মনে হয়। ফলে দেখা যায় যে পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের শাসনকর্তাগণ সুযোগ পাইলেই লখ্নৌতি অধিকার করিয়া লইতেন এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। এমনকি অনেক শাসনকর্তা 'মালিক-উশ-শারক্' বা প্রাচ্যের মালিক উপাধি গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

এই সময়কার ইতিহাসের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের ফলে বাংলার মুসলিম রাজ্যে তেমন কোন অগ্রগতিই এই সময়ে লক্ষ্য করা যায় না। নিজেদের ক্ষমতাদ্বন্দ্ব লইয়াই অধিকাংশ শাসনকর্তা ব্যস্ত ছিলেন। তবে তাহাদের

মধ্যে কেহ কেহ সাহসী ও সমরবিদ ছিলেন এবং তাঁহারা রাজ্যসীমা সম্প্রসারণের দিকে মনোযোগী হইয়া কিছু সাফল্যও অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু আবার তাহাদের দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধের সুযোগ পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজাগণও সময়ে সময়ে সদ্ব্যবহার করিয়াছে এবং ফলে বাংলার মুসলিম রাজ্য বিপর্যস্থ হইয়া পড়িয়াছে।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতাই এই অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন দিল্লীতে শাসনভার গ্রহণ করিবার পব তাঁহার প্রচেষ্টায ও সুষ্ঠ নীতিব ফলে দিল্লীর শাসনের শৌর্যবীর্য ফিরিয়া আসে। বলবন বাংলাব বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে পদানত করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা আক্রমন করেন এবং নিজ অধিকার বিস্তারে সক্ষম হন। ১২৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ পুত্র বুখরা খানকে বাংলায় শাসনকর্তা নিযুক্ত কবিয়া ফিরিয়া যান। বাংলার শাসনকর্তাদের মধ্যে অন্তর্বিবোধ ও স্বাধীনতা প্রবণতার অবসান ঘটে। ইলতুত্‌মিশোত্তর কালের অরাজকতাব অবসান হয় এবং বাংলায় বলবনী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বলবনী শাসকদের অধীনে বাংলার মুসলিম রাজ্য প্রভূত উন্নতি লাভ কবিযাছিল এবং সেই কাবণেই বলবনের বাংলা আক্রমণ ও বিজয়কে বাংলাব ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে গণ্য করা হয়।

১২২৭ হইতে ১২৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মোট পনরজন শাসনকর্তা বাংলার মুসলিম রাজ্য শাসন করেন। তাঁহাদের মধ্যে দশজন ছিলেন মমলুক বা দাস। তাঁহারা প্রথম জীবনে দিল্লীব সুলতানদিগেব দাস ছিলেন এবং নিজ নিজ প্রতিভা ও সমরনিপুনতা প্রদর্শন কবিয়া উচ্চপদ লাভ করেন। এই জন্য বাংলার ইতিহাসেব এই যুগকে মমলুক (দাস) শাসনামল বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। কিন্তু শাসনকর্তাদের মধ্যে সকলে মমলুক ছিলেন না। তাহা ছাড়া এই সময বাংলা মোটামুটিভাবে দিল্লীর শাসনাধীন ছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং এই সময়ে দিল্লীব সুলতানদের মধ্যে বলবন ছাড়া অন্য কেহ মমলুক ছিলেন না। তাঁহারা সকলেই তুর্কী ছিলেন। সুতরাং এই আমলকে তুর্কী শাসনামল বলিযা আখ্যায়িত করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

১২২৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজের মৃত্যুর পর বাংলা দিল্লীর অধীনে চলিয়া যায় এবং সুলতান ইলতুত্‌মিশের পুত্র যুবরাজ নাসির-উদ্দীন মাহমুদ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে নাসিরউদ্দীনকে

অযোধ্যার শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করিয়া পাঠান হইয়াছিল। ফলে তিনি অযোধ্যা হইতে লখ্নৌতি পর্যন্ত এলাকার শাসনকর্তা হন। ইলতুত্মিশ নাসিরউদ্দীন্ মাহমুদকে 'মালিক-উশ-শরক্' উপাধি দানে সম্মানিত করেন। ১২২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে নাসিরউদ্দীনের মৃত্যু হয়। সুলতান ইলতুত্মিশ তাঁহাকে খুব বেশী ভালবাসিতেন। তিনি নাসিরউদ্দীনের মৃতদেহ দিল্লীতে আনয়ন করিয়া সমাহিত করেন এবং এক সমাধিসৌধ তৈয়ার করান। এই সমাধি সৌধ 'সুলতান গরহীর' সমাধি নামে প্রসিদ্ধ এবং এইটি মুসলিম স্থাপত্যের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর লখ্নৌতিতে গোলযোগ দেখা দেয়। মিনহাজ উল্লেখ করিয়াছেন যে লখ্নৌতিতে মালিক বল্কা খলজী (ইখ্তিয়ার-উদ্দীন বল্কা খলজী) বিদ্রোহ করেন এবং ১২২৯—৩০ খৃষ্টাব্দে ইলতুত্মিশ লখ্নৌতি আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন। ৬২৭ হিজরীতে (১২২৯—৩০ খৃঃ) দওলত শাহ বিন মওদুদ কর্তৃক জারীকৃত একটি রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় আমরা ঐ সময়ে লখ্নৌতিতে দওলত শাহ নামে অন্য এক শাসনকর্তার নাম পাই। এই মুদ্রাটিতে দওলত শাহ 'আল-সুলতান-উল-আদিল শাহিন শাহ উল-বাজিল' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন এবং মুদ্রাটির অপর পৃষ্ঠে আব্বাসীয় খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহ ও দিল্লীর সুলতান শামসউদ্দীন ইলতুত্মিশের নাম অঙ্কিত আছে। দওলত শাহের অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর মিন্হাজের বর্ণনায় বল্কা খালজীর উল্লেখ থাকায় অনেকে মনে করেন যে দওলত শাহ ও বল্কা খলজী এক ও অভিন্ন। অনেকে আবার বল্কা খলজীকে পূর্ববর্তী সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজীর সহকর্মী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই প্রকারের অনুমানের পক্ষে তেমন কোন যুক্তি নাই। এই কথা ঠিক বোঝা যায় না যে যদি বল্কা ও দওলত শাহ একই ব্যক্তি হয় তাহা হইলে বল্কা খলজী কেন দওলত শাহ নামে মুদ্রা প্রচলন করিবে। কিংবা দওলত শাহর মুদ্রায় ইলতুত্মিশের নাম থাকায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে ইলতুত্মিশের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। সেই কারণে ইলতুত্মিশ কেন তাঁহাকে পদানত করিতে লখনৌতি আক্রমণ করিবেন; তাহাও ঠিক বোঝা যায় না। এই কারণে বল্কা খলজী ও দওলত শাহকে ভিন্ন ব্যক্তি মনে করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে নাসিরউদ্দীনের আকস্মিক মৃত্যুর পর অরাজকতা দেখা

দেয়। নাসিরউদ্দীনের সেনাদলের মধ্য হইতে দওলত শাহ নামে একজন নূতন শাসনকর্তা নিযুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতা অধিকার করেন এবং ইলতুত্‌মিশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া মুদ্রা জারী করেন। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন বল্‌কা খলজী সম্ভবত সৈন্যদলের অন্য এক উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তি ছিলেন, যিনি দওলত শাহ কর্তৃক ক্ষমতা দখলকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ইলতুত্‌মিশ তাহাকে পদানত করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। দওলত শাহ ও বলকা খলজী উভয়েরই শাসন স্বল্পকালীন ছিল। ইলতুত্‌মিশ মালিক আলাউদ্দীন জানীকে পরবর্তী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

মালিক আলাউদ্দীন জানী তুর্কীস্তানের শাহজাদা ছিলেন। এক বৎসরের কিছু বেশী সময় তিনি লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহাকে লখনৌতি হইতে সরাইয়া তাঁহার স্থলে সাইফউদ্দীন ⁻ ।ইবককে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তিনি ইলতুত্‌মিশের ক্রিতদাস ছিলেন এবং জাতিতে তুর্কী ছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বঙ্গ (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) আক্রমন করিয়া অনেক হাতী হস্তগত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে ইলতুত্‌মিশের মৃত্যু হয়। এই সময়ে বাংলাদেশে সাইফউদ্দীন আইবকেরও মৃত্যু হয়। রিযাজ উস-সালাতীন গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

সাইফউদ্দীনের মৃত্যুর পর আওর খান আইবক নামে একজন তুর্কী লখনৌতিতে ক্ষমতা দখল করেন। ইলতুত্‌মিশের মৃত্যুর পর দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সেই সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে থাকে এবং তাহাদিগকে বাধা দিবার মত শক্তি বা সামর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল না। আওর খান খুব সম্ভবত দিল্লীর অনুমতি ব্যতীতই ক্ষমতা হস্তগত করেন। পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বিহারের শাসনকর্তা তুঘরল তুঘান খান এই সময়ে ক্ষমতা বিস্তারে সচেষ্ট হন। তিনি আওর খানকে আক্রমণ করেন এবং লখনৌতি অধিকার করিয়া বিহার ও লখনৌতির শাসনকর্তা হইয়া বসেন।

- তুঘরল তুঘান কারা-খিতাই তুর্কী ছিলেন এবং প্রথম জীবনে ইলতুত্‌মিশের ক্রীতদাস ছিলেন। ১২৩২—৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বদায়ুনের শাসন-

কর্তা ও পরে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১২৩৬ হইতে ১২৪৫ পর্যন্ত প্রায় নয় বৎসর কাল তিনি লখনৌতি শাসন করেন। বল-পূর্বক লখনৌতি অধিকার করিয়া তিনি সুলতানা রাজিয়াকে বহুমূল্যের উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার ক্ষমতা আইনসঙ্গত করেন। পরবর্তী দিল্লীর সুলতানদের প্রতিও তিনি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শন করিলেও তিনি দিল্লীর সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে অবস্থিত অঞ্চলসমূহ, যেমন, অযোধ্যা, কারা-মানিকপুর ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল, অধিকার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তুঘান খান কর্তৃক উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে তাঁহার যে রাজকীয় উপাধি পাওয়া যায় তাহা হইতে তাঁহার উচ্চাকাঙ্খা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাংলার মুসলিম রাজ্যের পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্যসমূহ আক্রমন না করিয়া তুঘরল তুঘান ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে নৌবাহিনী ও সৈন্য সামন্তসহ পশ্চিম দিকে গঙ্গা তীর ধরিয়া অগ্রসর হন এবং কারা সীমান্ত পর্যন্ত পেঁৗছেন। সেখান হইতে তিনি দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ শাহের নিকট উপহার পাঠান। দুর্বল সুলতানও তাঁহাকে উপহার পাঠাইয়া সম্মানিত করেন। এই সময়ে ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-উস-সিরাজ তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং মিন্‌হাজকে সঙ্গে করিয়া তুঘান লখনৌতিতে ফিরিয়া আসেন।

তুঘান খানেব কারা পর্যন্ত এই অভিযানের সঠিক উদ্দেশ্য নিরূপণ করা যায় না। তিনি প্রায সমস্ত সৈন্যবাহিনী লইযাই এই অভিযান করেন। তাঁহাব অনুপস্থিতিব সুযোগ পার্শ্ববর্তী হিন্দুবাজাগণ পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিযাছিল। উড়িষ্যাব সমসাময়িক রাজা তৃতীয অনঙ্গ ভীমের পুত্র প্রথম নরসিংহদেব অত্যন্ত পবাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি বাংলার মুসলিম রাজ্য আক্রমণ কবিযা সীমান্তবর্তী শহর লখ্‌নৌতিব অধিকার করেন এবং আরও উত্তব দিকে অগ্রসব হইতে থাকেন। তুঘান ফিরিয়া আসিয়া উড়িষ্যা বাহিনীব অগ্রগতি বোধ করেন। মিন্‌হাজ নিজে এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে তুঘান সাফল্য লাভ করেন এবং শত্রুসৈন্যদিগকে হটাইয়া বাঁকুড়া জেলার কাটাসিন দুর্গ পর্যন্ত নিয়া যাইতে সক্ষম হন। প্রাথমিক সাফল্যে উল্লাসিক হইয়া মুসলিম সৈন্যদল কাটাসিন অবরোধ করিয়া শত্রুসৈন্যদলকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া বিজয় উল্লাসে মাতিয়া উঠে। কিন্তু উড়িষ্যার সৈন্যবাহিনীর পাল্টা আক্রমনে মুসলিম সৈন্যবাহিনী পশ্চাতপদ হইতে বাধ্য হয়।

প্রকৃতপক্ষে নিপুণ সমরনীতি অনুসরণ করিয়া উড়িষ্যা বাহিনী পশ্চাদ্‌গামী হইয়া মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে নিজেদের সীমান্তে নিয়া যাইয়া পাল্টা আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত করিয়া তোলে। লখ্‌নৌর সহ সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়। তুঘান লখনৌতিতে ফিরিয়া আসেন। তিনি দিল্লীর সুলতানের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ কারা-মানিকপুরের শাসনকর্তা মালিক কারাকাশ খান ও অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তমর খানকে তুঘান খানের সাহায্যে যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে উড়িষ্যারাজ উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া ১২৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে লখনৌতি আক্রমণ করেন। দিল্লীর বাহিনীর আগমনের সংবাদ পাইয়া উড়িষ্যা বাহিনী অবরোধ ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাদনুসরণ করে। মালিক তমর খান সুযোগ পাইয়া লখনৌতি অবরোধ করিয়া তুঘান খানের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকেন। তুঘান পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ঐতিহাসিক মিন্‌হাজের মধ্যস্থতায় তুঘান লখনৌতি ছাড়িয়া দিল্লীতে চলিয়া যাইবার অনুমতি পাইলেন। তমর খান লখ্‌নৌতি অধিকার করিয়া বসিলেন। ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে ইলতুতমিশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তুঘরল তুঘান খানকে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অল্পদিন পরে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি অযোধ্যায় মারা যান। ভাগ্যের কি পরিহাস যে ঐ একই দিনে লখ্‌নৌতিতে প্রায় দুই বৎসরকাল বেআইনী শাসনের পর তমর খানেরও মৃত্যু হয়। তমর খান দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় উড়িষ্যারাজের অধিকার খর্ব করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। ঐ অঞ্চলে উড়িষ্যার শাসন বজায় ছিল বলিয়া লিপি প্রমাণ পাওয়া যায়।

তমর খানের মৃত্যুর পর মালিক জালালউদ্দীন মাসুদ জানী লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১২৪৭ হইতে ১২৫১ পর্যন্ত শাসন করেন। তাঁহার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি 'মালিক-উস-শরক্' ও 'শাহ্' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাসুদ জানীর পর অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন ইউজবককে লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা হইতে উড়িষ্যার শাসন উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হন এবং মুসলমানদের হৃত গৌরব অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করেন। উড়িষ্যার সামন্তরাজ শবণতরের রাজধানী হুগলী জেলার মন্দারণ অধিকার করিয়া ঐ পর্যন্ত

রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। এই সাফল্যের পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং রৌপ্য মুদ্রা জারী করেন। এই মুদ্রায় তিনি 'সুলতানুল আজম মুগীসউদ্দীন ইউজবক' উপাধি গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বিহার ও অযোধ্যায় ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এক বিরাট ভূখণ্ডের অধিপতি হইয়া বসেন। দিল্লীর সুলতানের ঘরোয়া গোলযোগের সুযোগে ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করিয়া তিনি কামরূপ রাজ্যের রাজধানী পর্যন্ত অধিকার করেন। কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হইবার পর কামরূপ বাহিনীর আক্রমনে বিপর্যস্ত হইয়া পড়েন এবং আত্মসমর্পণ করেন। বন্দী অবস্থায় ১২৫৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। উড়িষ্যার হাত হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা পুনরুদ্ধারই ইউজবকের প্রধান কৃতিত্ব। স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করিতে যাইয়া তিনি কামরূপে প্রাণ হারান। মাত্র দুই বৎসরকাল তাঁহার স্বাধীনতা স্থায়ী হইয়াছিল।

মুগিসউদ্দীন ইউজবকের পর বাংলার মুসলিম রাজ্য আবার দিল্লীর অধীনস্থ প্রদেশ হয় এবং শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন ইজ্জউদ্দীন বলবন-ই-ইউজবকী। ইজ্জউদ্দীন ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেন। রাজধানী হইতে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে কারা প্রদেশের শাসনকর্তা তাজউদ্দীন আরসলান খান লখনৌতি আক্রমন করিয়া অধিকার করেন। ইজ্জউদ্দীন ফিরিয়া আসিয়া পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু যুদ্ধে বন্দী হন এবং তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

এই সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ১২৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মিনহাজের তবকৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজত্বকাল (১২৬৬খৃঃ) হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফলে এই অন্তবর্তীকালের (১২৬০—১২৬৬) ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে ধারণা করা যায় যে তাজউদ্দীন আরসলান খান লখনৌতিতে স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করেন এবং ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। বিহার ও লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করেন তাতার খান। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দীন বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাতার খান বহু মূল্যবান উপহার পাঠাইয়া বলবনের স্বীকৃতি লাভ করেন। লখনৌতিতে আবার দিল্লীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু দিল্লীর এই আধিপত্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। অল্প কয়েক বৎসর পর তুঘরল দিল্লীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁহাকে দমন করিতে বলবনকে স্বয়ং বাংলাদেশ আক্রমন করিতে হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে তাতার খান বলবনের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অল্পদিন পর তাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বংশের শের খান প্রায় চার বৎসরকাল (১২৬৮—১২৭২ খৃঃ) লখনৌতি শাসন করেন এবং তিনি গিয়াসউদ্দীন বলবনের নামেই মুদ্রা প্রচলন করেন। অতঃপর বলবন আমিন খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা এবং তুঘরল খানকে সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সহকারী শাসন-কর্তা নিযুক্ত কবিবার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। বলবন খুব সম্ভবতঃ লখনৌতির শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ-প্রবণতা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি হয়তো মনে করিয়া থাকিবেন যে একজন অন্য-জনের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে বাধা দিবে এবং ঐরূপ কোন ঘটনা ঘটিলে তাড়াতাড়ি সুলতানের গোচরে আসিবে। কিন্তু বলবনের কূটনীতিজ্ঞান-প্রসূত এই ব্যবস্থাও তুঘরলের বিদ্রোহ বন্ধ করিতে পারে নাই।

যদিও আমীন খান লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মনে হয় তুঘরল খান অল্পদিনের মধ্যেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া আমীন খানকে বহিষ্কার করিতে সক্ষম হন। জিয়া-উদ্দীন বরণীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে তুঘরল খান মুসলিম রাজ্য সম্প্রসারণে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি সোনারগাঁও এর অনতিদূরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করেন। বরণী এই দুর্গকে 'তুঘরলের কিল্লা' বা 'নারকিল্লা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নারকিল্লাকে ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ফিরিঙ্গীদের 'লরিকল' এর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়। সুতরাং মনে হয় তুঘরল প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা আক্রমন করিয়া সোনারগাঁও এর নিকটবর্তী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

তুঘরল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমন করেন এবং বিপুল ধন সম্পদ হস্তগত করেন। রাজ্য বিস্তারে সাফল্য ও ধনসম্পদ হস্তগত করিবার ফলে তুঘরলের মনে স্বাধীন হইবার বাসনা জাগে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ দিল্লীতে প্রেরণ না করায় তুঘরলের বাসনা প্রকাশ পায়। খুব সম্ভব এই সময়েই আমীন খানের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয় এবং যুদ্ধে আমীন খান পরাজিত হন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে মোঙ্গলেরা পাঞ্জাব সীমান্তে প্রায় প্রতি বৎসরই আক্রমণ চালায়। তাই বলবন মোঙ্গল আক্রমন প্রতিহত করিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সীমান্ত রক্ষাকার্য পরিদর্শন করিতে তিনি তাঁহার রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে লাহোরে গমন করেন এবং সেখানে প্রায় দুই বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছিতে তাঁহার মৃত্যুতে পরিণত হইল। বলবনের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া তুঘরল প্রকাশ্য বিদ্রোহের উপযুক্ত সময় মনে করিয়া সুলতান মুগীসউদ্দীন নাম ধারণ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

তুঘরলের বিদ্রোহ সম্পর্কে জিয়াউদ্দীন বরণীর উক্তি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বরণী তাঁহার 'তারীখ-ই-ফীরূজ' শাহী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে বাংলাদেশ স্বভাবতই বিদ্রোহী প্রদেশ রূপে গণ্য হইত এবং দিল্লীর লোকেরা বাংলা-দেশকে 'বলগাকপুর' (বিদ্রোহীর নগরী) নাম দিয়াছিল। বরণী বিগত ইতিহাস লক্ষ্য করিয়াই যে এই উক্তি করিয়াছেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে দিল্লী হইতে বাংলার দূরত্বের ফলে দিল্লীর সরকার লখনৌতির উপর নজর রাখিতে পারিত না। কিংবা বিদ্রোহ হইলে তাড়াতাড়ি বাংলাদেশে আসাও সম্ভব ছিল না। আবার আসিয়া বিদ্রোহ দমন করাও সহজ ছিল না। বরণী আরোও বলিয়াছেন যে বাংলাদেশের আবহাওয়াও বিদ্রোহের সহায়ক ছিল। এইখানে শাসকেরা স্বভাবতই বিদ্রোহী হইত। যদি কোন শাসক বিদ্রোহী না হইত তাহা হইলে অন্যেরা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। সুতরাং শাসকগণ বাধ্য হইয়াই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। শেষোক্ত ক্ষেত্রে হয়তো বরণী বাংলার প্রাচুর্যের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন।

রোগমুক্তির পর সুলতান বলবন তুঘরলকে আনুগত্য স্বীকারের শেষ সুযোগ দেন। তিনি তাঁহার রোগমুক্তির জন্য শুক্রিয়া আদায় করিয়া উৎসব করিতে তুঘরলকে আদেশ দেন। কিন্তু তুঘরলের আনুগত্য স্বীকার করিবার কোনরূপ ইচ্ছাই ছিল না। তাই তুঘরল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিহারের দিকে অগ্রসর হইয়া দিল্লী বাহিনীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

জিয়াউদ্দীন বরণী উল্লেখ করিয়াছেন যে তুঘরল বিপুল ধনসম্পদ তাহার সৈন্যবাহিনী ও লখনৌতির জনগণের মধ্যে বিলাইয়া দেন এবং ফলে তাহাদের সমর্থন লাভ করেন। বরণীর বিবরণে বলবনের লখনৌতি

অভিযানের কাহিনী অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মুগীসউদ্দীনের বিপুল সমর্থন ছিল এবং দুই দুইবার দিল্লী বাহিনীকে পরাজিত করিবার মতো শক্তি তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ কানুনগোর অভিমত যে 'গিয়াসউদ্দীন বলবন শুধু একজন বিদ্রোহী তুঘরলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেন নাই, সারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল' যথার্থ বলিয়াই মনে হয়।

তুঘরল কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা শুনিয়া বলবন অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়েন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তুঘরলকে শাস্তি দিতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তুরমতীর অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তমর খান ও মালিক তাজ-উদ্দীনকে তুরমতীর সাহায্যার্থে পাঠান হয়। দিল্লীর বাহিনী সরযু নদী অতিক্রম করিয়া ত্রিহুতের মধ্য দিয়া লখনৌতির দিকে অগ্রসর হয়। সীমান্তে তুঘরল বাধা দান করেন তুঘরল ধনরত্নের বিনিময়ে বিপক্ষ দলের অনেক সেনা নায়ককে নিজ দলভুক্ত করিতে সক্ষম হন। ফলে যখন যুদ্ধ শুরু হইল তখন দিল্লী বাহিনী পরাজিত হইল। মালিক তুরমতি অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে বলবনের আদেশে তাহাকে হত্যা করা হয়। বলবন দ্বিতীয় এক অভিযান প্রেরণ করেন। সেনাপতির নাম কোন সূত্রে পাওয়া যায় শিহাবউদ্দীন, আবার কোন সূত্রে তাহার নাম বাহাদুর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অভিযানের ফলও পূর্বের অভিযানের মতোই হইল। দুই দুইবার দিল্লীর সৈন্য বাহিনীর পরাজয়ে বলবন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং নিজেই যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত করিলেন।

বলবন নতুন করিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি বিরাট এক সৈন্য বাহিনী ও নৌবাহিনী সঙ্গে নিয়া ১২৮০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে লখনৌতি অভিমুখে যাত্রা করেন। তাহার দ্বিতীয় পুত্র বুখরা খানকেও তিনি সঙ্গে নিলেন। আনুমানিক প্রায় তিন লক্ষ সৈন্য বলবনের বাহিনীতে ছিল। ইতিপূর্বে কোন মুসলমান সুলতানই এত বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া রাজ্য জয়ে বাহির হন নাই। বলবন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি তুঘরলকে ধ্বংস না করিয়া দিল্লীতে ফিরিবেন না। বিশাল সেনা ও নৌ বাহিনী সংগ্রহ এবং বলবনের সঙ্কল্প ইহাই প্রমাণ করে যে বাংলায় মুগীসউদ্দীন তঘরল বিশাল শক্তিশালী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দমন

করিবার জন্য বলবন অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া নিজেই যুদ্ধ পরিচালনার ভার নিয়াছিলেন।

সরযু নদীর তীরে অবস্থান করিয়া তুঘরল বলবনের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির উপরি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। সীমান্তে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সমীচিন হইবে না মনে করিয়া তুঘরল লখনৌতিতে ফিরিয়া আসেন। বলবনের সৈন্যবাহিনী লখনৌতির নিকটবর্তী হইলে তিনি লখনৌতি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। ঐতিহাসিক বরণীর বিবরণ হইতে মনে হয় যে তুঘরল জাজনগরের (উড়িষ্যা) দিকে গিয়াছিলেন এবং কিছুদূরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব ইওজ খলজী নির্মিত লখনৌতি —লখ্‌নৌর সড়ক ধরিয়া তুঘরল লখ্‌নৌরের কাছাকাছি কোন স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। বলবন লখনৌতি দখল করিয়া বরণীর মাতামহ হিসামউদ্দীনকে শাসনভার দেন এবং নিজে তুঘরলের পশ্চাদ্‌ধাবন করেন। তুঘরল এইবার সোনারগাঁও এর নিকটস্থ নারকিলা দুর্গে গমন করেন। বলবন এই সংবাদ পাইয়া পূর্ব বাংলার দিকে অগ্রসর হন। তিনি দক্ষিণ-পূব বাংলার হিন্দু রাজা দনুজ রায়ের সহিত এক সন্ধি করেন। উভয়েই বোধহয় নিজ নিজ প্রয়োজনেই এই সন্ধিতে রাজী হন। কারণ বলবনের জন্য রায় দনুজের সাহায্য প্রয়োজন ছিল এবং রায় দনুজও নিশ্চয়ই বলবনের আক্রমনের কথা স্মরণ করিয়া সন্ধিতে রাজী হইয়াছিলেন। সন্ধির শর্তানুসারে নদীপথে যাহাতে তুঘরল পলায়ন করিতে না পারে তাহার ভার লইলেন রায় দনুজ। কারণ নারকিলা হইতে নদীপথে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলিয়া যাইবার যথেষ্ট সুবিধা তুঘরলের ছিল। সেই পথ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই বলবনেব এই সন্ধি।

খুব সম্ভব এই সন্ধির কথা জানিতে পাবিয়াই তুঘরল অগোচরে নারকিলা দুর্গ ত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ ও সৈন্য বাহিনী সহ উড়িষ্যার পথে অগ্রসর হন। খবর পাইয়া বলবনও ক্ষিপ্রগতিতে তাহার পশ্চাদ্‌ধাবন করেন।

এইবাব তুঘরলকে তাড়া করিবার সময় বলবন এক কৌশল অবলম্বন কবেন। মূল বাহিনী লইয়া দ্রুতগতিতে পশ্চাদ্‌ধাবন সম্ভব নয়। তাই তিনি মালিক বারবক বেকতুরছের নেতৃত্বে এক অগ্রগামী ছোট সৈন্যদল তুঘবলের পিছু লইতে আদেশ দেন। বেকতুরছের সৈন্যদল কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইয়া তুঘরলের অবস্থানের খোঁজ কবিতে লাগিল। এমনই

এক খণ্ডবাহিনীর অধিপতি মালিক শের আন্দাজ এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তুঘরলের অবস্থান সম্বন্ধে খোঁজ পায়। মালিক শের আন্দাজ অসীম সাহসের পরিচয় দিয়া তাহার ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়াই তুঘরলের শিবিরে হানা দেন। সেই সময় তুঘরলের সৈন্যবাহিনী অবসরের সময় অসংযত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। শের আন্দাজের আক্রমণের ফলে তাহারা মনে করে যে বলবনের মূলবাহিনী তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এইভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা পলাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তুঘরলও নদী সাঁতরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তীরবিদ্ধ হন এবং একজন সৈন্য তাহার মাথা কাটিয়া ফেলে।

বলবন বিজয়ী বেশে লখনৌতিতে প্রবেশ করেন। তুঘরলের পক্ষ সমর্থনকারী সকলকে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়। জিয়াউদ্দীন বরণীর বিবরণে দেখা যায় যে লখনৌতির এক ক্রোশ দীর্ঘ বাজারে গণফাঁসির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে যাহাতে জনগণ বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হইতে সাহস না করে সেইজন্য বলবন লখনৌতিতে এক ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বলবন তাহার কনিষ্ঠ পুত্র বুখরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। লখনৌতি ত্যাগ করিবার পূর্বে বলবন বুখরা খানকে শাসন ব্যাপারে নানান উপদেশ দিয়া যান এবং বিশেষ করিয়া বাংলায় মুসলিম রাজ্যবিস্তারে সচেষ্ট হইতে নির্দেশ দেন। বলবনের এই নির্দেশ কার্যে পরিণত করিতে বুখরা খান চেষ্টা না করিলেও পরবর্তী যুগে ইহার প্রতি যে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বরণীর বিবরণ হইতে মনে হয় যে বলবনের লখনৌতি অভিযানে সর্বমোট তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

প্রত্যক্ষভাবে বলবনের অভিযানের কোন সুফল পরিলক্ষিত না হইলেও পরোক্ষভাবে এই অভিযান বাংলাদেশের ইতিহাসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটাইয়া কিছুকালের জন্য বাংলার মুসলিম রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার যুগের সূচনা করিয়া সারা বাংলাদেশে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পথ বলবনের বিজয় নিশ্চয়ই সুগম করিয়াছিল। বলবনের বিজয়োত্তর কালেই উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার মুসলিম রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তার লাভ করিবার সুযোগ পায় এবং বাংলার ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিরাট মুসলিম রাজ্যে পরিণত হয়। এই বলবনের বাংলা বিজয় বাংলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া গণ্য করা হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে বলবনী শাসন ও স্বাধীন সুলতানী প্রতিষ্ঠা

১২৮১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন বাংলার স্বাধীন সুলতান মুগীসউদ্দীন তুঘরলকে পরাজিত করিয়া পুনরায় বাংলার মুসলিম রাজ্যকে দিল্লীর শাসনাধীনে আনয়ন করেন এবং স্বীয় পুত্র বুঘরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। বলবন তাঁহার পুত্রের চরিত্র সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই তিনি শাসনকার্যে পুত্রকে উপদেশ ও সাহায্য দানের জন্য তাঁহার দুইজন দক্ষ কর্মচারীকে বাংলায় রাখিয়া যান। উভয় কর্মচারীর নামই ফীরুজ, একজন খলজী যিনি উত্তম বিবেচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং অপরজন কোহ-ই-জুদের অধিবাসী, যিনি রাজ্য বিজয়ী ছিলেন। এই দুই ফীরুজের মধ্যেই একজন পরবর্তীকালে শাসন ক্ষমতা দখল করিয়া শামসউদ্দীন ফীরুজ নামে শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

বুঘরা খান ১২৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু পর্যন্ত লখনৌতিতে দিল্লীর শাসনকর্তা হিসাবে শাসন করেন। তিনি আরাম আয়াসের দিকেই অধিক মনোযোগী হন। তাঁহার দক্ষ সাহায্যকারীদ্বয় খুব সম্ভবতঃ ভাল ভাবেই শাসন পরিচালনা করিয়াছিল। ১২৮৫ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠপুত্র মুহাম্মদের মৃত্যু হইলে বলবন শোককাতর হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং বুঘরা খানকে দিল্লীতে যাইয়া সিংহাসনে বসিবার জন্য ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু বুঘরা খান বাংলার জীবনযাত্রার সহিত এতই জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি দিল্লীতে দুই মাস অবস্থান করিয়া লখনৌতিতে ফিরিয়া আসেন। ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে বলবনের মৃত্যু হইলে উজীর নিযাম-উদ্দীন বলবনের মনোনয়ন উপেক্ষা করিয়া বুঘরা খানের ১৮ বৎসর বয়স্ক পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসান। পিতার মৃত্যুর পর বাংলাদেশে বুঘরা খান নিজেকে স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা করেন এবং নাসির-উদ্দীন মাহমুদ উপাধি ধারণ করেন।

যুবক কায়কোবাদ দিল্লীর সুলতান হইয়া শাসনকার্যের দিকে মনোযোগ না দিয়া অন্যান্য দিকে অধিক আসক্তি প্রদর্শন করেন। উজীর নিযাম-

উদ্দীন রাজ্যে সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। বুঘরা খান পুত্রের এই আচরণ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হন। উজীর নিযামউদ্দীনের প্ররোচনায় কায়কোবাদও সৈন্যদল লইয়া বাংলার দিকে রওয়ানা হন। শরয়ু নদীর উভয় তীরে দুই সৈন্যদল শিবির স্থাপন করে। শরয়ু নদীর তীরে পিতাপুত্রের এই মিলনই আমীর খসরু বিরচিত "কিরান-উস-সাদাইন' কাব্যের বিষয় বস্তু। আমীর খসরু বিস্তারিত ভাবে এই নাটকীয় পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়াছেন। যাহা হউক পিতাপুত্রের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটে এবং সমঝোতা স্থাপিত হয়। এই সমঝোতার ফলে মনে করা হয় যে বাংলায় বুঘরা খানের স্বাধীন শাসন পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

বুঘরা খান আর বেশীদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন নাই। দিল্লীতে কায়কোবাদের হত্যার পর তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়েন এবং পুত্র রুকনউদ্দীন কায়কাউসের হাতে শাসনভার অর্পণ করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। দিল্লীর শাসনকর্তা বা স্বাধীন সুলতান হিসাবে বাংলায় বুঘরা খানের শাসনকালে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

কিন্তু তাঁহার পুত্র রুকনউদ্দীন কায়কাউসের নয় বৎসর ব্যাপী (১২৯১—১৩০০ খৃঃ) শাসনকাল বাংলার মুসলিম রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিল্লীতে খলজী শাসনের প্রতিষ্ঠার পর বাংলার বলবনী শাসকদের সাথে দিল্লীর আর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই স্বাধীন সুলতান হিসাবে রুকনউদ্দীন কায়কাউস বাংলার মুসলিম রাজ্য বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। ফলে বাংলার মুসলিম রাজ্য যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

দিল্লীর সহিত কোন সম্পর্ক না থাকায় দিল্লীর ঐতিহাসিকগণ রুকন-উদ্দীন কায়কাউস সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে প্রাপ্ত শিলা-লিপি ও মুদ্রা হইতে তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়। তাঁহার শাসনকালের মোট পাঁচটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। মুঙ্গের জেলার মহেশ্বর ও লক্ষ্মীসরাইতে দুইটি ও অপর তিনটি যথাক্রমে দিনাজপুর জেলার দেবকোট, হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে ও বগুড়া জেলার মহাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। লখ্‌নৌতি টাকশাল হইতে রুকনউদ্দীন কায়কাউস কর্তৃক জারীকৃত অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন মুদ্রায় বলা হইয়াছে যে মুদ্রাগুলি বঙ্গের (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার) খাজানার দ্বারা জারী করা হইয়াছে। এই মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে যৎসামান্য যাহা জানা যায়

তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কায়কাউস বাংলার মুসলিম রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হইয়া কিছু সাফল্যও অর্জন করিয়াছিলেন এবং তিনি রাজ্যে সুশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান হইতে প্রমাণিত হয় যে তাঁহার রাজ্যসীমা পশ্চিমে বিহার, উত্তরে দেবকোট এবং দক্ষিণে সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুদ্রার সাক্ষ্যে এই কথাও বলা যায় যে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা (বঙ্গ) আক্রমন করিয়া সম্ভবতঃ কিছু অংশ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ঐ স্থানের খাজানা হইতে মুদ্রা জারী করিয়াছিলেন। শিলালিপি সাক্ষ্যে তাঁহার শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব। তিনি তাঁহার রাজ্যকে খুব সম্ভবতঃ দুইটি প্রদেশে ভাগ করিয়াছিলেন। বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ফীরুজ ইতিগীন এবং উত্তরে দেবকোট হইতে দক্ষিণে সাতগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত লখনৌতি প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন জাফর খান বাহরাম ইতিগীন। বিহার পশ্চিম সীমান্তস্থ হওয়ায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রদেশে একজন সহকারী শাসনকর্তার উল্লেখ লিপিতে পাওয়া যায়। উভয় প্রদেশের শাসনকর্তাই 'সিকান্দার-উস-সানী' (দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল। রুকন-উদ্দীন নিজেও অতী উচ্চমানের উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপাধিসমূহ বাংলার মুসলিম রাজ্যের উন্নতির পরিচয়ই বহন করে। এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সমসাময়িক দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন খলজীও 'সিকান্দার-উস-সানী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার মুসলিম রাজ্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া দিল্লীর সমকক্ষতার দাবীদার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সুলতান শামসউদ্দীন ফীরূজ শাহ্‌

শিলালিপি ও মুদ্রার সাক্ষ্যে দেখা যায় যে সুলতান রুকনউদ্দীন কায়-কাউসের পর সুলতান শামসউদ্দীন ফীরূজ শাহ লখনৌতির সিংহাসনে আরোহন করেন এবং তিনি ১৩০১ হইতে ১৩২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। লখনৌতি ও সোনারগাঁও টাকশাল হইতে ৭০১ হইতে ৭২২ হিজরীর মধ্যে (১৩০১—১৩২২ খৃঃ) উৎকীর্ণ তাঁহার অনেক মুদ্রা

পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া তাঁহার রাজত্বকালের চারিটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রা ও শিলালিপিতে শামসউদ্দীন ফীরূজ শাহের নাম ও উচ্চ উপাধি পাওয়া যায় এবং তিনি নিজেকে সুলতান রূপে দাবী করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পিতার নাম বা তাঁহার পিতা যে সুলতান ছিলেন এমন কোন উল্লেখ মুদ্রায় বা লিপিতে নাই।

শামসউদ্দীন ফীরূজ শাহের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিক-দের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইব্‌নে বতুতা উল্লেখ করিয়াছেন যে শামসউদ্দীন ফীরূজ নাসিরউদ্দীন বুঘরা খানের পুত্র ছিলেন, অর্থাৎ তিনি রুকনউদ্দীন কায়কাউসের ভ্রাতা ছিলেন। ইব্‌নে বতুতার এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মনে করেন যে শামসউদ্দীন ফীরূজ বলবনী বংশের ছিলেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে ইব্‌নে বতুতার বিবরণে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি রহিয়াছে। সুতরাং একমাত্র এই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তই নির্ভুল বলিয়া দাবী করা যায় না। ইহা ছাড়া অন্যান্য সূত্র বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আমীর খসরু বুঘরা খানের মাত্র দুইজন পুত্রের নাম করিয়াছেন—কায়কোবাদ, যিনি দিল্লীর সুলতান হইয়া-ছিলেন এবং কায়কাউস, যিনি বুঘরা খানের পর বাংলার সুলতান হইয়া-ছিলেন। আমীর খসরু ফীরূজের কথা উল্লেখ করেন নাই। ফীরূজের মুদ্রায় বা শিলালিপিতে এমন কোন দাবী করা হয় নাই যে তিনি সুলতানের পুত্র ছিলেন। কায়কাউস নিজেকে মুদ্রায় সুলতানের পুত্র হিসাবে দাবী করিয়াছেন এবং শামসউদ্দীন ফীরূজের পুত্রগণও নিজদিগকে মুদ্রায় সুলতানের পুত্র বলিয়া দাবী করিয়াছেন। শামসউদ্দীন ফীরূজ যদি সুলতানের পুত্র হইতেন তাহা হইলে তাহা উল্লেখিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। তৃতীয়তঃ সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন পারস্যের রীতি-নীতি অনুকরণে পৌত্রদের নামকরণ করিয়াছিলেন, যেমন কায়কোবাদ, কায়-কাউস, কায়খসরু ইত্যাদি। শামসউদ্দীনের নাম এই রীতির ব্যতিক্রম। চতুর্থতঃ দেখা যায় যে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে কায়কোবাদ (বুঘরা খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ১৮ বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফীরূজ যদি কায়কোবাদের তৃতীয় ভ্রাতা হয় তাহা হইলে ১৩০১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণকালে তাঁহার বয়স ২৫।২৬ বৎসর হইবে। কিন্তু আমরা শামস-উদ্দীনের রাজত্বকালের প্রথম দিকেই তাঁহার দুই তিনজন পুত্র কর্তৃক শাসনকার্যে

পিতাকে সাহায্য করিতে দেখি। অর্থাৎ ঐ সময়ে তাঁহার একাধিক প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ছিল। সুতরাং শামসউদ্দীন ফীরূজের কায়কোবাদের তৃতীয় ভ্রাতা হইবার সম্ভাবনা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। উপরোক্ত কারণে মনে করা হয় যে শামসউদ্দীন ফীরূজ বলবনের বংশ সম্ভূত ছিলেন না। বলবনের বংশের সহিত তাঁহার সম্পর্কের কোন প্রমাণ নাই।

তাঁহার উৎপত্তি ও ক্ষমতা লাভ সম্পর্কেও সঠিক কিছু জানা যায় না। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে সব মতবাদ রহিয়াছে তাহা আনুমানিক। বলবন বুঘরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে উপদেশ ও সাহায্য দানের জন্য দুইজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বাংলায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইসামীর মতে এই দুইজনের নামই ছিল ফীরূজ। বরণী একজনের নাম শামসউদ্দীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। অনুমান করা হয় যে কায়কাউসের রাজত্বকালে বিহারের শাসনকর্তা ফীরূজ ইতিগীন খুব সম্ভবতঃ এই দুইজনের মধ্যে একজন এবং তিনিই পরবর্তী কালে ক্ষমতা অধিকার করেন। কায়কাউস হয় অপুত্রক অবস্থায় মারা যান এবং ফীরূজ ক্ষমতা দখল করেন, কিংবা এমনও হইতে পারে যে কায়কাউসকে অপসারিত করিয়া ফীরূজ ক্ষমতা দখল করেন। তবে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে উভয় সিদ্ধান্তই আনুমানিক।

বখ্‌তিয়ার খলজীর পর শামসউদ্দীন ফীরূয শাহের সময়েই বাংলাদেশে মুসলমান রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। ইতিপূর্বে বাংলার মুসলিমরাজ্য বিহার, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বা রাঢ় লখ্‌নৌর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সুলতান রুকনউদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা শুরু হয়। হুগলী জেলার সাতগাঁও অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার তাঁহার সময়েই আরম্ভ হয়। কায়কাউস বঙ্গ অঞ্চলেও কিছু সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু শামসউদ্দীন ফীরূজের সময়েই বঙ্গ ও সাতগাঁও জয় সম্পূর্ণ হয়। রুকনউদ্দীন কায়কাউস বঙ্গের খাজানা হইতে মুদ্রা জারী করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শামসউদ্দীন ফীরূজের সময় সোনারগাঁও অঞ্চল (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) স্থায়ী ভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং সোনারগাঁও টাকশাল হইতে ৭০১ হিজরী (১৩০১ খৃঃ) হইতে মুদ্রা প্রকাশ করা হইয়াছিল। সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও ছাড়াও ফীরূজের শাসনকালে ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চল মুসলমান সাম্রাজ্য-

ভুক্ত হয়। এক কথায় বলা যায় যে প্রত্যন্ত এলাকা ছাড়া প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ স্থলতান শামসউদ্দীন ফীরূজের সময়ে মুসলমানদের অধিকারে আসে।

সাতগাঁও বিজয়ের সুস্পষ্ট ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা কষ্টসাধ্য। স্থলতান রুকনউদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি হইতে জানা যায় যে জাফর খান নামক তাঁহার এক শাসনকর্তা সাতগাঁও-এ একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়াছিলেন। শামসউদ্দীন ফীরূজের রাজত্বকালে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ আর একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে যাহাতে জাফর খান কর্তৃক 'দার-উল-খয়রাত' নামক একটি মাদ্রাসা তৈরীর উল্লেখ আছে। ত্রিবেনীস্থ জাফর খানের দরগাহের খাদেমদের কাছে প্রাপ্ত কুরছিনামায় এক জাফর খান গাজীর উল্লেখ আছে যিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে। স্থতরাং বোঝা যায় যে মুসলমানদের সাতগাঁও জয়ের সহিত জাফর খানের নাম জড়িত। সাতগাঁও বিজয়ের সহিত শাহ সফীউদ্দীন নামক অন্য এক সুফীর নামও জড়িত আছে। জনশ্রুতি আছে যে শাহ্ সফীউদ্দীন স্থলতান ফীরূজের শ্যালক ছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশে ইস্লাম প্রচার করেন। তিনি হুগলীতে পাণ্ডব রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি স্থলতানের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং জাফর খান গাজী তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত সূত্রসমূহ হইতে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে স্থলতান রুকনউদ্দীন কায়কাউসের সময় ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সাতগাঁও অঞ্চলে মুসলিম বিজয় শুরু হয়। জাফর খান নামক সেনাপতি এই আক্রমন পরিচালনা করেন। তিনি যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়া সাতগাঁওএ একটি মাদ্রাসা তৈরী করিয়াছিলেন। কিন্তু সাতগাঁও অঞ্চল সম্পূর্ণ জয় করিতে বেশ কিছু সময় লাগিয়াছিল। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাফর খান সাতগাঁও বিজয় সম্পূর্ণ করেন। শাহ সফীউদ্দীন এই বিজয়াভিযানে জাফর খান গাজীকে সাহায্য করেন। মনে হয় শাহ সফীউদ্দীন ধর্মপ্রচার করিতে বাহির হইলে হিন্দুদের সহিত সংঘর্ষে উপনীত হন। তিনি স্থলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং স্থলতান তাঁহার সেনাপতি জাফর খানকে সাহায্যে পাঠান। জাফর খানই সাতগাঁও বিজয়ের নায়ক এবং বাংলার অনেক সুফীর মত তিনিও প্রথমে সমর নায়ক হিসাবে রাজ্য জয় করেন এবং পরে লোক স্মৃতিতে তিনি দরবেশ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

সুলতান শামসউদ্দীনের সময়ে সিলেট অঞ্চলও জয় করা হইয়াছিল, এবং ঐ অঞ্চলে আক্রমন চালাইবার পূর্বে ময়মনসিংহ এলাকাও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ময়মনসিংহ বিজয়ের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ফীরূজ শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর গিয়াসপুর টাকশাল হইতে ৭২২ হিজরীতে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গিয়াসপুরকে ময়মনসিংহের প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত ঐ নামের একটি গ্রামের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়।

সিলেটে শাহ জালালের দরগাহে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে সুলতান শামসউদ্দীন ফীরূজের শাসনকালে ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ঐ অঞ্চল বিজিত হইয়াছিল। এই জয়ের সহিত শাহ্‌জালাল ও নাসিরউদ্দীনের নাম জড়িত। প্রচলিত লোককাহিনীতে সিলেট বিজয়ের কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে যে বুরহানউদ্দীন নামক এক মুসলমান সিলেটের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের বাস করিত। বুরহানউদ্দীন পুত্রের জন্য উপলক্ষে গরু জবেহ করেন এবং এক টুকরা গোস্ত চিল মুখে করিয়া নিয়া রাজা গৌড় গোবিন্দের মন্দিরে নিক্ষেপ করে। রাজা গৌড় গোবিন্দ বুরহানউদ্দীনকে শাস্তি প্রদান করেন। বুরহানউদ্দীন সুলতান ফীরূজ শাহর শরণাপন্ন হন। সুলতান সিকান্দার গাজীকে সসৈন্যে গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু সিকান্দার গাজী দুই দুইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। এই সময় শাহ জালাল তুরস্কের কুনিয়া শহর হইতে ৩১৩ জন শিষ্যসহ বাংলাদেশে আসেন। তিনি সিকান্দার গাজীর সসহি গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন। সৈয়দ নাসিরউদ্দীনকে এই যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। গৌড় গোবিন্দ সিলেট ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। ঐ অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে। শাহ জালাল মৃত্যু অবধি সিলেটে অবস্থান করেন এবং তিনিই ঐ অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের অগ্রনায়ক।

বুরহানউদ্দীন কর্তৃক গরু জবেহর কাহিনী কতখানি সত্য তাহা বলা যায় না। সাতগাঁও বিজয় সম্পর্কেও এই ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। কিংবা রামপালের বাবা আদম শহীদ সম্পর্কেও একই কাহিনীর অবতারণা করা হয়। সুতরাং মনে হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমান বিজয়ের সাথে এই ধরনের কাহিনীর অবতারণা বহুল প্রচলিত। কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে সিলেট জয়ের সহিত শাহ জালাল জড়িত ছিলেন এবং শিলালিপি

প্রমাণে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সিলেট সুলতান শামস-উদ্দীন ফীরূজ শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

সুলতান শামসউদ্দীন ফীরূজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার মুসলিম রাজ্যের এই বিস্তৃতি এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহার শাসনকালে তাঁহার তিন পুত্র তাঁহাকে সাহায্য দান করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ফীরূজ শাহের জীবিতাবস্থায় তাঁহার পুত্র জালালউদ্দীন মাহমুদ, গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর ও শিহাবউদ্দীন বোঘ্‌দা শাহ লখনৌতির টাকশাল হইতে নিজেদের নামে মুদ্রা জারী করিয়াছিল। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সোনারগাঁও এবং গিয়াসপুর টাকশাল হইতেও মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিল। পূর্ণ রাজকীয় উপাধি ব্যবহার করিয়া পিতার জীবিত অবস্থায় পুত্রগণ কর্তৃক মুদ্রা প্রকাশ হইতে অনেকে মনে করেন যে শামসউদ্দীন ফীরূজের পুত্রগণ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে বিষদ আলোচনা করিয়া বর্তমানে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে পুত্রগণ পিতার সাহত রাজকার্যে পূর্ণ সহযোগিতা করিত এবং তাহারা মুদ্রা প্রকাশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পুত্রগণের বারংবার বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়া থাকিলে শামসউদ্দীনের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের যে সম্প্রসারণ হইয়াছিল তাহা সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং পুত্রগণ পিতাকে শাসনকার্যে সাহায্য করিয়াছিল এবং পিতা কর্তৃক মুদ্রা প্রকাশের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এইরূপ মনে করাই অধিক যুক্তি সঙ্গত। বাংলাদেশের মুসলিম শাসনামলে এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়।

সুলতান শামসউদ্দীন ফীরূজ শাহের শাসনামলে শুধু বাংলার মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভই করে নাই, ইসলাম প্রচারও বৃদ্ধি পায়। সাতগাঁও ও সিলেট বিজয়ের সহিত দুইজন বিখ্যাত সুফির নাম জড়িত। বাংলায় ফীরূজের নাম খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। দুইটি শহরকে—মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া ও হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া—তাঁহার নামানুসারে ফিরুজাবাদ নামকরণ করা হইয়াছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার ইতিহাস পুন-র্গঠনের জন্য আমরা কেবলমাত্র মুদ্রা ও লিপি প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। তাঁহার সমসাময়িক কোন ইতিহাস গ্রন্থ নাই বা পরবর্তী যুগের ইতিহাসেও তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। ফলে তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু তবুও মনে হয় যে বাংলার মুসলিম রাজ্য বিস্তারে এবং ইহার সুপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার যে বিশেষ ভূমিকা ছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী প্রতিষ্ঠা

সুলতান শামসউদ্দীন ফীরূজ শাহ্‌র পর তাহার পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর কর্তৃক সিংহাসন অধিকার তাহার ভ্রাতাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরউদ্দীন ইব্রাহীম দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক এই আবেদনের ফলে বাংলাকে পদানত করিবার সুযোগ পাইলেন এবং তিনি সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিলেন। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক লখনৌতি আক্রমণ করেন। লখনৌতিতে পৌঁছিবার পূর্বে সুলতান গিয়াসউদ্দীন ত্রিহুত জয় করেন এবং ঐ স্থানে নাসিরউদ্দীন ইব্রাহীম তাহার সহিত সাক্ষাত করেন। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক তাহার পালকপুত্র বাহরাম খানের নেতৃত্বে লখনৌতির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর পরাজিত হন এবং পালাইয়া পূর্ব বাংলার দিকে যাইবার সময় ধরা পড়েন। বাংলার মুসলিম রাজ্যের উপর পুনরায় দিল্লীর শাসন প্রবর্তিত হইল।

বাংলা ত্যাগ করিবার পূর্বে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বাংলার মুসলিম রাজ্যকে তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হইল লখনৌতি এবং তিনি নাসিরউদ্দীন ইব্রাহীমকে এই বিভাগের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার শাসনকেন্দ্র হইল সাতগাঁও এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করা হইল সোনারগাঁও এ। উভয় বিভাগের যুক্ত শাসনভার অর্পণ করা হইল সুলতান গিয়াসউদ্দীনের পালকপুত্র বাহরাম খানের উপর। এইভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা করিয়া সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বন্দী গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়া দিল্লীর উদ্দেশ্যে লখনৌতি ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি দিল্লী পৌঁছিতে পারেন নাই। দিল্লীর অদূরে আফগানপুরের দুর্ঘটনায় সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের মৃত্যু হয়।

নাসিরউদ্দীন ইব্রাহীম কয়েক বৎসর দিল্লীর অধীন শাসনকর্তা হিসাবে লখনৌতি শাসন করেন এবং তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের নামে মুদ্রা প্রকাশ করেন। কিন্তু মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজ্যভার গ্রহণ করিবার অল্পকাল পরেই বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন করেন। তিনি গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে মুক্তি দেন এবং তাহাকে

সোনারগাওএ বাহরাম খানের সহিত যুগ্ম শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বাহাদুরকে শাসনকর্তা নিয়োগের সময় সুলতান মুহাম্মদ শর্ত দিয়াছিলেন যে বাহাদুর তাহার নামে খোত্‌বা পাঠ ও মুদ্রা জারী করাইতে বাধ্য থাকিবে এবং আনুগত্যের প্রমাণ স্বরূপ নিজ পুত্রকে প্রতিভূরূপে দিল্লীর দরবারে পাঠাইতে হইবে। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক লখনৌতি এবং সাতগাও কেন্দ্রেও শাসনকর্তা পরিবর্তন করেন। লখনৌতিতে পাঠাইলেন মালিক পিন্দর খলজীকে এবং সাতগাওএ পাঠাইলেন ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়াকে। মালিক পিন্দর খলজীকেই পরবর্তীকালে কদর খান উপাধি দান করা হয়। লখনৌতির শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীন ইব্রাহীমকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠান হয়।

সুতরাং দেখা যায় সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থার যে আমূল পরিবর্তন করেন তাহার ফলে লখনৌতিতে কদরখান, সাতগাওএ ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়া ও সোনারগাওএ বাহরাম খান এবং গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সোনারগাওএ যুগ্ম শাসনকর্তা নিয়োগের মূল কারণ এই ছিল যে একজন অপরজনকে দমাইয়া রাখিতে পারিবে। বাংলার তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া হয়তো সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক বিদ্রোহের আশঙ্কা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন।

গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর দিল্লীর আনুগত্য মানিয়া কিছুদিন শাসন করেন। তিনি সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘ্‌লকের নামে ৭২৮ হিজরীতে (১৩২৭—২৮খৃঃ) মুদ্রা জারী করেন। কিন্তু ইব্‌নে বতুতা উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি তাহার নিয়োগের অন্য শর্ত, অর্থাৎ পুত্রকে দিল্লীতে প্রেরণ করিবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। দিল্লীর সুলতান এই বিষয়ে চাপ দিলে তিনি ঐ বৎসরই অর্থাৎ ৭২৮ হিজরীতে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। স্বনামে ৭২৮ হিজরীতে মুদ্রা জারীই তাহার স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রমাণ করে। বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথেই বাহরাম খান তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন; বাহাদুর পরাজিত ও নিহত হইলেন।

৭৩৯ হিজরী (১৩৩৮ খৃঃ) পর্যন্ত বাংলাদেশে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসন তেমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই। কিন্তু ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যু হইলে তাহার সিলাহ্‌দার (বর্ম রক্ষক) ফখ্‌রা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান ফখরুউদ্দীন মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সোনারগাও এর সিংহাসন অধিকার করেন। ফখরউদ্দীন কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণাই বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা করে।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সেই সময়ে তাহার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ দমনে ব্যতিব্যস্ত থাকায় সুদূর বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তাই ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালে বাংলার ঘটনাপ্রবাহ স্বাধীনতাকে অব্যাহত রাখে এবং ধীরে ধীরে সোনারগাও ছাড়া অন্যান্য কেন্দ্রেও স্বাধীনতার সূচনা করে।

পার্শ্ববর্তী শাসনকেন্দ্রে স্বাধীনতার খবর পাইয়া লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান ও সাতগাওএর শাসনকর্তা ইজ্জউদ্দীন মিলিতভাবে সোনারগাও আক্রমণ করেন। ফখরউদ্দীন পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। কদর খান বহু ধন-সম্পদ ও হাতী ঘোড়া হস্তগত করিয়া সোনারগাও অধিকার করিয়া সেখানে থাকিয়া গেলেন। ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়া নিজ শাসনকেন্দ্রে ফিরিয়া গিয়াছিলেন কিনা সঠিক জানা যায় না। তবে পরবর্তীকালে কেবল কদর খান ও ফখরউদ্দীনের মধ্যে সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফখর-উদ্দীন বর্ষার আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলেন। বর্ষাকালে তিনি পাল্টা আক্রমণ করেন। কদর খান যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পত্তি সৈন্যদলের মধ্যে ভাগ না করায় তাহার সৈন্যদলে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অসন্তোষের সুযোগে ফখরউদ্দীন তাহার সৈন্যদলে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। ফলে অনেক সৈন্য কদর খানের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ফখরউদ্দীনের সৈন্যদলে যোগদান করে। যুদ্ধে কদর খান পরাজিত ও নিহত হইলেন। ফখর-উদ্দীন সোনারগাও পুনরুদ্ধার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাহার পুত্র ইখতিয়ারউদ্দীন গাজী শাহের রাজত্বকালে ইলিয়াস সোনারগাও অধিকার করেন।

মুদ্রা প্রমাণে বলা যায় যে ৭৩৯ হিজরী (১৩৩৮ খৃঃ) হইতে ৭৫০ হিজরী (১৩৪৯ খৃঃ) পর্যন্ত ফখরউদ্দীন মোবারক শাহ্ সোনারগাওএ রাজত্ব করেন। সোনারগাওএ কদর খানের মৃত্যুর পর লখনৌতিতে তাঁহার সেনাধ্যক্ষ (আরিজ) আলী মোবারক সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফখরউদ্দীন লখনৌতি অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে মুখলিস নামক তাঁহার এক সেনাপতিকে লখনৌতি আক্রমণ করিতে পাঠান। কিন্তু আলী মোবারক তাঁহাকে পরাজিত করেন। অতঃপর প্রায় প্রতি বৎসরই লখনৌতি ও সোনারগাঁও এর মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়াই ছিল। ফীরুজাবাদ টাকশাল হইতে মুদ্রিত আলাউদ্দীন আলী শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ একই টাকশাল হইতে ৭৪৩ হিজরীর

ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আলাউদ্দীন আলী শাহ্ ৭৪৩ হিজরী (১৩৪২ খৃঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ইলিয়াস শাহ লখনৌতি এলাকা অধিকার করায় তাঁহার শাসনের অবসান ঘটে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সোনারগাঁও এর সুলতান ফখর-উদ্দীন মুবারক শাহের লখনৌতি অধিকারের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই।

ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ তাঁহার রাজ্যসীমা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার সময়েই সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম অঞ্চল মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে। সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ খানের বংশ পরিচয়ে এই বিষয়ের পরোক্ষ উল্লেখ রহিয়াছে। শিহাবউদ্দীন তালিশের ইতিহাসেও ইহার উল্লেখ আছে। তালিশ আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে ফখরউদ্দীন চাঁদপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ তৈরী করিয়াছিলেন। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে চট্টগ্রাম বিজয় ফখরউদ্দীনের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ফখরউদ্দীনের রাজত্বকালে ১৩৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে সেই যুগের বাংলাদেশ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ইবনে বতুতা ফখরউদ্দীনকে বলবনী সুলতান নাসিরউদ্দীন বুখরা খানের বংশের মিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইবনে বতুতার এই উক্তি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ইবনে বতুতা আরও বলিয়াছেন যে সুলতান ফখরউদ্দীন ফকীরদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। ফখরউদ্দীন ৭৫০ হিজরী (১৩৪৯) পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং পরবর্তী সুলতান, খুব সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র, ইখ্তিয়ারউদ্দীন গাজী শাহ ৭৫৩ হিজরী (১৩৫২ খৃঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মুদ্রা প্রমাণ পাওয়া যায়। মুদ্রা প্রমাণে এই কথাও বলা যায় যে ঐ বৎসরই, অর্থাৎ ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে, ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও অধিকার করেন। মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে গাজী শাহ্র উল্লেখ নাই। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ফখরুউদ্দীন কর্তৃক সোনারগাঁওএ ক্ষমতা অধিকার বাংলায় স্বাধীন সুলতানীর সূচনা করে। পরবর্তীকালে লখনৌতিতে আলাউদ্দীন আলী শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা ও ইলিয়াস শাহের আবির্ভাব স্বাধীনতার প্রাথমিক সোপান সম্পূর্ণ করে। বাংলার এই স্বাধীনতা দুই শত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এই দীর্ঘকাল দিল্লীর শক্তি বাংলার মুসলিম রাজ্যকে

পদানত করিতে পারে নাই। তুঘলক বংশের পর দিল্লীর সুলতানদের দুর্বলতা এবং বাংলার সুলতানদের সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন এই স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে ইবনে বতুতার বিবরণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালে ১৩৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে আসেন। ইবনে বতুতা উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহ সফর করিয়া দিল্লীতে আসিয়াছিলেন এবং দিল্লী হইতে তিনি বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে আসিবার তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল সিলেটে যাইয়া শাহ জালালের সাথে সাক্ষাৎ করা। সিলেটে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তিনি নদীপথে সোনারগাঁওএ আসেন এবং সেখান হইতে জাহাজ যোগে জাভার পথে যাত্রা করেন। ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে স্বল্প বর্ণনা রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করিয়া তদানীন্তন বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির যে অল্প তথ্য তাঁহার বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে তাহা খুবই মূল্যবান। সমসাময়িক অন্য কোন সূত্রে এই ধরণের তথ্যের অভাব ইবনে বতুতার সংক্ষিপ্ত বিবরণকে অধিক মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে।

ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন দক্ষিণ ভারত হইতে সমুদ্রপথে এবং যেই জায়গায় তিনি প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহার নাম তিনি 'সোদকাওয়ান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে বতুতার সোদকাওয়ানের সনাক্তকরণ লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে সোদকাওয়ান ও হুগলী জেলার সাতগাঁও একই জায়গা, আবার কেহ কেহ সোদকাওয়ান ও চট্টগ্রাম (চাটগাঁও) অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। সোদকাওয়ানের যে বর্ণনা ইবনে বতুতা দিয়াছেন তাহা হইতে বর্তমানে শেষোক্ত সিদ্ধান্তই অধিক যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।[১]

১ N.K. Bhattasali : Coins And Chrondhogy of tLe Early Independent Sultans of Bengal 145—149.

ইবনে বতুতার বর্ণনায় সোদকাওয়ান একটি সমুদ্র উপকূলবর্তী বিরাট শহর। সমুদ্রে মিলিত হইবার আগে এই শহরের নিকট গঙ্গা, যেখানে হিন্দুরা তীর্থে যায়, এবং যমুনা নদী মিলিত হইয়াছে। ধ্বনির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে সাতগাঁও ও চাটগাঁও উভয় শহরের নামের সাথেই সোদকাওয়ানের মিল আছে। তবে বর্ণনার অন্যান্য আনুসঙ্গিক তথ্য বিচারে এই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব।

চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করিয়া ইবনে বতুতা সিলেটে শাহ জালালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করিয়া তিনি নদীপথে সোনারগাঁও আসেন এবং সেখান হইতে জাহাজ যোগে জাভার পথে যাত্রা করেন।

ইবনে বতুতা উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার কায়রো, বসরা, সিরাজ, ইস্পাহান, বোখারা, বলখ, সমরকন্দ, হেরাত প্রমুখ বিখ্যাত শহরসমূহ ভ্রমণ করিয়া ভারতে আসেন এবং দিল্লী ও অন্যান্য ভারতীয় শহর পরিদর্শনের পর তিনি বাংলাদেশে আসেন। সুতরাং বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যে যখনই কোন তুলনামূলক উক্তি থাকে তাহা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনে বতুতার বর্ণনায় সর্বাগ্রে যে বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইতেছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্যসমূহ। বাংলাদেশের প্রাচুর্য ও অর্থনৈতিক সাচ্ছল্যতা নিশ্চয়ই ইবনে বতুতাকে অবাক করিয়াছিল। ফলে তাঁহার বর্ণনায় বাংলাদেশের খাদ্যসামগ্রীর অল্পমূল্য ও অল্পব্যয়ে জীবনযাপনের কথা উল্লেখ পাইয়াছে। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে বাংলাদেশের মত এত প্রচুর চাউল এবং এত সস্তা খাদ্য সামগ্রী তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। ইবনে বতুতা বাংলাদেশের কিছু খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসের দাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দিল্লী রতলের হিসাবে ওজন ও দিনারের হিসাবে দাম উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান টাকার হিসাবে মূল্য নির্ণয় খুবই কষ্টসাধ্য। তবুও আনুমানিক নীচের তালিকা তৈরী করা হইয়াছে এবং ইহা হইতে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব:[১]

চাউল	আনুমানিক	৮৩/৪ মণ	৭ টাকা
ধান	,,	২৮ ,,	৭ টাকা
ঘি	,,	১৫ সের	৩৷৷০
তিল তেল	,,	১৪ ,,	১৸০
চিনি	,,	১৪	৩৷৷০
৮টি তাজা মুরগী			৸৵০
১টি ,, ভেড়া			১৸০
১টি দুগ্ধবতী গাভী			২১ টাকা
১৫টি পায়রা			৸৵০
১৫ গজ সূক্ষ্ম সূতী কাপড়			১৪ টাকা

১ এই তালিকা ১৯৪৬ সনে প্রফেসর নিরোদ ভূষণ রায় প্রণয়ন করিয়াছেন। J. N. Sarker (ed), History of Bengal, Vol. II, 101—102.

আনুমানিক ভাবে প্রবর্তিত এই তালিকা হইতে বাংলাদেশের উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার কথা স্পষ্টভাবে অনুমান করা সম্ভব। তবে দ্রব্য মূল্যের স্বল্পতাই সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক চিত্রের পরিচায়ক নয়; মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ইবনে বতুতা বাংলাদেশের হাটে বাজারে দাস-দাসী ক্রয় বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে বতুতার সামনে একজন সুন্দরী দাসী বিক্রী হইয়াছিল ৭ টাকায় এবং ইবনে বতুতা নিজেও আশুরা নাম্নী একজন সুন্দরী দাসী ক্রয় করেন এক স্বর্ণ দীনার মূল্যে, অর্থাৎ ১০ টাকায়। ইবনে বতুতার একজন সহকর্মী দুই স্বর্ণ দীনারের বিনিময়ে একজন দাস ক্রয় করেন। ইবনে বতুতা বাংলাদেশে দ্রব্য মূল্যের পরিচয় দিতে গিয়া আরও বলিয়াছেন যে তিনি মুহাম্মদ আল মশহাদী নামক এক মরক্কোবাসীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি স্ত্রী ও একজন ভৃত্যসহ পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য মাত্র ৭ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করিতেন। দ্রব্যমূল্যের এই তালিকা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে তৎকালীন বাংলাদেশে খাদ্য সম্ভার কত প্রচুর ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা যে তেমন স্বচ্ছল ছিল না তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। দেশীয় লোকদের মতে দেশে তখন জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত চড়া ছিল। হাট বাজারে দাস দাসীর বিক্রয়ের কথা যেমন তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার উপর আলোকপাত করে তেমনই অর্থনৈতিক অবস্থারও ইঙ্গিত দেয়।

ইবনে বতুতার বর্ণনায় নদীপথে ব্যবসা বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। তিনি চাটগাঁও বন্দরে অসংখ্য জাহাজ দেখিয়াছিলেন। তিনি নদীপথেও অসংখ্য নৌকা চলাচল করিতে দেখিয়াছেন। প্রধানতঃ নদীপথেই ব্যবসা বাণিজ্য হইত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইবনে বতুতা উল্লেখ করিয়াছেন যে নদীপথে নৌযানসমূহ দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করিত। প্রত্যেক নৌকায় একটি করিয়া ডঙ্কা থাকিত এবং যখন নৌকাগুলি পরস্পরকে অতিক্রম করিত তখন ডঙ্কাধ্বনি করা হইত। সম্ভবতঃ জলদস্যুতা নিবারণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

ইবনে বতুতার বর্ণনায় তদানীন্তনকালের ধর্মীয় অবস্থারও কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে। দেশে সুফী সাধক ও ফকীরদের বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ ফকীর ও উলেমাদের অত্যন্ত

ভক্তি করিতেন। ফলে ফকীর ও উলেমারা অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করিত। তাহারা বিনা পয়সায় নৌকায় যাতায়াত করিতেন; তাহাদের খাওযা-পবার সংস্থান করা হইত এবং যখন তাঁহারা কোন নগরে উপস্থিত হইতেন তখন অর্ধ দীনার উপহারসহ তাঁহারা অভ্যথিত হইতেন। হিন্দুদের অবস্থাব কথাও ইবনে বতুতা উল্লেখ করিয়াছেন। উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক রাজাকে দিতে হইত। তদুপরি তাহাদিগকে অন্যান্য করও দিতে হইত।

ইবনে বতুতার জন্মভূমি পৃথিবীর বৃহত্তর মরুভূমির পার্শ্বদেশে। বহু-কাল তিনি উত্তর ভারতের শুষ্ক আবহাওয়ায় বাস করিবার পর তিনি বাংলাদেশে আসেন। সুতরাং নদীপথে প্রায় পঞ্চাশ দিন ব্যাপী সিলেট হইতে সোনারগাঁও যাত্রাকালে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক শোভা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, নদীপথের বাঁকে বাঁকে গ্রাম ও কিছুদূর পর পর হাট বাজার, চারিদিকে সবুজের সমারোহ তাঁহার মনে মিশরের নীলনদীর তীরভূমির স্মৃতি জাগ্রত করিয়াছিল। জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক দ্রব্যাদির প্রাচুর্য ও স্বল্পমূল্য আর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ইবনে বতুতাকে আকৃষ্ট করিলেও এই দেশের আবহাওয়া তাঁহার পছন্দ হয় নাই। শুষ্ক দেশের মানুষ ইবনে বতুতা বাংলাদেশের অতি বৃষ্টি ও তাহার ফলে আর্দ্রতা, বর্ষাকালের কর্দমাক্ত পথঘাট এবং বন্যার প্লাবন পছন্দ করিতে পারেন নাই। সেই কারণেই তিনি বাংলাদেশের নামকরণ করিয়াছেন "দোজখপুর-আন-নিয়ামত", বা আশীর্বাদপুত নরক বা ধন-পূর্ণ নরক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহী শাসন

১৩৪২ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহকে হত্যা করিয়া হাজী ইলিয়াস সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করিয়া ফীরুজাবাদের সিংহাসন অধিকার করেন। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আলাউদ্দীন আলী শাহ লখনৌতিতে ক্ষমতা দখল করিয়া তাঁহার রাজধানী ফিরুজাবাদে (পাণ্ডুয়া) স্থানান্তরিত করেন। ৭৪২ ও ৭৪৩ হিজরীতে (১৩৪১—৪২খৃঃ) ফিরুজাবাদ টাকশাল হইতে জারীকৃত তাঁহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। একই টাকশাল হইতে ৭৪৩ হিজরীতে মুদ্রিত ইলিয়াস শাহের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। তাই বলা যাইতে পারে যে হাজী ইলিয়াস আলী শাহকে অপসারিত করিয়া ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে ফিরুজাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

যদিও ফখরউদ্দীন মোবারক শাহ সোনারগাঁওএ স্বাধীন সুলতানীর সূচনা করেন এবং লখনৌতিতে আলাউদ্দীন আলী শাহ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় করেন, ইলিয়াস শাহই সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশকে একত্রিত করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বাধীন সুলতানীর প্রতিষ্ঠা পর্ব সমাপ্ত করেন। ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশের এই নব প্রতিষ্ঠিত সুলতানী সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার বংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করে। ইলিয়াস শাহ এমন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন যেই বংশের সুলতানরা দেশীয় লোকদের সহিত সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিতে সক্ষম হয়। এই সহযোগিতার ফলে দিল্লীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার মতো ক্ষমতা সঞ্চারিত হয় এবং ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন হইতেই বাংলার মুসলিম রাজ্য বিদেশী শাসনের প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া এই দেশীয় আশা আকাংক্ষার সহিত তাল মিলাইয়া এই দেশীয় রাজ্যে পরিণত হয়।

সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ্

সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের পূর্ব পরিচয় বা প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে যে সব তথ্য রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে ঐক্য না থাকায় সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। আরবের দুইজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবন্ হজর এবং আল-সাখাওভীর মতে তিনি পূর্ব ইরানের সিজিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। সেখান হইতে তিনি বা তাঁহার পরিবার কিভাবে এই উপমহাদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। গোলাম হোসেন সলিম রচিত 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' গ্রন্থে তাঁহার বাংলাদেশে আগমনের কাহিনী বর্ণিত আছে। হাজী ইলিয়াস আলী মোবারকের (যিনি লখনৌতিতে আলাউদ্দীন আলী শাহ উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন) ধাত্রী পুত্র বা দুধ ভাই ছিলেন। উভয়ই দিল্লীতে মালিক ফীরুজ বিন রজবের (যিনি পরে দিল্লীর সুলতান ফীরুজ শাহ তুঘলক নামে খ্যাত) অধীনে চাকুরী করিত। চাকুরী করা কালীন হাজী ইলিয়াস কোন অপকর্ম করিয়া পলাইয়া যান। মালিক ফীরুজ ইলিয়াসকে ধরিয়া আনিবার জন্য আলী মোবারককে আদেশ দেন। আলী মোবারক ইলিয়াসকে ধরিয়া আনিতে ব্যর্থ হইলে মালিক ফীরুজ তাহাকেও তাড়াইয়া দেন। আলী মোবারক বাংলাদেশে চলিয়া আসেন এবং লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে তিনি লখনৌতিতে ক্ষমতা দখল করেন এবং আলাউদ্দীন আলী শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর হাজী ইলিয়াস বাংলাদেশে আসিলে আলী মোবারক তাঁহাকে বন্দী করেন। ইলিয়াসের মাতার অনুরোধে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং পরে উচ্চ রাজপদেও তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়।

হাজী ইলিয়াস অল্পদিনের মধ্যেই আলী মোবারকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং সৈন্য বাহিনীকে নিজের দলে টানিয়া লন। খোজাগণের সাহায্যে আলী মোবারককে হত্যা করিয়া তিনি নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। বুকাননের পাণ্ডুলিপিতে যে বিবরণ আছে তাহাতে এই কাহিনীরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এই কাহিনীর সত্যতা নিরূপণ সম্ভব নয়। তাঁহার নামের পূর্বে হাজী উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে তিনি আগেই হজ করিয়াছিলেন। 'আইন-ই-আকবরী'তে ইলিয়াস শাহকে বাংলার অন্যতম আমীর ও 'তারিখ

ই-মোবারক শাহী'তে তাঁহাকে মালিক রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। সমসাময়িক দিল্লীর ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী এবং তাঁহার অনুকরণে অন্যান্য ঐতিহাসিক ইলিয়াস শাহের নামে নানান কুৎসা রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইলিয়াস ভাঙ বা সিদ্ধির নেশা করিতেন বা কাহারও কাহারও মতে তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ছিলেন। এই সব ঐতিহাসিকের উপর নির্ভর করিয়া পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম বা ফিরিশতা ইলিয়াস শাহের নামের সাথে 'ভাঙরা' উপাধি যোগ করিয়াছেন। ইলিয়াস শাহ ভাঙ খাইতেন কিনা জানিবার উপায় নাই। তবে 'ভাঙরা' উপাধি তিনি নিজে নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং স্পষ্টতই মনে হয় দিল্লীর ঐতিহাসিকগণ তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া ব্যাঙ্গ করিয়া তাঁহাকে 'ভাঙরা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিদ্বেষের কারণও রহিয়াছে। দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ তুঘলক ইলিয়াস শাহকে দমন করিতে আসিয়া খুব সম্ভবতঃ ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যান। ফলে দিল্লীর ঐতিহাসিকগণ স্বভাবতই তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে আগ্রহী ছিলেন। রিয়াজে বর্ণিত ইলিয়াস শাহের প্রথম জীবনের কুকর্মের কথাও যে কতখানি সত্য তাহা বলা কঠিন। কারণ ফীরূজ শাহ তুঘলক বাংলা আক্রমণকালে যে 'নিশান' প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে এই সব কুকর্মের কোন উল্লেখ নাই। যদি এইসব কুকর্মের কথা জানা থাকিত তাহা হইলে ঐসবের উল্লেখ থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল, কারণ এই 'নিশান' প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইলিয়াস শাহকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া বাংলার জনগণকে তাঁহার পক্ষ সমর্থন হইতে বিরত করা। দিল্লীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে শামস-ই-সিরাজ আফীফ ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' 'শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয় ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলাদেশে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া যথার্থই 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই উপাধিই বিদ্রূপের ছলে 'শাহ-ই-ভাঙরা'য় পরিণত হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মুদ্রা প্রমাণে বলা যায় যে ৭৪৩ হিজরীতে (১৩৪২ খৃষ্টাব্দে) ইলিয়াস শাহ ফীরূজাবাদের সিংহাসন অধিকার করেন অর্থাৎ তিনি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় অধীশ্বর হন। পূর্ব বাংলা (সোনারগাঁও যাহার কেন্দ্র) এবং দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা (সাতগাঁও যাহার কেন্দ্র) তখনও তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয় নাই। এই দুই অঞ্চলে যথাক্রমে

ফখরউদ্দীন মোবারক শাহের ও দিল্লীর শাসন চলিতেছিল। খুব সম্ভবতঃ ইলিয়াস শাহ প্রথমে সাতগাঁওএর দিকে রাজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। ৭৪৭ হিজরীতে (১৩৪৬ খৃঃ) সাতগাঁও টাকশাল হইতে প্রকাশিত তাঁহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে ইলিয়াস শাহ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা তাঁহার রাজ্য-ভুক্ত করেন।

ইহার পর পূর্ব বাংলার দিকে সম্প্রসারণের চেষ্টা না করিয়া তিনি অন্য দিকে রাজ্যজয়ের জন্য মনোনিবেশ করেন। খুব সম্ভবত নদীমাতৃক পূর্ব বাংলা জয় সহজসাধ্য হইবে না বলিয়া এবং সেখানে ফখরউদ্দীনের সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন বহাল থাকায় তিনি সেইদিকে নজর দেন নাই। পশ্চিম সীমান্তে রাজ্যজয়ের দিকে তিনি সচেষ্ট হন।

১৩৫০ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ কর্তৃক নেপালে অভিযান প্রেরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। নেপাল রাজ বংশাবলীতে ৪৬৯ নেওয়ারী সম্বৎ (১৩৪৯ খৃঃ) পূর্ব দেশীয় সুলতান শামসদ্দীনের নেপাল আক্রমনের উল্লেখ আছে। কাঠমণ্ডুর নিকটস্থ স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে এই আক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এই লিপিতে আক্রমণের তারিখ ৪৭০ নেওয়ারী সম্বৎ (১৩৫০ খৃঃ) বলিয়া উল্লেখিত আছে। এই আক্রমনের কোন বিস্তারিত বিবরণ কোন সূত্রে নাই। মনে হয় যে এই আক্রমনের ফলে ইলিয়াস শাহ স্বরাজ্য সীমা বৃদ্ধি না করিলেও প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

নেপাল জয়ের পূর্বেই হয়তো ইলিয়াস শাহ ত্রিহুতে (উত্তর বিহার অঞ্চল) কিছু অংশ জয় করেন। ত্রিহুতের হিন্দুরাজ বংশে অন্তর্বিরোধের সুযোগে ইলিয়াস শাহ খুব সম্ভবতঃ এই অঞ্চলে কিছু সাফল্য অর্জন করিয়া-ছিলেন।

১৩৫২ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ পূর্ব বাংলার দিকে সাফল্যজনক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সোনারগাঁওএ ফখরউদ্দীন মোবারক শাহের পর সুলতান ইখতিয়ারউদ্দীন গাজী শাহ্ রাজত্ব করেন ৭৫০ হিজরী হইতে ৭৫৩ হিজরী (১৩৪৯ হইতে ১৩৫২ খৃঃ) পর্যন্ত। ৭৫৩ হিজরীতেই (১৩৫২ খৃঃ) ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও অধিকার করিয়া-ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ বৎসরে সোনারগাঁও টাকশাল হইতে জারীকৃত তাঁহার মুদ্রা হইতে। সোনারগাঁও অধিকারের ফলে ইলিয়াস

বাংলাদেশের তিন অঞ্চলেরই অধিপতি হন—অর্থাৎ ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র বাংলাদেশের অধিপতি হন। ইতিপূর্বে বাংলার অন্য কোন মুসলমান সুলতান সমগ্র বাংলাদেশের সুলতান হইবার গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। এই কারণেই হয়তো ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ ইলিয়াস শাহকে "শাহ-ই-বাঙ্গালাহ" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

সমগ্র বাংলাদেশ অধিকারের ফলে ইলিয়াসের শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়; তিনি রাজ্যসীমা বাংলার বাহিরে বৃদ্ধি কল্পে অভিযান প্রেরণ করিবার মত শক্তিশালী হইয়া উঠেন। 'তারিখ-ই-ফিরিশতা' ও 'তবকত্-ই-আকবরী'র সাক্ষ্যে মনে হয় ইলিয়াস শাহ জাজনগর। (উড়িষ্যা) আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ৪৪টি হাতীসহ প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করিয়াছিলেন। এই সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশ বিহার আক্রমণ করেন। বিহার সেই সময়ে দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত প্রদেশ এবং উহার শাসনকর্তা ছিল মালিক ইব্রাহিম বায়ু। দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সেই সময়ে সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইলিয়াস শাহ কর্তৃক পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আক্রমণ করা খুবই স্বাভাবিক। লিপি প্রমাণে বলা যায় যে ইব্রাহীম বায়ুর ৭৫৩ হিজরীতে মৃত্যু হয়। সুতরাং ইলিয়াস শাহের আক্রমণ ঐ সময়েই হইয়াছিল এবং এমনও হইতে পারে যে ইলিয়াসের আক্রমণই বায়ুর মৃত্যুর কারণ। ইলিয়াস কর্তৃক ত্রিহুত আক্রমন এই সময়ে সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে নেপাল অভিযানের প্রাক্কালেও ত্রিহুতে সাফল্য অসম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণের অভাবে এই ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়।

বিহারের সাফল্য ইলিয়াস শাহের উদ্যম ও অভিলাস বৃদ্ধি করে। তিনি আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী জয় করিয়া এক বিরাট ভূখণ্ড রাজ্যভুক্ত করেন এবং বাহরাইচের শেখ মাসুদ গাজীর সমাধিতে যাইয়া দুইবার নিজের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। কথিত আছে যে এই বিজয়াভিযান হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ইলিয়াস শাহ দম্ভভরে বলিয়াছিলেন, "আমার প্রচুর ধনসম্পদ ও লোক-লস্কর লইয়া আমি যদি দিল্লীতে যাইয়া শয়খ-উল-ইসলাম নিজামউদ্দীনের দরগাহে ভক্তি নিবেদন করিতাম তাহা হইলে কি ভাল হইত! আমাকে এবং আমার বাহিনীকে কে বাধা দিত?"

ইলিয়াস শাহ সত্যিই এই উক্তি করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে এই জনশ্রুতিতে ইলিয়াস শাহের সাফল্যেরই পরিচয় বহন করে।

তবে ইলিয়াস শাহের এই সাফল্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ফীরূজ শাহ্ তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি এই অভিযান শুরু করেন এবং ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ইলিয়াস শাহ কর্তৃক দিল্লীর সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ অধিকারই এই আক্রমনের প্রধান কারণ। ইলিয়াস কর্তৃক বিহার অধিকার ও কাশী পর্যন্ত বিজয়াভিযান নিশ্চয়ই দিল্লীর ক্ষমতার উপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। সুতরাং দিল্লীর সুলতান কর্তৃক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশ আক্রমনের প্রাক্কালে প্রকাশিত ফীরূজ শাহ তুঘলকের যে 'নিশান' বা ঘোষণাপত্র পাওয়া গিয়াছে এবং বরণী প্রমুখ দিল্লীর ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে এই আক্রমণের জন্য অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা লক্ষণীয়। এই সব সূত্রে ইলিয়াস শাহকে অত্যাচারী রূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইলিয়াস শাহ বাংলাদেশে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমানদের উপর যথেচ্ছাচারি উৎপীড়ন চালাইয়াছিলেন, এমনকি স্ত্রীলোকদের উপরও তিনি অত্যাচার করেন। সুতরাং ফীরূজের আক্রমন এই দেশের মুসলমানদের রক্ষার্থে এইরূপ একটা ধারণাই আমরা পাই। নিশানে এমনও বলা হইয়াছে যে এই অঞ্চলে যে সব অতিরিক্ত ও অবৈধ কর আরোপ করা হইয়াছে সেইগুলি সব মকুব করা হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ফীরূজ শাহের নিশানখানি আক্রমনের প্রাক্কালে প্রকাশিত একখানি প্রচারপত্র। এবং কর রোহিতকরণের আশ্বাস এই কথাই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের জনগণের সহযোগিতা লাভই এই প্রলোভন প্রদর্শনের কারণ। সুতরাং ফীরূজ শাহ তুঘলকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টায় লিখিত বরণীর 'তারিখ-ই-ফীরূজ শাহী' বা ফীরূজের প্রচারপত্র 'নিশানের' ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না যে ইলিয়াস শাহ অত্যাচারী ছিলেন এবং ফীরূজের বাংলা আক্রমণ ইহারই প্রতিকারের জন্য।

ঐতিহাসিক আফীফ অন্য এক কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইলিয়াস শাহ দিল্লীর হাউজ-ই-শামসীর (ইলতুতমিশ কর্তৃক নির্মিত স্নানাগার) অনুকরণে একটি বিরাট স্নানাগার নির্মাণ কিরিয়াছিলেন। ফলে তিনি

সুলতান ফীরূজ শাহের বিরাগ-ভাজন হন এবং ফীরূজ বাংলা আক্রমণ করেন। এই কারণও খুব একটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বলিয়া মনে হয় না। এই ধরণের কারণ না থাকিলেও ফীরূজ কর্তৃক ইলিয়াস শাহের রাজ্য আক্রমণ খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ তুঘলক সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে বাংলাদেশ দিল্লীর অধীনতা ছিন্ন করে। সুতরাং স্বাধীনতা ঘোষণাকারী প্রদেশ পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা দিল্লী সম্রাটের অবশ্য কর্তব্য। তাহা ছাড়া ইলিয়াস শাহের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং সাফল্য জনক বিজয়াভিযান ফীরূজকে নিশ্চয়ই বিচলিত করিয়াছিল। দিল্লীর সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে ইলিয়াস শাহের আক্রমণ দিল্লীর কর্তৃত্বের উপর সরাসরি হুমকি স্বরূপ ছিল। সুতরাং ফীরূজ কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণ খুবই স্বাভাবিক এবং বাহ্যিক কোন কারণ আনিয়া ইহার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিলেই চলে। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে স্বীয় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এবং সম্ভব হইলে বাংলাদেশে দিল্লীর শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সুলতান ফীরূজ তুঘলকের বাংলাদেশ আক্রমন।

ফীরূজ তুঘলকের বাংলা অভিযানের বিবরণ বরণীর 'তারীখ-ই-ফীরূজ শাহী' আফীফের 'তারীখ-ই-ফীরূজ শাহী' এবং 'সিরাত-ই-ফীরূজ শাহী' গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সব সমসাময়িক সূত্রে সামান্য কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও মোটামুটিভাবে যুদ্ধের বিবরণ প্রায় একই রকম। তবে জায়গায় জায়গায় দিল্লীর ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাহাদের সব তথ্যই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় না।

সুলতান ফীরূজ শাহ তুঘলক এক বিরাট সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর সঙ্গে নিয়া বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। অযোধ্যা চম্পারণ ও গোরক্ষপুরের ভিতর দিয়া কুশী নদী অতিক্রম করিয়া ফীরূজ বাংলাদেশে আসেন। ফীরূজ শাহের আগমনের খবর পাইয়া ইলিয়াস শাহ সীমান্তে বাধা প্রদানের কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া ত্রিহুতের দিকে চলিয়া আসেন এবং পরে ত্রিহুত ত্যাগ করিয়া রাজধানী ফিরূজাবাদে (পাণ্ডুয়া) আসেন। দিল্লীর বাহিনী নিকটবর্তী হইলে ইলিয়াস শাহ রাজধানী প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়াই একডালা নামক একটি নিকটবর্তী স্থানের দুর্গে আশ্রয় নিলেন এবং আত্মরক্ষার প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন। একডালা দুর্গের অবস্থিতি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। তবে বর্তমানে প্রায়

সকলেই মানিয়া লইয়াছেন যে ইহা পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বনগের পরগণাস্থ একডালা গ্রামে অবস্থিত ছিল। মনে করা হয় যে একডালা দূর্গ বিরাট এলাকা জুড়িয়া কাদামাটির দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার তিন পার্শ্ব বালিয়া, চিরামতি এবং মহানন্দার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং অন্যদিকে ছিল ঘন অরণ্য। খুব সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক এই দুর্ভেদ্যতার জন্যই ইলিয়াস শাহ একডালা দূর্গে আশ্রয় নিয়াছিলেন। বিশাল দিল্লী বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে সাফল্যের আশা না করিয়া ইলিয়াস শাহ নিপুণ সমরনীতির পরিচয় দেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে জল ও জঙ্গল ঘেরা একডালা দুর্গ জয় করিতে দিল্লীর সৈন্যদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে এবং বর্ষাকালে এই রকম অঞ্চলে তাহাদের সফলের সম্ভাবনা খুবই কম।

অতিসহজে ফীরুজ শাহ পাণ্ডুয়া দখল করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে পাণ্ডুয়া রক্ষা করিবার জন্য ইলিয়াস শাহ কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই। পাণ্ডুয়া দখলের পর সুলতান ফীরুজ শাহ একডালা দূর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু জলবেষ্টিত কাদামাটি দ্বারা প্রস্তুত এই দুর্গটি জয় করা ফীরুজ শাহের সৈন্যদের পক্ষে সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইল না। ইলিয়াস শাহ একডালা দূর্গের অভ্যন্তর হইতে প্রিতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করিতে লাগিলেন এবং বর্ষাকাল পর্যন্ত দিল্লীর সৈন্যদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিলেন। তিনি জানিতেন বর্ষাকালের প্রবল বারিপাত এবং মশার দংশন দিল্লীর সৈন্যগণ সহ্য করিতে পারিবে না এবং বাংলা জয়ের আশা ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে।

উভয়পক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডযুদ্ধ হইল। কিন্তু সেগুলির তেমন কোন চূড়ান্ত ফলাফল ছিল না। এইদিকে বর্ষাকাল সমাগত প্রায়। ফীরুজ শাহের সৈন্যগন বাংলাদেশের অবিরাম বৃষ্টিপাত এবং মশার আক্রমনে অসহ্য যন্ত্রণার কবলে পড়িল। একদিন সুলতান ফীরুজ শাহ তাঁহার সৈন্যদেরকে শিবির তুলিয়া নিতে আদেশ দেন। তাঁহার আদেশ শুনিয়া সৈন্যগণ আনন্দিত হইয়া সোরগোল করে এবং নূতন ঘাঁটির জন্য নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এইদিকে ইলিয়াস শাহ এবং তাঁহার দলের লোকেরা ভাবিলেন যে ফিরুজ শাহের সৈন্যদল পশ্চাদ-পসরণ করিয়াছে। তাই ইলিয়াস শাহ তাঁহার সৈন্যদলসহ দুর্গের বাহিরে চলিয়া আসেন এবং দিল্লীর বাহিনীকে পিছন দিক হইতে আক্রমণ করিবার

জন্য যাত্রা করিলেন। ফিরূজ শাহ একডালা দুর্গ হইতে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং ইলিয়াস শাহের আসার খবর পাইয়া তাঁহার সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধের কায়দায় সারিবদ্ধ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। দিল্লীর ঐতিহাসিকগণ ইলিয়াস শাহের শোচনীয় পরাজয়ের কথা বলিয়াছেন। তবে এই কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ শোচনীয় পরাজয় ঘটিলে ফীরূজ শাহ্ নিশ্চয়ই বাংলাদেশে স্থায়ী শাসন প্রবর্তন করিতেন। মনে হয় ইলিয়াস শাহ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পিছন দিক হইতে আক্রমণ করিয়া দিল্লীর বাহিনীকে অপদস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। হয়তো তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করিতে না পারিয়া পুনরায় একডালায় আশ্রয় নেন।

সিরাত-ই-ফিরূজ শাহীর মতে সুলতান ফিরূজ শাহ একডালা দুর্গ দখল করিবার জন্য পুনরায় অবরোধ করেন। দিল্লীর ঐতিহাসিকদের মতে ফীরূজ শাহ দুর্গটি অধিকারের জন্য প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করিতে উদ্যত হন, কিন্তু দুর্গের মধ্যে অবরোধবাসিনী সম্ভ্রান্ত মহিলাদের করুণ আবেদনের ফলে তিনি নিরস্ত হইলেন। অনেক কান্নাকাটির পর বাংলার বন্দী সৈন্যদিগকেও তিনি মুক্তি দেন। ইহার পর তিনি ইলিয়াস শাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া দিল্লী ফিরিয়া যান। দিল্লীর ঐতিহাসিকদের যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের বে-ইজ্জতী ও অনেক মুসলমান হত্যা হইবে প্রভৃতি কারণে ফীরূজ শাহ অবরোধ উঠাইয়া ইলিয়াস শাহের সহিত সন্ধি করেন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঐ সব ঐতিহাসিকেরা ফীরূজের বাংলা অভিযানের ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্যই এই সব অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। ফীরূজ যদি সত্যি সত্যি মহিলাদের বে-ইজ্জতী ও মুসলমান বধ রোধ করিতে উৎসুক হইতেন, তাহা হইলে তিনি ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দর শাহের সময় দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ আক্রমন করিতেন না। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে যুদ্ধে তেমন কোন চূড়ান্ত ফলাফলের কোন আশা না থাকায় উভয়পক্ষই নিজ নিজ কারণে সন্ধিতে সম্মত হয়। পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে দূত ও উপহার বিনিময় হয়।

ফীরূজ শাহ কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমনের ফলে তিনি বাংলাদেশ জয় করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি ইলিয়াস শাহের উচ্চাভিলাষ রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশে ও তাহার

পূর্বদিকে ইলিয়াস শাহের অধিকার কিছুমাত্র খর্ব হয় নাই, কিন্তু লখনৌতির পশ্চিমে যে সকল স্থান ইলিয়াস শাহ জয় করিয়াছিলেন, সেইগুলি ফীরূজ শাহের অধিকারভুক্ত হইল। বারণি, আফীফ এবং সিরাৎ-ই-ফিরূজ শাহীর লেখকেব মতে ইলিয়াস শাহ কর্তৃক উপঢৌকন প্রেরণ বশ্যতা স্বীকারের চিহ্ন, কিন্তু ইয়াহিয়া বিন সরহিন্দি তাঁহার 'তারিখ-ই-মোবারক শাহী'তে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে ইলিয়াস শাহ সমকক্ষ রাজা হিসাবে ফীরুজ শাহকে এই উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন।

যাহা হউক একডালা দুর্গের সাহায্যে বাংলাদেশের সুলতান ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ তুঘলকের আক্রমন প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অতঃপর ইলিয়াস শাহ বিনা বাধায় আরও কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়েও তিনি রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তবে এইবার তিনি পূর্ব সীমান্তে মনোযোগ দেন। ইলিয়াস শাহ ত্রিপুরা বাজ্যের উপব প্রভাব বিস্তার কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজমালা হইতে জানা যায় ত্রিপুরা রাজ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রত্ন-ফাকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিয়া মারা যান। কিন্তু তাঁহাব মৃত্যুর পর অন্যান্য সতরজন ভাই রত্ন-ফাকে সিংহাসন চ্যুত কবে এবং তাড়াইয়া দেয়। রত্ন-ফা বাংলার সুলতানের আশ্রয় প্রার্থনা কবেন। সুলতান তাঁহাকে আশ্রয় দেন এবং সুলতানের সাহায্যে ত্রিপুরাব সিংহাসন ফিরিয়া পান। প্রতিদানে রত্ন-ফা বাংলার সুলতানকে একটি মানিক ও কয়েকটি হাতী উপহার দেন এবং সুলতান রত্ন-ফাকে মাণিক্য উপাধি প্রদান করেন।

ইলিয়াস শাহ তাঁহার রাজত্বের শেষ দিকে কামরূপ রাজাকে পরাজিত করিয়া কামরূপের কিছু অংশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সিকান্দার শাহের রাজত্বের শুরুতেই অর্থাৎ ৭৫৯ হিজরীতে জারীকৃত একটি মুদ্রার টাকশালের নাম "আওয়ালিস্তান ওরফে কামরু" পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় সিকান্দার শাহের রাজত্বের শুরু হইতেই কামরূপ বা তাহার কিয়দংশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অথচ সিকান্দার শাহ সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কামরূপ বিজয় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং ঐতিহাসিকদের ধারণা সুলতান ইলিয়াস শাহই কামরূপের কিছু অংশ জয় করিয়াছিলেন।

কিভাবে ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয় সেই সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। 'সিরাত-ই-ফীরূজ শাহী', 'তারিখ-ই-মোবারক শাহী' ও 'রিয়াজ-উস-

সালাতীন' এর মতে ৭৫৯ হিজরীতে (১৩৫৮খৃঃ) ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয়। মুদ্রা প্রমাণে এই তথ্য সত্য বলিয়া মনে হয়। ৭৫৮ হিজরী পর্যন্ত ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে এবং ৭৫৯ হিজরী হইতে তাঁহার পুত্র সিকান্দার শাহের মুদ্রা পাওয়া যায়।

সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল। তিনি নিঃসন্দেহে একজন উচচ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সমরনায়ক হিসাবেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় বুদ্ধি ও সমরনীতির গুণে বাংলাদেশে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনিই মুসলমান সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশের অধিপতি হইবার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি শুধুমাত্র সমস্ত বাংলাদেশ একক শাসনাধীনে আনিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পশ্চিম সীমান্তে সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি ত্রিহুত, নেপাল, উড়িষ্যায় সাফল্যজনক অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার মতো ক্ষমতা সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিহার জয় করিয়া তিনি চম্পারণ, কাশী ও গোরক্ষপুর পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ তুঘলকের আক্রমন কালে তিনি একডালা দুর্গে প্রতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং বাংলার প্রাকৃতিক অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফীরূজ শাহের সহিত যুদ্ধে প্রকৃত অবস্থা সঠিক না জানা গেলেও ইহা স্পষ্ট যে ফীরূজ শাহ তাঁহাকে পদানত করিতে পারেন নাই। বরঞ্চ সন্ধি স্থাপন করিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইলিয়াস তারপর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন উভয়ের মধ্যে উপঢৌকন বিনিময় হইয়াছে। সুতরাং মনে হয় যুদ্ধে ফীরূজ আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং দিল্লীর ঐতিহাসিকদের ইলিয়াস শাহের প্রতি আক্রোশের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। এবং এই আক্রোশের বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা ইলিয়াস শাহের 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ্' উপাধিকে নানারূপ ব্যাঙ্গ করিয়াছে। দিল্লীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যাপারে ইলিয়াস শাহ্ নিপুণ সমর কৌশলের পরিচয় দেন।

দিল্লীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার পর ইলিয়াস শাহ আমরণ মিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার

করেন এবং কামরূপ রাজ্যের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ইলিয়াস শাহের অধীন বাংলাদেশে যে নূতন উদ্যম সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার প্রভাব বাংলাদেশের একমাত্র পশ্চিম সীমান্তেই পড়ে নাই, পূর্ব সীমান্তেও সেই প্রভাব পড়িয়াছিল।

ইলিয়াস শাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি সুফী ও দরবেশদিগকে খুব সম্মান করিতেন। তাঁহার সময়ে বাংলাদেশে তিনজন বিশিষ্ট সুফীর নাম পাওয়া যায়—শয়খ আখী সিবাজউদ্দীন, তাঁহার শিষ্য আলা-উল-হক এবং শযখ রাজা বিয়াবাণী। ইলিয়াস শাহ শয়খ আলা উল হকের সম্মানে একখানি মসজিদ তৈয়ারী করাইয়া ছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতীন এ বলা হইয়াছে যে ফীরূজ তুঘলক কর্তৃক একডালা দুর্গ অবরোধ কালে শয়খ বিয়াবাণীর মৃত্যু হয়। ইলিয়াস শাহ্ তাঁহাকে এতই ভক্তি করিতেন যে তিনি নিজের জীবনের প্রতি খেয়াল না করিয়া ছদ্মবেশে দুর্গের বাহিরে আসেন এবং শযখ বিয়াবাণীর দাফনে যোগদান করেন।

স্বাধীন সুলতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস শাহ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সমগ্র বাংলাদেশে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজ্য সীমা ও প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং দিল্লীর আক্রমনের বিরুদ্ধে স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া তিনি শৌর্য ও বীর্যের প্রমাণ দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে দিল্লীর সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়া তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বাধীনতার প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁহার সর্বক্ষেত্রে সাফল্য বাংলাদেশের এই স্বাধীনতাকে দীর্ঘায়ু দিতে সাহায্য করিয়াছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ইলিয়াস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিশক্তি দিল্লীর ঐতিহাসিকদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। ফলে তাঁহার কৃতিত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তবে নিঃসন্দেহে তাঁহার সুদীর্ঘ পনর বৎসরকাল শাসন তাঁহার যোগ্যতারই পরিচয় দেয়।

সুলতান সিকান্দার শাহ্

সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলাদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। দুঃখের বিষয় যে তাঁহার রাজত্বকালের কিছু মুদ্রা ও কয়েকটি শিলালিপি ছাড়া অন্যকোন সূত্রে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ তুঘলক দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন এবং এই প্রসঙ্গে দিল্লীর ঐতিহাসিকদের লেখনীতে সিকান্দার শাহের উল্লেখ আছে। কিন্তু ফীরূজ শাহের প্রত্যাবর্তনের পর দিল্লীর সহিত বাংলার সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কছেদ ঘটে। ফলে বাংলাদেশ সম্বন্ধে দিল্লীর ঐতিহাসিকদের তেমন কোন সম্যক জ্ঞান ছিল না। এককথায় বলা যাইতে পারে যে পিতার ন্যায় সিকান্দার শাহ সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ তুঘলক প্রথম বার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু তেমন কোন সাফল্য অর্জন না করিয়া ফিরিয়া যান এবং ইলিয়াস শাহের জীবিতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে মিত্রতা বজায় ছিল এবং একাধিকবার উভয়ের মধ্যে উপঢৌকন বিনিময় হইয়াছিল। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর সময় ফীরূজ শাহের দূত উপহার নিয়া বাংলাদেশে আসিতেছিল। পথে ইলিয়াস শাহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ঐ দূত আর বাংলাদেশে আসে নাই। তদুপরি সিকান্দর শাহের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই ফীরূজ শাহ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাঁহার দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করেন। সুতরাং মনে হয় যে দিল্লীর সুলতান ইলিয়াস শাহের রাজত্বের অবসানের অপেক্ষায় ছিলেন। বাংলাদেশে দিল্লীর শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নূতন সুলতান সিকান্দার শাহের রাজত্বের প্রারম্ভেই উপযুক্ত সময় মনে কবিযা তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া আবার বাংলাদেশ আক্রমন করেন।

দিল্লীর ঐতিহাসিক আফীফ দ্বিতীয় আক্রমনের কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইলিয়াস শাহের উপর দোষ চাপাইয়াছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে ফীরূজের প্রত্যাবর্তনের পর ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও আক্রমণ করিয়া ফখরউদ্দীন মোবারক শাহকে হত্যা করেন। ফখরুউদ্দীনের জামাতা জাফর খান পালাইয়া দিল্লীতে যান। ফীরূজ তুঘলক তাহাকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার শ্বশুরের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পুনরায় আক্রমন করেন। ইতিমধ্যে ইলিযাসের মৃত্যু হয় এবং সিকান্দার শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু আফীফের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। স্পষ্টই বোঝা যায় যে আফীফ সঠিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কারণ ফীরূজ তুঘলকের আক্রমণের পূর্বেই ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও অধিকার করিয়াছিলেন এবং সুলতান ইখতিয়ারউদ্দীন

গাজী শাহের পর ঐ স্থানে ইলিয়াস শাহের শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ফীরূজ শাহ ফখরউদ্দীনের জামাতাকে সাহায্য করিবারও কোন যৌক্তিকতা নাই। কারণ ফখরউদ্দীনও ইলিয়াস শাহের মত দিল্লীর শাসনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন। 'সিরাত-ই-ফীরূজ শাহী'র লেখক অন্য এক কারণের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সিংহাসনারোহণের পর সিকান্দর শাহ দিল্লীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন এবং সেই কারণেই দিল্লীর আক্রমন। এই উক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সিকান্দার শাহ পিতার সার্বভৌম স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। সুতরাং দিল্লীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশের প্রশ্নই উঠে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ফীরূজ তুঘলক তাঁহার প্রথম অভিযানের ব্যর্থতার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায়ই বাংলাদেশ আক্রমন করিয়াছিলেন। যতদিন ইলিয়াস শাহ্ বাঁচিয়া ছিলেন তিনি হয়তো দ্বিতীয় আক্রমন করিতে সাহস করেন নাই। তাই তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি তাঁহার আক্রমন পরিচালনা করেন।

প্রথমবারের মত এইবারও ফীরূজ শাহ এক বিরাট সৈন্যদল ও নৌবহর সংগে নিয়া বাংলাদেশ আক্রমন করেন। কনৌজ, অযোধ্যা ও জৌনপুর হইয়া ফীরূজ শাহ বাংলাদেশে আসিয়া পৌঁছিলে সুলতান সিকান্দার শাহ তাঁহার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দুর্ভেদ্য ও জলবেষ্টিত একডালা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ফীরূজ শাহ একডালা দুর্গ অবরোধ করেন এবং উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলিতে থাকে। কিন্তু এই সকল যুদ্ধের দ্বারা জয় পরাজয় অমীমাংসিত থাকে। উভয় পক্ষই বিরক্ত হইয়া সন্ধির জন্য অস্থির হইয়া উঠে এবং অবশেষে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। ফীরূজ শাহ ৮০,০০০ টঙ্কা দামের একটি মুকুট এবং ৫০০ আরবী ও তুর্কী ঘোড়া সিকান্দার শাহকে উপহার দেন। সুলতান সিকান্দার শাহও ফিরূজ শাহকে চল্লিশটি হাতী এবং আরও নানা মূল্যবান উপহার পাঠাইলেন। যতদিন ফীরূজ শাহ ও সিকান্দার শাহ বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন দুইজনের মধ্যে উপহার বিনিময় চলিয়াছিল। সুতরাং দেখা যায় ফিরূজ শাহের দ্বিতীয় বঙ্গ অভিযানও ব্যর্থ হইয়াছিল; উপরন্তু সিকান্দর শাহ তাঁহার নিকট হইতে স্বাধীন ও সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করিয়া নিয়াছিলেন। ফিরূজ শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযান ৭৫৯ হিজরীতে শুরু হইয়াছিল এবং দুই বৎসর সাত মাস চলিয়াছিল।

দিল্লীর ঐতিহাসিকগণ এই অভিযানের ব্যর্থতা ঢাকিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমবারের মত এইবারও মুসলমান নারীদের উপর অত্যাচারের কথা ও অন্যান্য অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তাঁহারা সন্ধির যথার্থতা দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সিকান্দার শাহের দীর্ঘ রাজত্বকালে ফীরূজ তুঘলকের আক্রমন ব্যতীত অন্য কোন ঘটনা সম্পর্কে আমরা জানিতে পারি না। এই পর্যন্ত তাঁহার শাসনকালের তিনখানি শিলালিপি এবং বেশ কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপিগুলি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি মুসলমান সুফী সাধকদের অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তিনি ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার দেবকোটে মোল্লা আতার দরগায় একখানি মসজিদ নির্মাণ করান। পাণ্ডুয়ার শয়খ আলাউল হক তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার সহিত বিহারের মনের-এ বসবাসকারী শয়খ শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মনেরীর সৌহার্দ্য ও পত্রালাপ ছিল। কথিত আছে যে শয়খ আলাউল হকের প্রতি তাঁহার প্রথমে অতীব ভক্তি থাকিলেও পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়।

সুলতান সিকান্দার শাহ শিল্পানুরাগী ও শিল্পস্রষ্টা ছিলেন। স্থাপত্য শিল্পে তাঁহার অমর কীর্তি পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ। ১৩৬৪ হইতে ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত এই মসজিদ বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আয়তনের বিশালতায় ও উচ্চমানের কারুকার্যের জন্য এই মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে অতুলনীয়। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০৭ ফুট ও প্রস্থে প্রায় ২৮৫ ফুট—এই বিশালকায় মসজিদটি নির্মাণে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ব্যবহার করা হইয়াছিল। এই মসজিদের অঙ্গসজ্জায় বাংলাদেশের সনাতন পোড়ামাটির শিল্পের ব্যবহার ইহাকে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করিয়াছে। এত বিরাট স্থাপত্য নির্মাণে বাংলাদেশের কারিগরদের অদক্ষতাহেতু এই মসজিদটি বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। আজ ইহা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত; পশ্চিমদিকের কিছু অংশ এখনও ইহার অবস্থানে চিহ্ন বহন করিতেছে।

মুদ্রা ও শিলালিপিতে সুলতান সিকান্দার শাহ কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাধি পাওয়া যায়। কোন কোন মুদ্রায় 'আল-মুজাহিদ ফি সবিল উর-রহমান' (আল্লাহর রাস্তায় যোদ্ধা) বা 'ইমাম-উল-আজম" (প্রধান ইমাম)

উপাধির ব্যবহার দেখা যায়। মনে হয় যে তিনি ধর্ম বিষয়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন।

সিকান্দার শাহের শেষ জীবন সুখে কাটে নাই। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বিমাতার চক্রান্তে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং পিতা-পুত্রের সংঘর্ষে পিতার মৃত্যু হয়। বুকাননের পাণ্ডুলিপির বিবরণেও এই তথ্য পাওয়া যায়। মুদ্রা প্রমাণে এই ঘটনা সত্য বলিয়া মনে হয়। ৭৫৯ হইতে ৭৯১ হিজরী পর্যন্তকালে জারীকৃত সিকান্দর শাহের মুদ্রা পাওয়া যায়। ৭৯০ হিজরীতে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রা এই বিদ্রোহেরই প্রমাণ বলিয়া মনে করা হয়। সিকান্দার শাহের মৃত্যুব সঠিক তারিখ নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে মনে হয় ৭৯১ হইতে ৭৯৫ হিজরীর মধ্যবর্তী কোন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সুলতান হিসাবে গিয়াসউদ্দীন কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রার প্রথম তারিখ ৭৯৫ হিজরী। সুতরাং সিকান্দার শাহের রাজত্বকাল মোটামুটি ভাবে ৭৫৯ হিজরী (১৩৫৮খৃ:) হইতে ৭৯৫ হিজরী ১৩৯৩খৃ:) পর্যন্ত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সিকান্দার শাহের প্রায় ৩৫ বৎসরকাল ব্যাপী দীর্ঘ রাজত্বকাল বাংলা-দেশের মুসলিম শাসনকালের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ফীরুজ তুঘলকের আক্রমন ব্যতীত অন্য কোন দুর্যোগের সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হয় নাই। সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তৃত রাজ্য তিনি অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। যদিও উপাদানের অভাবে তাঁহার শাসনকাল সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানিতে পারি, তবুও স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা যাইতে পারে যে দেশে সুশাসন উদ্ভুত শান্তি বিরাজমান ছিল। ইলিয়াস শাহ কর্তৃক প্রবর্তিত স্বাধীন সুলতানী দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে সিকান্দার শাহের শাসন-কালে।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ্

সুলতান সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বিমাতার চক্রান্তে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং পিতা-পুত্রের সংঘর্ষে সিকান্দার শাহের মৃত্যু হইলে গিয়াসউদ্দীন সিংহাসন আরোহন করেন। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে বিমাতার চক্রান্তই

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনি পিতৃহন্তা, তবুও তিনি নিজে এই বিদ্রোহ ও হত্যার জন্য কতখানি দায়ী ছিলেন ঠিক বোঝা যায় না। সিংহাসনারোহণের পর তিনি বৈমাত্রেয় ভাইদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন বা হত্যা করিয়াছিলেন। প্রতিদ্বন্দীদের হত্যা করা বা অন্ধকরা এই উপমহাদেশের ইতিহাসের মধ্যযুগে মোটেই অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে গিযাসউদ্দীন আজম শাহের মত আকর্ষণীয় চরিত্র বোধহয় আর কাহারও নাই। লোক রঞ্জক ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া তাঁহার তুলনা হয় না। তাঁহাব চরিত্রে নানা রকম বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হইয়াছিল। গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের জীবনের কোন কোন ঘটনা এতই বিচিত্র যে সেইগুলি হইতে তাঁহাকে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ তাঁহার পিতা ও পিতামহের মত দক্ষ নৃপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে নয়। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্বান ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ, সুফী সাধকদেব প্রতি ভক্তি, ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্র স্থলে মাদ্রাসা স্থাপন এবং চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময়ের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বুকাননের বিববণী হইতে জানা যায় যে গিযাসউদ্দীন আজম শাহ শাহাব নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ কবেন ও সাফল্যলাভে ব্যর্থ হন। বুকাননের এই বিবরণ গ্রহণ যোগ্য নয, কারণ আজম শাহেব সমসাময়িক শাহাব নামে কোন রাজার নাম ইতিহাসে পাওযা যায় না। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ কামরূপ আক্রমণ কবিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌহাটি যাদুঘবে আজম শাহের একখানি শিলালিপি রক্ষিত আছে। এই শিলালিপিখানি মূলে কোথায় ছিল, তাহা জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে ইহা কামরূপেব কোন অঞ্চলেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে সুলতান ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালের শেষেরদিকে কামরূপ বিজিত হইয়াছিল। এমন হইতে পারে যে সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে কামরূপে মুসলমান অধিকার লোপ পায় এবং গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ এই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আসাম বুরুঞ্জীতেও সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ কর্তৃক কামতারাজ ও

অহোমরাজের মধ্যে অন্তর্বিরোধের সুযোগে কামরূপ আক্রমনের কথা উল্লেখিত আছে। এই সূত্রে বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে অহোম ও কামতারাজের সম্মিলিত প্রতিরোধ ও যুদ্ধে বাংলার সুলতানের পরাজয়ের কথা আছে। ১৩১৬ শকাব্দে (১৩৯৪-৯৫খৃ:) লিখিত যোগিনীতন্ত্র নামক গ্রন্থে মুসলমানদের কামরূপ আক্রমন ও অধিকারের কথা উল্লেখিত আছে। গৌহাটিতে যে মুদ্রা সমষ্টি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। এই সব প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ কামরূপ আক্রমন করিয়াছিলেন। যদিও আসামী সূত্রে তাঁহার পরাজয়ের কথা আছে, মুদ্রা ও লিপি তাঁহার বিজয় ও অধিকারের কথাই প্রমাণ করে। তবে এই অধিকার বেশীদিন স্থায়ী হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। বিদ্যাপতির 'পুরুষ-পরীক্ষা' ও 'শৈব সর্বস্বসারে' মিথিলা রাজ শিব সিংহ কর্তৃক গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করার উল্লেখ আছে। তবে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। তিনি চরিত্রবান, বিদ্যোৎসাহী, ন্যায় বিচারক ও সুশাসক রূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

রিয়াজ-উস-সলাতীনে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনী পাওয়া যায়। একদিন তীর ছুড়িবার সময় সুলতানের তীর আকস্মিকভাবে এক বিধবার পুত্রকে আঘাত করে। বিধবা কাজী সিরাজউদ্দীনের কাছে ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করে। কাজী চিন্তিত হইলেন। কারণ তিনি যদি রাজার প্রতি পক্ষপাত দেখান তাহা হইলে আল্লাহর বিচারশালায় তিনি অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন। আর যদি তাহা না দেখান তাহা হইলে রাজাকে বিচারালয়ে আহ্বান করা কঠিন কাজ হইবে। অনেক বিচার-বিবেচনার পর তিনি রাজাকে আদালতে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং নিজে বিচারের মসনদের তলায় একটি বেত রাখিয়া দিলেন। যখন সুলতান কাজীর সামনে উপস্থিত হইলেন, কাজী তাঁহাকে কিছুমাত্র খাতির না করিয়া বলিলেন, 'এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের হৃদয়কে শান্ত করুন'। রাজার পক্ষে যাহা সম্ভব ছিল সেই উপায়ে (অর্থাৎ প্রচুর অর্থ দিয়া) বৃদ্ধাকে শান্ত করিয়া রাজা বলিলেন, 'কাজী! এখন বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হইয়াছে'। কাজী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি ক্ষতি-

পূরণ পাইয়াছ এবং সন্তুষ্ট হইয়াছ'? স্ত্রীলোকটি বলিল, 'হ্যাঁ। আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি'। তখন কাজী মহানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাজাকে শ্রদ্ধা দেখাইয়া মসনদে বসাইলেন। রাজা বগল হইতে একখানি তলোয়ার বাহির করিয়া বলিলেন, 'কাজী! আজ যদি আমি তোমাকে আইনের নির্দেশের প্রতি নিষ্ঠা হইতে একচুল বিচ্যুত হইতে দেখিতাম, তাহা হইলে এই তলোয়ার দিয়া তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিতাম। আল্লাহকে ধন্যবাদ, সমস্তই ঠিকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে'। কাজীও মসনদের তলা হইতে তাঁহার বেতখানা বাহির করিয়া বলিলেন, 'হুজুর যদি আপনাকে আজ আমি পবিত্র আইনের সামান্য মাত্র ও লংঘন করিতে দেখিতাম—তাহা হইলে আল্লার দোহাই, এই বেত দিয়া আমি আপনার পিঠ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিতাম।' রাজা খুশী হইয়া কাজীকে অনেক উপহার ও পারিতোষিক দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই গল্পের সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে ন্যায় বিচারক হিসাবে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নিশ্চয়ই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং এই গল্প সেই জনশ্রুতিরই ফল বলিয়া মনে হয়।

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যার আদর করিতেন। তিনি ফার্সী ভাষায় কবিতা লেখিতেন এবং একবার তিনি ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আগমনের নিমন্ত্রণ জানান। রিয়াজ-উস-সলাতীনে কবি হাফিজের সঙ্গে গিয়াসউদ্দীনের যোগাযোগের একটি কাহিনী পাওয়া যায়। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই। একবার সুলতান গিয়াস উদ-দীন আযম শাহ কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করেন। তিনি সেই সময়ে সরবা, গুল ও লালা নাম্নী তিনজন হারেমের মেয়েকে তাঁহার মৃত্যুর পর শবদেহকে স্নান করাইবার জন্য নির্বাচিত করেন। সুলতান আরোগ্য লাভ করেন এবং মেয়ে তিনটিকে আগের চেয়েও বেশী অনুগ্রহ করিতে থাকেন। কিন্তু হারেমের অন্য মেয়েরা তাহাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়ে এবং লাশ ধোয়ার কথা নিয়া তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে থাকে। মেয়ে তিনটি একদিন সুলতানের নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ জানায়। সুলতান তখন খুব প্রফুল্ল ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে একছত্র ফার্সী কবিতা রচনা করিয়া ফেলেন। কিন্তু সুলতান কবিতাটির দ্বিতীয় চরণ আর রচনা করিতে পারিলেন না, তাঁহার সভার কোন কবিও পারিলেন না। তখন সুলতান এই চরণটি লিখিয়া একজন দূত মারফত ইরানের কবি হাফিজের নিকট পাঠাইয়া দেন।

কবি হাফিজ কবিতার দ্বিতীয় ছত্রটি রচনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে হাফিজ একটি গজল রচনা করিয়া বাংলার সুলতানের নিকট পাঠাইলেন। সুলতান হাফিজের নিকট বহুমূল্য উপহার পাঠাইলেন। গজলটি 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' নামে হাফিজের কাব্য সংগ্রহের মধ্যে হুবহু পাওয়া যায়।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ মক্কা এবং মদিনা শরীফে বহু টাকা ব্যয়ে মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং ঐ দুই শহরের অধিবাসীদের বিলি করিবার জন্যও বহু অর্থ প্রেরণ করেন। সমসাময়িক কয়েকজন আরব দেশীয় এবং এই উপমহাদেশীয় ঐতিহাসিকদের লেখনীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে সুলতানের বিদ্যোৎসাহিতা এবং পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনার প্রতি তাঁহার ভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

পিতা ও পিতামহের মত সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহও মুসলমান সুফীদের অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তাঁহার সমসাময়িক সুফীদের মধ্যে শয়খ আলা-উল-হকের পুত্র ও শিষ্য শয়খ নূর কুতব-ই-আলম অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুতব-ই-আলমের ভাই আজম খান সুলতানের উজীর ছিলেন। বিহারের মুজাফফর শমস বল্‌খি নামে আর একজন দরবেশকে তিনি বিশেষ ভক্তি করিতেন।

বিদেশে দূত প্রেরণ গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্বের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে আজম শাহ পারস্যের কবি হাফিজের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং মক্কা ও মদিনায় দূত পাঠাইয়া সেখানে মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই দুইটি দৃষ্টান্ত ছাড়াও ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও যে তিনি দূত পাঠাইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। আজম শাহ প্রথমে দূত পাঠান জৌনপুরের শর্কী সুলতানাতের প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহান উপাধি-ধারী মালিক সরওয়ারের নিকট। গিয়াসউদ্দীন কর্তৃক জৌনপুরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রমাণ 'তারীখ-ই-মোবারক শাহী'তেও পাওয়া যায়। গিয়াস-উদ্দীন আজম শাহ চীন সম্রাটের সঙ্গেও দূত বিনিময় করেন। সমসাময়িক চীন সম্রাট য়ুং-লো বাংলাদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার নীতি গ্রহণ করেন এবং চীন সম্রাট ও বাংলার সুলতানের মধ্যে পর পর কিছুদিন দূত বিনিময় চলিতে থাকে। চীনা গ্রন্থের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে আজম শাহ চীন সম্রাটের নিকট ১৪০৫, ১৪০৮ এবং ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে দূত ও উপহার পাঠাইয়া-

ছিলেন। চীন সম্রাটও বাংলার সুলতানের নিকট দূত ও উপহার পাঠাইয়াছিলেন। চৈনিক প্রতিনিধিদলের সহিত আগত দোভাষী মা-হুয়ান বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। (পরে এই বিবরণ দেওয়া হইল)

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ ৮১৩ হিজরী (১৪১০-১১ খৃঃ) পর্যন্ত মুদ্রা জারী করিয়াছিলেন। সুতরাং মুদ্রা প্রমাণে বলা যায় যে তিনি ৭৯৫ হইতে ৮১৩ হিজরী (১৩৯৩—১৪১১ খৃঃ) পর্যন্ত প্রায় ১৮ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। রিয়াজ-উস-সালাতীনে বলা হইয়াছে যে রাজা কানস্ (সম্ভবতঃ রাজা গণেশ) নামক এক জমিদারের ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে তিনি খুব একটা সাফল্য অর্জন না করিলেও তিনি যে ইহা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শাসক হিসাবে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহী, ন্যায় বিচারক হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ইসলামী বিশ্বের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং চীনদেশের সহিত দূত বিনিময় করিয়া তিনি বাংলাদেশের সহিত বহির্বিশ্বের পরিচয় ঘটান। খুব সম্ভবতঃ তিনি বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। "বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মত আকর্ষণীয় চরিত্র বোধহয় আর কারও নেই। লোকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে তাঁর তুলনা হয় না। তাঁর চরিত্রে নানারকম বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হয়েছিল। এই সুলতানের যে সমস্ত কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়, প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে একটি উন্নত বৈচিত্র্যপ্রিয় রুচিবান বিদগ্ধ মনের পরিচয় মেলে। এঁর জীবনের কোন কোন ঘটনা এতই বিচিত্র যে সেগুলি থেকে এঁকে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে হয়।"[১]

বাংলাদেশ সম্বন্ধে মা-হুয়ানের বিবরণ

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে তিনবার চীন দেশীয় দূত বাংলাদেশে আসিয়াছিল। চৈনিক প্রতিনিধিদলের সহিত দোভাষী হইয়া আসিয়াছিলেন মা-হুয়ান। মা-হুয়ান

১। সুখময় মুখোপাধ্যায়ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পৃঃ ৬০।

বাংলাদেশে তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বলিত একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণে তদানীন্তন বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। সমসাময়িক অন্য কোন সূত্রে সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যের একান্ত অভাব। তাই মা-হুয়ানের বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৪০৫ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট য়ুংলো তাঁহার নির্বাসিত প্রতিদ্বন্দ্বী হুই-তীব সন্ধানে চেঙ হো, ওয়াঙ-চিঙ-হুঙ- প্রভৃতি কয়েকজন দূতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরণ করেন। সুমাত্রা হইতে যাত্রা শুরু করিয়া চৈনিক প্রতিনিধি দল সমুদ্রপথে একবিংশতি দিবস পরে বাংলাদেশের 'চেহ-টি-গান' (চাটগাঁ) বন্দরে পৌঁছায়। সেখান হইতে নদীপথে তাঁহারা 'সোনা-উরহ-কোঙ' (সোনারগাঁও) বন্দরে আসেন। চট্টগ্রাম হইতে সোনারগাঁও এর দূরত্ব ছিল ৫০০ লী অর্থাৎ প্রায় ১৬০ মাইল। তাঁহারা লখনৌতিও গিয়াছিলেন। সোনারগাঁও হইতে লখনৌতির দূরত্ব প্রায় ১০৫ মাইল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

চীনা বিবরণে বাংলাদেশের অধিবাসীদের দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে—হিন্দু ও মুসলমান। তাহাদের সংস্কৃতি ছিল ভিন্ন। হিন্দুরা গো-মাংস খাইত না, বা তাঁহাদের পরিবারে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বসিয়া আহার করিত না এবং হিন্দু সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল না। বাংলাদেশের লোকদের সততা ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যবসায় ক্ষতি হইলেও তাহারা কখনও মিথ্যা ও ঠকামির আশ্রয় নিত না। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে উচ্চপদস্থ লোকেরা মাথায় সাদা পাগড়ী ব্যবহার করিত। তাহারা এক ধরনের লম্বা জামা পরে এবং তাহাতে গোল গ্রীবা-বেষ্টনী থাকে। এই বেষ্টনীতে জরীর পাড় থাকে। তাহারা যে জুতা ব্যবহার করিত তাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। মুসলমান সুলতান ও উজীরেরা টুপীও ব্যবহার করিত। স্ত্রী লোকেরা খাট জামার উপরে সিল্ক বা সুতী কাপড় ঘুরাইয়া পরিধান করিত। স্ত্রীলোকেরা সোনা ও অন্যান্য দামী পাথরের তৈরী অলঙ্কার ব্যবহার করিত। তাহারা হার, ফুল, বাজুবন্দ, হাত ও পায়ের আঙ্গুলের আংটি এবং হাতের কব্জায় ও পায়ের গোড়ালিতে বালা ও মল ব্যবহার করিত। অধিবাসীদের সম্বন্ধে উপরোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় চৈনিক দূতদের পরিচয় ঘটিয়াছিল কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর সহিত; সাধারণ লোকের বেশভুষা সম্বন্ধে তাহারা কোন বক্তব্য রাখেন নাই।

মাহুয়ান উল্লেখ করিয়াছেন যে বাংলাদেশে বহু প্রাচীর বেষ্টিত নগরী আছে—উহাদের মধ্যে লখনৌতি অন্যতম। রাজা পাত্রমিত্রসহ নগরে বাস করেন। রাজধানীর অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান।

দেশের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী। বিবরণে এই দেশের কৃষকদের খুব প্রশংসা করা হইয়াছে। তাহারা অবিরাম পরিশ্রম করিয়া চাষ করে, রোপণ করে ও জমির উদ্ধার করে। সারা বৎসর পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশের ক্ষেতগুলি শস্য সমৃদ্ধ। বাঙালী কৃষক নিজের পরিশ্রমের ফলেই নিজের স্বর্গ গড়িয়া তুলে। অধিক ফসল ফলনহেতু বাংলাদেশে জিনিসপত্র সস্তা। ধানই এই দেশের প্রধান ফসল এবং ইহা বৎসরে দুইবার ফলে। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তিল, বজরা, আদা, সরিষা, পিয়াজ, রসুন, শসা ও বেগুন। নারিকেল, তাল, খেজুর, গম ও সবরকমের ডাল উৎপন্ন হইত। বাংলাদেশে চা উৎপন্ন হয় না, তাই এখানকার লোকেরা চা দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন করিত না, চায়ের পরিবর্তে তাহারা পান দিয়া অতিথি আপ্যায়ন করে। ফলের মধ্যে কলা, আম, কাঁঠাল, ডালিম ও ইক্ষু প্রচুর পাওয়া যায়।

অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী হইলেও বণিক, জ্যোতিষী, শিল্পী এবং পণ্ডিতও আছেন। ধনী বণিকগণ পণ্যসম্ভার লইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত এবং সেই উদ্দেশ্যে বৃহৎ নৌ-যান নির্মাণ করা হইত।

শিল্পদ্রব্যের মধ্যে বাংলাদেশের সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্রের বেশ প্রশংসা করা হইয়াছে এবং ছয় প্রকার সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। রেশমের বস্ত্রও পাওয়া যাইত। জরীর কাজকরা তাফেটাও বাংলাদেশে পাওয়া যাইত। এক প্রকার গাছের ছাল হইতে এক প্রকার কাগজ তৈয়ার করা হইত। প্রকাশ্য বিপণীতে সুরা বিক্রয় হইত। ধান, নারিকেল, তাল ও কাজঙ হইতে বিভিন্ন সুরা প্রস্তুত করা হইত।

এই দেশের মুদ্রার নাম ছিল টংকা। তবে সাধারণ বিনিময়ের জন্য কড়ির ব্যবহারও প্রচলিত ছিল।

অপরাধীদের শাস্তির জন্য ভারী বাঁশ দিয়া প্রহার এবং নির্বাসনের প্রচলন ছিল। সৈন্যদের নিয়মিত বেতন দেওয়া হইত এবং রসদ সরবরাহ করা হইত।

সাধারণ জনসাধারণের ভাষা ছিল বাংলা। তবে সরকারী কাজকর্ম ফার্সী ভাষায় সম্পাদিত হইত এবং উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারীরাও ফার্সী ভাষা ব্যবহার করিত।

মা-হুয়ান নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুকের উল্লেখ করিয়াছেন। এক ধরনের নাট্যকার বিচিত্র বসনে ভূষিত হইয়া বাদ্যযন্ত্র সহকারে নাটক অভিনয় করিত। অন্য এক ধরনের গায়ক মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অভিজাত শ্রেণীর গৃহে মনোরঞ্জন করিত। পথে বাজীকর নানা প্রকার খেলা দেখাইত। বাংলাদেশে পশুর মেলা, পশুর যুদ্ধ ও মল্ল যুদ্ধের প্রচলন ছিল।

মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে চৈনিক বিবরণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা মূলতঃ সমাজের উচ্চশ্রেণী ভিত্তিক। তবে বাংলাদেশের প্রাচুর্য যে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান চৈনিক বিবরণের উপরই নির্ভরশীল।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের উত্তরাধিকারীগণ

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকাল হইতেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সম্ভবতঃ রাজা গণেশ নামে এক হিন্দু জমিদারের আবির্ভাব হয়। রাজা গণেশ পরবর্তী পর্যায়ে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন এবং আজম শাহের হত্যা হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী সুলতানদের শাসনকালে তাহার ক্ষমতা বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায় এবং অবশেষে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া তিনি নিজ ক্ষমতা পুরাপুরিভাবেই বিস্তার করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সাইফউদ্দীন হামজা শাহ সুলতান হইলেন। এই পর্যন্ত তাঁহার শাসনকালের কোন লিপি প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্যে বলা যায় যে তিনি ৮১৩ হিজরী (১৪১০—১১ খৃঃ) হইতে ৮১৪ হিজরী (১৪১১-১২খৃঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মুদ্রায় তিনি 'সুলতান-উস-সালাতীন' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেও চীন দেশের সহিত সদ্ভাব অক্ষুন্ন ছিল এবং দূত বিনিময় হইয়াছিল। ফিরিশতার মতে সাইফউদ্দীন হামজা শাহ সাহসী, উদার ও ধৈর্যশীল নরপতি ছিলেন। রাজা গণেশের চক্রান্তে সুলতানের ক্রীতদাস শিহাবউদ্দীন তাঁহাকে হত্যা করেন এবং নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মুদ্রা প্রমাণে বলা যায় শিহাবউদ্দীন সুলতান হইয়া শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহ নামে ৮১৪ হিজরী (১৪১১-১২খৃঃ) হইতে ৮১৭ হিজরী (১৪১৪-১৫ খৃঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পূর্বে অজানা ছিল। কিন্তু এখন আর কোন সন্দেহ নাই যে শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ পূর্ববর্তী সুলতান সাইফউদ্দীন হামজা শাহের ক্রীতদাস ছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। শিহাবউদ্দীনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধেও সঠিক কিছু জানা যায় না। খুব সম্ভবতঃ রাজা গণেশের চক্রান্তে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

মুদ্রা প্রমাণে বলা যায় যে শিহাবউদ্দীন বায়েজিদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলাউদ্দিন ফীরুজ শাহ সুলতান হন। সাতগাঁও ও মুয়াজ্জমাবাদ টাকশাল হইতে উৎকীর্ণ তাঁহার ৮১৭ হিজরীর (১৪১৪-১৫খৃঃ) মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এমনও হইতে পাবে যে গণেশের চক্রান্তে পিতার মৃত্যু হইলে আলাউদ্দীন রাজধানী ফীরুজাবাদ ত্যাগ করিয়া রাজ্যের কিছু অংশে নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হন। তবে তাঁহার রাজত্বকাল ক্ষণ-স্থায়ী হইয়াছিল। রাজা গণেশ তাহাকে অপসারিত করিয়া ক্ষমতা দখল করিয়া নিয়াছিল।

এইভাবে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল এবং বাংলার রাজনীতিতে রাজা গণেশের আবির্ভাবই ইহার প্রধান কারণ। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের হত্যা হইতে শুরু করিয়া আলাউদ্দীন ফীরুজ শাহের হত্যা ও অপসারণ পর্যন্ত রাজা গণেশের প্রভাবই বাংলার রাজনীতির ধারা নির্ধারণ করিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজা গনেশ--ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরভ্যুদয়--হাবশী শাসন

৮১৭ হিজরী (১৪১৪-১৫ খৃ:) সালের পর বাংলাদেশের ইতিহাসে রাজা গণেশ ও তাহার বংশধরগণ প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল তাহাদের শাসন বজায় রাখিয়াছিলেন। রাজা গণেশের ইতিহাস পুনরুদ্ধার কষ্ট-সাধ্য, কারণ সমসাময়িক কালের কোন ইতিহাস নাই বলিলেই চলে। পরবর্তীকালে লিখিত ইতিহাসসমূহে নির্ভরযোগ্য তথ্য কতখানি রহিয়াছে তাহা নিরুপণ করা সম্ভব নয়। কিংবদন্তী ও কুলপঞ্জীতে রাজা গণেশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদে প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যে সমস্ত সূত্রের মধ্যে গণেশ ও তাহার বংশের ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী, নিজামউদ্দীন বখশী রচিত তাবকাৎ-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশতা, গোলাম হোসেন সলিম রচিত রিয়াজ-উস-সালাতীন উল্লেখযোগ্য। তবে পরবর্তী যুগে লিখিত এইসব সূত্রে ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত আছে বলা কঠিন। সুতরাং রাজা গণেশ সম্বন্ধে অনেকখানি অস্পষ্টতা রহিয়াছে। মুদ্রার মত প্রামাণিক তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া মোটামুটি ভাবে রাজা গণেশ ও তাহার বংশধরদের ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা যায়।

বাংলার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করিবার পূর্বে গণেশের পরিচয় সম্বন্ধে মতানৈক্য রহিয়াছে। রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতে গণেশ ছিলেন ভাতুড়িয়ার জমিদার। রেনেলের মানচিত্র অনুসারে ভাতুড়িয়া অঞ্চলের পশ্চিমে মহানন্দা ও পূনর্ভবা নদী, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে করতোয়া ও উত্তরে দিনাজপুর এবং ঘোড়াঘাট। গণেশ যে একজন জমিদার ছিলেন তাহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত শেখ নূর কুতুব আলমের একখানি চিঠি হইতেও জানা যায়। ফিরিশতার বিবরণ হইতে জানা যায় যে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিবার পূর্বে গণেশ ইলিয়াস শাহী সুলতানদের অমাত্য ছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের মৃত্যু প্রসঙ্গে আমরা গণেশের প্রথম উল্লেখ পাই এবং পরবর্তী সুলতানদের সময় তাহাকে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন অমাত্য হিসাবে দেখিতে পাই। এই সময় গণেশের ক্রমাগত ক্ষমতাবৃদ্ধির

পরিণতি হইয়াছিল বাংলার সিংহাসন অধিকার। আযম শাহের পরবর্তী তিনজন সুলতানের শাসনকালে গণেশ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং তাহারই ষড়যন্ত্রে শিহাবউদ্দীন বায়েজিদ শাহর মৃত্যু হয় এবং আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ অপসারিত ও নিহত হন। রাজা গণেশ বাংলার সর্বময় ক্ষমতা অধিকার করিতে সক্ষম হন।

রিয়াজ-উস-সালাতীন হইতে আমরা জানিতে পারি যে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন উচ্ছেদ করিয়া রাজা গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান দরবেশদের সহিত তাহার বিরোধ বাধিয়া উঠে। গণেশ অনেক মুসলমান দরবেশকে হত্যা করেন। দরবেশদের নেতা নূর কুতুব আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কীকে বাংলা আক্রমনের আহ্বান জানান। সুলতান ইব্রাহীম সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হইলে রাজা গণেশ নতি স্বীকার করেন এবং নূর কুতুব আলমের সহিত আপোষ করেন। আপোষের শর্তানুযায়ী রাজা গণেশের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং যদুই জালালউদ্দীন মাহমুদ নাম ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে বসেন। সুলতান ইব্রাহীম শর্কী জালালউদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইয়া জৌনপুরে ফিরিয়া যান। বুকাননের বিবরণীতেও এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। মুদ্রা প্রমাণেও এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ৮১৮ হিজরী হইতে সুলতান জালালউদ্দীন মাহমুদ বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ট ছিলেন। ৮১৭ হিজরীতে জারীকৃত সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং রাজা গণেশ অতি অল্প কালের জন্য (৮১৭ হিজরীর শেষের দিকে বা ৮১৮ হিজরীর প্রথম দিকে) সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ৮১৮ হিজরী হইতে তাহার পুত্র যদু জালালউদ্দীন মাহমুদ নামে বাংলাদেশ শাসন করিতে থাকেন।

কোন কোন সূত্রে রাজা গণেশ কর্তৃক দ্বিতীয় বার সিংহাসন অধিকারের উল্লেখ আছে। সুলতান ইব্রাহীম শার্কীর প্রত্যাবর্তনের পর পরই রাজা গণেশ শাসনদণ্ড পরিচালনা আরম্ভ করেন এবং পুত্র যদুকে সুবর্ণধেনু ব্রত দ্বারা পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করেন। মুদ্রা প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই সময়ে রাজা গণেশ গৌরবসূচক "দনুজমর্দন" এবং "চণ্ডীচরণ পরায়ণ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। দনুজমর্দনদেব নামে এক হিন্দু রাজার কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলির এক পৃষ্ঠে রাজার নাম ও অপর পৃষ্ঠে টাকশালের

নাম, তারিখ ও 'শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণস্য' লেখা আছে। দনুজমর্দনদেবের মুদ্রাসমূহ ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে পাণ্ডুনগর, সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগ্রাম টাকশাল হইতে প্রকাশিত। মহেন্দ্রদেব নামে একজন রাজার মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। এইসব মুদ্রা ১৩৪০ শকাব্দে পাণ্ডুনগর ও চাটিগ্রাম টাকশাল হইতে প্রকাশিত। ১৩৩৯—৪০ শকাব্দ ৮২০—২১ হিজরীর সমসাময়িক। ৮২০ হিজরীতে জারিকৃত জালালউদ্দীন মাহমুদের কোন মুদ্রা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাহার ৮১৯ হিজরীর মুদ্রাও অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই ডঃ ভট্টশালী অনুমান করিয়াছেন যে রাজা গণেশ দ্বিতীয়বার সিংহাসন অধিকার করিয়া দনুজমর্দনদেব উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভট্টশালীর এই মত সর্বজন স্বীকৃত নয়। অনেকে দনুজমর্দন দেবকে পূর্ব বঙ্গীয় একজন রাজা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

৮২১ হিজরী হইতে আবার জালালউদ্দীন মাহমুদের মুদ্রা পাওয়া যায়। যদি রাজা গণেশ কর্তৃক দ্বিতীয়বার সিংহাসন অধিকারের কথা সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে রাজা গণেশ ৯১৯-২০ হিজরীতে ক্ষমতাসীন ছিলেন। মুদ্রা প্রমাণে বলা যায় যে জালালউদ্দীন মাহমুদ ৮২১ হিজরী হইতে ৮৩৫ হিজরী পর্যন্ত (১৪১৮—১৪৩১) রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনেকে দনুজমর্দনদেবের উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রদেব ও জালালউদ্দীনকে এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ মহেন্দ্রদেবকে গণেশের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সীমিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। এমনও হইতে পারে যে দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি এবং তাহারা জালালউদ্দীনের রাজত্বকালে বাংলাদেশের কিছু অংশে ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শাসক হিসাবে জালাল উদ্দীন মাহমুদ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ফিরিশতা, নিজামউদ্দীন বখ্শী ও গোলাম হোসেন তাহার সুশাসনের প্রশংসা করিয়াছেন। ফীরূজাবাদ, সোনারগাও, মুয়াজ্জামাবাদ, সাতগাঁও, চাটগাঁও, ফতেহাবাদ ও রোতাসপুর টাকশাল হইতে তাহার মুদ্রা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বৃহদাংশ তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। রিয়াজ-উস-সালাতীন হইতে জানা যায় যে তিনি রাজধানী পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। একই

সূত্রে জানা যায় যে জালালউদ্দীন মাহমুদ তাহার স্ত্রী ও পুত্রসহ পাণ্ডুয়ার এক লাখী সমাধি সৌধে সমাধিস্থ আছেন। এই সমাধি সৌধ বাংলার মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের এক অনন্য সাধারণ নিদর্শন।

জালালউদ্দীন মাহমুদ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি তাহার রাজত্বের শেষের দিকের মুদ্রায় "খলিফাতুল্লাহ্" উপাধি ধারন করিয়াছিলেন। তিনি চীন সম্রাট, পারস্য ও মিসরের সুলতান এবং দামেস্কের খলিফার সহিত দূত বিনিময় করিয়াছিলেন।

সুলতান জালালউদ্দীন মাহমুদের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শামসউদ্দীন আহমদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৮৩৬ হিজরীতে উৎকীর্ণ তাহার একটিমাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। শামসউদ্দীন আহমদ শাহ সম্বন্ধে ফিরিশতা ও রিয়াজ-উস-সালাতীনে পরস্পর বিরোধী তথ্য আছে। ফিরিশতা তাহাকে ন্যায় পরায়ণ ও উদার বলিযা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রিযাজ তাহাকে অত্যাচারী ও রক্ত পিপাসু বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। সভাসদগণের ষড়যন্ত্রে সুলতানের দুইজন কৃতদাস সাদী খান ও নাসির খান সুলতানকে হত্যা করেন। তাহার মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নয। পরবর্তীকালে নাসির খান সাদী খানকে হত্যা করিয়া নিজেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু কৃতদাসের আধিপত্য অপমানজনক বিবেচনা করিয়া গৌড়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সাতদিনের মধ্যেই তাহাকে হত্যা করে। অমাত্য ও সেনানায়কগণ ইলিয়াস শাহের এক বংশধর নাসির খানকে সিংহাসনে বসান। এইভাবে ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরভ্যুদয় হয়। ৮৪৬ হিজরীতে (১৪৪২খৃঃ) নাসির খান সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ উপাধি ধারণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ৮৪৬—৮৯০ হিজরী পর্যন্ত ৪৫ বৎসর কাল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন বাংলাদেশে কায়েম ছিল।

সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। রিয়াজে উল্লেখিত আছে যে তাঁহার শাসনকালে বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে সমস্ত প্রজা তৃপ্ত ছিল। বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্যে পুনরায় সামরিক শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ৮৬৩ হিজরীতে (১৪৫৯ খৃঃ) বাগের হাটের খানজাহান আলীর সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, যশোহর ও খুলনা অঞ্চল নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই অঞ্চলে ব্যাপক প্রবাদ

আছে যে খানজাহান নামে বাংলার সুলতানের একজন সেনাপতি ঐ অঞ্চলে প্রথম মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। উড়িষ্যা রাজ কপিলেন্দ্রদেবের এক শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাহার সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ হইয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ কপিলেন্দ্রদেবের সমসাময়িক গৌড়ের সুলতান নাসির-উদ্দীন মাহমুদই ছিলেন। মিথিলারাজের সহিত নাসিরউদ্দীনের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াও অনুমান করা হয়।

তাহার রাজত্ব কালের টাকশাল ও বিভিন্ন শিলালিপির সংস্থান হইতে তাহার রাজ্য সীমা অনুমান করা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ ও বিহারের কতকাংশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে তাঁহার রাজ্য সীমা পশ্চিমে ভাগলপুর, পূর্বে ফরিদপুর, উত্তরে গৌড় পাণ্ডুয়া এবং দক্ষিণে ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তাঁহার শাসনকালের বহু মসজিদ, খানকা, তোরণ, সেতু, সমাধি সৌধ এ প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া লিপি প্রমাণ আছে। সুতরাং মনেহয় তাঁহার রাজত্বে দেশে শান্তি বিরাজমান ছিল এবং সুলতান নাসিরউদ্দীন স্থাপত্য শিল্পে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। ৮৬৩ হিজরী পর্যন্ত তাঁহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ঐ বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র রুকনউদ্দীন বরবক শাহ সিংহাসনে আরোহন করেন।

৮৬৩ হিজরী হইতে ৮৭৮ হিজরী পর্যন্ত বরবক শাহের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে পিতার রাজত্ব কালে তিনি সাতগাঁও এর শাসনকর্তা হিসাবে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সুলতান হিসাবেও তিনি অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকাল বাংলাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বরবক শাহের সামরিক ক্ষেত্রে কৃতিত্বের ইতিহাস আমরা বিখ্যাত সৈনিক-দরবেশ শাহ্ ইসমাইল গাজীর জীবনী "রিসালাত-উস-শুহাদা" হইতে জানিতে পারি। এই গ্রন্থ ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে পীর মুহাম্মদ শাত্তারী রচনা করেন। বরবক শাহের রাজত্বের প্রথমদিকে উড়িষ্যারাজ গজপতি সীমান্তবর্তী দুর্গ গড়মন্দারন (হুগলী জিলায়) অধিকার করেন, ফলে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। বিধর্মীদের এই অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য তিনি শাহ ইসমাইল গাজীকে প্রেরণ করেন। ইসমাইল গাজী গজপতিকে পরাজিত

করিয়া গড়মন্দারন পুনরুদ্ধার করেন। ইহার কিছুকাল পর শাহ্ ইসমাইলের উপর কামরূপরাজ কামেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্বের ভার পড়িল। এই সময়ে করতোয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চল কামরূপরাজ দখল করিয়া নিলে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। সন্তোষের রণক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধে বাংলার সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটে। সামরিক বিজয়ে ব্যর্থ হইলেও শাহ্ ইসমাইল গাজী তাহার সাধুগুণের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল করিলেন। তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া কামরূপ রাজ আত্মসমর্পণ করেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। ইসমাইলের এই সুখ্যাতি বেশীদিন স্থায়ী রহিল না। ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাধ্যক্ষ ভাণ্ডসীরাও ইসমাইলের উপর ঈর্ষা পরায়ণ হইয়া সুলতানের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিলেন যে, সে কামরূপ রাজ্যের সহিত জোট বাধিয়া এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন। বরবক শাহের আদেশে (১৪৭৪ খৃঃ) ইসমাইলকে হত্যা করা হয়।

বরবক শাহের রাজত্বকালে হাব্‌শী দাসগণ শাসনকার্যে প্রাধান্য লাভ করে। কথিত আছে যে, তিনি প্রায় আট হাজার কৃতদাস সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। হাব্‌শীদের এই প্রাধান্য বিস্তারের ফলেই পরবর্তীকালে তাহারা সিংহাসন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

বরবক শাহ নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। শিলালিপিতে বিভিন্ন রাজকীয় উপাধির সহিত দুইটি উপাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বরবক শাহ তাহার নামের সহিত আল্ কামিল এবং আল-ফাজিল উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া মালাধরবসু শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বরবক শাহ মালাধর বসুকে গুনরাজ খান উপাধি দান করিয়াছিলেন। মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজও খান উপাধি পাইয়াছিলেন। স্থাপত্য শিল্পক্ষেত্রেও বরবক শাহের অবদান রহিয়াছে। গৌড়ে রাজ প্রাসাদ এবং "দাখিল দরওয়াজা" নামে পরিচিত বিরাট প্রবেশ তোরণটি তাহার স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন বহন করিতেছে।

বরবক শাহের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাহার পুত্র শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে ধর্মনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র, আদর্শবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ ও সুদক্ষ নরপতি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

স্থাপত্যশিল্পে তাঁহার বিশেষ অবদান ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার আদেশে বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে গৌড়ের কদমরসুল মসজিদ, দরসবাড়ি মসজিদ ও তাঁতীপাড়া মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কানিংহামের মতে গৌড়ের লোটন মসজিদও তাঁহারই কীর্তি। তাঁহার আমলের শিলালিপি সমূহের প্রাপ্তিস্থান হইতে মনে হয় যে তিনি বিশাল সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মুদ্রা ও লিপি প্রমাণে বলা যায় যে তিনি ৮৮৫ হিজরী পর্যন্ত (১৪৮০-৮১ খৃ:) রাজত্ব করেন।

তারিখ-ই-ফিরিশতা ও রিয়াজ-উস-সালাতীন এর মতে ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকান্দর শাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য অল্পদিন পরেই তাঁহাকে অপসারিত করিয়া ইউসুফ শাহের অন্য পুত্র জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ্কে সিংহাসনে বসানো হয়। লিপি ও মুদ্রা প্রমাণে বলা যায় যে তিনি ৮৮৬ হইতে ৮৯২ হিজরী (১৪৮১—১৪৮৬খৃ:) পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রুকনউদ্দীন বরবক শাহ্ ও ইউসুফ শাহের শাসনকালে হাবশী ক্রীতদাসদের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে। হাবশী ক্রীতদাসগণ বিভিন্ন উচচ রাজপদে অধিষ্ঠ ছিল। অকস্মাৎ অত্যাধিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া তাহারা উদ্ধত হইয়া উঠিল। ফতে শাহ তাহাদের ক্ষমতা খর্ব করিতে মনস্থ করিলেন এবং উদ্ধত দাসদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ফলে বিরোধীদল ষড়যন্ত্র শুরু করিল। প্রাসাদরক্ষী সুলতান শাহজাদাকে দলভুক্ত করিয়া তাঁহারা ফতেহ শাহকে হত্যা করে, এবং হত্যাকারী হাবশী ক্রীতদাস সুলতান শাহজাদা 'বরবক শাহ' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইভাবে বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্যে ইলিয়াস শাহী বংশের গৌরবময় শাসনের অবসান ঘটে এবং হাবশী ক্রীতদাসদের শাসনের সূচনা হয়। আমীর ওমরাহগণের ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে সুলতান রুকনউদ্দীন বরবক শাহ আবিসিনিয়া হইতে হাবশী ক্রীতদাস আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে প্রাসাদ রক্ষার কাজে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহারা রাজ্যের প্রধান প্রধান পদগুলি অধিকার করে এবং তাহাদের ঔদ্ধত্য বাড়িয়া যায়। সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ্ শাহ তাহাদের ক্ষমতা খর্ব করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাহাদের চক্রান্তে তাঁহার প্রাণ যায় এবং রাজক্ষমতা হাবশীদের হাতে চলিয়া যায়।

প্রায় ছয় বৎসরকাল (৮৯০—৮৯৬হিঃ।১৪৮৭—১৪৯৩খৃঃ) বাংলাদেশে হাবশী শাসন কায়েম ছিল। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে এই ছয় বৎসর এক কলঙ্কময় অধ্যায়। এই ছয় বৎসরে চারিজন হাবশী সিংহাসন অধিকার করেন এবং প্রত্যেক সুলতানই নিহত হইয়াছিলেন। ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, হত্যা ও নাতিদীর্ঘ রাজত্ব বাংলাদেশকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

জালালউদ্দীন ফতেহ শাহকে হত্যা করিয়া বরবক শাহ হাবশী সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু রাজ্যে প্রধান অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষ হাবশী মালিক আন্দিল তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং অবশেষে তাহাকে হত্যা করিয়া নিজেই ক্ষমতা দখল করেন। মালিক আন্দিল সাইফউদ্দীন ফীরুজ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তিন বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাঁহাকে দয়ালু ও মহৎ বলিয়া পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ প্রশংসা করিয়াছেন। রিয়াজ-উস-সালাতীনের বর্ণনানুসারে প্রাসাদরক্ষী সেনাদলের হস্তে তিনি নিহত হইয়াছিলেন। মুদ্রা ও লিপি হইতে মালিক আন্দিলের পর সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের নাম পাওয়া যায়। এই নামে ইতিপূর্বে আর একজন সুলতান ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ বলা হইয়া থাকে। তবকাৎ-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশতা ও রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতে তিনি সাইফউদ্দীন ফীরুজ শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মুদ্রায় বা লিপিতে তাঁহার পিতৃ-পরিচয় সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।

দ্বিতীয় নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে হাবশ খান নামক একজন হাবশী ক্রীতদাস রাজকোষ ও শাসন ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা হইয়া উঠে। মাহমুদ শাহ তাহার হাতের পুতুলে পরিণত হন। সদর বদর নামে অন্য এক হাবশী হাবশ খানের প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে হত্যা করে এবং নিজেই রাজ্যের কর্তা হইয়া বসেন। কিছুদিন পর পাইকদের সর্দারের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি মাহমুদ শাহকে হত্যা করেন এবং নিজে শামসউদ্দীন মুজাফ্ফর শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসেন।

শামসউদ্দীন মুজাফফর শাহ্ প্রায় দুই বৎসরকাল (১৪৯১—১৪৯৩খৃঃ) রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন উদ্ধত, নৃশংস ও রক্তপিপাসু প্রকৃতির। সুলতান হইয়া তিনি বহু শিক্ষিত, ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত লোককে হত্যা করেন। রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে প্রজাবৃন্দ তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে মুজাফফর শাহের দুই বৎসরকাল রাজত্ব বাংলা-

দেশে অরাজকতার চরম দৃষ্টান্ত। রিয়াজে উল্লেখিত আছে যে গৌড়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ না করিলেও অসহযোগ আরম্ভ করিলেন। তাহাদের সহিত যোগ দিলেন মুজাফ্ফর শাহের উজীর সৈয়দ হোসেন। অবশেষে অমাত্যদের বিদ্রোহে সুলতান মুজাফ্ফর শাহ নিহত হন। বাংলাদেশে হাবশী শাসনের বিভীষিকা বিদূরিত হইল, দেশ অত্যাচার ও অনাচার হইতে অব্যাহতি পাইল।

ইলিয়াস শাহী বংশের কৃতিত্ব ও অবদান

ইলিয়াস শাহী বংশ বাংলাদেশে প্রায় ১২০ বৎসরকাল শাসনকার্য পরিচালনা করেন। প্রথম পর্যায়ে ইলিয়াস শাহ হইতে শুরু করিয়া আলাউদ্দীন ফীরুজ শাহ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ হইতে জালালউদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্ব পর্যন্ত অষ্টপুরুষব্যাপী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন বাংলাদেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালের মধ্যভাগে রাজা গণেশের বংশ প্রায় ২৫ বৎসর কাল শাসন ক্ষমতা দখল করিয়াছিল। তবে তাঁহাদের শাসন অবসানের পর বাংলাদেশের সিংহাসনে ইলিয়াস শাহী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাঁহাদের জনপ্রিয়তা ও কৃতিত্বেরই পরিচায়ক।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী যুগ একটি স্মরণীয় যুগ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের অবদানের কথা বলিতে গেলে সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতে হয় যে ইলিয়াস শাহ্ বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানী দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যদিও ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াস শাহ্ই স্বাধীনতার সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া তিনি বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানী দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফীরুজ তুঘলকের বাংলাদেশ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা দুই দুইবার ব্যাহত করিয়া ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী করিতে তাঁহাদের এই সাফল্য নিশ্চয়ই সাহায্য করিয়াছিল।

সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী মুসলিম শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ সীমান্তের চতুর্পার্শ্বে তাঁহাদের সামরিক শক্তির প্রভাব বিস্তার

করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দিল্লীতে তুঘলক বংশের শাসনের অবসানের পর দিল্লীর মুসলিম রাজ্যের অপেক্ষাকৃত দুর্বলতা ও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে তৈমুর লং-এর আক্রমন বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্যের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল। ফলে বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহী শাসন তেমন কোন বলিষ্ঠ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় নাই।

দিল্লীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদের ফলে বাংলাদেশের ইলিয়াস শাহী শাসকগণ স্বাভাবিক কারণেই দেশীয় জনগণের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। ফলে মুসলিম শাসন বাংলাদেশীয় মুসলিম শাসনে পরিণত হয়। উচ্চ রাজকার্যে হিন্দুদের নিয়োগ, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর এবং দেশীয় পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা ইলিয়াস শাহী শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে বাংলাদেশে মুসলিম সামরিক বিজয়কে সাংস্কৃতিক বিজয় দ্বারা সুসম্পন্ন করায় ইলিয়াস শাহী বংশের বিশেষ কৃতিত্ব রহিয়াছে। বাংলাদেশে সামাজিক জীবনে এক নূতন ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল ইলিয়াস শাহী যুগে।

স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রেও ইলিয়াস বংশের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। এই যুগে বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্য শিল্প স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল শান্তি বিরাজমান থাকায় শিল্পের উৎকর্ষতা ও প্রসারের দিকে সুলতানগণ মনোযোগী হইতে পারিয়াছিলেন। বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ ও সমাধিসৌধ এই যুগে নির্মিত হইয়াছে। ফলে ইলিয়াস শাহী যুগ স্থাপত্য শিল্পের বিবর্তনের ইতিহাসেও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ইসলাম ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিস্তার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ স্থাপনের সাথে সাথে তাঁহারা প্রায় সকলেই সুফী ও আলিমদিগকে বিশেষ-ভাবে সাহায্য দান করিতেন। ফলে ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশের আনাচে কানাচে প্রসার লাভ করিয়াছিল।

বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্যকে বহির্বিশ্বের সহিত পরিচিত করাইবার কৃতিত্বও ইলিয়াস শাহী সুলতানদের। আরবদেশ ও পারস্যের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া এবং দীর্ঘকালব্যাপী চীনের সহিত দূত বিনিময়ের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বের নিকট পরিচিত করাইয়াছিলেন।

মোটামুটিভাবে এই কথা বলা যায় যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দৃঢ় করিয়া, সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী মুসলিম রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা লাভ করিয়া, স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া এবং শিল্পকলা ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া স্থাপত্য শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষ অবদান রাখিয়া ইলিয়াস শাহী শাসকগণ বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্যকে এক নূতন রূপ দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হুসেনশাহী যুগ

বাংলাদেশে হাবশী শাসনের অবসান ঘটাইয়া উজীর সৈয়দ হুসেন সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ উপাধি ধারণ করিয়া স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। হাবশী শাসনের দুর্যোগময় অধ্যায়ের অবসান হইল, পুনরায় সূচিত হইল শান্তি ও শৃঙ্খলার যুগ। সিংহাসন নিয়া বিবাদ, ষড়যন্ত্র, হত্যা ও প্রজা সাধারণের উপর নির্মম অত্যাচারই ছিল হাবশী শাসনের ধারা। বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্যের এই শোচনীয় অবস্থায় প্রয়োজন ছিল একজন যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তির। আলাউদ্দীন হুসেন শাহ অসীম যোগ্যতার সহিত এই দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন এবং শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বাংলাদেশের মুসলিম শাসনকে এক নবজীবন দান করিয়াছিলেন। ১৪৯৩ হইতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশের চারিজন সুলতান—আলাউদ্দীন হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ, আলাউদ্দীন ফীরুজ শাহ ও গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ—বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের শাসনকালে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সামরিক ক্ষেত্রে সাফল্য ও বাঙালী প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ফলে বাঙালী জীবনে নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল। এই সময়েই বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। এক-কথায় বলা যাইতে পারে যে বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীন ক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাই হুসেনশাহী যুগকে বাংলাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল যুগ বলা যাইতে পারে।

সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ

বাংলাদেশের মুসলিম সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হুসেন শাহই সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার খ্যাতি এই দেশের ঘরে ঘরে জনস্মৃতিতে আজও অম্লান। উড়িষ্যা হইতে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে তাঁহার নাম সুপরিচিত। সুশাসক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি জনগণের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল; ইহাই তাঁহার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

সুদূর প্রসারিত সাম্রাজ্যে তাঁহার খ্যাতি পাইয়াছিল ব্যাপক প্রসার ক্ষেত্র। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ফলে চৈতন্যের সাথে তাঁহার নামও বাঙালী স্মৃতিতে স্থায়ী আসন পাইয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের অন্যান্য সুলতানদের মত তাঁহারও প্রামানিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁহার শাসনকালের বেশ কিছু সংখ্যক লিপি পাওয়া গিয়াছে। তবে সমসাময়িক লেখনীতে তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া যায়। আরবী, ফার্সী, বাংলা, সংস্কৃত, উড়িয়া, অসমীয়া, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন সূত্রে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে লিখিত ফার্সী ইতিহাসেও কিছু কিছু তথ্য আছে। ইহাদের মধ্যে একমাত্র রিয়াজ-উস-সালাতীনে কতকটা বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। রিয়াজের তথ্য অনেকাংশে অন্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থসমূহে, আলাউদ্দীন হুসেন শাহ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। উড়িষ্যার মাদলাপঞ্জী, আসামের বুরঞ্জী এবং ত্রিপুরার রাজমালায় ঐ সব দেশসমূহের সহিত হুসেন শাহের যুদ্ধের কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। তবে ইহাদের মধ্যে কোনটিই সমসাময়িক নয় এবং ইহাদের বর্ণনায় পক্ষ-পাতিত্ব সুস্পষ্ট। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকালেই পর্তুগীজরা প্রথম বাংলাদেশে পদার্পণ করে। ফলে কয়েকজন পর্তুগীজ পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং জোআঁ দ্য বারোসে প্রমুখ পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের লেখনীতেও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে এইসব সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য হইতেই আলাউদ্দীন হুসেন শাহের ইতিহাস পুন-রুদ্ধার করা যায়। তবে তাহা কষ্টসাধ্য এবং স্থানে স্থানে অস্পষ্টতা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ যথার্থই আক্ষেপ করিয়াছেন যে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সভায় একজন আবুল ফজল ছিল না, থাকিলে হয়তো তাঁহার কীর্তিসমূহের বিবরণ থাকিত। তবুও তাঁহার কার্যাবলী সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাহা তাঁহাকে নিঃসন্দেহে মহৎ প্রতিপন্ন করে এবং তাঁহাকে মহামতি আকবরের সহিত তুলনা করা সম্ভব।[১]

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের বাল্য জীবন ও ক্ষমতালাভ সম্বন্ধে তেমন স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। বিভিন্ন সূত্রে যেই সব তথ্য আছে তাহার

১। J. N. Sarkar (ed.), History of Bengal, Vol. II, p. 152

উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। রিয়াজ-উস-সালাতীনের লেখক সলিমের মতে হুসেন শাহ তাঁহার পিতা সৈয়দ আশরাফুল হোসেন ও ভ্রাতা ইউসুফের সাথে সুদূর তুর্কীস্তানের তিরমিজ শহর হইতে বাংলাদেশে আসেন এবং রাঢ়ের চাঁদপাড়া মৌজায় বসতি স্থাপন করেন। সেখানকার কাজী তাঁহাদের দুই ভাইকে শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদের উচ্চবংশ মর্যাদার কথা শুনিয়া হুসেনের সহিত তাঁহার নিজ কন্যার বিবাহ দেন। হুসেন বাংলাদেশের রাজধানী গৌড়ে যান এবং মোজাফফর শাহের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। নিজ যোগ্যতা-বলে তিনি পরবর্তীকালে উজীর পদে উন্নীত হন। সলিম ও ফিরিশতা হুসেনকে 'সৈয়দ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আদিতে তাঁহারা আরবের অধিবাসী ছিল বলিয়া মনে হয়। লিপি ও মুদ্রায় হুসেনের আরব ও সৈয়দ বংশের সহিত সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়। বাল্যজীবনে চাঁদপাড়ার সহিত তাঁহার সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদ জেলার বহুল প্রচলিত কিংবদন্তীতে। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার একানি—চাঁদপাড়া (বা চাঁদপাড়া) গ্রামের আশেপাশে হুসেন শাহর রাজত্বকালের বেশ কয়েকটি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে হুসেন বাল্যকালে চাঁদপাড়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালের কাজ করিতেন এবং পরবর্তীকালে সুলতান হইয়া তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে মাত্র এক আনা করের বিনিময়ে চাঁদপাড়া গ্রামখানি ভোগ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। অদ্যাবধি এই গ্রামের নাম একানি—চাঁদপাড়া এবং এই নামই এই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করে।

চাঁদপাড়া হইতে হুসেন গৌড়ে যান এবং সেখানে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে অন্য এক কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে রাজা হইবার অনেক আগে সৈয়দ হুসেন "গৌড় অধিকারী" (উচ্চ রাজ কর্মচারী) সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী করিতেন। সুবুদ্ধি তাহাকে একটি দিঘী খননের কাজে নিয়োগ করেন এবং কাজে ত্রুটির জন্য তাহাকে বেত্রাঘাত করেন। পরে সৈয়দ হুসেন সুলতান হইয়া সুবুদ্ধি রায়ের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু স্ত্রীর প্ররোচনায় তিনি সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ করেন। এই কাহিনীর সত্যতা যাঁচাই করা সম্ভব নয়। তবে গৌড়ে সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী গ্রহণ মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

মনে হয় সামান্য চাকুরী হইতে হুসেন নিজ যোগ্যতাবলে উচ্চরাজপদে উন্নীত হন এবং খুব সম্ভবতঃ হাবশী সুলতান মুজাফ্ফর শাহের রাজত্বকালে তিনি উজীর পদে অধিষ্ট ছিলেন। কারণ ক্ষমতা অধিকারের পূর্বে উচ্চপদে থাকাই স্বাভাবিক। গোলাম হুসেন সলিম ও নিজামউদ্দিন আহমদ বখশী তাঁহাকে উজীর বলিযাই উল্লেখ করিয়াছেন। মুজাফ্ফর শাহের হত্যার সহিত হুসেন জড়িত ছিলেন বলিয়া মনে হয়, তবে তাঁহার ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে খুব সম্ভবতঃ মুজাফ্ফব শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণ মিলিত হইযা হুসেন শাহকে সুলতান মনোনীত করেন।

এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সুখময় মুখোপাধ্যায় হুসেন শাহকে বহিরাগত বলিয়া মানিতে দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের উক্তির উপর ভিত্তি কবিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে হুসেন শাহের গায়ের রং কালো ছিল এবং তিনি বাংলাদেশেরই সন্তান ছিলেন।[১] তবে তাহার যুক্তি নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বকালে বাংলাদেশে মুসলিম রাজ্যের চতুর্দিকে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। তবে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিবার পূর্বে হুসেন শাহ অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অরাজকতা সৃষ্টিকারী সৈন্যদলকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সুলতানের হত্যাকাণ্ডে প্রধান অংশ নিয়াছিল দেহরক্ষী পাইকদল। হুসেন শাহ পাইকদের দল ভাঙিয়া দিয়া নূতন এক রক্ষীবাহিনী গঠন করিলেন। হাবশীদের তিনি রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। তাহাদের পরিবর্তে তিনি সৈয়দ, মোঙ্গল, আফগান ও হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি বিধানের উদ্দেশ্যে তিনি অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন।

আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করিয়া সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ রাজ্যসীমা সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করেন। হুসেন শাহের সামরিক কৃতিত্বসমূহ পাঁচভাগে ভাগ করা যায়:—(১) সিকান্দার লোদীর সহিত সন্ধি ও উত্তর বিহার অধিকার; (২) কামতা-কামরূপ ও

১। সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, পৃঃ ১৮০—১৮২

আসাম অভিযান; (৩) উড়িষ্যা অভিযান; (৪) ত্রিপুরার সহিত সংঘর্ষ এবং (৫) চট্টগ্রাম বিজয়।

সিংহাসন আরোহণের দুই বৎসরের মধ্যেই হুসেন শাহের সহিত দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের শর্কী সুলতান ও দিল্লীর লোদী সুলতানের মধ্যে সংঘর্ষ এক চরম পর্যায়ে পৌঁছে। এই বৎসর দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদী জৌনপুরের শর্কী শাসক হোসেন শাহ্ শর্কীকে বেনারসের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। হোসেন শাহ শর্কী পরাজিত হইয়া বাংলার অভিমুখে পলায়ন করেন। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ শর্কী সুলতানকে উপযুক্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন; তাঁহাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেন এবং ভাগলপুরের কাছে কহলগাঁওএ তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করেন। খুব সম্ভব হুসেন শাহ মনে করিয়াছিলেন যে জৌনপুর রাজ্য দিল্লী ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ থাকিলে তাঁহার পক্ষে মঙ্গলকর হইবে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের জৌনপুরের শাসকের প্রতি এই মিত্রতা সুলভ আচরণে সিকান্দর লোদী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ খান লোদী এবং মুবারক খান লোহানীর নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী হুসেন শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হুসেন শাহও তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য তাঁহার পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী পাঠাইলেন। বিহারের বারহ্ নামক স্থানে (পাটনার পূর্বাঞ্চল) দুই পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হন। কিন্তু কোন যুদ্ধ হয় নাই। শেষ পর্যন্ত দুইপক্ষ সন্ধি স্থাপন করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া যায়। সন্ধির সময় হুসেন শাহের পক্ষে দানিয়েল প্রতিশ্রুতি দেন সিকান্দর শাহের শত্রুকে ভবিষ্যতে আর বাংলায় আশ্রয় দেওয়া হইবে না। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে জানা যায় এই শর্ত পালিত হয় নাই। বদাওনী "মন্তখব-উৎ-তওয়ারিখে" লিখিয়াছেন, "দুই পক্ষই নিজের রাজ্য নিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেন।" সারণ এবং মুঙ্গিরে আবিষ্কৃত হুসেন শাহের শিলালিপি হইতে জানা যায় হুসেন শাহ সম্পূর্ণ উত্তর বিহার এবং দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশ দখল করিয়াছিলেন। সিকান্দর লোদীর সহিত সন্ধির শর্তানুসারে তিনি এই এলাকা সমূহ দখল করিয়াছিলেন কিংবা সিকান্দর লোদীর সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পর যুদ্ধ করিয়া তিনি তাহা দখল করিয়াছিলেন। তবে এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়।

পশ্চিম সীমান্তের ভয় দূরিভূত হইলে হুসেন শাহ পূর্বসীমান্তে রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। হুসেন শাহ তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসর হইতেই মুদ্রায় নিজেকে 'কামরূপ-কামতা জাজনগর উড়িষ্যা বিজয়ী' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মুদ্রায় এই উল্লেখ হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে হুসেন শাহ্ প্রথম হইতেই রাজ্যজয়ের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উল্লেখযুক্ত মুদ্রা তাঁহার রাজত্বকালের বিভিন্ন সময়ে জারী করা হইয়াছে এবং ৯২৪ হিজরী।১৫১৮ খৃঃ পর্যন্ত মুদ্রায় এই উল্লেখ দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'বাহারিস্তান-ই-গায়বী' গ্রন্থে কামরূপ ও কামতা রাজ্যদ্বয়ের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। কামরূপ রাজ্যের পূর্বসীমা ছিল ব্রহ্মপুত্র নদী এবং পশ্চিম সীমা ছিল বনাস বা মনসা নদী; কামতা রাজ্য বনসা হইতে শুরু হইয়া করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খেন বংশীয় তৃতীয় রাজা নীলাম্বর সামরিক বিজয় দ্বারা এই দুইটি রাজ্য একত্রিত করিয়াছিলেন। পূর্বে বরনদী হইতে পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডের তিনি একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। হাবশী শাসনকালে খেন রাজগণ করতোয়ার পূর্বতীরস্থ অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এমনকি বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্যের পূর্ব সীমান্তবর্তী ঘোরাঘাট ও কান্তাদুয়ারও তাহাদের অধিকারে ছিল। সুতরাং আলাউদ্দীন হুসেন শাহ পূর্বসীমান্তের এই শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন তাহা খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্যের সহিত কামরূপের সংঘর্ষ কোন নূতন ঘটনা নয়, মুসলিম রাজ্যের প্রাথমিক যুগ হইতেই এই সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। প্রচলিত কিংবদন্তীতে হুসেন শাহ এই বিজয়ে নীলাম্বরের মন্ত্রী কর্তৃক প্ররোচিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এই সংঘর্ষে হুসেনের সাফল্য সম্বন্ধে প্রায় সব সূত্রই একমত। তবে কোন কোন সূত্রে উল্লেখিত আছে যে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে মুসলমানদের জয় হইয়াছিল। মনে হয় দীর্ঘকাল অবরোধের পর হুসেন শাহ জয়লাভ করেন এবং কামতা-কামরূপ বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দানিয়েলকে বিজীতরাজ্যের শাসনভার অর্পণ করা হয়। অসমীয়া বুরঞ্জীতে তাহাকে দুলাল গাজী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ দানিয়েলের বিকৃতরূপই দুলাল গাজী। হুসেন শাহের রাজত্বকালে কামরূপে মুসলমান অধিকার বজায় ছিল, কারণ আসাম বুরঞ্জী মতে পরবর্তী সুলতান নসরৎ শাহের রাজত্বকালে কামরূপ হাজো বাংলার সুলতানের

অধিকারে ছিল এবং সেখান হইতে আসামে অভিযান পরিচালনা করা হইয়াছিল।

মীর্জা মুহাম্মদ কাজিমের 'আলমগীরনামা', শিহাবউদ্দীন তালিশের 'তারিখ-ফত-ই-আসাম' (বা ফতুহিয়া-ই-ইব্রিয়া) ও গোলাম হুসেন সলিমের 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' গ্রন্থে হুসেন শাহ কর্তৃক আসাম অভিযানের উল্লেখ আছে। অসমীয়া বুরঞ্জীতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। খুব সম্ভবতঃ হুসেন শাহ কামরূপ বিজয়ের পর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। এক বিশাল অশ্বারোহী এ পদাতিক সেনাবাহিনী এবং নৌ বাহিনী সহকারে এই অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছিল। আসামের রাজা তাঁহাকে বাধা না দিয়া সমতল অঞ্চল ত্যাগ করিয়া পার্বত্যাঞ্চলে গমন করেন। হুসেন শাহ সমতল অঞ্চলে পুত্র দানিয়েলকে (দুলাল গাজী) রাখিয়া ফিরিয়া আসেন। কিন্তু বর্ষার আগমনের সাথে সাথেই আসাম রাজা পাল্টা আক্রমণ করেন। বর্ষাকালে সমস্ত অঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় মুসলমান সৈন্যদল বিপদের সম্মুখীন হয়। আসাম রাজ মুসলমান সৈন্য-দলকে পরাজিত করেন এবং স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন সূত্র হইতে ইহাই মনে হয় যে প্রাথমিক সাফল্যের পর হুসেন শাহের আসাম অভিযান শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। আসামের হোসেন শাহী পরগণা নামে পরিচিত একটি অঞ্চল এখনও হুসেন শাহের স্মৃতি বহন করিতেছে।

কামরূপ ও আসামের বিরুদ্ধে অভিযানের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। ৮৯৯হিঃ।১৪৯৪ খৃঃ হইতে ৯২৪হিঃ।১৫১৮ খৃঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে উৎকীর্ণ মুদ্রায় কামরূ-কামতা ও উড়িষ্যা-জাজনগর জয়ের উল্লেখ আছে। তাই সিদ্ধান্ত করা হয় যে ১৪৯৪ হইতে আসাম অভিযান শুরু হয় এবং খুব সম্ভবত ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই অভিযান চলে।[১]

মুদ্রার উল্লেখ হইতে জানা যায় যে উড়িষ্যার সহিতও হুসেন শাহের সংঘর্ষ হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ভ্রমণকারী বারবোসা এই সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রিয়াজ ও বুকাননের পাণ্ডুলিপিতে এবং সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া বৃন্দাবন দাসের লেখনীতে, এই সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। উড়িষ্যার মাদলা পঞ্জিকায় ১৫০৯

১। M. R. Tarafdar, Husain Shahi Bengal, পৃঃ ৪৮

খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা গৌড়ীয় মুসলিম সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। সমসাময়িক উড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্রদেব প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের ১৫১০ খৃষ্টাব্দের এক লিপিতে মুসলিম রাজ কর্তৃক হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধারের উল্লেখ হুসেন শাহের আক্রমণের কথাই প্রমাণ করে। তবে হুসেন শাহের সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল কিনা সেই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। ক্ষণস্থায়ী সাফল্য যে হইয়াছিল সেই বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নাই।

হুসেন শাহ এবং ত্রিপুরার রাজার মধ্যেও অনেকদিন ধরিয়া যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল। ত্রিপুরা রাজাদের ইতিহাস 'রাজমালা'য় এই সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। কখন হইতে প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরার সহিত হুসেন শাহের যুদ্ধ শুরু হয় সেই বিষয়ে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে সোনার-গাঁওএ প্রাপ্ত হুসেন শাহের এক শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই তিনি ত্রিপুরার কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। এই লিপিতে হুসেন শাহের কর্মচারী খওয়াস খানকে ত্রিপুরার 'সর-ই-লস্কর' (সামরিক প্রশাসক) বলা হইয়াছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে হুসেন শাহ কর্তক ত্রিপুরা জয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকর নন্দীও লিখিয়াছেন যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হুসেন শাহের অন্যতম সেনাপতি ছুটি খান ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। রাজমালায় হুসেন শাহ ও ত্রিপুরারাজ ধান্য-মাণিক্যের মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌড় মল্লিক ও হাতিয়ান খানের অধীনে প্রেরিত অভিযান ত্রিপুরা বাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হয়। তবে পরবর্তী কালের অভিযান যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহা লিপি প্রমাণ হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এমনও হইতে পারে যে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সাফল্য চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া গৌড়, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজের মধ্যে সংঘর্ষের সহিত জড়িত ছিল। রাজমালা হইতে জানা যায় যে ধান্য-মাণিক্য কিছুকালের জন্য চট্টগ্রামের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিছুকালের জন্য আরাকান রাজ কর্তৃক চট্টগ্রাম দখলেরও উল্লেখ আছে। তবে চট্টগ্রামে স্থায়ী ভাবে হুসেন শাহের অধিকারেরও বহু প্রমাণ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে ও অন্যান্য সূত্রে রহিয়াছে। সুতরাং মনে হয় যে চট্টগ্রাম অধিকারকে কেন্দ্র করিয়া হুসেন শাহের সহিত ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজাদের সংঘর্ষ হইয়াছিল। চট্টগ্রামের অবস্থিতি এবং বাণিজ্যিক কারণে

এই সংঘর্ষ খুবই স্বাভাবিক। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আরাকান ও ত্রিপুরা রাজাদের চট্টগ্রামের উপর অধিকার খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল এবং ১৫১৭ হইতে ১৫৩৮ পর্যন্ত সময়ে চট্টগ্রামের উপর হুসেন শাহী শাসকদের অধিকার অক্ষুন্ন ছিল। হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ এবং খুব সম্ভবত পরবর্তীকালে পরাগল খান ও তাঁহার পুত্র ছুটি খান আরাকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেন। পরাগল খান ও ছুটিখান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। পর্তুগীজ দূত জাও-দা-সিলভেরিওর উক্তি অনুসারে মনে হয় যে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। দ্য ব্যারস উল্লেখ করিয়াছেন যে আরাকানরাজ গৌড়রাজের অধীন সামন্তরাজা ছিলেন।

হুসেন শাহ তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে সামরিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কামতাপুরের খেন রাজ্য ধ্বংস করেন, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশে অধিকার বিস্তার করেন, উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের অংশ বিশেষেও তাঁহার আধিপত্য ছিল। চট্টগ্রামের অধিকার লইয়া আরাকান ও ত্রিপুরারাজ্যের বিরুদ্ধেও তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। একমাত্র আহোমরাজ্যের বিরুদ্ধেই তিনি ব্যর্থতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এই কথা বলিলেও বোধহয় ভুল হইবে না যে বাংলাব স্বাধীন সুলতানী আমলে তাঁহার রাজত্বকালেই বাংলার মুসলিম রাজ্যের শৌযবীর্যের সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্যম প্রকাশ পাইয়াছিল।

দীর্ঘ সাফল্যজনক রাজত্বের পর আলাউদ্দীন হুসেন শাহের মৃত্যু হয়। সোনারগাঁও এর গোয়ালদী মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে ৯২৫ হিজরী/১৫১৯খৃঃ পযন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ঐ একই বৎসর হইতে তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহের মুদ্রা পাওয়া যায়। সুতরাং নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বৎসর রাজত্বের পর হুসেন শাহের মৃত্যু হয়। বাবুরের আত্মকাহিনী হইতে জানা যায় যে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল।

হুসেন শাহ সাধারণ অবস্থা হইতে নিজ ক্ষমতাবলে রাজ সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহ, অত্যাচার ও অনাচারের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া তিনি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার রাজত্বকালের বেশীর ভাগ সময়ই বৈদেশিক যুদ্ধ বিগ্রহে কাটিয়াছিল, কিন্তু ইহাতে দেশের শান্তি ব্যাহত হয় নাই। ইহা আভ্যন্তরীণ সুষ্ঠুশাসন-

ব্যবস্থারই পরিচায়ক। সুশাসক হিসাবে জালাউদ্দীন হুসেন শাহ তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকেই যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিজয়গুপ্ত কর্তৃক ১৪৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে হুসেন শাহের শাসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে 'নৃপতি তিলক' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

শাসনক্ষেত্রে হুসেন শাহ যে উদার ধর্মীয় নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বিভিন্ন উচ্চরাজপদে হিন্দু কর্মচারীদের নিয়োগ হইতেই বোঝা যায়। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এই ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে তিনি রাজকর্মচারী নিয়োগে ধর্ম অপেক্ষা যোগ্যতার সম্মান দিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যের উজীর ছিলেন পুরন্দর খান। গৌর মল্লিক ত্রিপুরা অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রূপ ও সনাতন দুই ভাই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় কর্মচারী ছিলেন; রূপ ছিলেন 'সাকর মল্লিক' (মন্ত্রী বিশেষ) ও সনাতন ছিলেন 'দবীর খাস' (ব্যক্তিগত কর্মাধ্যক্ষ)। মুকুন্দ দাস ছিলেন তাঁহার প্রধান চিকিৎসক, তাঁহার দেহরক্ষী ছিলেন কেশবছত্রী, অনুপ ছিলেন মুদ্রাশালার অধ্যক্ষ। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় স্থানীয় ভূস্বামী ছিলেন রামচন্দ্র খান। হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাসের পরিবারের অনুরূপ অবস্থা ছিল। জগাই ও মাধাই নবদ্বীপের কোতওয়াল ছিলেন। হুসেন শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তাগণও হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। বাংলা ভাষায় মহাভারত প্রণেতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

হুসেন শাহ কর্তৃক সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি আচরণ, উড়িষ্যা অভিযান-কালে হিন্দুমন্দির ধ্বংস এবং জয়ানন্দ কর্তৃক বর্ণিত নবদ্বীপের হিন্দুদের প্রতি হুসেন শাহের নির্মম আচরণের উল্লেখ করিয়া অনেক ঐতিহাসিক হুসেন শাহের হিন্দুবিরোধী মনোভাবের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই সব ঘটনার প্রত্যেকটির পিছনেই কোন না কোন কারণ ছিল। স্ত্রীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধিরায়কে শাস্তি দান, রাজ্যজয় কালে হিন্দু মন্দির ধ্বংস এবং রাজ-দ্রোহীতার অপরাধে নবদ্বীপের হিন্দুদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং এই সব ঘটনাকে ধর্মীয় নীতির পরিচায়ক হিসাবে বলা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না। উচ্চ রাজপদে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চয়ই তাঁহার ধর্মীয় উদারতার পরিচয় দান করে। বৃন্দাবন দাস

ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে হুসেন শাহ শ্রীচৈতন্যদেবকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং তিনি চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া মনে করিতেন। চৈতন্যদেবের গৌড়ে আগমনের সময় হুসেন শাহ তাঁহার কর্মচারীদের তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি হুসেন শাহের উদারতাই বিভিন্ন হিন্দু লেখককে তাঁহাকে 'নৃপতি-তিলক', 'জগতভূষণ', 'কৃষ্ণাবতার' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছে।

হুসেন শাহ আরবী ও ফারসী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস ও যশোরাজ খান পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে পরাগল খান ও ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী বাংলা ভাষায় মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং আলাউদ্দীন হুসেন শাহের উদার নীতি সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

হুসেন শাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি মালদহে একটি বিরাট মাদ্রাসা নির্মাণ করান এবং পাণ্ডুয়াতে নূর-কুতব-ই-আলমের দরগাহতে বহু সম্পত্তি ও অর্থ দান করেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করান। কথিত আছে যে প্রতি বৎসর তিনি পায়ে হাটিয়া রাজধানী একডালা হইতে পাণ্ডুয়ায় আসিয়া এই সুফীর দরগাহে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। স্থাপত্য ক্ষেত্রেও হুসেন শাহের অবদান রহিয়াছে। ইলিয়াস শাহী যুগে বাংলার মুসলিম স্থাপত্য শিল্পক্ষেত্রে যে নূতন ধারার সূচনা হইয়াছিল হুসেন শাহের সময়ে সেই ধারার প্রচলন ছিল। তাঁহার সময়ে নির্মিত বহু মসজিদের মধ্যে গৌড়ের 'ছোট সোনা মসজিদ' এবং 'গুমতি দ্বার' শিল্প সৌন্দর্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

মধ্য যুগীয় বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাসে আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গৌরবজনক। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া হুসেন শাহ রাজ্যসীমা সম্প্রসারণে প্রভূত সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। সুষ্ঠশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া এবং দেশের জনগণের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় বাংলায় আবার শৌর্যবীর্যের যুগের সূচনাই আলাউদ্দীন হুসেন শাহের কৃতিত্ব। যদিও তাঁহার কৃতিত্বের সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু অদ্যাবধি আলাউদ্দীন হুসেন শাহের জনপ্রিয়তা তাঁহার কৃতিত্বের ও সাফল্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

সুলতান নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ নাসির-উদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর নসরৎ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে নসরৎ শাহ যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পিতা কর্তৃক মুদ্রা প্রকাশের ক্ষমতাও প্রদত্ত হইয়াছিলেন। ৯২২ হিঃ/১৫১৬ খৃঃ ও ৯২৩ হিঃ/১৫১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মুদ্রা তাঁহার যুবরাজ অবস্থায় প্রকাশিত মুদ্রা বলিয়া মনে করা হয়।

নসরৎ শাহ যখন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন সেই সময় উত্তর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইতেছিল। ইব্রাহিম লোদীর দুর্বলতার সুযোগে লোহানী ও ফার্মুলী আফগানগণ পাটনা হইতে জৌনপুর অঞ্চলে প্রায় স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। বিহারে লোহানী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। নসরৎও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া আজমগড় পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ করেন। প্রায় সমগ্র উত্তর বিহার অধিকার করিয়া নসরৎ এই অঞ্চলের শাসনভার আলাউদ্দীন ও মখদুম আলমের উপর অর্পণ করেন। গন্দক ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হাজীপুর এই অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র হইল।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুর লোদী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া উত্তর ভারতের অধীশ্বর হইলেন। বাবুরের অভ্যুদয় ও লোদী সাম্রাজ্যের অবসান বাংলার মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য বিপদ উপস্থিত করিল। পলায়মান আফগান নেতাগণ নসরৎ শাহের সাহায্য প্রার্থী হইলেন এবং মানবতার খাতিরে নসরৎ শাহ তাহাদিগকে সাহায্য দিলেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে বাবুর ঘোগরা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তিনি মোল্লা মোহাম্মদ মাজহার নামক একজন দূত নসরৎ শাহের কাছে পাঠাইয়া নসরতের মনোভাব জানিতে চাহিলেন। নসরতের জন্য এক মহা সমস্যা দেখা দিল। তিনি কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়া বাবুরের দূতকে প্রায় এক বৎসরকাল নিজ দরবারে রাখিয়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত নসরৎ নিরপেক্ষতার পথ অবলম্বন করেন এবং নসরতের পাল্টা দূত ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে বাবুরের দরবারে নসরৎ কর্তৃক প্রেরিত বহু উপঢৌকন নিয়া হাজির হইল। বাবুর নসরতের নিরপেক্ষতায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করিলেন। সম্ভবতঃ আফগান নেতৃবর্গ ও নসরতের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের সম্ভাবনা না থাকায় বাবুর এই সিদ্ধান্ত করেন।

পরবর্তীকালে বিহারে বাবুরের বিরুদ্ধে আফগান নেতাদের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপিত হয় তাহাতে নসরৎ শাহ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বলিয়া মনে হয় না। মাহমুদ লোদীর নেতৃত্বে যে মুঘল-বিরোধী আঁতাত ঘটিত হইয়াছিল তাহাতে নসরতের যোগদানের কোন উল্লেখ বাবুরের আত্মকাহিনীতে নাই। মাহমুদের নেতৃত্বে আফগান নেতা বায়জিদ, বীবন, ফতেহ খান ও শের খান সুরের যে জোঠ স্থাপিত হয় তাহাতে জালাল খান লোহানী ও জালাল খান শর্কী স্বাভাবিকতই যোগদান করেন নাই। কারণ তাহাদের নিজ নিজ অধিকার অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্য ছিল। একই উদ্দেশ্যে জালাল লোহানী ও জালাল শর্কী বাবুরের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ধরনের মুঘল-বিরোধী আঁতাতে নসরতের যোগদানে তাঁহার নিজস্ব কোন স্বার্থতো নাই বরংচ ফলে স্বরাজ্যের প্রতি মুঘল আক্রোশ উত্থাপনের আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নসরতের পক্ষে মুঘলদের সহিত সংঘর্ষ পরিহার করা সম্ভব হয় নাই। ১৫২৯ সালে আফগান নেতাগণ বাবুরের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিল। গঙ্গা নদীর উভয় তীর অনুসরণ করিয়া মাহমুদ লোদী এবং শের খান চুনার হইতে বারানসী অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। বীবন ও বায়জিদ গোগরা অতিক্রম করিয়া গোরক্ষপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বাবুরও সসৈন্যে বিহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মাহমুদ লোদী বাবুরের আগমনে যুদ্ধ না করিয়া মহোবার দিকে পলায়ন করিলেন। শের খান বারাণসী অধিকার করিয়াও বাবুরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। জালাল খানও বক্সারের নিকট বাবুরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বাবুর তীরহুত অধিকার করিয়া গঙ্গা ও গন্দকের সঙ্গমস্থলে বীবন ও বায়জিদের অধীন আফগান সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন। ফলে বাবুরের সৈন্যদল বাংলার সৈন্যদলের সম্মুখীন হইল। বক্সারের শিবির হইতে বাবুর দূত পাঠাইয়া নসরতের সৈন্যদলকে গোগরা নদীর তীর ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। নসরৎ উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। একমাস কাল অপেক্ষা করিয়া বাবুর পুনরায় নসরতের কাছে দূত পাঠাইলেন। যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। তিন দিন ব্যাপী যুদ্ধ চলিল—বাংলার পদাতিক, অশ্বারোহী ও নৌবাহিনী যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও মুঘল রণকৌশলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ফলে গোগরা নদীর পূর্বতীরে বাবুরের আধিপত্য স্থাপিত হইল এবং আফগান জোঠের পরাজয়ের পথ

সুগম করিল। কূটনৈতিক কারণে বাবুর বিহার ও অযোধ্যা জয়ের পূর্বে বাংলা আক্রমণ করা সমীচীন মনে করেন নাই। এই সময়ে বাবুর কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী বাংলার সুলতান স্বীকার করে। মুঘলদের প্রত্যক্ষ আক্রমণের হাত হইতে বাংলায় মুসলিম রাজ্য রক্ষা পাইল।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবুরের মৃত্যু হয় এবং নসরৎ শাহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইলেন। বাবুরের উত্তরাধিকারী হুমায়ুনও বাংলা আক্রমনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। বাবুরের মৃত্যুর পর মাহমুদ লোদী পুনরায় মুঘলদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন। বীবন খান, বায়জিদ খান ও শের খান জৌনপুর হইতে মুঘল সৈন্য বিতাড়িত করিলেন। মাহমুদ লোদীর বিরুদ্ধে দাওরার যুদ্ধে বীবন খান ও বায়জিদ খান নিহত হন। শের খান আবার মুঘল বশ্যতা স্বীকার করেন। মাহমুদ লোদী পরাজিত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করেন। হুমায়ুন বাংলা আক্রমণের উদ্যোগ করেন। নসরৎ শাহ এই সময়ে হুমায়ুনের রাজ্যের অপর সীমান্তের শত্রু গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের সহিত মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে মালিক মরজানকে দূত হিসাবে পাঠান। বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া হুমায়ুন বাংলার বিরুদ্ধে আর অগ্রসর না হইয়া গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করেন। নসরৎ শাহের আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলা-গুজরাটের মৈত্রী পরিপূর্ণভাবে কার্যকরি না হইলেও নসরতের সময়োপযোগী কূটনীতি বাংলাকে আসন্ন যুদ্ধ হইতে রক্ষা করিল। মোটা-মুটিভাবে বলা যায় যে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার মুসলিম রাজ্যকে যুদ্ধে লিপ্ত না করিয়া নসরৎ শাহ দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন।

নসরৎ শাহ তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত লইয়া এতই ব্যস্ত ছিলেন যে অন্য সীমান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার মতো অবকাশ তাঁহার ছিল না। কামতার মুসলমান শাসনকর্তা স্বীয় উদ্যোগেই অহোম রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। সেনাপতি তুরবক্ অহোম সৈন্যদলকে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য করিয়াছিল এবং কলিয়াবর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই অভিযানের পরিসমাপ্তি দেখিবার পূর্বেই ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়।

উড়িষ্যা সীমান্তেও কিছু সংঘর্ষ সংঘটিত হইয়াছিল। উড়িষ্যা রাজ প্রতাপরুদ্র দেব নিজরাজ্য সীমা সম্প্রসারণে সচেষ্ট হন। তবে তাঁহার সাফল্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়।

নসরৎ শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা বাংলাদেশে ঘাটি স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। সিলভেয়ার আগমনের পর হইতে পর্তুগীজরা প্রায় প্রতি বৎসরই বাংলাদেশে জাহাজ পাঠাইত।

পিতার ন্যায় নসরৎ শাহও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি রচনায় তাঁহার নাম উল্লেখিত পাওয়া যায়। কবিশেখর নসরৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন। স্থাপত্য শিল্পেও তাঁহার অবদান আছে। গৌড়ের বিখ্যাত বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ তাঁহার অমর স্থাপত্য কীর্তি। গৌড়ের কদমরসুল ভবনে তিনি একটি মঞ্চ নির্মাণ করান।

তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। বিভিন্ন বিবরণের মতে নসরৎ শাহ আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

হুসেনশাহী শাসনের অবসান

নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ফীরূজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুদ্রা প্রমাণে মনে হয় যে নসরৎ শাহ তাঁহার ভাই মাহমুদ শাহকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতে রাজ্যের একদল আমীরের সহায়তায় ফীরূজ সিংহাসনে বসেন। মাত্র নয় মাসকাল শাসনের পর মাহমুদ শাহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করেন। ফীরূজ শাহের স্বল্পকালীন রাজত্বের বিশেষ কোন ঘটনা জানা যায় না। নসরৎ শাহের মৃত্যুর পূর্বে অহোম রাজের সাথে যে সংঘর্ষ শুরু হইয়াছিল তাহা তাঁহার রাজত্বকালেও চলিয়াছিল। ফীরূজ শাহ যুবরাজ থাকাকালীন তাঁহার আদেশে শ্রীধর কবিরাজ 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। শ্রীধর তাঁহার আশ্রয়দাতার প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় পিতা ও পিতামহের ন্যায় ফীরূজও বাংলা সাহিত্যে উৎসাহী ছিলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পাঁচ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে হুসেন শাহী বংশের শাসনের অবসান ঘটে। বাংলাদেশের ইতিহাসে তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই পাঁচ বৎসর পরিবর্তনের যুগ। শের খান সুরের নেতৃত্বে আফগান শক্তির পুনরুত্থানের চাপে বাংলায় হুসেন শাহী শাসনের এবং দীর্ঘ দুই শত বর্ষব্যাপী স্বাধীন সুলতানীর অবসান ঘটে।

বিহারের হাজীপুরের শাসনকর্তা মখ্‌দুম আলমের বিদ্রোহ এই পতনের সূচনা করে। মখদুম আলম শের শাহ সুরের সাহায্য পায়। গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ জালাল খান লোহানীব সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া মখদুম আলমকে দমন করিতে সচেষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত জালাল খান ও মাহমুদের সম্মিলিত শক্তি শের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দের সুরজগড়ের যুদ্ধে জালাল খানের পরাজয় শের শাহ সুরের পক্ষে বিহারের ভাগলপুর পর্যন্ত জয়ের সুযোগ আনিয়া দেয়।

এই বিজয়ের পথ ধরিযাই শের শাহ সুর গৌড় পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন। দ্বিতীয়বার গৌড় আক্রমন করিয়া ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল শেব শাহ গৌড় অধিকার করেন। মাহমুদ বিহারের হাজীপুরে পলায়ন কবিয়া হুমায়ুনের সহিত জোঠ বাধিয়া পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার দুই পুত্রের হত্যাব কথা শুনিয়া তিনি অসহ্য শোকে ও নিস্ফল আক্রোশে হুমায়ুনের শিবিরেই প্রাণ ত্যাগ করেন।

গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহেব রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম পর্তুগীজগণ বাণিজ্যিক ঘাঁটি স্থাপন কবিবাব সুযোগ পায। পর্তুগীজ সাহায্যের আশায তিনি চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওএ পর্তুগীজ ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলেন।

হুসেনশাহী শাসনের কৃতিত্ব

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ এবং তাঁহার বংশধরগণ প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বাংলাদেশে শাসন করিয়াছেন। বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানীর ইতিহাসে ইহা এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। রাজ্য সীমা সম্প্রসারণ, প্রশাসনিক স্থিতি-শীলতা এবং ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পকলাক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উৎকর্ষতা এই যুগের বৈশিষ্ট্য। দিল্লীব লোদী সুলতানদের ক্ষীণ অবস্থান এবং হুসেন শাহী বংশের প্রথম দুইজন সুলতানের সামরিক ও কূটনৈতিক কৃতিত্বই পশ্চিমে গোগরা এবং গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থল হইতে পূর্বদিকে চট্টগ্রাম এবং উত্তর-পূর্ব দিকে কামতা-কামরূপ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে মন্দারন ও চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল ভূখণ্ডে হুসেনশাহী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দিল্লীর সুলতানের সহিত বিবাদের সুযোগে হুসেন শাহ ভাগলপুরের পশ্চিমে রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন এবং এই কৃতিত্বের স্মারক

স্বরূপই তিনি 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন। রাজ্যচ্যুত শর্কী সুলতানকে ভাগলপুরে আশ্রয়দান বাংলার মুসলিম রাজ্যকে দিল্লীর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করিতে সাহায্য করে।

রাজ্যজয় এবং দিল্লীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বূহ্যকে শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল হুসেন শাহী শাসনের প্রতি সর্বস্তরের জনসাধারণের আনুগত্য। ইহা হুসেন শাহী শাসকগণ ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশী উপাধিধারী শাসক গোষ্ঠী তো ছিলই, কিন্তু এই দেশীয় অভিজ্ঞ লোকদিগকে শাসনকার্যে নিয়োগ এবং তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতা হুসেন শাহী শাসনকে এক অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা দান করিয়াছিল। রাজকর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে উদারতা হুসেন শাহী যুগে লক্ষ্য করা যায় তাহা শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান ঘুচাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ফলে রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনিয়াছিল এবং হুসেন শাহী যুগে অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পথ সুগম করিয়াছিল।

দিল্লীর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় পুষ্ট হইয়া বাংলা তাহার সাংস্কৃতিক স্বত্বা এই যুগেই খুঁজিয়া পাইয়াছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষার মাধ্যমে, যে নবজাগরণ এই যুগে সূচীত হইয়াছিল, তাহা এই দেশীয় জনগণের মেধা ও মননশীলতারই স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তি যাহা বহুদিন যাবৎ চাপা পড়িয়াছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শাসকবর্গের উদার নীতি এই নবজাগরণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের জন্ম এই যুগকে এক নূতন মহিমা দান করিয়াছিল। ভক্তি মতবাদ ও তৎসম্বন্ধীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করিয়াছিল।

শিল্পকলা ক্ষেত্রে এই যুগে যদিও কোন নূতন ধারার সন্ধান পাওয়া যায় না, বিগত শিল্পধারাকে উৎকর্ষতা দানে এই যুগ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। হুসেন শাহী যুগের শিল্পকলা বিগত যুগের নির্দেশিত পথে চলিয়াই উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। স্থাপত্য শিল্পক্ষেত্রে নূতন কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা না হইলেও হস্তাক্ষর শিল্পে 'তুঘ্রা' পদ্ধতিতে তীর-ধনুক রীতির আগমন এই শিল্পের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অবদান।

সবদিকে বিবেচনা করিয়া এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে হুসেন শাহী যুগেই প্রথম বাংলার মুসলিম রাজ্য স্থানীয় আশা আকাঙ্খা সম্বলিত এক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এই যুগের কৃতিত্ব বাস্তবিকই এই যুগকে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ রূপে চিহ্নিত করিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাংলায় আফগান শাসন : আকবরের বাংলা জয়

শের শাহের বাংলা জয় :

বাংলায় আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শের খান সূর। তাঁহার পিতা হাসান খান সূর দিল্লীর আফগান সুলতান ইব্রাহিম খান লোদীর অধীনে বিহারের অন্তর্গত সাহসারাম অঞ্চলের জায়গীরদার ছিলেন। হাসান বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অনেক সময় তাঁহাকে জৌনপুরে শাসনকর্তার দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত। এইজন্য তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শের খানের উপর তাঁহার জায়গীর তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত করেন। শের খান জায়গীরের উন্নতি ও প্রজাদের সুখ শান্তি বিধানের ব্যবস্থায় খুব বিচক্ষণতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁহার বিমাতার প্ররোচনায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে জায়গীরের শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারিত করেন এবং তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের উপর জায়গীর শাসনের ভার অর্পণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইব্রাহিম লোদীর আদেশনামার বলে শের খান সূর সাহসারামের জায়গীরের অধিকার লাভ করেন। এই সময় বিহারের শাসনকর্তা জালাল খান লোহানী নাবালক ছিলেন। শের খান তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হন। পানিপথের যুদ্ধের পর আফগানদের মধ্যে যে রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয় তার সুযোগে শের খানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাঁহাকে জায়গীর হইতে বেদখল করেন। শের খান সম্রাট বাবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁহার সৈন্য সাহায্য লইয়া সাহসারামের জায়গীর পুনরুদ্ধার করেন।

হুমায়ুনের রাজত্বের প্রথম দিকে শের খান সম্রাটকে মাঝে মাঝে উপহার-উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি আস্তে আস্তে শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি বৈবাহিক সম্বন্ধের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ চুণার দুর্গ হস্তগত করেন। হুমায়ুন যখন গুজরাটের বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন শের খান সমগ্র বিহারে তাঁহার একাধিপত্য স্থাপন করেন এবং আফগানদেরকে সংঘবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন। তিনি দুইবার বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। প্রথম

বার তিনি সুলতান তৃতীয় মাহমুদের নিকট হইতে বহু অর্থ আদায় করিয়া বিহারে ফিরিয়া আসেন (১৫৩৭ খৃঃ)। দ্বিতীয় বার তিনি বাংলা অধিকারের সঙ্কল্প নিয়া গৌড় অবরোধ করেন (১৫৩৭খৃঃ)। আফগান নায়ক শের খানের শক্তি বৃদ্ধিতে মুগল সাম্রাজ্যের বিপদ দেখা দেয়। সম্রাট হুমায়ুন বুঝিতে পারেন যে, উচ্চাকাঙ্খী শের খানকে আর উপেক্ষা করা যায় না এবং তাঁহাকে দমন করা একান্ত প্রযোজন। তিনি ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে বিহার অভিমুখে যাত্রা করেন এবং প্রথমে চুণার দুর্গ অবরোধ করেন। ছয মাস অবরোধের পর তিনি চুনার দখল করেন। ইহার পর তিনি বিহারের অন্যান্য স্থান অধিকার করেন। ইতিমধ্যে শের খান গৌড় দখল করিযা লন (এপ্রিল, ১৫৩৮খৃঃ)।

হুমায়ুনের বাংলা জয় :

হুমায়ুন যখন পাটনা হইতে বহরকুণ্ডার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন তিনি জানিতে পারেন যে, শের খান গৌড় অধিকার করিয়াছেন। ইহার পর বাজ্যহারা সুলতান মাহমুদের দূত বহরকুণ্ডায় সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শের খানের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাংলার মত একটি সমৃদ্ধ রাজ্য জয়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখিয়া হুমায়ুন গৌড় অভিমুখে যাত্রা করেন। মাণিরের নিকটে দুর্দশাগ্রস্ত সুলতান মাহমুদও সম্রাটের শরণাপন্ন হন। পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হুমায়ুনের বিহার অভিযানের প্রাক্কালে শের খান এক হিন্দু রাজার নিকট হইতে কৌশলে রোহটাস দুর্গ দখল করেন। হুমায়ুন যখন বাংলায় প্রবেশের আয়োজন করেন তখন শের খান গৌড়ের সমস্ত ধনরত্ন রোহটাস দুর্গে স্থানান্তরিত করেন। এইজন্য আফগান সৈন্যরা তেলিয়াগঢ়ি প্রবেশ পথে কিছুদিনের জন্য মুগল সৈন্যদেরকে বাধা দিয়া রাখে। ইহার পর বিনা বাধায় হুমায়ুন বাংলায় প্রবেশ করেন এবং গৌড় অধিকার করেন (সেপ্টেম্বর, ১৫৩৮)। গৌড়ের সুরম্য প্রাসাদবলী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া হুমায়ুন খুবই মুগ্ধ হন এবং তিনি ইহার নাম রাখেন জান্নাতাবাদ। তিনি প্রায় ছয় মাস গৌড়ে অবস্থান করেন এবং আমোদস্ফূর্তিতে কাটান। ইতিমধ্যে তাঁহার সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। শের খান বিহার পুনরুদ্ধার করেন এবং হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিন্দাল দিল্লীর সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই সংবাদ পাইয়া হুমায়ুন দিল্লী যাত্রার

আয়োজন করেন। তিনি জাহাঙ্গীর কুলীকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং বিজিত প্রদেশ রক্ষার জন্য ৫000 মুগল সৈন্য গৌড়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর হুমায়ূন দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হন (মে, ১৫৩৯)। তিনি বক্সারের নিকটে গঙ্গা নদীর তীরে পৌঁছিলে চৌসা নামক স্থানে শের খান তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন। চৌসার যুদ্ধে হুমায়ূনের পরাজয় হয় (৮ই জুলাই, ১৫৩৯)। এই সময় নিযাম নামক ভিস্তি তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন।

শের শাহের বাংলা অধিকার :

চৌসার যুদ্ধে জয় লাভের পর শের খান শের শাহ উপাধি ধারণ করিয়া বিহারে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তিনি ত্বরিৎগতিতে গৌড় আক্রমণ করেন এবং মুগল শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী ও তাঁহার অনুচরদেরকে নিহত করিয়া বাংলার রাজধানী অধিকার করেন। বাংলা ও বিহারে আধিপত্য স্থাপন করিয়া শের শাহ উত্তর ভারতের অনেক স্থান দখল করেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য হুমায়ূন আবার তাঁহার সৈন্যদল নিয়া অগ্রসর হন। হুমায়ূনের সহিত শের শাহের কনৌজের নিকটে এক যুদ্ধ হয়। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ূন আবার পরাজিত হন (১৭ মে, ১৫৪0)। এই যুদ্ধের ফলে শের শাহ দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন এবং হুমায়ূনকে বিতাড়িত করিয়া উত্তর ভারতে সূর আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে বাংলাদেশ আবার দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ শের শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

বাংলায় স্বাধীন সূর আফগান বংশ :

শের শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১৫৪৫—৫৩খৃ:) বাংলাদেশ দিল্লীর অধীনে ছিল। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়া আফগানদের মধ্যে যে ভীষণ গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তাহাতে আফগান সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সময় বাংলার শাসন-কর্তা মুহম্মদ খান সূর স্বাধীনতা অবলম্বন করেন এবং মুহম্মদ শাহ সূর উপাধি ধারণ করেন। আফগানদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে আরাকানের মগ রাজা মেং বেং চট্টগ্রাম দখল করেন। মুহম্মদ শাহ সূর মগদেরকে পরাজিত

করিয়া চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন এবং আরাকান অধিকার করেন। কিন্তু আরাকানের উপর তাঁহার অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। মুহম্মদ শাহ সূর উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মুহম্মদ আদিল শাহ সূরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। তিনি বিহার জয় করেন এবং আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। আদিল সূরের সেনাপতি হিমু চাপ্পারঘাটার যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (১৫৫৫ খৃঃ)।

মুহম্মদ শাহ সূরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাহাদুর শাহ সূর গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করেন। বাহাদুর শাহ সূর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য আদিল সূরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং সুরজগড়ের নিকট এক যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (এপ্রিল, ১৫৫৭)। বাহাদুর শাহ সূর দক্ষিণ বিহারের শাসনভার তাজ খান করবাণীর উপর ন্যস্ত করেন এবং গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ সূরের মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী জালাল শাহ সূর তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান। জালাল শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী গিয়াসুদ্দীন নামক এক ব্যক্তির হাতে প্রাণ হারান। গিয়াসুদ্দীন গৌড়ের সিংহাসন আত্মসাৎ করেন। ইহার ফলে বাংলায় সূর আফগান বংশের রাজত্বের অবসান হয়।

বাংলায় কররাণী আফগানদের রাজত্ব:

কররাণী আফগান বংশীয় তাজ খান ও সুলায়মান খান কনৌজের যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ শের শাহ তাহাদেরকে দক্ষিণ বিহারের খাসপুর তান্ডায় জায়গীর দান করেন। ইসলাম শাহের রাজত্ব কালে তাজ খান কররাণী সেনাপতি ও কূটনৈতিক পরামর্শদাতা রূপে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইসলাম শাহের বালক-পুত্র ও উত্তরাধিকারী ফিরুযের সময় তাজ খান ওযীর নিযুক্ত হন। ফিরুযকে হত্যা করিয়া তাঁহার মাতুল মুহম্মদ আদিল সূর সিংহাসন আত্মসাৎ করেন। এই সময় তাজ খান প্রাণ রক্ষার জন্য রাজধানী গোয়ালিয়র হইতে পলায়ন করেন। তিনি দক্ষিণ বিহারে তাঁহার ভ্রাতা সুলায়মান, ইমাদ ও ইলিয়াসের সহিত মিলিত হন এবং সেখানে প্রাধান্য স্থাপন করেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তাজ খান কররাণী নামমাত্র বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহ সূরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিছুদিন পর তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া পড়েন।

বাংলার সিংহাসনের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল, তিনি সুযোগের অন্বেষণে ছিলেন। অজ্ঞাতনামা গিয়াসুদ্দিন যখন সূর বংশের সিংহাসন আত্মসাৎ করেন তখন সুযোগ বুঝিয়া তাজ খান ও তাঁহার ভ্রাতারা গৌড় আক্রমণ করেন এবং গিয়াসুদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাংলা জয় করেন (১৫৬৪খৃঃ)। তাজ খান বাংলায় কররাণী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অল্পদিন রাজত্ব করিয়া মারা যান।

সুলায়মান খান কররাণী:

তাজ খান কররাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সুলায়মান খান কররাণী বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলায়মান খান কররাণী খুব বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ শাসক ছিলেন। শের শাহের মত আফগানদেরকে সংঘবদ্ধ করিয়া তিনি বাংলা ও বিহারে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। সম্রাট আকবরের সভা-ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, আফগানরা দলে দলে সুলায়মান কররাণীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং তিনি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হন। সুলায়মান কররাণী উড়িষ্যা জয় করিতে সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার পুত্র বায়াযিদ ও দুর্ধর্ষ সেনাপতি কালাপাহাড়ের* অধীনে অভিযান প্রেরণ করেন। কুটসামার নিকট যুদ্ধে উড়িষ্যার রাজা হরিচন্দন মুকুন্দরাম পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ রামচন্দ্র ভানজা ধৃত ও নিহত হন (১৫৬৮খৃঃ)। বিজয়ী আফগান বাহিনী উড়িষ্যা দখল করে এবং বহু ধনরত্ন হস্তগত করে। সুলায়মান কররাণী তাঁহার ওযীর লোদী খানকে উড়িষ্যার ও কতলু লোহানীকে পুরীর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এই সময় কুচবিহারের রাজা বিশ্ব সিংহ তাঁহার পুত্র ও খ্যাতনামা সেনাপতি শুক্লধ্বজের (চিলা রায় নামে সুপরিচিত) অধীনে একদল সৈন্য কররাণী রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠান। সুলায়মান কররাণী শুক্লধ্বজকে পরাজিত ও বন্দী করেন। ইহার পর তিনি কালাপাহাড়কে কুচবিহার জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। কালাপাহাড় কুচবিহারের কামাখ্যা ও হাজু পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। এই সময় উড়িষ্যায় এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইজন্য সুলায়-মান কররাণী কালাপাহাড়কে ডাকিয়া পাঠান এবং কুচবিহারের বিজিত

---

*কালা পাহাড় প্রথমে হিন্দু ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল রাজু। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং কালাপাহাড় নামে পরিচিত হন।

স্থান প্রত্যর্পণ করিয়া ও শুক্লধ্বজকে মুক্তি দিয়া তিনি বিশ্ব সিংহের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন (১৫৬৮ খৃ:)।

মুগল সম্রাট আকবরের সহিত সম্পর্কে সুলায়মান কররাণী খুব দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি তাঁহার বিজ্ঞ ওযীর লোদী খানের পরামর্শে জৌনপুরের মুগল শাসনকর্তাদের সহিত সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া চলেন। তিনি প্রায়ই আলী কুলী খান জামানকে উপহার উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন। খান জামানের পরবর্তী শাসনকর্তা খানখানান মুনিম খানকেও তিনি মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাইয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন। মুনিম খানের মাধ্যমে সুলায়মান কররাণী সম্রাট আকবরের দরবারে মাঝে মাঝে বহু মূল্যের উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন। তা'ছাড়া তিনি যদিও কার্যতঃ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বেসর্বা শাসক ছিলেন, তবুও তিনি প্রকাশ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার দাবী করেন নাই। তিনি সম্রাটের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি শাহ অথবা সুলতান উপাধি ধারণ করেন নাই, কেবল 'হযরত আলা' উপাধি নিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। এইজন্য সম্রাট আকবর কররাণী রাজ্য আক্রমণ করার অজুহাত পান নাই। এই সময় আফগানদের মধ্যে ঐক্য বজায় ছিল এবং সুলায়মান কররাণী বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। এই কারণে সম্রাট আকবর কররাণী রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে সুলায়মান কররাণীর মৃত্যু হয়।

দাউদ খান কররাণী :

সুলায়মান কররাণীর মৃত্যুর পর আফগান নেতাদের মধ্যে দলাদলি ও গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। সুলায়মানের জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াযিদ কররাণী পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। বায়াযিদ উদ্ধত প্রকৃতির যুবক ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া কতলু লোহানী ইমাদ কররাণীর পুত্র হানসুকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং বায়াযিদকে হত্যা করেন। ওযীর লোদীর সহায়তায় সুলায়মান কররাণীর দ্বিতীয় পুত্র দাউদ খান কররাণী সিংহাসন লাভ করেন (১৫৭২খৃ:)। লোদী হানসুকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং কতলু লোহানীকে বশীভূত করেন। গুজর কররাণী বায়াযিদের পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। লোদীর প্রতাপে শেষ পর্যন্ত তিনিও দাউদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। লোদীর সুযোগ্য পরিচালনায় দাউদের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হয়।

ওযীর লোদীর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কতলু লোহানী, গুজর কররাণী ও দাউদের অন্যতম পরামর্শদাতা শ্রীহরি ঈর্ষান্বিত হন। তাঁহারা দাউদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেন যে, লোদী গোপনে তাজ খানের পুত্র য়ুসুফকে সিংহাসনে বসাইবার পরিকল্পনা করিতেছেন। সন্দেহের বশবর্তী হইয়া দাউদ তাঁহার বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত ওযীর লোদীকে বন্দী করেন এবং তাঁহাকে হত্যা করেন। লোদীকে হত্যা করিয়া দাউদ নিজের সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করেন। লোদীর হত্যা সম্পর্কে আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, সম্রাট আকবরের সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহার শত্রুরা নিজেরাই তাঁহার কার্য সম্পন্ন করিয়া দিতেছে এবং এই কার্য সম্রাটের কর্মচারীরা শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমাধা করিতে সমর্থ হইতেন না। বস্তুতঃ, লোদী সাফল্যের সহিত মুগল সেনাপতি মুনিম খানের বিহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আফগানদের মধ্যে অভিজ্ঞ পরিচালকের অভাবে তাহাদের পক্ষে মুগলদের মুকাবিলা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

সম্রাট আকবরের বাংলা জয়:

দাউদ কররাণী অপরিনামদর্শী শাসক ছিলেন। তাঁহার দূরদর্শী পিতা যদিও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, তবুও তিনি প্রকাশ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার দাবী করেন নাই। তিনি নাম মাত্র মুগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। দাউদ কররাণী মুগল সম্রাট সম্পর্কে পিতার অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করেন। বিশাল রাজ্য, বৃহৎ সামরিক বাহিনী ও প্রভূত ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হইয়া তিনি নিজকে সম্রাট আকবরের সমকক্ষ বলিয়া মনে করেন এবং বাদশাহ উপাধি ধারণ করিয়া স্বীয় সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। তিনি নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা অঙ্কিত করেন। ইহাতে সম্রাট আকবর তাঁহার প্রতি রুষ্ট হন।

সম্রাট আকবর বহুদিন হইতে কররাণী রাজ্য জয়ের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাছাড়া, বিহার ও বাংলা তাঁহার পিতার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং এই প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধার করা তিনি তাঁহার কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তৃতীয়তঃ, আফগানরা মুগলদের পরম শত্রু ছিলেন এবং ইহারা সুযোগ পাইলেই যে আবার মুগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শক্তিশালী আফগান রাজ্য হইতে

যে কোন সময় মুগল সাম্রাজ্যের বিপদ ঘটিতে পারে। এই অবস্থায় কররাণী রাজ্য জয় করিয়া আফগান শক্তি নির্মূল করা মুগল সম্রাটের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিচক্ষণ ও শক্তিশালী আফগান নেতা সুলায়মান কররাণীর জীবিতকালে সম্রাট আকবর কররাণী রাজ্য আক্রমণ করিতে সুযোগ পান নাই এবং সাহসও করেন নাই। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে যখন সম্রাট আকবর গুজরাট জয়ের জন্য অভিযান করিয়াছিলেন তখন তিনি সুলায়মান কররাণীর মৃত্যুসংবাদ পান। অনেকে সম্রাটকে গুজরাট অভিযান স্থগিত রাখিয়া বাংলা-বিহারে অভিযান করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। তিনি মনে করেন যে, সুলায়মানের মৃত্যুতে কররাণী রাজ্য জয়ের বাধা দূর হইয়াছে এবং মুগল সেনাপতিরা সহজেই বাংলা-বিহার জয় করিতে পারিবেন। সম্রাট আকবর কররাণী রাজ্য জয়ের জন্য জৌনপুরের শাসনকর্তা খান খানান মুনিম খানকে নির্দেশ দেন।

মুনিম খান ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বিহার আক্রমণ করেন। সুলায়মান কররাণীর সহিত বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়া এবং ওযীর লোদীর সহিত সম্প্রীতি থাকায় মুনিম খান অনিচ্ছার সহিত কররাণী রাজ্যে অভিযান করেন। লোদী নগদ তিন লক্ষ টাকা ও মূল্যবান উপঢৌকন করস্বরূপ দিতে স্বীকার করায় মুগল সেনাপতি দাউদ কররাণীর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন এবং জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট আকবর মুনিম খানের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে আবার বাংলা-বিহার অধিকারের জন্য নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে দাউদ কররাণী তাঁহার সুযোগ্য ওযীর লোদীকে হত্যা করিয়া নিজের সর্বনাশ করিয়াছেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মুনিম খান সর্বশক্তি নিয়া বিহার আক্রমণ করেন। মুগলদের তীব্র আক্রমণের দরুণ দাউদ কররাণী ও তাঁহার সেনাপতিরা পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হন। তাঁহারা পাটনায় আশ্রয় লন এবং দুর্গ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মুনিম খান পাটনা দুর্গ অবরোধ করেন। প্রায় নয় মাস পর্যন্ত অবরোধ চলে, মুনিম খান পাটনা অধিকার করিতে ব্যর্থ হন। তখন সম্রাট আকবর স্বয়ং বিহার অভিযানে অগ্রসর হন। তিনি পাটনা জয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, নদীর অপর তীরে অবস্থিত হাজীপুর শহর হইতে পাটনা দুর্গে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয় এবং হাজীপুর দখল না করিলে পাটনার দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিতে বহু সময় লাগিবে। এইজন্য

তিনি প্রথমে হাজীপুর হস্তগত করার পরিকল্পনা করেন। সম্রাটের পরিকল্পনা অনুসারে স্থলপথে ও জলপথে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মুগল সৈন্যরা হাজীপুর দখল করিয়া লয়। ইহাতে পাটনা দুর্গের সরবরাহ কেন্দ্র বন্ধ হইয়া যায়। দাউদ কররাণীর সেনাপতিরা নিরাশ হইয়া পড়েন। দাউদ মুগলদেরকে পাটনা প্রবেশে বাধা দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁহার সেনাপতি ও পরামর্শদাতা, কতলু, গুজর ও শ্রীহরি তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া রাত্রে নৌকাযোগে পাটনা হইতে রাজধানী তান্ডায়* লইয়া যান (১০ আগষ্ট, ১৫৭৪)। সম্রাট আকবর পাটনা দখল করেন এবং কিছু দূর পর্যন্ত পলায়মান আফগানদের অনুসরণ করেন। ইহার পর মুনিম খানের উপর অভিযানের ভার দিয়া সম্রাট রাজধানী আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মুনিম খান বিহারের অন্যান্য স্থান অধিকার করিয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হন। আফগানরা নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার দরুন তেলিয়াগড়ির সংকীর্ণ প্রবেশ পথে মুগলদেরকে প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হয়। দাউদ কররাণী ভীত হইয়া তান্ডা হইতে সপ্তগ্রামের দিকে চলিয়া যান। কররাণী রাজধানী অধিকার করিয়া মুগল সৈন্যরা সপ্তগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। দাউদ উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুনিম খান ও রাজা টোডরমলের অধীনে মুগল বাহিনী উড়িষ্যায় দাউদের অনুসরণ করে। ইহার পর দাউদ মুগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তুকারস নামক স্থানে দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয় (৩ মার্চ, ১৫৭৫)। যুদ্ধে গুজর কররাণী নিহত হন। ইহাতে দাউদের সৈন্যরা নিরুৎসাহ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। দাউদ কটক দুর্গে আশ্রয় লন। মুনিম খান কটক অবরোধের আয়োজন করেন। দাউদের পক্ষে মুগলদেরকে বাধা দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনন্যোপায় হইয়া তিনি মুনিম খানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। দাউদ ও তাঁহার সেনাপতিরা মুগল শিবিরে মুনিম খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার ফলে দাউদ ও মুনিম খানের মধ্যে এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি কটকের সন্ধি নামে পরিচিত (১২ এপ্রিল, ১৫৭৫)। কটকের সন্ধি অনুযায়ী, বাংলা ও বিহার মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং স্থির হয় যে, দাউদ সম্রাটের সামন্তরূপে উড়িষ্যা শাসন করিবেন। তিনি সম্রাটের জন্য বহু

---

* কররাণী রাজধানী তানডা গৌড়ের ৪ মাইল পশ্চিমে এবং মালদার ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল।

মূল্যবান উপঢৌকন দেন। সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য দাউদ মুগল রাজধানীর দিকে মুখ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন।

মুনিম খান তান্ডায় প্রত্যাবর্তন করেন। গৌড়ের প্রাসাদাবলীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সেখানে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইহার এক মাস পরে গৌড়ে প্লেগের মহামারী দেখা দেয়। বহু লোক মারা যায়। অনেক মুগল সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যু হয়। মুনিম খান তাঁহার লোকজন নিয়া আবার তান্ডায় ফিরিয়া আসেন। তান্ডায় পৌঁছিবার পূর্বে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন (২৩ অক্টোবর, ১৫৭৫)। মুনিম খানের মৃত্যুর পর মুগল সৈন্যদের মধ্যে ভীতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে দাউদ কররাণী পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনরুদ্ধার করেন এবং রাজধানী তান্ডায় পুনঃপ্রবেশ করেন। ভাটির জমিদার ঈসা খান পূর্ব বাংলা হইতে মুগল নৌবহর বিতাড়িত করেন। মুগল সৈন্যরা বাংলাদেশ ছাড়িয়া বিহারে আশ্রয় লয়।

রাজমহলের যুদ্ধ :

সম্রাট আকবর মুনিম খানেব মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বৈরাম খানের ভাগিনেয় খান জাহান হোসেন কুলী খানকে বাংলার শাসনকর্তা ও সেনাপতি নিয়োগ করিয়া পাঠান। রাজা টোডরমল তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। খান জাহান ও টোডরমল ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আগ্রা হইতে রওয়ানা হন। ভাগলপুরে তাঁহারা মুগল কর্মচারী ও সৈন্যদের সাক্ষাৎ পান। তাঁহারা ইহাদেরকে আবার বাংলায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। তেলিয়াগহিতে একদল আফগান সৈন্য মুগলদেরকে বাধা দেয়। কিন্তু মুগলদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে ইহারা সরিয়া পড়ে। খান জাহান তান্ডার দিকে অগ্রসর হন। রাজমহলের প্রবেশ পথে দাউদ কররাণী তাঁহাকে প্রতিরোধ করেন। এই প্রবেশ পথের উত্তর-পশ্চিম দিকে বিশাল গঙ্গানদী এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাজমহলের পর্বত ও মানভূম-সিংহভূমের অরণ্যরাজি বিস্তৃত ছিল। সাত মাস (ডিসেম্বর, ১৫৭৫ হইতে জুন, ১৫৭৬) চেষ্টা করিয়াও মুগল বাহিনী এই সংকীর্ণ প্রবেশ পথের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। মুগল সৈন্যরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। তা'ছাড়া রীতিমত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের অসুবিধা হওয়ায় ইহাদের অবস্থা সংকটজনক হইয়া উঠে।

সম্রাটের নির্দেশে বিহারের শাসনকর্তা মুজাফফর খান তুরবাতি পর্যাপ্ত রসদ ও সৈন্য নিয়া খান জাহানের সাহায্যে আসেন। ইহার পর খান জাহান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের নিকটে মুগল ও আফগানদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ রাজমহলের যুদ্ধ নামে পরিচিত। দাউদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধের পূর্বের দিন রাত্রে মুগলদের একটি কামানের আঘাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি জুনায়েদ কররাণীর পা চূর্ণ হইয়া যায়। যুদ্ধের শুরুতে কালাপাহাড়ের তীব্র আক্রমনে মুগল সৈন্যরা পিছু হটিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মুগলদের গুলির আঘাতে কালাপাহাড় আহত হন এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়েন। পা-ভাঙ্গা অবস্থায় জুনায়েদ কররাণী মুগলদের সহিত তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং তিনি নিহত হন। দাউদের অন্যতম সেনাপতি খান জাহানও* নিহত হন। সেনাপতিদের মৃত্যুতে আফগান সৈন্যরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে থাকে। পরাজয় অনিবার্য দেখিয়া দাউদ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। তাঁহার অশ্ব জলাভূমিতে আটকাইয়া যায় এবং তিনি মুগলদের হাতে বন্দী হন। মুগল সেনাপতিরা দাউদ কররাণীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

রাজমহলের যুদ্ধের ফলে বাংলায় কররাণী বংশের রাজত্বের অবসান হয় এবং মুগল শাসনের সূত্রপাত হয়। খান জাহান তান্ডায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি সপ্তগ্রাম (পশ্চিম বাংলা) ও ঘোড়াঘাট (উত্তর বাংলা) অঞ্চল অধিকার করেন। ইহার পর তিনি পূর্ব বাংলায় অভিযান করেন। তিনি ভাওয়াল পেঁৗছিলে সে অঞ্চলের জমিদার তিলা গাজী, ইব্রাহীম মোড়ল ও করিমদাদ সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। খান জাহান ভাটি (সোনারগাঁও) এলাকার জমিদার ঈসা খানকে এগার-সিন্ধুরের নিকটে এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই অঞ্চলের জমিদার মজলিস দিলোয়ার ও মজলিস কুতব মুগল নৌবহরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। খান জাহান তান্ডায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর যে কয়েকজন জমিদার মুগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারাও আবার স্বাধীন হইয়া পড়েন। ইহার ফলে মুগল শাসন বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে।

* তিনি মুগল সেনাপতি খান জাহান হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি দাউদের অন্যতম সেনাপতি। দাউদ তাহাকে খান জাহান উপাধি দেন।

খান জাহান ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর মারা যান। তাঁহার ভ্রাতা ইসমাইল কুলী কিছুদিন অস্থায়ীভাবে বাংলার শাসনকর্তার দায়িত্ব বহন করেন। ইহার পর মুজাফফর খান তুরবাতি বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (১৫৭৯খৃঃ)।

বাংলা-বিহারে মুগল সৈন্যদের বিদ্রোহ:

সুবাদার মুজাফফর খান তুরবাতির শাসনকালে বাংলা ও বিহারে মুগল কর্মচারী, জায়গীবদার ও সৈন্যদের এক মারাত্মক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের কয়েকটি কারণ ছিল। সমসাময়িক ইতিহাস-লেখকরা মুগল সাম্রাজ্যের দীউয়ান খাজা শাহ মনসুর ও বাংলার শাসনকর্তা মুজাফফর খান তুরবাতিকে দায়ী করিয়াছেন। বাংলা ও বিহারে কর্মরত মুগল কর্মচারী ও সৈন্যদেরকে যথাক্রমে শতকরা ১০০ ও ৫০ টাকা বর্ধিত হারে বেতন দেওয়া হইত। শাহ মনসুর ইহা হ্রাস করিয়া শতকরা ৫০ ও ২০ টাকা করেন। মুজাফফর তুরবাতি এই আদেশ খুব কড়াকড়িভাবে কার্যকরী করেন এবং এমনকি যাহা পূর্বে বেশী দেওয়া হইয়াছে তাহা রাজকোষে প্রত্যর্পণের দাবী করেন। ইহাতে সকল কর্মচারী ও সৈন্যরা অসন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, মুজাফফর খান তাঁহার পূর্ববর্তী শাসনকর্তা খান জাহানের সম্পত্তির ব্যাপারে এরূপ অশোভনভাবে তদন্ত করেন যে, ইহাতে তাঁহার ভ্রাতা ইসমাইল কুলী ও তুর্কী সৈন্যরা রুষ্ট হন। তৃতীয়তঃ, এই সময় জায়গীরের নূতন বন্দোবস্ত করা হয়। অনেক কর্মচারীর জায়গীর কমাইয়া দেওয়া হয় এবং পূর্বের অতিরিক্ত আদায়ের টাকা রাজকোষে প্রত্যর্পণের আদেশ দেওয়া হয়। মুজাফফর খান রওশন বেগ নামক রাজস্ব আদায়-কারীকে দুর্নীতির অপরাধে প্রকাশ্যভাবে ফাঁসি দেন। ইহাতে ঘোড়া-ঘাটের বাবা খান কাকশাল ও তাঁহার লোকজন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। চতুর্থতঃ, ঘোড়ায় দাগ দেওয়ার ব্যবস্থায় কড়াকড়ি করার দরুন মনসবদারদের মধ্যে অসন্তুষ্টির সঞ্চার হয়। তাছাড়া অনেক কর্মচারী ও মনসবদার সম্রাট আকবরের ধর্মনীতির জন্য তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। বাংলার কাজী মীর মুইযুল মুলক ও জৌনপুরের কাযী মাওলানা মুহম্মদ ইয়াযদি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পক্ষে ফতুয়া দেন।

আরব বাহাদুর এবং আরও কয়েকজন মনসবদার বিহারের বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করেন। বাংলার বিদ্রোহী কর্মচারী ও সৈন্যদের নেতা ছিলেন

বাবা খান কাকশাল। আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও কাবুলের শাসনকর্তা মির্যা হাকিম এই বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং পাঞ্জাব আক্রমণের আয়োজন করেন। মির্যা হাকিমের দুধ-ভাই মাসুম খান কাবুলী বাবা খান কাকশালের সহিত যোগ দেন এবং বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা মির্যা হাকিমকে মুগল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা করে। মুজাফফর খান বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়া তান্ডা দুর্গে আশ্রয় লন। বিদ্রোহীরা তান্ডা দখল করে এবং মুজাফফর খানকে হত্যা করে (১৯ এপ্রিল, ১৫৮০)। তাহারা মির্যা হাকিমকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে এবং তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ করে। মাসুম খান কাবুলী হাকিমের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন এবং বাবা খান কাকশাল বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

সম্রাট আকবর আবদুন খান, রাজা টোডরমল, শাহবাজ খান, মির্যা আযিয কোকা ও অন্যান্য সেনাপতিদেরকে বহু সৈন্যসহ বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করেন। প্রায় দুই বৎসর যুদ্ধের পর তাঁহারা বিদ্রোহীদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে সমর্থ হন। বাবা খান কাকশাল অসুখে মারা যান। মাসুম খান কাবুলী সোনারগাঁয়ের জমিদার ঈসা খানের সহিত মিলিত হন। সম্রাট আকবর পাঞ্জাবে মির্যা হাকিমের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া কাবুল পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করেন। ইহার পর বাংলা-বিহারের বিদ্রোহীরা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আকবরের দুধ-ভাই খান আযম মির্যা আযিয কোকা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন (এপ্রিল, ১৫৮২)। এক বৎসর পর তাঁহার অনুরোধে সম্রাট তাঁহাকে বিহারে বদলি করেন এবং বিহারের শাসনকর্তা শাহবাজ খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন (১৮ মে, ১৫৮৩)।*

* আযিয কোকা ৫ মাস পূর্বেই বাংলা হইতে চলিয়া যান। ঐ সময় ওযীর খান অস্থায়ী শাসনকর্তা ছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বাংলায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠা

বাংলার বার ভূঁইয়া:

সম্রাট আকবরের সময়ে নাম মাত্র বাংলাদেশ মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই প্রদেশে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। মুগল শাসন উত্তর-পশ্চিম বাংলার শহর ও দুর্গ এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুগল শাসন মানিয়া লন নাই। তাঁহারা কররাণী রাজত্বের অবসানের পর নিজেদের জমিদারীতে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। জমিদারদের সৈন্যদল ও শক্তিশালী নৌবহর ছিল। তাঁহারা সম্মিলিত ভাবে বাংলায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সম্রাট আকবরের খ্যাতনামা সেনাপতিদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন। এই জমিদাররা বার ভূঁইয়া নামে খ্যাত। তাঁহাদের আমলের বাংলাদেশ 'বার ভূঁইয়ার মুলক' নামে অভিহিত হয়। বার ভূঁইয়াদের অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন।

মুসলমানদের শাসনকালে বাংলাদেশের বার ভূঁইয়াদের উৎপত্তি হয়। সে সময় সামরিক কর্মচারীদেরকে জায়গীর দেওয়া হইত। বার ভূঁইয়াদের কেহ কেহ এই জায়গীরদারদের বংশধর ছিলেন। তা' ছাড়া, মুসলমান শাসকরা রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার নিয়োগ করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ইজারাদারী বংশগত হইয়া পড়ে এবং ইজারাদাররা পরবর্তীকালে জমিদার নামে পরিচিত হন। আফগান শাসন পতনের পর অনেক পাঠান সরদার বাংলায় আশ্রয় লন এবং কোন কোন অঞ্চল দখল করিয়া স্বাধীন জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন। বার ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন সোনারগাঁয়ের জমিদার ঈসা খান ও তাঁহার পুত্র মূসা খান। ঈসা খানের পিতা সুলায়মান খান হোসেন শাহী বংশের অবসানের পর ভাটি অঞ্চলে (সোনারগাঁও) জমিদারী স্থাপন করেন। ইসলাম শাহ সূরের সেনাপতি তাজ খান কররাণী তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং ঈসা খানকে বন্দী করেন। তাজখান কররাণী যখন বাংলায় রাজ্য স্থাপন করেন তখন

তিনি ঈসা খানকে সোনারগাঁও অঞ্চলের জমিদারী প্রত্যর্পণ করেন। এইজন্য ঈসা খান কররাণী বংশের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত ছিলেন।

ভাওয়ালের গাযী পরিবারের জমিদারী শের শাহের বাংলা জয়ের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফজল গাযী শের শাহের আমলের একজন বড় জমিদার ছিলেন। মজলিস পরতাপ ও মজলিস কুতব ভাওয়াল সংলগ্ন ময়মনসিংহ অঞ্চলের অন্য দুইজন জমিদার ছিলেন। মজলিস কুতব পরে ফতেহবাদ (ফরিদপুর) জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। ফতেহ খান তরফের (দক্ষিণ শ্রীহট্ট), করিমদাদ মুসাজাই ও ইব্রাহিম মোড়ল কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের এবং আনোয়ার খান বাণিয়াচঙ্গের জমিদার ছিলেন। মসনদ-ই-আলী তাজ খান ও সলিম খান হিজলীর এবং শামস খান বীরভূমের জমিদার ছিলেন। মাসুম খান কাবুলী বাংলা-বিহার বিদ্রোহের পর ঈসা খানের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার সহায়তায় পাবনা অঞ্চলে জমিদারী স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র মির্যা মুমিন মুসা খানের সমসাময়িক ছিলেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের উড়িষ্যা জয়ের পর উসমান খান লোহানী সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া লোকজনসহ ঈসা খানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঈসা খানের সহায়তায় তিনি বুকাইনগরে (শ্রীহট্ট জিলায়) জমিদারী স্থাপন করেন। এই সময় বায়াযিদ কররাণী নামক অন্য একজন আফগান সরদার শ্রীহট্ট অঞ্চলে জমিদারী স্থাপন করেন। হিন্দু জমিদারদের মধ্যে বিষ্ণুপুরের (বাকুড়া) বীর হামির, চন্দ্রদ্বীপের (বরিশাল) পরমানন্দ রায়, ভুলুয়ার (নোয়াখালী) লক্ষ্মণমাণিক্য, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের (শ্রীপুর) চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভূষণার (ফরিদপুর জিলায়) মুকুন্দরাম ও তাঁহার পুত্র সত্রজিৎ, শাহজাদপুরের (পাবনা জিলায়) রাজা রায় এবং চান্দপ্রতাপের (মাণিকগঞ্জ) জমিদার বিনোদ রায় ও মধুরায় প্রধান ছিলেন।

বার ভূঁইয়াদেরকে* দমন করিয়া বাংলাদেশে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সম্রাট আকবর ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্যতম খ্যাতনামা সেনাপতি শাহবাজ খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। শাহবাজ খান বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খান ও মাসুম কাবুলীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের আয়োজন করেন। এই সময় ঈসা খান কুচবিহারের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে মুগল সেনাপতি তাঁহার জমিদারী আক্রমণ করেন

* বার ভূঁইয়ার অর্থ বার প্রধান বা বার জন প্রধান জমিদার। কার্যতঃ বাংলায় তখন অনেক বড় বড় জমিদার ছিলেন।

এবং সোনারগাঁও, কত্রাবু ও এগারসিন্ধুর হস্তগত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে টোক নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন। ঈসা খান ও মাসুম কাবুলী কুচবিহার হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং বাজিতপুরের নিকট এক যুদ্ধে শাহবাজ খানের সহকারী তারসুন খানকে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁহারা ঢাকার মুগল থানাদার সৈয়দ হোসেনকে বন্দী করেন। ভাওয়ালের নিকট এক যুদ্ধে তাঁহারা শাহবাজ খানকে পরাজিত করেন এবং বহু মুগল সৈন্য বন্দী করেন ও ইহাদের ধনবস্ত্র হস্তগত করেন (১৫৮৪খৃঃ)। শাহবাজ খান তান্ডায় ফিরিয়া যান। ঈসা খান ও মাসুম কাবুলী তাঁহাদের জমিদারী হইতে মুগলদেরকে বিতাড়িত করেন। এই সময় উড়িষ্যার আফগান নায়ক কতলু লোহানী বারে বারে মুগল অধিকৃত পশ্চিম বাংলা আক্রমণ করেন।

শাহবাজ খানের পরবর্তী সুবাদার সাদিক খান (১৫৮৫খৃঃ) ও ওযীর খান (১৫৮৬-৮৭খৃঃ) বহু দিন জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও সুবিধা করিতে পারেন নাই। ওযীর খানকে সাহায্যের জন্য সম্রাট আকবর আবার শাহবাজ খানকে বাংলায় পাঠান। কূটনীতির সাহায্যে শাহবাজ খান অনেক আফগান সরদারকে হাত করেন। ঈসা খান অসুবিধায় পড়িয়া শাহবাজ খানের সহিত সন্ধি করেন। তিনি উত্তর বাংলায় তাঁহার বিজিত স্থানগুলি মুগলদেরকে ছাড়িয়া দেন এবং সম্রাটের জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মাসুম কাবুলী নিজ পুত্রকে সম্রাটের দরবারে পাঠান। কতলু লোহানী মুগলদের শত্রুতা হইতে বিরত থাকেন। ওযীর খান ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মারা যান এবং সায়েদ খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। সায়েদ খান কতলু লোহানীর নিকট হইতে উড়িষ্যা জয় করিতে বিহারের শাসনকর্তা রাজা মানসিংহকে সাহায্য করেন। ইহার ফলে উড়িষ্যা মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (১৫৯২খৃঃ)।

১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। মানসিংহ তানডা হইতে অল্পদূরে রাজমহলে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। কুচ বিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ঈসা খানের আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষার জন্য মানসিংহের শরণাপন্ন হন। তিনি তাহার ভগ্নীকে মানসিংহের সহিত বিবাহ দেন এবং সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন (১৫৯৬খৃঃ)। মানসিংহ ঈসা খান ও মাসুম কাবুলীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বিক্রমপুরের ১২ মাইল দূরে এক নৌ-যুদ্ধে মান-

সিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ নিহত হন এবং তাহার অনেক সৈন্য শত্রুদের হাতে বন্দী হয় (সেপ্টেম্বর ১৫৯৭)। ইহার পর মানসিংহের সহিত ঈসা খানের সন্ধি হয়। ঈসা খান মুগল বন্দীদেরকে মুক্তি দেন এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন (১৫৯৭খৃঃ)। মানসিংহ রাজমহলে প্রতিনিধি রাখিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ঈসা খানের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র মুসা খান বার ভূইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদের আক্রমণে অনেক স্থানে মুগলদের বিপর্যয় ঘটে। মানসিংহ আবার বাংলায় আসেন (১৬০১ খৃঃ)। তিনি শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায়কে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তিনি বুকাইনগরের উসমান লোহানীকে এক যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ময়মনসিংহের থানা পুনরুদ্ধার করেন। তিনি যখন ঢাকায় পৌছেন তখন মুসা খান, কেদার রায় ও অন্যান্য জমিদারদের নৌবাহিনী ইছামতি নদীতে মুগলদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করে। মানসিংহ হাতির পিঠে করিয়া নদী পার হন এবং শত্রুদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। বিক্রমপুরের নিকটে আর একটি যুদ্ধে কেদার রায় আহত ও বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয় (১৬০৩খৃঃ)। সম্রাট আকবর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং মানসিংহকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠান। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহনের পর মানসিংহ আবার বাংলায় প্রেরিত হন। এক বৎসর পর কুতবুদ্দীন কোকাকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করা হয় (সেপ্টেম্বর, ১৬০৬)। কুতবুদ্দীন কোকা শের আফকুনের হাতে প্রাণ হারান। তাহার পরবর্তী সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলী খান এক বৎসর পর মারা যান (১৬০৮খৃঃ)। ইহার পর ইসলাম খান সুবাদার নিযুক্ত হন।

সুবাদার ইসলাম খান

বার ভূঁইয়াদেরকে দমন ঃ

বাংলার বার ভূঁইয়াদেরকে দমন করিয়া এ প্রদেশে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের কৃতিত্বপূর্ণ কার্য। সুবাদার ইসলাম খান (১৬০৮—১৬১৩খৃঃ) এই কৃতিত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করেন। তিনি ফতেহপুর সিক্রির শেখ সলিম চিশতীর দৌহিত্র ছিলেন। ইসলাম খান খুব বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন। শাসনভার গ্রহণ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন

যে, বার ভুঁইয়াদের নেতা মুসা খানকে দমন করিতে পারিলে তাহার পক্ষে অন্যান্য জমিদারদেরকে বশীভূত করা সহজসাধ্য হইবে এবং সে জন্য তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জমিদারদের নৌবাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য তিনি শক্তিশালী নৌবহরের ব্যবস্থা করেন। ইসলাম খান স্থল ও জল পথে মুসা খান ও তাহার মিত্রদের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যাপক আয়োজন করেন। কূটনীতির সাহায্যে তিনি বার ভুঁইয়াদের ঐক্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। তিনি যখন রাজমহল হইতে ঘোড়াঘাট (রংপুর) পৌছেন তখন যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্য স্বেচ্ছায় তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন। বিষ্ণুপুরের বীর হামির, বীরভূমের শামস খান ও হিজলীর সলিম খান মুগলদের আনুগত্য মানিয়া লইতে বাধ্য হন। ভূষণা অঞ্চলের জমিদার সত্রজিৎ কিছুদিন প্রতিরোধের পর মুগল বাহিনীর সহিত যোগ দেন। তাহার সাহায্যে মুগলরা মজলিস কুতবের ফতেহাবাদ অধিকার করে।

ইসলাম খান ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঘোড়াঘাট হইতে করতোয়া নদীর তীর ধরিয়া শাহজাদপুরে (পাবনা জিলায়) পৌছেন এবং ইহার পূর্ব তীরে অবস্থিত মুসা খানের দুর্ভেদ্য যাত্রাপুর দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন। মুসা খান ও তাহার মিত্রবাহিনী যাত্রাপুরের তিন মাইল দূরে ডাকচরায় আরও একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তাহারা মুগলদের বিরুদ্ধে তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং ইহাদের যথেষ্ট ক্ষতি করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুগল বাহিনীর তীব্র আক্রমনে মুসা খান, মির্যা মুমিন, মধু রায় ও বিনোদ রায় দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ইসলাম খান রাত্রে হঠাৎ যাত্রাপুর দুর্গ আক্রমণ করেন এবং ইহা হস্তগত করেন। ইহার পর মুগলরা একটি খাল খনন করিয়া জল ও স্থল পথে ডাকচরা অবরোধ করে। এক মাস সংঘর্ষ ও অবিরাম গোলাগুলির পর তাহারা দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ডাকচরায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় (১৫ জুলাই, ১৬১০)। ডাকচরা হইতে ইসলাম খান ঢাকার দিকে অগ্রসর হন এবং মহাসমারোহে শহরে প্রবেশ করেন। এই সময় হইতে ইসলাম খান ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন এবং ইহার নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্য ও নৌবহর রাখার ব্যবস্থা করেন।

মুসা খান, মির্যা মুমিন, শামসুদ্দীন বাগদাদী, বাহাদুর গাযী ও অন্যান্য জমিদাররা লক্ষ্যা নদীতে মুগলদেরকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হন।

তাহারা ইহার পূর্ব তীরের দুর্গগুলি সুরক্ষিত করেন। ইসলাম খান ইহার পশ্চিম তীরের বিভিন্ন স্থানে সৈন্যদল ও নৌবহর সমাবেশ করেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দের ১২ মার্চ মুগলদের সহিত জমিদারদের নৌযুদ্ধ শুরু হয়। মুগল নৌবহর রাত্রিকালে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মুসা খানের কত্রাবু দুর্গ অধিকার করে। ইহার পর কদমরসুল এবং মুসা খানের আরও কয়েকটি দুর্গ মুগলদের হস্তগত হয়। অবস্থার বিপর্যয়ে মুসা খান সোনারগাঁও প্রত্যাবর্তন করেন। রাজধানী নিরাপদ নয় মনে করিয়া তিনি মেঘনা নদীতে অবস্থিত ইব্রাহিমপুর দ্বীপে আশ্রয় লন। মুগল সৈন্যরা সোনারগাঁও দখল করে। শামসুদ্দীন বাগদাদী, বাহাদুর গাযী ও মজলিস কুতব ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাহারা বশ্যতা স্বীকার করায় ইসলাম খান তাঁহাদেরকে তাঁহাদের জমিদারী জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। অনন্যোপায় হইয়া মুসা খান সুবাদারের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইসলাম খান তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার জমিদারী জায়গীর স্বরূপ দান করেন। মুসা খান সম্রাটের আনুগত্য মানিয়া লন এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের কার্যে মুগলদেরকে সাহায্য করেন।

বার ভূঁইয়াদের নায়ক মুসা খানের আত্মসমর্পণের পর অন্যান্য জমিদাররা মুগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র ইহাদের অন্যতম ছিলেন। যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রথমে সুবাদারের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি মুগলদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ইসলাম খান প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য সলকার নৌযুদ্ধে শোচনীয় রূপে পরাজিত হন এবং আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন (১৬১২ খৃঃ)। বন্দী অবস্থায় তাঁহাকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁহার পুত্রদেরকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। ভুলুয়ার অনন্তমাণিক্য মুগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি মুগল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন এবং আরাকানে পলায়ন করেন। তাঁহার মন্ত্রী য়ুসুফ বারলাস আত্মসমর্পণ করেন।

উসমান লোহানী :

বুকাইনগরের আফগান জমিদার উসমান খান লোহানী মুগলদের পরম শত্রু ছিলেন। মুসা খানের বশ্যতা স্বীকার করার পরেও তিনি মুগল সম্রাটের আধিপত্য মানিয়া লন নাই। ইসলাম খান তাঁহার বিরুদ্ধে

অভিযানের বিরাট আয়োজন করেন। এই অভিযানে সুবাদারকে সাহায্যের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার অন্যতম খ্যাতনামা সেনাপতি সুজাত খানকে বাংলায় পাঠান। ১৬১২ খৃষ্টাব্দের ১২ মার্চ দৌলাম্বা-পুরে (দক্ষিণ শ্রীহট্টে) মুগল বাহিনীর সহিত উসমান লোহানীর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তিনি অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। হঠাৎ শত্রুপক্ষের একটি তীর তাঁহার চক্ষু বিদ্ধ করিয়া মগজে প্রবেশ করে। তিনি তীরটি টানিয়া বাহির করেন। ইহাতে তাঁহার দুইটি চক্ষুই নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায়ও উসমান লোহানী সারাদিন যুদ্ধ পরিচালনা করেন। রাত্রে তিনি মারা যান। নেতার মৃত্যুতে আফগানরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে এবং সুজাত খানের নিকট আত্মসমর্পণ করে। শ্রীহট্টের অন্যতম আফগান জমিদার বাগাযিদ কররাণীও উসমানের মৃত্যুর পর মুগল সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সুবাদার ইসলাম খান আফগানদেরকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করেন।

সুবাদার ইসলাম খানের বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতার ফলে নোয়াখালী ও শ্রীহট্ট পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বার ভূঁইয়াদের শক্তি বিধ্বস্ত হয়। বাংলার জমিদাররা সম্পূর্ণরূপে মুগল সম্রাটের অনুগত হন এবং তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে নিজেদেরকে নিয়োগ করেন।

সুবাদার ইসলাম খান বাংলার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি জয় করিয়া মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে কাচার রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কাচারের রাজা শত্রুদমন (প্রতাপ নারায়ণ) কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নিয়মিত কর দিতে অঙ্গীকার করেন। সুসাংয়ের কুচ জমিদার রাজা রঘুনাথ মানসিংহের সময় মুগল সম্রাটের আধিপত্য মানিয়া লইয়াছিলেন। ইসলাম খানের সময় কামরূপের রাজা পরীক্ষিৎ নারায়ণ রঘুনাথের জমিদারী আক্রমণ করেন। রঘুনাথ মুগল সুবাদারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রঘুনাথের সাহায্যের জন্য ইসলাম খান শেখ কামালের অধীনে সৈন্য ও নৌবহর প্রেরণ করেন। শেখ কামাল কামরূপ আক্রমণ করেন। তিনি সালকোনার নিকট এক নৌযুদ্ধে পরীক্ষিৎকে পরাজিত করিয়া ধুবরী দুর্গ অবরোধ করেন এবং ইহা অধিকার করেন। পরীক্ষিৎ ভীত হইয়া শেখ কামালের নিকট মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ইসলাম খান তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন

নাই। তাঁহার নির্দেশে শেখ কামাল পরীক্ষিতের রাজধানী গিলাহ আক্রমণ করেন এবং কিছুকাল অবরোধের পর ইহা দখল করেন। ইহার ফলে সমগ্র কামরূপ মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কামরূপ শাসনের জন্য একজন ফৌজদার নিয়োগ করা হয় (১৬১৩খৃঃ)।

ইসলাম খান ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের ২১ আগষ্ট মারা যান।

কাসিম খান চিশতী :

ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাসিম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন (১৬১৩খৃঃ)। কাসিম খান সুবাদার রূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার শাসনকালে কাচারের শত্রুদমন মুগল আধিপত্য অস্বীকার করেন। কাসিম খান মুবারিয খানের অধীনে কাচারে সৈন্য প্রেরণ করেন। মুবারিয খান প্রতাপগড় ও আসুরাতেকর দুর্গদ্বয় দখল করেন। কিছুদিন পর মুবারিয খানের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ মিরাক বাহাদুর শ্রীহট্টে প্রত্যাবর্তন করেন। শত্রুদমন দুর্গদ্বয় পুনরুদ্ধার করেন। ইহাতে কাচারে মুগল আধিপত্য নষ্ট হয়। কাসিম খান আসাম জয়ের জন্য অভিযান প্রেরণ করেন (১৬১৫ খৃঃ)। নানা কারণে এই অভিযান ব্যর্থ হয়।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দে আরাকানের রাজা মেঙ্গ বেঙ্গ পর্তুগীজ জলদস্যুদের সহিত মিলিত হইয়া ভুলুয়া আক্রমণ করে। কাসিম খান বিরাট নৌবাহিনী লইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে মেঙ্গ বেঙ্গ ও তাহার ফিরিঙ্গী মিত্রদের মধ্যে মতান্তর হওয়ায় ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সুযোগে মুগল সৈন্যরা আরাকান বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং ইহাদেরকে ভুলুয়া হইতে বিতাড়িত করে। কাসিম খান চট্টগ্রাম জয় করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার চট্টগ্রাম অভিযান ব্যর্থ হয়।

ইব্রাহিম খান ফতেহজঙ্গ :

সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে কাসিম খানের স্থলে ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। ইব্রাহিম খান সম্রাজ্ঞী নূরজাহান বেগমের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি শাসক রূপে খুব যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁহার সততা ও বিশ্বস্ততার সুনাম ছিল। অমায়িক ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা তিনি শত্রুমিত্র সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা

অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বাংলার সবত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই প্রদেশে মুগল শাসনের সুফল দেখা দেয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয় এবং লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হয়। ইসলাম খানের সময়ে যশোহরের প্রতাপাদিত্যের পুত্রদেরকে এবং কাসিম খানের সময়ে কামরূপের পরীক্ষিৎ নারায়ণকে বন্দী অবস্থায় সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সুবাদার ইব্রাহিম খানের সুপারিশে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাদেরকে মুক্তি দেন। মুসা খান ও অন্যান্য প্রধান জমিদারদেরকে জাহাঙ্গীরনগরে নযরবন্দীর মত রাখা হইয়াছিল। ইব্রাহিম খান তাঁহাদের উপর হইতে এই ব্যবস্থা উঠাইয়া লন। সুবাদারের মহত্ব ও সৌজন্যে তাঁহারা খুবই সন্তুষ্ট হন এবং মুগল শাসনের একান্ত অনুগত হইয়া উঠেন।

ত্রিপুরা রাজ্য জয় ইব্রাহিম খানের শাসনকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সম্রাট জাহাঙ্গীর এই পার্শ্ববর্তী রাজ্যটি অধিকার করার জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দেন। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম খান মির্যা ইসফান্দিয়ার ও মির্যা নূরুদ্দীনের অধীনে স্থল ও জলপথে ত্রিপুরা রাজ্যে অভিযান প্রেরণ করেন। মুসা খান এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। মেহেরপুর ও কুমিল্লা হইয়া মুগল বাহিনী ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হয়। রাজা যশোমাণিক্য ইহাদেরকে বাধা দেন, কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার অনেক ক্ষতি হয়। তিনি উদয়পুরে আশ্রয় লন। মুগল বাহিনী উদয়পুর আক্রমণ করে এবং ইহা দখল করে। যশোমাণিক্য আরাকানে পলায়ন করেন। উদয়পুরে মুগল সামরিক থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় আরাকানের রাজা মেঙ্গ খামঙ্গ ফিরিঙ্গীদের নিকট হইতে সন্দ্বীপ দখল করিয়া মেঘনা নদীর তীরবর্তী ভূভাগে লুটতরাজ করিতেছিলেন। ইব্রাহিম খান আরাকানের মগদেরকে শাস্তি দিবার জন্য শক্তিশালী নৌবহর নিয়া অগ্রসর হন এবং ইহাদেরকে মেঘনা হইতে বিতাড়িত করেন। তিনি মেঘনার তীরে স্থানে স্থানে সামরিক থানার ব্যবস্থা করেন। কয়েক মাস পর তিনি ত্রিপুরা হইতে আরাকানে অভিযানের আয়োজন করেন। ফেনী নদীতে নৌবহর রাখিয়া তিনি স্থল পথে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হন। ঘন জঙ্গলের পথে তাঁহার সৈন্যরা খুবই অসুবিধা ভোগ করে এবং তাহাদের মধ্যে মহামারী দেখা দেয়। এই কারণে আরাকান অভিযান বন্ধ হইয়া যায়।

হিজলীর জমিদার সলিম খানের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর খান তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। বাহাদুর খান সম্রাটের প্রতি

আনুগত্য অস্বীকার করেন। বর্ধমানের ফৌজদার তাঁহাকে দমন করিতে অসমর্থ হন। ইহার পর সুবাদার ইব্রাহিম খান নিজে অগ্রসর হন। বাহাদুর খান ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তিন লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হন।

বিদ্রোহী শাহজাহানের বাংলা অধিকার :

১৬২২ খৃষ্টাব্দে পারস্যের শাহ দ্বিতীয় আব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহজাদা শাহজাহানকে কান্দাহারে অবরুদ্ধ মুগল সৈন্যদের সাহায্যের জন্য যাইতে আদেশ দেন। শাহজাহান তখন দাক্ষিণাত্যের মুগল প্রদেশগুলির শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়া কান্দাহার যাইতে গড়িমসি করেন এবং কয়েকটি দাবী উত্থাপন করেন। কার্যতঃ, শাহজাহান সম্রাটের আদেশ অমান্য করেন এবং বিদ্রোহী হন। সম্রাট তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি মহবত খানকে প্রেরণ করেন। মহবত খানের আক্রমণের ফলে বিদ্রোহী শাহজাহান দাক্ষিণাত্য বা উত্তর ভারতের কোন স্থানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে অসমর্থ হন। ইহার পর তিনি উড়িষ্যা হইয়া বাংলায় প্রবেশ করেন। মেদেনীপুর ও বর্ধমানের পথে তিনি রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন এবং রাজমহল দখল করেন। শাহজাহান সুবাদার ইব্রাহিম খানকে তাঁহার পক্ষে যোগ দিতে নির্দেশ দেন। ইব্রাহিম খান বিদ্রোহী শাহজাদার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাজমহলের নিকটে শাহজাহানের সহিত এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন (২০ এপ্রিল, ১৬২৪)। বিজয়ী শাহজাহান জাহাঙ্গীরনগর অভিমুখে যাত্রা করেন এবং নয় দিন পর বাংলার রাজধানীতে প্রবেশ করেন। তিনি এক সপ্তাহ জাহাঙ্গীরনগরে অবস্থান করেন। খান খানান আবদুর রহিমের পুত্র দারাব খানকে বাংলার সুবাদার রূপে জাহাঙ্গীরনগরে রাখিয়া শাহজাহান রাজমহলে ফিরিয়া যান।

শাহজাহান রাজমহল হইতে বেনারস, চুণার, জৌনপুর ও এলাহাবাদ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্রাটের সেনাপতি মহবত খান তাঁহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। শাহজাহানকে আবার দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় লইতে হয় (১৬২৫খৃঃ)। সম্রাট জাহাঙ্গীর মহবত খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। মহবত খান দারাব খানকে পরাজিত ও নিহত

করেন এবং বাংলায় জাহাঙ্গীরের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পুত্র খানাজাদকে প্রতিনিধি রাখিয়া মহবত খান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। মহবত খানের পর সম্রাট জাহাঙ্গীর মুকাররম খানকে সুবাদার নিয়োগ করেন (১৬২৬ খৃঃ)। এক বৎসর পর মুকারবম খান মারা যান। ফিদাই খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ফিদাই খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেব বাংলার শেষ সুবাদার ছিলেন।

সুবাদার কাসিম খান জুয়িনী

পর্তুগীজদের দমন:

সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনারোহনের পর ফিদাই খানের স্থলে কাসিম খান জুয়িনীকে বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠান (৪ ফেব্রুয়ারী, ১৬২৮)। তাঁহার শাসনকালে হুগলীর পর্তুগীজদের সহিত মুগলদের সংঘর্ষ বাধে। য়ুরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজ বণিকরা প্রথম বাংলায় আসে এবং হোসেন শাহী বংশের রাজত্ব কালে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বন্দরের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করে। ইহারা সপ্তগ্রামের তিন মাইল দূরে হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। ভাগীরথী নদীর গতি পরিবর্তনের দরুন যখন সপ্তগ্রাম বন্দরের অবনতি হয় তখন হুগলী বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরের আসন লাভ করে এবং সেখানে পর্তুগীজদের প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর হুগলীর পর্তুগীজদের প্রধান পেড্রো টেভারিজের সহিত আলাপে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সেখানে শহর ও গীর্জা নির্মাণ করিতে এবং ধর্মপ্রচার করিতে অনুমতি দেন। ইহার ফলে হুগলী বন্দরে পর্তুগীজদেব একটি বড় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে।

নানা কারণে জনসাধারণ পর্তুগীজদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং সুবাদার কাসিম খানের সময় ইহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ, পর্তুগীজরা বাণিজ্য না করিয়া জলদস্যুতা করিত এবং আরাকানের মগ দস্যুদের সহিত মিলিয়া বাংলার নদী অঞ্চলে লুট-তরাজ করিত। ইহাদের সহিত হুগলীর পর্তুগীজদের সংযোগ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, পর্তুগীজরা জোরজবরদস্তি করিয়া এদেশের লোকদেরকে খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত করিত। তৃতীয়তঃ, হুগলীতে পর্তুগীজদের সংখ্যা ও সামরিক শক্তি বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইহাদের গোলাবারুদ ও নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। এমতাবস্থায় হুগলীতে একটি পর্তুগীজ রাজ্য স্থাপিত হইবার

আশঙ্কা ছিল। তা'ছাড়া, শাহজাহান যখন বাংলায় আসিয়াছিলেন তখন হুগলীর পর্তুগীজদের আচরণে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পর্তুগীজ নেতা ম্যানুয়েল টেভারিজ ও মিগোয়েল রডরিগিজ তাহাদের নৌবহর নিয়া শাহজাহানের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং এলাহাবাদের অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করেন। ইহাতে শাহজাহানের খুবই অসুবিধা হয় এবং তাহাকে অভিযান বন্ধ করিয়া দিয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় লইতে হয়। পর্তুগীজরা ফিরিবার পথে পাটনা হইতে মমতাজ মহল বেগমের দুইজন পরিচারিকা ধরিয়া লইয়া যায় এবং ইহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। এই সমস্ত কারণে সম্রাট শাহজাহান হুগলীর পর্তুগীজদেরকে শাস্তি দিবার জন্য সুবাদার কাসিম খানকে নির্দেশ দেন।

কাসিম খান খুব নিপুণভাবে হুগলীর পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যবস্থা করেন। তিনি ইহাদেরকে চতুর্দিক হইতে ঘেরাও করার পরিকল্পনা করেন। বর্ধমান হইতে একটি মুগল সৈন্যদল হুগলী ও সপ্তগ্রামের মধ্যবর্তী হলদিপুর নামক স্থানে পৌঁছে। মকসুদাবাদ হইতে আর একটি সেনাদল আসিয়া ইহাদের সহিত যোগ দেয়। শ্রীপুর হইতে মুগল নৌ-বাহিনী নদী বাহিয়া কলিকাতার ১০ মাইল দক্ষিণে সাংকরাইল নামক স্থানে ঘাটি স্থাপন করে। ইহার পর হলদিপুরের সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ দিকে সরিয়া যায়। নৌকা যোগে সেতু নির্মাণ করিয়া ইহারা নদী পার হয় এবং সাংকরাইলে নৌবাহিনীর সহিত মিলিত হয়। মুগল বাহিনী ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের ২০ জুন হুগলী আক্রমণ করে এবং ২২ জুন ইহারা শহরের উপকণ্ঠ হস্তগত করে। পর্তুগীজরা ব্যাপক গোলাবারুদ ব্যবহার করায় মুগল সৈন্যদের খুব ক্ষতি হয়। ইহার পর মুগল সৈন্যরা হুগলী শহর অবরোধ করিয়া রাখে এবং কামানের সাহায্যে শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি করে।

পর্তুগীজরা গোয়া ও অন্যান্য স্থানের পর্তুগীজদের নিকট হইতে সাহায্যের আশা করিয়াছিল, কিন্তু কোন সাহায্য না আসায় ইহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। অবরুদ্ধ অবস্থায় হুগলীর অধিবাসীদের দুর্দশা চরমে পৌঁছে এবং অনেকে শহর ত্যাগ করে। পর্তুগীজরা গোপনে নদীপথে পলাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু মুগলদের গোলাগুলির আঘাতে তাহাদের অনেকের নৌকাডুবি হয়। কিছু সংখ্যক নৌকা সাগর দ্বীপে পৌঁছিতে সমর্থ

হয়। সেখান হইতে পর্তুগীজরা জাহাজে গোয়ায় চলিয়া যায়। ১৫ সেপ্টেম্বর মুগল সৈন্যরা হুগলী অধিকার করে। সমসাময়িক ইতিহাস লেখক আবদুল হামিদ লাহোরী লিখিয়াছেন যে, হুগলীর যুদ্ধে দশ হাযার পর্তুগীজ নরনারী মারা যায় এবং এক হাযার মুগল সৈন্য নিহত হয়। ৪৪০০ পর্তুগীজ বন্দীকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়।

হুগলী জয়ের কিছুদিন পর কাসিম খান জুয়িনী মারা যান (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৬৩২)।

ইসলাম খান মাসহাদী :

কাসিম খান জুয়িনীর পর আযম খান তিন বৎসর বাংলার সুবাদার ছিলেন। ইহার পর ইসলাম খান মাসহাদী (১৬৩৫–৩৯খৃঃ) সুবাদার নিযুক্ত হন। ইসলাম খান মাসহাদীর সময়ে আসামের রাজা প্রতাপসিংহ মুগলদের বিরুদ্ধে শত্রুতা আরম্ভ করেন। তিনি কামরূপের ভূতপূর্ব রাজা পরীক্ষিৎ নারায়ণের ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ধরাংয়ের সামন্ত রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ সিংহ ও লক্ষ্মীনারায়ণ মিলিতভাবে মুগল অধিকৃত কামরূপ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হন। পাণ্ডুর মুগল থানাদার সত্রজিৎ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোপনে তাহাদেরকে কামরূপ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করেন। ইহাতে তাহারা সহজেই পাণ্ডু অধিকার করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা কামরূপের অন্যতম হাজু দুর্গ আক্রমণ করেন। কামরূপের ফৌজদার আবদুস সালাম কয়েক মাস পর্যন্ত শত্রুদেরকে বাধা দিয়া দুর্গ রক্ষা করেন, কিন্তু পরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই সময় সুবাদার ইসমাইল খান মাসহাদী এক শক্তিশালী নৌবহর ও সৈন্যদল কামরূপে প্রেরণ করেন। বিষ্ণুপুরের নিকটে অহোমদের সহিত মুগলদের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অহোমরা পরাজিত হয় এবং ইহাদের চার হাযার সৈন্য নিহত হয় এবং তিনশত সৈন্যাধ্যক্ষ বন্দী হন (১০ অক্টোবর, ১৬৩৭)। মুগল বাহিনী পাণ্ডু ও অন্যান্য স্থান পুনরুদ্ধার করিয়া কামরূপে মুগল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। ইহার পর তাহারা আসাম আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয় এবং আসাম সীমান্তে অবস্থিত কাজলি দুর্গ অধিকার করে। যুদ্ধে বহু ক্ষয় ক্ষতি হওয়ার দরুন অহোমরাজ মুগলদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। দুই পক্ষে যুদ্ধ বন্দীদের বিনিময় হয়। উত্তরে বড়নদী ও দক্ষিণে আশুরালি

আসাম রাজ্য ও মুগল অধিকৃত কামরূপের মধ্যে সীমানা নির্দিষ্ট হয় (১৬৩৮)। গৌহাটিতে কামরূপের ফৌজদারের রাজধানী স্থাপিত হয়।

সুবাদার ইসলাম খান মাসহাদীর সময়ে আরাকানের রাজা থুধম্মার মৃত্যু হয় (১৬৩৮ খৃঃ)। তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে হত্যা করিয়া জনৈক কর্মচারী সিংহাসন দখল করে। থুধম্মার ভ্রাতা ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মংগতরায় সিংহাসন আত্মসাৎকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মংগতরায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং লোকজন নিয়া জাহাঙ্গীর-নগরে আশ্রয় লন। মগরাজা এক বিরাট নৌবাহিনী লইয়া মেঘনা নদীতে প্রবেশ করেন এবং তীরবর্তী স্থানগুলিতে লুটতরাজ করিতে থাকেন। সুবাদার একটি শক্তিশালী নৌবহর লইয়া মগদেরকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হন। মগরাজা ভয় পাইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

সুবাদার শাহজাদা সুজা :

ইসলাম খান মাসহাদীর পর সম্রাট শাহজাহান তাহার দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ সুজাকে বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠান (ফেব্রুয়ারী ১৬৩৯)। সুজাকে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশেরও শাসনভার দেওয়া হয়। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বৎসর বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মাত্র দুইবার (১৬৪৭ ও ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে) স্বল্পকালের জন্য সম্রাটের আদেশে তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন। সুজার শাসনকালে বাংলায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ছিল। আরাকান ও আসামের রাজারা তাহার প্রদেশ আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। বাংলায় আভ্যন্তরীণ কোনরূপ গোলযোগ ছিল না। হিজলীব জমিদার বাহাদুর খান অসুবিধায় না পড়িলে মুগলদের আনুগত্য মানিয়া চলিতেন না। সুজা সুবাদার হইয়া আসার পর তিনি নিয়মমত কর দিতে শুরু করেন। সুজা তাহার কর বৃদ্ধি করেন। বাহাদুর খান বর্ধিত কর দিতে গড়িমসি করায় সুবাদার তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। বাহাদুর খানকে বন্দী করা হয় এবং তাহাকে জাহাঙ্গীরনগরে আটক রাখা হয়। সুজার সময়ে বাংলার রাজধানী ঢাকায় থাকিলেও তিনি নিজে রাজমহলে থাকিতেন।

সুজার শান্তিপূর্ণ শাসনকালে বাংলায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। য়ুরোপীয় বণিকরা, বিশেষতঃ ওলন্দাজ ও ইংরেজরা বাংলার বাণিজ্যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। সুজা জেব্রাইল ব্রাউটন নামক এক

ইংরেজ চিকিৎসকের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া ইংরেজ বণিকদেরকে বাৎসরিক মাত্র তিন হাযার টাকা করের বিনিময়ে সারা বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দান করেন। এই বিরাট সুবিধার ফলে ইংরেজ বণিকরা অল্প সময়ে বাংলায় বাণিজ্য বিস্তার করিয়া সমৃদ্ধ হইতে সুযোগ পায়।

শাহজাদা সুজা শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষিত লোকদের সাহচর্য পসন্দ করিতেন। তাঁহার সভাসদ ও কর্মচারীদের মধ্যে অনেক ইরানী পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। সে সময়ে ঢাকায় বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। বাংলার শান্তিপূর্ণ জীবনে সুজা আরামপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আমোদ-প্রমোদ ও গানবাজনা নিয়া থাকিতেন। সুজা উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি দিনাজপুরের মাদারী ফকীর-দেরকে ভূমি দান করেন এবং নানা রকম সুবিধা দেন।

উত্তরাধিকার যুদ্ধ:

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর সম্রাট শাহজাহান সাংঘাতিক রূপে পীড়িত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং তাহার উপর সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করেন। তখন সুজা রাজমহলে ছিলেন। শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গযেব দাক্ষিণাত্যের এবং চতুর্থ পুত্র মুরাদ গুজরাটের সুবাদার রূপে যথাক্রমে আহমদনগর ও আহমদাবাদে ছিলেন। শাসনভার গ্রহণ করার পর দারা কয়েকটি মারাত্মক ভুল করেন। তিনি পিতার অসুখের সংবাদ গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন এবং রাজমহল, আহমদ-নগর ও আহমদাবাদের সহিত যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দেন ও কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে সুজা ও তাহার ভ্রাতারা মনে করেন যে, সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যু হইয়াছে এবং দারা দিল্লীর সিংহাসনে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। মুগল বংশে সিংহাসনে উত্তরাধিকারিত্বের জন্য কোন ধরাবাধা নিয়ম ছিল না। পরিবারের যে কোন শাহজাদা উত্তরাধি-কারিত্বের দাবী করিতে পারিতেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক শাহজাদারই সিংহাসনের আকাংখা ছিল। সুজা ও তাহার ভ্রাতাদেরও সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টি ছিল। এইজন্য সিংহাসন লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। তৃতীয়তঃ, সিংহাসনের জন্য প্রতিযোগিতা হইতে বিরত থাকিলেও তাহাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছিল না। দারা

সাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করিলে তিনি যে তাহার ভ্রাতাদেরকে সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন না, সে সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয়তা ছিল না। এই অবস্থায় সিংহাসনের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত তাহাদের অন্য পথ ছিল না। আওরঙ্গযেব ও মুরাদ দারার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হন। তাহারা সুজার সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজমহল বহু দূরে অবস্থিত থাকায় তাহারা সুজাকে তাহাদের সংঘের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সুজা রাজমহলে নিজকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি রাজমহল হইতে সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি বিহারে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন। তাহাকে বাধা দিবার জন্য দারা তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলায়মান শিকো ও রাজা জয়-সিংহকে পাঠান। তাহারা বেনারসের নিকটে সুজার অগ্রগতি প্রতিরোধ করেন। বাহাদুরপুর নামক স্থানে দুইপক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হয় (২৪শে জানুয়ারী, ১৬৫৮)। সুজা পরাজিত হন এবং মুঙ্গেরে আশ্রয় লন। সুলায়মান ও জয়সিংহ তাহাকে অনুসরণ করেন। ইতিমধ্যে আওরঙ্গযেব ও মুরাদের মিলিত বাহিনী দারার সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ ও কাসিম খানকে ধর্মটের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তাহারা আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। দারা তাহার সাহায্যের জন্য সুলায়মান ও জয়সিংহকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাহাদেরকে সুজার সহিত সন্ধি করিতে নির্দেশ দেন। সুলায়মান সুজাকে বাংলা, উড়িষ্যা ও মুঙ্গের পর্যন্ত বিহার ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করেন (৭ই মে, ১৬৫৮) এবং পিতার সাহায্যের জন্য আগ্রা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি সামুগড়ের যুদ্ধে পিতার শোচনীয় পরাজয় ও দিল্লীর দিকে পলায়নের কথা জানিতে পারেন। এই সংবাদে জয়সিংহ তাহার পক্ষ ত্যাগ করেন এবং তাহার বহু সৈন্য তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। দিল্লী ও পাঞ্জাবের দিকে যাওয়ার পথ আওরঙ্গযেবের সৈন্যদের দ্বারা রুদ্ধ থাকায় সুলায়মানকে শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইতে হয়।

আওরঙ্গযেব যখন আগ্রা অধিকার করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন তখন তিনি তাহার প্রতি মুরাদের বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় পান। এইজন্য তিনি মুরাদকে বন্দী করেন। ইহার পর আওরঙ্গযেব দারাকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করেন এবং মুগল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট আওরঙ্গযেব সুজার সহিত সমঝোতা করিতে চেষ্টা করেন। তিনি

সুজাকে বাংলা, উড়িষ্যা ও বিহারের শাসনভার অর্পণ করেন এবং এই মর্মে তিনি সুজাকে চিঠি লিখেন। কিন্তু সুজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তিনি দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য আওরঙ্গযেবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত হন। আওরঙ্গযেব যখন পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে দারার অনুসরণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন তখন সুজা বিহার হইতে এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হন। এলাহাবাদের নিকট খাজুয়া নামক স্থানে আওরঙ্গ-যেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ করেন। কয়েক দিনের মধ্যে আওরঙ্গযেব ও তাহার বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরজুমলা তাহাদের সৈন্য-বাহিনী নিয়া মুহম্মদের সহিত যোগ দেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী খাজুয়া প্রান্তরে আওরঙ্গযেব ও সুজার মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সুজা শোচনীয় রূপে পরাজিত হন। শাহজাদা মুহম্মদ ও মীরজুমলার অধীনে বিজয়ী বাহিনী সুজাকে অনুসরণ করে। বিহারের কোন স্থানে শত্রুপক্ষকে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া সুজা রাজমহলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন (২৭শে মার্চ, ১৬৫৯)।

সুজার বিরুদ্ধে মীর জুমলা:

খাজুয়ার যুদ্ধের পর মীরজুমলা ও শাহজাদা মুহম্মদ পরাজিত সুজাকে অনুসরণ করিয়া তেলিয়াগর্হি পৌছেন। মীরজুমলা বীরভূমের আফগান জমিদার খাজা কামালের সাহায্যে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলের মধ্য দিয়া গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বেলঘাটায় উপস্থিত হন এবং সেখানে শিবির স্থাপন করেন। ইহাতে সুজা রাজমহল ছাড়িয়া নদীর পূর্ব তীরে তাণ্ডায় সরিয়া যান। মীরজুমলা রাজমহল অধিকার করেন (১৩ই এপ্রিল, ১৬৫৯) এবং সুযুতি পর্যন্ত স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেন। তিনি নিজে সুযুতিতে অবস্থান করেন এবং শাহজাদা মুহম্মদ দোগাচিতে শিবির স্থাপন করেন। এইভাবে অবস্থান করিয়া তাহারা নদী পার হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। সুজা গোপনে লোক পাঠাইয়া শাহজাদা মুহম্মদকে হাত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মুহম্মদের সহিত তাহার বাগদত্তা কন্যার বিবাহ দিতে এবং মুহম্মদকে মুগল সিংহাসনে বসাইতে অঙ্গীকার করেন। মুহম্মদ প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন এবং ৮ই জুন রাত্রে নদী পার হইয়া সুজার সহিত যোগ দেন। মীরজুমলার বিচক্ষণতার ফলে অবস্থা আয়ত্বাধীন থাকে এবং সেনাপতি ও সৈন্যদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হয়।

নৌবহর না থাকায় বর্ষার সময় মীরজুমলা কিছুটা অসুবিধায় পড়েন। তিনি স্থানীয় জমিদারদেব সাহায্যে নৌবহর প্রস্তুত করেন। এই সময় বিহারের সুবাদার দাউদ খান পাটনা হইতে অগ্রসর হইয়া অনেক চেষ্টার পর কুশী ও কালিন্দী নদী পার হন এবং মালদহের দিকে রওয়ানা হন। দাউদ খানের নৌবহরেব সাহায্যে মীরজুমলা রাজমহল হইতে গঙ্গা পার হইয়া সামদাহ নামক স্থানে পৌছেন (১৭ই জানুযারী), ১৬৬০)। সেখান হইতে তিনি সুজাকে ঘিরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন। এই সময় শাহজাদা মুহম্মদ তাহার শ্বশুর সুজাকে ত্যাগ কবিযা সস্ত্রীক মীরজুমলার সৈন্যদলে ফিরিযা আসেন। মীবজুমলা সম্রাট আওবঙ্গযেবের আদেশে মুহম্মদকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে পাঠান। সম্রাট তাহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন।

একদিকে মীরজুমলা ও অন্যদিকে দাউদ খানের সৈন্য বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সুজার অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া উঠে। সুজা তাণ্ডা হইতে জাহাঙ্গীরনগর পলাযন কবেন (১৯শে এপ্রিল)। মীরজুমলা তাহাকে অনুসরণ কবেন। এই সমষ সুজার সেনাপতিরা ও স্থানীয় জমিদাররা সুজার পক্ষ ত্যাগ করেন। মীরজুমলাকে বাধা দিবার মত শক্তি না থাকায় এবং আবাকানেব রাজার সাহায্যের প্রত্যাশায় সুজা জাহাঙ্গীর-নগর ত্যাগ করেন (১৬ই মে, ১৬৬০) এবং আবাকানে আশ্রয় লন। তিনি আরাকানীদের হাতে প্রাণ হাবান।

সুবাদার মীরজুমলা :

সুজাকে অনুসরণ কবিযা মীবজুমলা জাহাঙ্গীরনগরে প্রবেশ করেন (মে, ১৬৬০)। সম্রাট আওবঙ্গযেব মীরজুমলাকে বাংলার সুবাদাব নিয়োগ করেন এবং সাত হাযার মনসর প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করেন। সুজাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া মীরজুমলা বাংলায় সম্রাট আওরঙ্গ-যেবের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খুব রণনিপুণ সেনাপতি ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মাত্র তিন বৎসর বাংলার সুবাদার ছিলেন এবং তাহার সুবাদারীব বেশীর ভাগ সময় কুচবিহার ও আসাম অভিযানে ব্যয় হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেও সুবাদার মীরজুমলা বাংলায় সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রচলন কবেন এবং প্রজার কল্যাণের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন কবেন। তিনি নিজে প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনিতেন এবং প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেন। ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের

জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় জমিদাররা কিছুটা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সূচনা করিয়াছিলেন। মীরজুমলার শাসনদণ্ড গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার গোলযোগের অবসান হয়। সুজা হিজলীর জমিদার বাহাদুর খানকে ঢাকায় নযরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি পলাইয়া হিজলীতে যান এবং মুগলদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। মীরজুমলা তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করেন। বাংলার সুবাদারের সৈন্যদল ও উড়িষ্যার সুবাদারের সৈন্যরা দুই দিক হইতে হিজলী আক্রমণ করে এবং বাহাদুর খানকে পরাজিত করিয়া বন্দী করে। ইহার পর হিজলীতে মুগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুচবিহার জয়ঃ

শাহজাদা সুজা যখন উত্তরাধিকার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন সুযোগ বুঝিয়া কুচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ মুগল সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং মুগল অধিকৃত কামরূপ পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেন। এই সময় আসামের রাজা জয়ধ্বজ মুগল সাম্রাজ্যের সহিত শত্রুতা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এক বিরাট বাহিনী কামরূপ আক্রমণ করিতে পাঠান। কামরূপের মুগল ফৌজদার লুৎফুল্লা ইহাদের মুকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়া গৌহাটি ত্যাগ করেন এবং ঢাকায় চলিয়া আসেন। অহোম বাহিনী সমগ্র কামরূপ দখল করে (মার্চ, ১৬৬০)। বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার পর মীরজুমলা কুচবিহার ও কামরূপে মুগল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর মীরজুমলা ১২০০০ অশ্বারোহী, ৩০০০০ পদাতিক সৈন্য এবং বিরাট নৌবহর নিয়া কুচবিহারে অভিযান করেন। রাজা প্রাণনারায়ণ ভয় পাইয়া রাজধানী হইতে পলাইয়া যান। মীরজুমলা কুচ রাজধানী অধিকার করেন এবং ইহার নাম সম্রাটের নামানুসারে আলমগীরনগর রাখেন (১৯শে ডিসেম্বর, ১৬৬১)। কুচবিহার মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

আসাম অভিযানঃ

কুচবিহার অধিকারের পর মীরজুমলা তাঁহার সৈন্যদল ও নৌবাহিনী লইয়া আসাম অভিযানে যাত্রা করেন (৪ঠা জানুয়ারী, ১৬৬২)। কামরূপ পুনরুদ্ধার ও আসাম জয় করিয়া অহোমরাজের শাস্তির ব্যবস্থা করা তাঁহার অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। স্থল ও জলপথে মুগল-বাহিনী কামরূপে

প্রবেশ করে। মুগলদের সহিত সংঘর্ষে অহোমদের খুব ক্ষতি হয়। একটি বড় নৌযুদ্ধে অহোমদের নৌশক্তি বিধ্বস্ত হইয়া যায়; ইহাদের ৩০০ রণতরী মুগলদের হস্তগত হয়। ইহার ফলে অহোমদেরকে গৌহাটি ও অন্যান্য স্থান হইতে সরিয়া পড়িতে হয়। কামরূপে আবার মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মীরজুমলা তাঁহার অগ্রগতি অব্যাহত রাখেন। নদনদী বহুল, জঙ্গলাকীর্ণ ও পার্বত্যময় আসামের নানারূপ অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মুগল সেনাপতি অহোমরাজের রাজধানী ঝাড়গাঁওয়ের দিকে অগ্রসর হন। রাজা জয়ধ্বজ রাজধানী ত্যাগ করিয়া দুর্ভেদ্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মীরজুমলা ঝাড়গাঁওয়ে প্রবেশ করেন (১৭ই মার্চ ১৬৬২)। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বহু রণতরী ও ৮২টি হস্তী তাঁহার হস্তগত হয়।

বর্ষার সময় মুগল সৈন্যদের খুব অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই সময় বন্যায় সারা আসাম প্লাবিত হইয়া যায়। মুগল সৈন্যরা লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং স্থানীয় লোকের অসহযোগিতার দরুন তাহাদের পক্ষে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তাছাড়া অহোম সৈন্যরা বিক্ষিপ্তভাবে মুগলদের উপর হামলা করিতে থাকে। মীরজুমলা নিজের বিরাট ব্যক্তিত্বের বলে তাঁহার সৈন্যদের মনোবল অটুট রাখিতে সমর্থ হন। বর্ষাশেষে মুগল সৈন্যদের অবস্থার উন্নতি হয়। মীরজুমলা আবার ঝাড়গাঁও হইতে টিপামের দিকে অগ্রসর হন (১৯ই নবেম্বর ১৬৬২)। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া অনেক অহোম প্রধান মুগল সেনাপতির নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। অহোমরাজ জয়ধ্বজও সন্ধির জন্য আবেদন করেন। আসামের আবহাওয়া মুগল সৈন্যদের অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। মীরজুমলা নিজেও মাঝে মাঝে অসুখে ভুগিতেছিলেন। এই অবস্থায় তিনি জয়ধ্বজের সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হন (জানুয়ারী ১৬৬৩)। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী অহোমরাজ ২০,০০০ তোলা সোনা ১২০,০০০ তোলা রূপা ও ৪০টি হাতি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে স্বীকৃত হন। ভরলি নদীর পশ্চিম, ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর ও কালংনদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত আসামের অর্ধেকের বেশী ভূভাগ মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। জয়ধ্বজ ২০টি হাতি বার্ষিক করস্বরূপ দিতে অঙ্গীকার করেন। তাঁহার এক কন্যাকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। শাহজাদা আযমের সহিত এই কন্যার বিবাহ হয়। চার অহোম প্রধানদের চার পুত্রকে ঢাকায় প্রতিভূস্বরূপ রাখার ব্যবস্থা হয়।

অহোমরাজের সহিত সন্ধির পর মীরজুমলা নৌকাযোগে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন (১০ জানুয়ারী, ১৬৬৩)। পথিমধ্যে তিনি খুবই অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং নারায়ণগঞ্জের নিকটে খিযিরপুরে মারা যান (৩১শে মার্চ, ১৬৬৩)।

দশম পরিচ্ছেদ

সুবাদার শায়েস্তা খান

মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিলির খান ও পরে দাউদ খান অস্থায়ী সুবাদাররূপে বাংলাদেশ শাসন করেন। ইহার পর সম্রাট আওরঙ্গযেব তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করিয়া পাঠান। শায়েস্তা খান নূরজাহান বেগমের ভ্রাতা আসফ খানের পুত্র ও মমতাজমহল বেগমের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি খুব উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। রাজনীতিক হিসাবে তাঁহার খুব সুনাম ছিল। শাহজাহানের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য করিয়া শায়েস্তা খান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি একে একে বিহার, মালব, গুজরাট ও মালবের (দ্বিতীয় বার) শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং ধর্মপ্রাণ আওরঙ্গযেবের একজন বড় ভক্ত ছিলেন। দারার উদ্ধত ব্যবহারের জন্য শায়েস্তা খান তাঁহার প্রতি রুষ্ট ছিলেন। এইজন্য সম্রাট শাহজাহানের অসুখের সময় দারা যখন সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তিনি শায়েস্তা খানকে মালব প্রদেশের শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারিত করেন এবং তাঁহাকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠান। উত্তরাধিকার যুদ্ধে শায়েস্তা খান যদিও প্রকাশ্যে আওরঙ্গযেবের পক্ষে যোগ দিতে পারেন নাই, তবুও তিনি রাজধানীতে থাকিয়া কূটবুদ্ধির সাহায্যে আওরঙ্গযেবের সাফল্যের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত দারার আগ্রা হইতে পলায়নের পর শায়েস্তা খান আওরঙ্গযেবের সহিত যোগ দেন এবং দারাকে দিল্লী ও অন্যান্য স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সম্রাট আওরঙ্গযেব শায়েস্তা খানকে সাত হাযারী মনসব ও আমীরুল ওমরাহ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন এবং তাঁহাকে আগ্রার সুবাদার নিয়োগ করেন। ইহার পর মারাঠা নায়ক শিবাজীকে দমনের জন্য সম্রাট তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন (১৬৬০ খৃঃ)। শায়েস্তা খান শিবাজীর অধীনস্থ প্রায় সকল দুর্গ এবং এমনকি তাঁহার রাজধানী পুনা দখল করেন এবং বর্ষার দরুন অভিযান স্থগিত রাখিয়া শিবাজীর প্রাসাদে অবস্থান করেন। একরাত্রে শিবাজী কয়েকজন অনুচরসহ প্রাসাদে প্রবেশ

করিয়া শায়েস্তা খান ও তাঁহার লোকদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করেন এবং কিছু ক্ষতি করিয়া আবার পলাইয়া যান। শায়েস্তা খানের হাতের আঙ্গুল কাটা যায় ও তাঁহার এক পুত্র নিহত হয়। শত্রুর বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন না করায় সম্রাট আওরঙ্গযেব শায়েস্তা খানের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠান (১৬৬৩খৃ:)।

মীরজুমলার মৃত্যুর পর দূরবর্তী বাংলা প্রদেশে একজন বিচক্ষণ শাসন-কর্তার প্রয়োজন ছিল। এইজন্য সম্রাট আওরঙ্গযেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। শায়েস্তা খান ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ জাহাঙ্গীরনগরে সুবাদারের কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি দুইবার বাংলার সুবাদার ছিলেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশ তাঁহার সুবাদারীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠান। ইহার পর ফিদাই খান (আযম খান কোকা) কয়েক মাস ও শাহজাদা মুহম্মদ আযম এক বৎসব কয়েক মাস (১৬৭৮—৭৯) বাংলার সুবাদার ছিলেন। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বার শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। শায়েস্তা খান ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় পেঁ ৗছেন এবং শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ঢাকা হইতে আগ্রায় বদলী হন।

শায়েস্তা খান দীর্ঘ ২২ বৎসর বাংলার সুবাদার ছিলেন। তিনি প্রথম বার যখন ঢাকায় আসেন তখন তাঁহার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর। এই বয়সে তাঁহার পক্ষে যুবককালের উদ্যম প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল না। তিনি অনেকটা আরাম-প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাজকীয় জাঁকজমকে থাকিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণতা ও তেজস্বিতা অটুট ছিল। তিনি অভিজ্ঞ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন। ইহার ফলে তিনি যোগ্য সহকারী ও সমরনিপুণ সেনাপতি নিয়োগ করিতে সমর্থ হইতেন এবং তাঁহাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিতেন। তাঁহার পুত্ররা তাঁহার সহকারী রূপে সামরিক প্রতিভা ও শাসনদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বুযুর্গউমেদ খান চট্টগ্রাম জয় করেন এবং জাফর খান চট্টগ্রামের থানাদারের গুরু দায়িত্ব বহন করেন। ইরাদত খান কুচবিহারের বিদ্রোহ দমন করেন এবং কুচবিহার ও রাঙ্গামাটির ফৌজদার রূপে সেখানে মুগল শাসনের স্থায়িত্বের বন্দোবস্ত করেন। শায়েস্তা খানের আর এক পুত্র আবু নসর উড়িষ্যা প্রদেশে পিতার নায়েব ছিলেন।

কুচ বিহারের বিদ্রোহ দমন :

মীর জুমলা কুচবিহার মুগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন এবং ইহা শাসনের জন্য ইসফান্দিয়ার নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে অস্থায়ী ফৌজদার নিয়োগ করেন। মুগল কর্মচারীরা কুচবিহারে উত্তর ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলন করেন। ইহাতে কুচবিহারের আদিবাসী প্রজারা বিক্ষুব্ধ হয়। তখন মীর জুমলা আসাম অভিযানে ছিলেন। এই সুযোগে কুচবিহারের রাজ্যচ্যুত রাজা প্রাণনারায়ণ পার্বত্যাঞ্চল হইতে বাহির হইয়া মুগলদেরকে আক্রমণ করেন। বিদ্রোহী প্রজারা তাঁহাকে সাহায্য করে। ইহারা কাঠালবাড়ির থানাদার মুহম্মদ সালেহকে নিহত করে এবং মুগলদের খাদ্য সরবরাহের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। অসুবিধায় পড়িয়া ইসফান্দিয়ার রাজধানী কুচবিহার হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হন। কুচবিহারের নবনিযুক্ত ফৌজদার ঘোড়াঘাট হইতে কুচবিহারের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। অবস্থা খারাপ দেখিয়া তিনি আবার ঘোড়া ঘাটে ফিরিয়া আসেন। কুচবিহার প্রাণনারায়ণের হস্তগত হয় (১৬৬২খৃ:)। সুবাদার শায়েস্তা খান যখন দিল্লী হইতে রাজমহলে পেঁ ৗছেন তখন প্রাণনারায়ণ জানিতে পারেন যে, মুগল সুবাদার কুচবিহার আক্রমণ করিবেন। প্রাণনারায়ণ ভয় পাইয়া শায়েস্তা খানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং ৫ লক্ষ টাকা করস্বরূপ সুবাদারের নিকট প্রেরণ করেন। প্রাণনারায়ণ যতদিন জীবিত ছিলেন তিনি সম্রাটকে রীতিমত কর দিয়াছেন।

প্রাণনারায়ণের মৃত্যুর পর (১৬৬৬খৃঃ) কুচবিহারের সিংহাসন নিয়া গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হয় এবং মুধনারায়ণ সিংহাসন অধিকার করেন। মুধ-নারায়ণ মুগল সম্রাটকে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা কর দিতে অঙ্গীকার করেন। কয়েক বৎসর পর তিনি অঙ্গীকৃত কর দিতে গড়িমসি করেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খান তাঁহার পুত্র ইরাদত খানের অধীনে কুচবিহারে অভিযান প্রেরণ করেন। একদুয়ার দুর্গের নিকট মুধনারায়ণ ইরাদত খানকে বাধা দেন। ইরাদত খান তাঁহাকে পরাজিত করিয়া একদুয়ার ও কুচবিহার দুর্গদ্বয় দখল করেন। ইহার পর মুগল সৈন্যরা কুচবিহারের অন্যান্য স্থান হস্তগত করে এবং পরাজিত মুধনারায়ণ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লন। কুচবিহার আবার মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং ইরাদত খান ইহার ফৌজদার নিযুক্ত হন।

মীর জুমলার সময়ে হিজলীর জমিদার বাহাদুর খানকে বন্দী করিয়া বণথম্ভোর দুর্গে রাখা হইয়াছিল। বাহাদুর খান এক লক্ষ টাকা দিতে ও সম্রাটের অনুগত থাকিতে অঙ্গীকার করায় শায়েস্তা খান তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহাকে জমিদারী ফিরাইয়া দেন (১৬৬৭ খৃ:)।

সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা :

সুবাদার শায়েস্তা খান পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির উপদ্রব হইতে বাংলাদেশ রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কুচ-বিহারের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত মোরং নামক পার্বত্য রাজ্যে অভিযান প্রেরণ করেন। ইহার ফলে মোরংরাজ বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং নিয়মিত কর দিতে অঙ্গীকার করেন। মীর জুমলা যখন আসাম অভিযানে লিপ্ত ছিলেন তখন জয়ন্তিয়ার রাজা মুগলদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং শ্রীহট্টে উৎপাত আরম্ভ করেন। কিন্তু শায়েস্তা খান সুবাদার হইয়া আসার পর তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সুবাদারের নিকট হাতির উপঢৌকন প্রেরণ করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তিয়ার রাজা আবার শ্রীহট্টে উপদ্রব শুরু করেন। শায়েস্তা খান তাঁহার বিরুদ্ধে ইরাদত খানকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

মগ বিতাড়ন ও চট্টগ্রাম জয় :

বাংলাদেশ হইতে মগ দস্যুদেরকে বিতাড়ন ও চট্টগ্রাম জয় শায়েস্তা খানের সুবাদারীর বিশেষ স্মরণীয় ও কৃতিত্বপূর্ণ কার্য। চট্টগ্রাম আরাকান রাজের শাসনাধীন ছিল। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানের রাজা পর্তুগীজদের নিকট হইতে সন্দ্বীপ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফলে ঢাকা পর্যন্ত মেঘনা অঞ্চলে লুটতরাজ করিতে মগ জলদস্যুদের পক্ষে খুবই সুবিধা হইয়াছিল। মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা মিলিত হইয়া এই অঞ্চলে উৎপাত করিত। পর্তুগীজ বা ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা হার্মাদ নামে অভিহিত হইত। এই জলদস্যুরা নারী ও পুরুষদেরকে ধরিয়া লইয়া যাইত এবং তাহাদেরকে দাসরূপে য়ুরোপীয় বণিকদের নিকট বিক্রয় করিত, য়ুরোপীয় বণিকরা তাহাদেরকে পণ্যরূপে বিভিন্ন দেশে পাঠাইত। মগরা অনেককে আরাকানে লইয়া যাইত এবং পুরুষদেরকে মজুরের কাজে নিয়োগ করিত ও মেয়েদেরকে দাসী করিয়া রাখিত।

সুবাদার শায়েস্তা খান মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের উপদ্রব হইতে লোকের জানমাল রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জরুরী প্রয়োজন অনুভব করেন। ইহাদেরকে বিতাড়নের জন্য তিনি বহু রণতরী নির্মাণ করেন এবং বিভিন্ন স্থান হইতে রণতরী সংগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি ৩০০ রণতরী সজ্জিত করেন এবং জল দস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হন। সন্দীপ ও চট্টগ্রাম জয় করা তাঁহার অভিযানের লক্ষ্য ছিল। অভিযানের কিছুদিন পূর্বে দিলায়ার নামে মুগল নৌবহরের একজন পলাতক নৌ-অধ্যক্ষ আরাকানীদের নিকট হইতে সন্দীপ ছিনাইয়া লন এবং সেখানে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। মুগল নৌ-সেনাপতি ইবন হোসেন তাহার নৌ-বহর লইয়া সন্দীপ আক্রমণ করেন এবং দিলায়ারকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া সন্দীপ অধিকার করেন (নবেম্বর ১৬৬৫)। এই সময় চট্টগ্রামের মগ শাসনকর্তা ও পর্তুগীজদের মধ্যে বিবাদ বাধে এবং নোয়াখালীর মুগল কর্মচারীরা ইহার সুবিধা গ্রহণ করে। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীরা ৪২টি জালিয়া নৌকায় তাহাদের পরিবার-পরিজন ও ধনরত্ন লইয়া নোয়াখালীতে আশ্রয় লয়। শায়েস্তা খান ফিরিঙ্গী নৌ-অধ্যক্ষকে পুরস্কৃত করেন এবং তাঁহাকে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে মুগল নৌবাহিনীতে নিয়োগ করেন। অন্যান্য ফিরিঙ্গী নায়কদেরকেও নৌবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়।

সুবাদার শায়েস্তা খান ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জয়ের জন্য ঢাকা হইতে অভিযান প্রেরণ করেন। সুবাদারের জ্যেষ্ঠপুত্র বুযুর্গ-উমেদ খান অভিযানে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। নৌ-সেনাপতি ইবন হোসেন ২৮৮টি রণতরী লইয়া নদীপথে যাত্রা করেন। ফিরিঙ্গীরা ৪০টি রণতরীসহ তাঁহার সহিত যোগ দেয়। বুযুর্গউমেদের সৈন্যদল নোয়াখালী হইতে এবং ইবন হোসেনের নৌবাহিনী সমুদ্রের উপকূল বাহিয়া চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। ১৪ জানুয়ারী ফেনী নদী পার হইয়া মুগল সৈন্যরা চট্টগ্রাম এলাকায় প্রবেশ করে এবং জঙ্গল কাটিয়া উপকূলের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। মুগল নৌবহর যখন কুমিরা ছাড়িয়া কাথালিয়া খালের নিকটবর্তী হয় তখন মগ নৌবাহিনী ইহার গতিরোধ করে। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৩ ও ২৪ জানুয়ারী কাথালিয়া খালের নিকট দুইপক্ষে নৌযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মগ নৌবহরের খুব ক্ষতি হয় এবং ইহা কর্ণফুলী নদীতে সরিয়া পড়ে। মগ নৌবাহিনী কর্ণফুলী নদীতে মুগলদেরকে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়। ইবন হোসেনের নৌবাহিনী কর্ণফুলীতে প্রবেশ করিয়া

মগদেরকে আক্রমণ করে। মুগলদের গোলাগুলিতে আরাকানীদের কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়া যায়। ইহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং ইহাদের ১৩৫টি রণতরী মুগলদের হস্তগত হয়। বিজয়ী মুগল নৌ-সেনাপতি নদীপথে চট্টগ্রাম বন্দর অবরোধ করেন। এই সময় বুযুর্গউমেদের সৈন্যদল চট্টগ্রামের নিকটবর্তী হয়। মগ সৈন্যরা একদিন যুদ্ধের পর নিরুপায় হইয়া ইবন হোসেনের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী বিজয়ী মুগল সেনাপতি বুযুর্গউমেদ চট্টগ্রাম দুর্গে প্রবেশ করেন। ২০০০ মগ মুগলদের হাতে বন্দী হয়। মগ জলদস্যুরা কয়েক হাযার বাঙ্গালী কৃষককে ধরিয়া নিয়া দাস বানাইয়াছিল, মুগলদের চট্টগ্রাম অধিকারের পর ইহারা মুক্তি পায়। চট্টগ্রাম মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং ইহার শাসনভার একজন ফৌজদারের উপর ন্যস্ত হয়। সম্রাটের আদেশে চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া ইসলামাবাদ রাখা হয়।

ইংরেজ বণিকদের সংঘর্ষ ঃ

শায়েস্তা খানের সুবাদারীর শেষ ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে। ইংরেজ বণিকরা ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথমে বংলার হুগলী বন্দরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। সুবাদার শাহজাদা সুজা ইহাদেরকে বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা দান করেন। বাৎসরিক মাত্র ৩০০০ টাকা নযরানার বিনিময়ে ইহাদেরকে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়। এই সময় ইহাদের ব্যবসায় খুবই সামান্য ছিল। কিন্তু পরে ইহারা বাংলা, উড়িষ্যা ও বিহারের অনেক স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে এবং ইহাদের ব্যবসায়ের খুবই উন্নতি হয়। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকদের বাংলাদেশ হইতে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩৪,০০০ পাউণ্ড, ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ইহার পরিমাণ হয় ১০০,০০০ পাউণ্ড ও ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ১৫০,০০০ পাউণ্ড। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়া ইহার পরিমাণ ২৩০,০০০ পাউণ্ডে পৌঁছে। ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্য বহু গুণ বৃদ্ধি পাইলেও ইহারা পূর্বের মত মাত্র ৩০০০ টাকা নযরানা দিত এবং বাণিজ্য শুল্ক দিতে অস্বীকার করিত। ইহার ফলে মুগল সরকার ন্যায্য শুল্ক হইতে বঞ্চিত হইত এবং রাজকোষের প্রচুর ক্ষতি হইত। ইংরেজ বণিকদের এই বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধার

দরুন দেশীয় ব্যবসায়ী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকদের খুব অসুবিধা হইত, কারণ তাহাদেরকে প্রথামত শুল্ক দিতে হইত বলিয়া তাহারা ইংরেজ বণিকদের সহিত ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিত না। এই ব্যবস্থার দ্বারা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের প্রতি অন্যায় করা হইত। তা' ছাড়া সুজা একজন সুবাদার রূপে ইংরেজ বণিকদেরকে বিশেষ সুবিধা দিয়াছিলেন; সম্রাট শাহজাহান তাহাদেরকে এই সুবিধা দেন নাই।

সম্রাট আওরঙ্গযেব সকল বণিকদেরকে সমান অধিকার দিবার জন্য ইংরেজ বণিকদের বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা রহিত করেন এবং অন্যান্য বণিকদের মত তাহাদের উপর পণ্যদ্রব্যের শতকরা ৩½ টাকা শুল্ক ধার্য করেন। ইহাতে ইংরেজ বণিকরা অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহারা শুল্ক ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। ইংরেজ বণিকদেরও শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। শুল্ক আদায়ের জন্য মুগল কর্মচারীরা অনেক সময় ইংরেজ বণিকদের উপর দৌরাত্ম করিত, ইহাদের নৌকার পণ্যদ্রব্য আটক করিয়া রাখিত এবং কোন কোন দ্রব্য বাহির করিয়া লইত। হুগলীর ইংরেজ কুঠির এজেন্ট উইলিয়ম হেজ সুবাদার শায়েস্তা খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার নিকট অভিযোগ করেন (১৬৮২খৃঃ)। শায়েস্তা খান ইহাদের অভিযোগের প্রতীকার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। কিন্তু ইহারা অসৎ কর্মচারীদের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তখন উইলিয়ম হেজ ও অন্যান্য ইংরেজ প্রধানরা নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিলাতে বণিক সংঘের কর্মকর্তাদের নিকট প্রস্তাব পাঠান। তদনুযায়ী ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড হইতে সৈন্যসহ কয়েকটি জাহাজ ভারতে প্রেরণ করা হয়। ইহাদের তিনটি সৈন্য বোঝাই জাহাজ হুগলীতে আসে। শায়েস্তা খান ইহা জানিতে পারেন এবং বুঝিতে পারেন যে ইংরেজ বণিকরা সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তিনি স্থানীয় ফৌজদারকে হুগলীতে সৈন্য সমাবেশ করিতে নির্দেশ দেন।

যখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয় তখন সামান্য একটি ঘটনা হইতে ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। হুগলীর ইংরেজ কুঠির তিনজন সৈন্য শহরের বাজারে আসে। ঐ সময় ইহারা আক্রান্ত হইয়া আহত হয় (২৮শে অক্টোবর, ১৬৮৬)। ইংরেজ কাপ্তান তাঁহার বাহিনী নিয়া ইহাদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু মুগল ফৌজদার আবদুল গণির সৈন্যরা ইহাদেরকে হটাইয়া দেয় এবং

ইহাদের কুঠি সংলগ্ন কুটিরগুলিতে আগুন লাগাইয়া দেয়। ইংরেজদের জাহাজগুলির উপর গোলাবর্ষণ করা হয়। এই সময় ইংরেজদের সাহায্যের জন্য আরও সৈন্য আসে। ইহাদের গোলাগুলির তীব্র আঘাতে ফৌজদারের কামান অকেজো হইয়া পড়ে। ইহারা অগ্রসর হইয়া শহরের অনেক স্থান পুড়াইয়া দেয়। ফৌজদারের সৈন্যসংখ্যা ও গোলাবারুদ খুবই সামান্য ছিল। এইজন্য তিনি শহর হইতে সরিয়া পড়েন এবং সুবাদারের সৈন্য সাহায্যের অপেক্ষায় থাকেন। এই সুযোগে ইংরেজরা তাহাদের সবকিছু নিয়া হুগলী ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়। শায়েস্তা খান আবদুল গণির সাহায্যের জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠান এবং ইংরেজদেরকে বন্দী করিবার আদেশ দেন। সুবাদারের সৈন্যদের হুগলী পৌঁছিবার পূর্বেই ইংরেজরা হুগলী হইতে সুতানটিতে সরিয়া পড়ে।

সুতানটির এজেন্ট জব চার্ণক সুবাদারের সহিত আপোষ করিতে চেষ্টা করেন। কোনরূপ সমঝোতা না হওয়ায় ইংরেজরা সুতানটি ত্যাগ করে এবং হিজলী দ্বীপে আশ্রয় লইতে সিদ্ধান্ত করে। পথিমধ্যে তাঁহারা মুগলদের থানাদুর্গ (বর্তমান মাটিয়াবুরুজ) দখল করে। ইহার পর গঙ্গা বাহিয়া ইংরেজদের নৌবহর হিজলী দ্বীপ আক্রমণ করে এবং গোলাগুলির সাহায্যে ইহা অধিকার করে (ফেব্রুয়ারী, ১৬৮৬)। হিজলী হইতে ইহারা বালেশ্বর আক্রমণ করে এবং মুগল দুর্গ হস্তগত করে। শায়েস্তা খান ইংরেজদেরকে হিজলী হইতে বিতাড়িত করার জন্য তাঁহার সহকারী আবদুস সামাদের অধীনে ১২,000 সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। মুগলদের অবিরাম কামান বর্ষণের দরুণ ইংরেজদের নৌবহর সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। ইহার পর মুগল সৈন্যরা নদী পার হইয়া হিজলী দ্বীপে অবতরণ করে এবং হিজলী শহর হস্তগত করে। এই সময় ইংরেজদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। ইহাদের দুইশত সৈন্য মারা যায় এবং মাত্র একশত সৈন্য কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে। ইহারা হিজলী দ্বীপ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় (১১ই জুন, ১৬৮৭)।

ইংরেজদেরকে বাংলা হইতে বিতাড়িত করিয়া সুবাদার শায়েস্তা খান ইহাদের উদ্ধত্যের শাস্তি দেন। ইহার পর ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট সুবাদার শায়েস্তা খান ইংরেজ বণিকদেরকে বাংলায় ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দেন। জব চার্ণক সুতানটিতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু এই সময় বোম্বাই ও পশ্চিম উপকূলের ইংরেজ বণিকদের সহিত মুগলদের

সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। এইজন্য শায়েস্তা খান তাঁহার অনুমতি প্রত্যাহার করেন। জব চার্ণক ইংরেজ বণিকদেরকে নিয়া সুতানটি ত্যাগ করেন নবেম্বর, ১৬৮৮)। জব চার্ণকের স্থলে নিযুক্ত এজেন্ট কাপ্তান হিথ বালেশ্বর আক্রমণ করেন এবং ইহা দখল করিয়া অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেন। ইহার পর তিনি নৌবহর লইয়া চট্টগ্রাম বন্দর অধিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পরে তিনি চট্টগ্রাম দখলের সংকল্প ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ চলিয়া যান (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৮৯)।

ইতিমধ্যে শায়েস্তা খান বাংলা হইতে আগ্রায় বদলী হন। খান জাহান বাহাদুর সুবাদার নিযুক্ত হন (জুলাই, ১৬৮৮)। খান জাহান বাহাদুরের পর ইব্রাহিম খান বাংলার সুবাদার হইয়া আসেন (জুলাই, ১৬৮৯)। ইব্রাহিম খানের সময়ে ইংরেজ বণিকদের সহিত আপোষের চেষ্টা হয়। ইংরেজ বণিকরা ব্যবসায় ত্যাগ করায় বাংলার বাণিজ্যের ক্ষতি হয় এবং রাজস্ব হ্রাস পায়। সম্রাট আওরঙ্গযেব ইংরেজদেরকে বাংলায় ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দেন এবং সুবাদার ইব্রাহিম খানকে ইহাদের সহিত আপোষ করিতে নির্দেশ দেন। ইব্রাহিম খান ইংরেজদের মাদ্রাজ পরিষদের নিকট এক চিঠিতে ইংরেজ বণিকদেরকে তাহাদের বাণিজ্য কুঠিতে ফিরিয়া আসিতে আমন্ত্রণ করেন (২রা জুলাই, ১৬৮৯)। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিম উপকূলের ইংরেজ বণিকদের সহিত মুগলদের আপোষ মীমাংসা হয়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বহু অর্থ প্রদান করেন। ইহার পর মাদ্রাজ পরিষদ জব চার্ণককে এজেন্ট নিয়োগ করিয়া বাংলায় পাঠান। জব চার্ণক ইংরেজ বণিকদেরকে লইয়া আবার সুতানটি আসেন (২৪শে আগষ্ট, ১৬৯০)। সুতানটিতে তিনি কলিকাতা শহর ও বন্দরের পত্তন করেন।

শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব :

শায়েস্তা খানের সুবাদারী বাংলার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ। সমসাময়িক ইতিহাস-লেখকরা তাঁহার গুণের ও কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি সদাশয়, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাদরদী শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের বহু বিধবা ও অভাবগ্রস্ত লোককে নিষ্কর জমি দান করেন। শায়েস্তা খান বাংলার লোকের শান্তি ও সুখের ব্যবস্থা করেন।

তিনি মগদের উৎপাত হইতে বাংলার অধিবাসীদের জানমাল রক্ষা করেন। তিনি সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া আরাকানী জল দস্যুদেরকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন। সুবাদার শায়েস্তা খান কুচবিহার, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে মুগল শাসন সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার ভয়ে আসামের রাজা মুগলদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিতে সাহস পান নাই। শায়েস্তা খান ইংরেজ বণিকদের উদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি দেন।

শায়েস্তা খানের সুদীর্ঘ শাসনকালে বাংলার লোকেরা সুখ-শান্তিতে ছিল। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। সম-সাময়িক ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ারের বিবরণী হইতে শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য ও দ্রব্যমূল্যের সুলভতা সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। এই সময় এক টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। এই ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্য শায়েস্তা খান ঢাকা হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে দুর্গের পশ্চিম তোরণ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দেন এবং সেখানে লিখিত হয় যে ভবিষ্যতে যে সুবাদারের আমলে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইবে, তিনি ব্যতীত আর কেহ যেন এই তোরণ-দ্বার না খোলেন। ইহার ফলে এই তোরণ-দ্বার বহু বৎসর বন্ধ থাকে। নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় আবার টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যায়। তখন মহাসমারোহে দুর্গের পশ্চিম তোরণ-দ্বার খোলা হয়। শায়েস্তা খান ঢাকার ছোট কাটরা দালান নির্মাণ করেন। লালবাগ দুর্গ ও ইহার প্রাসাদবলীর সহিত তাঁহার নাম বিশেষভাবে জড়িত। তাঁহার সময়ে হোসেনী দালান নির্মিত হয়।

সুবাদার ইব্রাহিম খান:

শায়েস্তা খানের পর একে একে খান জাহান বাহাদুর ও ইব্রাহিম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। খান জাহান বাহাদুর (কোকা) আওরঙ্গযেবের দুধ-ভাই ছিলেন। অকর্মণ্যতার জন্য তাঁহাকে সুবাদারী হইতে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তী সুবাদার ইব্রাহিম খান শাহজাহানের আমলের খ্যাতনামা আমীর আলীবর্দী খানের পুত্র ছিলেন। ইব্রাহিম খান খুব শান্তিপ্রিয় ও কোমল-হৃদয় শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং ফার্সী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গযেবের নির্দেশে তিনি বন্দী ইংরেজদেরকে মুক্তি দেন এবং বিতাড়িত ইংরেজদেরকে ফিরিয়া

আসিয়া বাংলায় বাণিজ্য করিতে আমন্ত্রণ করেন। ইংরেজ বণিকরা ফিরিয়া আসে এবং আবার ব্যবসায় শুরু করে।

শোভাসিংহের বিদ্রোহ :

সুবাদার ইব্রাহিম খানের শাসনকালে মেদেনীপুরের অন্তর্গত চেতুবর্দার জমিদার শোভাসিংহ বিদ্রোহী হন এবং তিনি পার্শ্ববর্তী স্থানগুলিতে লুটতরাজ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বর্ধমান জিলার রাজস্বের ইজারাদার কৃষ্ণরামকে (পাঞ্জাবী ক্ষত্রী) পরাজিত ও নিহত করেন এবং তাঁহার সম্পত্তি দখল করেন (জানুয়ারী, ১৬৯৬)। শোভা সিংহ কৃষ্ণরামের স্ত্রী ও কন্যাদেরকে বন্দী করেন। ইহার পর তিনি রাজা উপাধি ধারণ করেন এবং সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। উড়িষ্যার আফগান সরদার রহিম খান তাঁহার সহিত যোগ দেন। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায় সুবাদারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইব্রাহিম খান শোভা সিংহের বিদ্রোহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই এবং তাঁহাকে দমন করিতে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। তিনি হুগলীর ফৌজদার নুরুল্লাহ খাঁকে শোভা সিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেন। নূরুল্লাহ বিদ্রোহীদের বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করিতে ভয় পাইয়া যান। ইহারা হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলে তিনি শহর ছাড়িয়া পলায়ন করেন। শোভা সিংহ হুগলী লুন্ঠন করেন (২২শে জুলাই, ১৬৯৬)। নূরুল্লাহ চিনসুরার ওলন্দাজদের সহায়তায় হুগলী আক্রমণ করেন। ইহাতে শোভা সিংহের লোকেরা হুগলী হইতে সরিয়া পড়ে।

শোভা সিংহ হুগলী নদীর পশ্চিম তীরের স্থানসমূহে লুটতরাজ করিতে থাকেন। গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরস্থ সমগ্র ভূভাগে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন এবং বণিকদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করেন। তিনি বর্ধমানে রাজধানী স্থাপন করেন। শোভা সিংহ কৃষ্ণরামের কন্যার সতীত্বহানি করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু তেজস্বী মহিলা ছুরিকাঘাতে তাঁহার জীবন-নাশ করেন এবং নিজেও আত্মহত্যা করেন। শোভা সিংহের ভ্রাতা হিম্মত সিংহ অপদার্থ ছিলেন। এই জন্য বিদ্রোহীরা রহিম খানকে নেতা রূপে গ্রহণ করে। রহিম খান শাহ উপাধি ধারন করেন। তিনি নিজের সৈন্য বৃদ্ধি করেন। তাঁহার ১০,০০০ অশ্বারোহী ও ৬০,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। তিনি নদীয়া হইয়া মকসুদাবাদ অধিকারের জন্য অগ্রসর

হন। স্থানীয় জায়গীরদার ও কর্মচারীদের সৈন্যদেরকে পরাজিত করিয়া তিনি মকসুদাবাদ ও কাসিমবাজার দখল করেন এবং সেখানে লুটতরাজ করেন। ইহার পর রহিম খান রাজমহল ও মালদহ অধিকার করেন।

সম্রাট আওরঙ্গযেব শোভা সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহের কথা জানিতে পারেন। সম্রাট ইব্রাহিম খানের নিশ্চেষ্টতায় অসন্তুষ্ট হন। তিনি ইব্রাহিম খানকে বরখাস্ত করেন এবং স্বীয় পৌত্র আযিমউদ্দীনকে বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠান। সম্রাট ইব্রাহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খানকে আদেশ দেন যেন তিনি অবিলম্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। জবরদস্ত খান খুব সাহসী সেনাপতি ও তেজস্বী যুবক ছিলেন। তিনি সৈন্য ও কামান-গোলা সংগ্রহ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে মকসুদাবাদের নিকটবর্তী হন। রহিম খান গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ভগবানগোলা সুরক্ষিত করিয়া জবরদস্ত খানকে বাধা দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু মুগল ও ফিরিঙ্গীদের কামানের গোলাতে বিদ্রোহীদের খুব ক্ষতি হয়। দুই দিন প্রতিরোধের পর বিদ্রোহীরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয় (মে, ১৬৯৭)। বিজয়ী জবরদস্ত খান ইহাদেরকে অনুসরণ করিয়া মকসুদাবাদ ও বর্ধমান হইতে বিতাড়িত করেন। বিদ্রোহীরা চন্দ্রকোণার জঙ্গলে আশ্রয় লয়। বর্ষার দরুন জবরদস্ত খান বর্ধমানে অবস্থান করেন।

সুবাদার আযিমুদ্দীন:

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে শাহজাদা আযিমুদ্দীন দিল্লী হইতে ঢাকার পথে বর্ধমান পৌঁছেন। সুবাদার আযিমউদ্দীন জবরদস্ত খানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া জবরদস্ত খান সেনাপতিত্বে ইস্তেফা দেন এবং পিতার সঙ্গে বাংলা হইতে চলিয়া যান। আযিমুদ্দীন রহিম খানকে দমনের জন্য প্রায় এক বৎসর বর্ধমানে অবস্থান করেন। বিদ্রোহীরা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া প্রায়ই নদীয়া ও হুগলী জিলায় হানা দিত। আযিমুদ্দীন শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিদ্রোহীদেরকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রহিম খান এক সাক্ষাৎকারে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আযিমুদ্দীনের প্রধান উপদেষ্টা খাজা আনোয়ারকে হত্যা করেন। ইহার পর সুবাদার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাঁহার সৈন্য প্রেরণ করেন। চন্দ্রকোণার নিকটে এক যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত

হয়। রহিম খান বন্দী হন এবং তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় (আগষ্ট, ১৬৯৮)। ইহার পর বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

শাহজাদা আযিমুদ্দীনের শাসনকালে ইংরেজ বণিকরা সুতানটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করে এবং কলিকাতা বন্দর ও শহরের ভিত্তি স্থাপন করে।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে (জানুয়ারী) আযিমুদ্দীনকে বিহারের সুবাদারীও দেওয়া হয়। সম্রাটের আদেশে তিনি ঢাকা হইতে পাটনায় চলিয়া আসেন। তিনি পাটনার নাম আযিমাবাদ রাখেন। তিনি ১৭১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুপস্থিতিতে বাংলার সুবাদার ছিলেন। তাঁহার পুত্র ফররুখশিয়ার বাংলার নায়েব-সুবাদার ছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মুর্শিদ কুলী খান

মুর্শিদ কুলী খান দাক্ষিণাত্যের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহাকে বিক্রয় করা হয়। হাজী শফী ইস্পাহানী তাঁহাকে ক্রয় করেন এবং তাঁহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার নাম মুহম্মদ হাদী রাখেন। তিনি বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং পারস্যে লইয়া যান। সেখানে মুহম্মদ হাদীর শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হয়। হাজী শফী ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মুগল সাম্রাজ্যের দীউয়ান-ই-তান নিযুক্ত হন। কিছু-কাল তিনি বাংলার ও দাক্ষিণাত্যের দীউয়ান ছিলেন। আবার তিনি ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে দীউয়ান-ই-তান নিযুক্ত হন এবং ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর হাজী শফী পারস্য প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুহম্মদ হাদীও তাঁহার সঙ্গে যান। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে হাজী শফীর মৃত্যুর পর মুহম্মদ হাদী ভারতে ফিরিয়া আসেন। তিনি হাজী শফীর নিকট রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতে ফিরিয়া আসার পর তিনি বেরার প্রদেশের দীউয়ান হাজী আবদুল্লাহ খোরাসানীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। মুহম্মদ হাদীর রাজস্ব বিষয়ে দক্ষতার কথা শুনিয়া সম্রাট আওরঙ্গযেব তাঁহাকে হায়দরাবাদের দীউয়ান ও ইলকুন্তার ফৌজদার নিয়োগ করেন এবং করতলব খান উপাধি প্রদান করেন।

বাংলার দীউয়ান :

মুহম্মদ হাদী করতলব খানের কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া গুণগ্রাহী সম্রাট আওরঙ্গযেব তাঁহাকে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে (১৭ই নবেম্বর) বাংলার দীউয়ান নিযুক্ত করেন। সম্রাট তাঁহার উপর মকসুদাবাদের ফৌজদারীর দায়িত্বও ন্যস্ত করেন। এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে আরও অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়; তাঁহাকে মেদেনীপুর ও বর্ধমানের ফৌজদার (২৩শে জুলাই, ১৭০১); উড়িষ্যার দীউয়ান (৪ঠা আগষ্ট) এবং সুবাদার শাহজাদা আযিমুদ্দীনের সম্পত্তির দীউয়ান নিয়োগ করা হয়। ইহার পর

সম্রাট তাঁহাকে মুর্শিদ কুলী খান উপাধিতে ভূষিত করেন (ডিসেম্বর, ১৭০২) এবং এই নামে তিনি পরিচিত হন। মুর্শিদ কুলীর কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততার উপর সম্রাটের পূর্ণ আস্থা ছিল। এইজন্য সম্রাট আওরঙ্গযেব তাঁহার উপর বাংলার দায়িত্বগুলি ছাড়াও অন্য প্রদেশের দায়িত্ব অর্পণ করেন; ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে (২১শে জানুয়ারী) তাঁহাকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার ও পরে সুবাদার নিয়োগ করা হয়, ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে (১৮ই জানুয়ারী) বিহার প্রদেশের দীউয়ানীও তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। মুর্শিদ কুলী নায়েব দীউয়ান নিয়োগ করিয়া বিহারের দীউয়ানীর তত্ত্বাবধান করিতেন। সম্রাট আওরঙ্গযেবের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত মুর্শিদ কুলী খান বাংলার দীউয়ান ছিলেন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গযেবের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মুয়াজ্জম সিংহাসন লাভ করেন। তিনি শাহ আলম বাহাদুর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। সম্রাট বাহাদুর শাহ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আযিম-উদ্দীনকে বাংলা ও বিহারের সুবাদার পদে বহাল করেন এবং তাহাকে আযিমুশ শান উপাধি প্রদান করেন। এই সময় হইতে আযিমুদ্দীন আযিমুশ শান নামে পরিচিত হন। তাহার পুত্র ফররুখশিয়ার তাঁহার নায়েব রূপে ঢাকায় অবস্থান করেন। আযিমুশ শানের প্রভাবে সম্রাট বাহাদুর শাহ মুর্শিদ কুলীর স্থলে জিয়াউল্লাহ খানকে বাংলার দীউয়ান নিয়োগ করেন ১৪ই অক্টোবর, ১৭০৭)। কয়েক মাস পর মুর্শিদ কুলীকে উড়িষ্যার সুবাদারী হইতে দাক্ষিণাত্যের দীউয়ান করিয়া পাঠান হয় (১৯শে জানুয়ারী, ১৭০৮)। দুই বৎসর পর আবার মুর্শিদ কুলীকে বাংলার দীউয়ান নিয়োগ করা হয় এবং তাঁহাকে তিন হাযারী মনসব দিয়া সম্মানিত করা হয় (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৭১০)। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আযিমুশ শান নিহত হন (১৭১২ খৃঃ)। সম্রাট জাহান্দর শাহের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালে খান জাহান বাংলার সুবাদার ছিলেন। ফররুখ শিয়ার যখন সিংহাসন লাভ করেন (৯ই জানুয়ারী, ১৭১৩) তখন তাঁহার শিশু পুত্র ফরকুন্দাশিয়ারকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করা হয় এবং মুর্শিদ কুলী তাঁহার নায়েব নিযুক্ত হন। ফরকুন্দাশিয়ারের মৃত্যুর পর মীর জুমলা (ওবায়দুল্লাহ) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং মুর্শিদ কুলী নায়েব সুবাদারীতে বহাল থাকেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলীকে বাংলার নায়েব সুবাদারী ছাড়াও উড়িষ্যার সুবাদারী ও জাফর খান উপাধি দেওয়া হয়। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।

মুর্শিদ কুলী খান অতি সাধারণ অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া বাংলার দীউয়ানের উচচ পদ এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে হিংসা করিত। অভিজাত শ্রেণীর কর্মচারীরা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন এবং উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা দীউয়ানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শাহজাদা ও শাহজাদীদের মধ্যস্থতায় সম্রাট আওরঙ্গযেবকে প্রভাবান্বিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মুর্শিদ কুলী খুব দৃঢ় চরিত্রের লোক ছিলেন এবং তিনি নিজের শক্তির উৎস সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। তাঁহার সততা ও কর্মদক্ষতার প্রতি সম্রাট আওরঙ্গযেবের গভীর আস্থা ছিল। সম্রাট মুর্শিদ কুলীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন গুরুত্ব দেন নাই, বরং তিনি দীউয়ানের কার্যের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে আরও অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়া তাঁহার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলীর নিকট একপত্রে সম্রাট লিখিয়াছেন, "একই ব্যক্তি বাংলা ও বিহারের দীউয়ান এবং উড়িষ্যার সুবাদার ও দীউয়ান; তাঁহাকে তাঁহার দায়িত্ব পালনে সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আমার নিজেরও এত বেশী দায়িত্বের কাজ করার ক্ষমতা নাই; কেবল আল্লার মনোনীত ব্যক্তিই এই দায়িত্ব বহন করিতে পারে।" সম্রাট আওরঙ্গযেব মুর্শিদ কুলীকে রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্ব ক্ষমতা প্রদান করেন এবং শাসন ব্যাপারেও তিনি দীউয়ানের সুপারিশের মূল্য দিতেন। ইহার ফলে শাহজাদা আযিমুদ্দীন নাম মাত্র সুবাদার ছিলেন; কার্যতঃ মুর্শিদ কুলীই শাসনকার্যে সর্বেসর্বা ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গযেব মুর্শিদ কুলীর সুপারিশে আবদুব রহমানকে নৌবহরের দারোগা নিয়োগ করেন এবং অনেককে মনসব প্রদান করেন। তিনি দীউয়ানের অভিযোগে দুইজন ওকায়ানবিসকে (খবর লেখক) বরখাস্ত করেন।

সুবাদার আযিমুদ্দীন বিলাস-প্রিয় ছিলেন। তিনি সওদা-ই-খাসের (ব্যক্তিগত ব্যবসায়) দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতেন। সম্রাট জানিতে পারিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিয়া এক পত্র পাঠান। এই পত্রে তিনি লিখেন, "আমার পৌত্র আযিম আমার মত দয়াময় আল্লাকে ভুলিয়াছে। সৃষ্টিকর্তা আমাদের নিকট লোকদেরকে আমানত স্বরূপ রাখিয়াছেন; তাহাদের উপর অত্যাচার করা উচিত নয়; বিশেষতঃ, শাহজাদাদের পক্ষে ইহা খুবই গর্হিত কাজ।" সম্রাট তাঁহাকে মৃত্যু ও শেষ বিচারের দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং বলেন, "তুমি কোথায় এই সওদা-ই-খাস শিখিয়াছ, ইহা মস্তিষ্ক বিকৃতি

ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই তুমি ইহা তোমার পিতামহ বা পিতার নিকট হইতে শিখ নাই। ইহা হইতে তোমার চিন্তা দূরে সরাইয়া রাখিলে তুমি ভাল করিবে।" আযিমুদ্দীনের সওদা-ই-খাস বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর তিনি অন্যান্য উপায়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেন। তাঁহার অনুচররা অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ী ও প্রজাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করে। ইহাতে রাজস্বের আয় হ্রাস পায়। তা' ছাড়া আযিমুদ্দীন বেতন ও ভাতা বাবদ মঞ্জুরীকৃত টাকা হইতে বেশী টাকা লইতেন। মুর্শিদ কুলী সুবাদারের এইসব বেআইনী কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া দেন এবং খরচের ব্যাপারে মিত-ব্যয়িতার নীতি অবলম্বন করেন। এইভাবে তিনি পূর্বেকার রাজস্বের ঘাটতি দূর করিয়া রাজস্ব উদ্বৃত্তে পরিণত করিতে সমর্থ হন এবং সম্রাটকে অর্থ পাঠাইয়া দাক্ষিণাত্য অভিযানে সাহায্য করিতে পারেন।

সুবাদার আযিমুদ্দীন মুর্শিদ কুলীর প্রতি রুষ্ট হন এবং তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করেন। তখন ঢাকায় একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে নগদ বেতন দেওয়া হইত। ইহাদের বেতনের টাকা বাকী ছিল। সুবাদারের অনুচররা ইহাদেরকে দীউয়ানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন। একদিন সকালে মুর্শিদ কুলী সুবাদারের দরবারে আসিতেছিলেন সে সময় রাস্তায় এই অশ্বারোহী সৈন্যরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বেতনের দাবী করে। মুর্শিদ কুলী তাঁহার রক্ষীদলের সাহায্যে ইহাদের মধ্য দিয়া পথ করিয়া আযিমু-উদ্দীনের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার উপর সৈন্যদের আক্রমণের জন্য সুবাদারকে দায়ী করেন। সুবাদার নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। ইহার পর মুর্শিদ কুলী দপ্তরে যান এবং নগদী সৈন্যদের বেতন পরিশোধ করিয়া ইহাদের বরখাস্তের আদেশ দেন। তিনি ওকায়ান-বিসদের মাধ্যমে এই ঘটনার বিবরণ সম্রাট আওরঙ্গযেবের নিকট প্রেরণ করেন। স্বীয় নিরাপত্তার জন্য মুর্শিদ কুলী তাঁহার বাসস্থান ও দীউয়ানী দপ্তর ঢাকা হইতে মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন (১৭০২ খৃঃ)। পরে সম্রাটের অনুমতিক্রমে তিনি মকসুদাবাদের নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন। সম্রাট আওরঙ্গযেব আযিমুদ্দীনকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া লিখেন যে, যদি মুর্শিদ কুলীর সামান্য ক্ষতিও করা হয়, তাহা হইলে আযিমকে ইহার জন্য শাস্তি পাইতে হইবে। সম্রাট মুর্শিদ কুলীকে জানান যে, সুবাদার ও অন্যান্য কর্মচারীরা তাঁহার সহিত পূর্বের চেয়ে আরও ভদ্রভাবে ব্যবহার করিবেন, অন্যথায় তাঁহাদেরকে শাস্তি ভোগ

করিতে হইবে। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে আযিমুদ্দীন তাঁহার পুত্র ফররুখ শিয়ারকে ঢাকায় নায়েব সুবাদার রাখিয়া নিজে পাটনা চলিয়া যান। সম্রাট আওরঙ্গযেব ফররুখ শিয়ারকে নির্দেশ দেন যাহাতে তিনি মুর্শিদ কুলীকে তাঁহার অভিভাবক রূপে মান্য করেন।

মুর্শিদ কুলীর রাজস্ব সংস্কারঃ

মাল জামিনী:

মুর্শিদ কুলী যখন ১৭০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম দীউয়ান নিযুক্ত হইয়া বাংলায় আসেন তখন ইহার রাজস্ব সম্পর্কে কোনরূপ সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। বাংলার প্রায় সমগ্র ভূভাগ কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীরস্বরূপ নির্দিষ্ট ছিল। ইহার ফলে ভূমি রাজস্ব হইতে সরকারের অর্থাগম ছিল না বলিলেই চলে এবং বাণিজ্য শুল্কই রাজকোষের একমাত্র আয়ের পথ ছিল। এইজন্য বণিকদের উপর চাপ পড়িত। তা'ছাড়া বাংলার ভূমি রাজস্ব পুরাতন প্রথায় চলিতেছিল। মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলার ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের জন্য নিয়মিত জরীপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই। জমিদাররা সরকারকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতেন এবং তাঁহারা প্রজাদের নিকট হইতে নিজেদের নির্ধারিত হারে খাযনা আদায় করিতেন। মুর্শিদ কুলী রাজস্ব সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য দুই প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথম ব্যবস্থা দ্বারা তিনি কর্মচারীদের জায়গীরগুলিকে সরকারের খাস জমিতে পরিণত করেন এবং ইহাদের জন্য উড়িষ্যা প্রদেশে জায়গীর নির্দিষ্ট করিয়া দেন।

দ্বিতীয় প্রকারের রাজস্ব ব্যবস্থায় মুর্শিদ কুলী খান বাংলায় ভূমি জরীপের বন্দোবস্ত করেন এবং ইহার ভিত্তিতে প্রজাদের খাযনা নির্ধারিত করিয়া দেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদারদের সহিত জমির বন্দোবস্ত করেন। পুরাতন জমিদাররা বিলাসিতা, অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি কারণে নিয়মিত রাজস্ব দিতে পারিতেন না। এইজন্য মুর্শিদ কুলী ভূমি রাজস্ব ইজারা (কন্ট্রাক্ট) দেন এবং ইজারাদাররা নিয়মিত সরকারের রাজকোষে নির্দিষ্ট রাজস্ব জমা দিবে, এই শর্তে তাহাদের সহিত জমির বন্দোবস্ত করেন। ইজারাদারদের সহিত বন্দোবস্তের পূর্বে মুর্শিদ কুলী সমস্ত ভূমি

বিঘা প্রতি মাপ করেন। মাপের ব্যাপারে জমিদাররা যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, সেজন্য তিনি তাহাদেরকে আটক করিয়া রাখেন। টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থার মত তিনি ভূমির উৎপাদন শক্তি, কয়েক বৎসরের উৎপন্ন শস্যের বাৎসরিক গড় ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া এক-তৃতীয়াংশ শস্য ভূমিকর নির্ধারিত করেন। এইভাবে কয়েক বৎসরের শস্যের মূল্যের বাৎসরিক গড় হিসাব করিয়া টাকায় বিঘা প্রতি খাযনা নির্ণয় করেন। প্রজারা ইচ্ছামত শস্যে বা টাকায় ভূমিকর দিতে পারিত। জমিদাররা বা ইজারাদাররা প্রজাদের নিকট হইতে এই নির্ধারিত হারের বেশী ভূমি কর দাবী করিতে পারিতেন না। অতিরিক্ত কর নিষিদ্ধ করা হয়। এই জরীপের উপর ভিত্তি করিয়া মুর্শিদ কুলী ইজারাদারদের দেয় রাজস্ব ধার্য করেন। তিনি তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নানকার নামক কর নির্দিষ্ট করিয়া দেন। মুর্শিদ কুলী আমিলদের রাজস্ব আদায়ের খরচ হ্রাস করেন। রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য তিনি সমগ্র বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। মুর্শিদ কুলীর রাজস্ব ব্যবস্থা মাল জামিনী নামে পরিচিত।

মুর্শিদ কুলীর রাজস্ব সংস্কারের ফলে বাংলার রাজস্বের উন্নতি হয়। তাহার পূর্বে বাংলার রাজস্ব ঘাটতি হইত। মাল জামিনী ব্যবস্থা প্রচলনের পর ঘাটতি দূর হইয়া ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। মুর্শিদ কুলী ইহা হইতে প্রতি বৎসর নিয়মিত ১ কোটি তিন লক্ষ টাকা সম্রাটকে পাঠাইতে সমর্থ হন। তাঁহার রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রজাদের উপকার হয়। জমিদার ও ইজারাদাররা প্রজাদের নিকট হইতে শুধু নির্দিষ্ট খাযানা আদায় করিতেন, কোনরূপ অতিরিক্ত কর আদায় করিতে পারিতেন না। এই ব্যবস্থা কড়াকড়িভাবে কার্যকরী করা হয়। অতিরিক্ত কর বন্ধ হওয়ায় ও দেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত থাকায় প্রজাদের খাযনা দিবার সামর্থ বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদ কুলী ভূমি রাজস্ব ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা নির্দিষ্ট করেন। ইহা ব্যতীত তিনি জমিদার ও ইজারাদারদের নিকট হইতে আবওয়াব-ই-খাসনবিস (হিসাব-লেখকের কর) আদায় করিতেন। ইহাতে ২,৫০,৮৫৭ টাকা আদায় হইত। বাণিজ্য শুল্ক রাজস্বের আর একটি প্রধান উৎস ছিল।

সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক সলীমুল্লাহ লিখিয়াছেন যে, মুর্শিদ কুলী রাজস্ব আদায় ও হিসাব রাখার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করিতেন। যদি রাজস্ব বাকী পড়িত, তাহা হইলে তিনি জমিদার, আমিল, কানুনগো ও

মুৎসাদ্দিদেরকে দীউয়ান খানায় আটক করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদেরকে খাদ্য বা পানি কিছুই দেওয়া হইত না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহাদেরকে আটক রাখা হইত। কোন কোন সময় তাঁহাদেরকে মাথা নীচের দিকে দিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইত এবং চাবুক মারা হইত। রাজস্ব অনাদায়ের জন্য হিন্দু জমিদারদেরকে স্ত্রী পরিজন সমেত মুসলমান করা হইত। সলীমুল্লাহ আরও লিখিয়াছেন যে, মুর্শিদ কুলীর দৌহিত্রীর স্বামী ও নায়েব দীউয়ান সৈয়দ রাযী খান রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে আরও বেশী কড়াকড়ি করিতেন। তিনি বকেয়ার জন্য জমিদার ও আমিলদেরকে আবর্জনাপূর্ণ গর্তে ফেলিতেন। ইহাকে বৈকুন্ঠ বলা হইত।

সলীমুল্লাহ মুর্শিদ কুলী ও রাযী খানের শাস্তি ব্যবস্থার অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়াছেন। জমিদার, আমিল প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিদেরকে মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলাইয়া রাখা, চাবুক মারা ও আবর্জনাপূর্ণ গর্তের বৈকুন্ঠে ফেলিয়া শাস্তি দেওয়া কল্পনা কর'ও যায় না। এরূপ বর্বরোচিত শাস্তি দেওয়া হইলে কোন জমিদার, ইজারাদার ও আমিল মুর্শিদ কুলীর সময়ে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতেন না। রাজস্ব অনাদায়ের জন্য তাঁহাদেরকে দীউয়ান খানায় আটক রাখা হইত এবং টাকার জন্য কেহ জামিন হইলে তাঁহাদেরকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কিছুটা কড়াকড়ি ছিল। রাজস্ব অনাদায়ের জন্য হিন্দু জমিদারদেরকে পরিবার-পরিজনসহ মুসলমান করা হইত, এই অভিযোগ অমূলক। মুর্শিদ কুলী অনেক মুসলমান জমিদারের জমিদারী রাজস্ব অনাদায়ের জন্য কাড়িয়া লইয়া হিন্দু ইজারাদারদেরকে দিয়াছেন। এই অবস্থায় হিন্দু জমিদারদেরকে মুসলমান করিলে তিনি রাজস্বের ক্ষতি করিতেন। রাজস্ব বৃদ্ধি করা মুর্শিদ কুলীর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কোন হিন্দু জমিদারকে মুসলমান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। তা' ছাড়া মুর্শিদ কুলী হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি বরং মুসলমানদেরকে সরাইয়া হিন্দুদেরকে জমিদারী দিয়াছেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বড় বড় হিন্দু জমিদারীগুলির উৎপত্তি হয় এবং অনেক হিন্দু রাজস্ব শাসনের দায়িত্ব-পূর্ণ পদে নিযুক্ত হন।

মাল জামিনী ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময়ে মুর্শিদ কুলীকে নানারকম বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। যে সকল আমিলকে বরখাস্ত করা হইয়াছিল তাঁহারা দীউয়ানের বিরুদ্ধে সম্রাট আওরঙ্গযেবের নিকট অভিযোগ

করেন যে, মুর্শিদ কুলীর নিযুক্ত ইজারাদাররা প্রজাদের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া টাকা আদায় করিতেছে এবং কৃষির অবস্থার অবনতি হইতেছে। ইহার উত্তরে মুর্শিদ কুলী তাঁহার রাজস্ব সংস্কার সম্বন্ধে সম্রাটকে পূর্ণ বিবরণ দেন এবং জানান যে, প্রথম হইতেই তিনি কৃষকদের নিরাপত্তার জন্য ইজারাদারদেরকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহাদের রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য কিস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থায় সম্রাট আওরঙ্গযেব সন্তুষ্ট হন এবং তিনি একপত্রে মুর্শিদ কুলীকে লিখেন, "আপনাকে তিনটি প্রদেশের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন দীউয়ান নিয়োগ করা হইয়াছে এবং শাহজাদার (আযিমুদ্দীন) সম্পত্তির দীউয়ান রূপেও আপনাকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আপনি সুবাদারের পরামর্শ নিয়া ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া রাজস্বের সুব্যবস্থার জন্য যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করেন তাহা করিবেন।........আমি জানিয়াছি যে, আপনি উড়িষ্যা শাসনের ব্যাপারে আপনার পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা বেশী দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এবং জমিদারদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এইজন্য আপনি প্রশংসা পাইবার যোগ্য।"

মাল জামিনী ব্যবস্থার ফলে অনেক পুরাতন জমিদার, বিশেষতঃ মুসলমান পরিবার জমিদারী হারান এবং যে সমস্ত জমিদারী অবশিষ্ট থাকে সেগুলিও ইজারাদারদের প্রতিপত্তি ও নিজেদের আর্থিক অধঃপতনের দরুন কিছুকালের মধ্যে অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে। ইজারাদাররা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা বংশগত করিয়া লয় এবং পরে ইহারা জমিদার বলিয়া পরিচিত হয় এবং রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হয়। সলীমুল্লাহ লিখিয়াছেন যে, মুর্শিদ কুলী রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে হিন্দুদের ব্যতীত আর কাহাকেও নিয়োগ করিতেন না, কারণ তিনি মনে করিতেন যে, হিন্দুরা রাজস্বের ব্যাপারে দুর্নীতি অবলম্বন করিতে সাহস করিবে না। মুসলমান জমিদারদের রাজস্ব বাকী পড়িত। রাজস্ব বিভাগের মুসলমান কর্মচারীরা অনেক সময় রাজস্বের টাকা আত্মসাৎ করিতেন। এইজন্য মুর্শিদ কুলী হিন্দু ইজারাদারদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন।

মুর্শিদ কুলীর আমলে কয়েকটি বড় হিন্দু জমিদারীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রঘুনন্দনের নাটোর জমিদারী ইহাদের অন্যতম। রঘুনন্দন বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মুর্শিদ কুলীর রাজস্ব বিভাগের কার্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া মুর্শিদ কুলী তাঁহাকে প্রধান কানুনগো ও নিজের বিশ্বস্ত

পরামর্শদাতার পদে উন্নীত করেন। এই পদে থাকিয়া রঘুনন্দন তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে অনেক ভূসম্পত্তি করেন। তিনি সীতারামের ভূষণা জমিদারীর অনেকাংশ লাভ করেন। সীতারাম দস্যুতা করিয়া ভূষণা অঞ্চলে জমিদারী স্থাপন করিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলী তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (১৭১৪ খৃঃ) এবং ভূষণা জমিদারীর অধিকাংশ রামজীবনকে ইজারা দেন। এইভাবে নাটোর জমিদারীর উৎপত্তি হয়। রঘুনন্দনের অনুগত কর্মচারী দয়ারাম রায় ভূষণার কতকাংশের ইজারা পান এবং রাজশাহীর অন্যতম দিঘাপতিয়া জমিদারী স্থাপন করেন। মুর্শিদ কুলী শ্রীকৃষ্ণ হালদার (হাওলাদার) নামক বরেন্দ্র ব্রাহ্মণকে কানুনগো নিয়োগ করেন এবং তাঁহাকে মোমেনশাহী (ময়মনসিংহ) পরগণার ইজারা দেন (১৭১৮ খৃঃ)। তিনি শ্রীকৃষ্ণ আচার্য নামক অন্য একজন বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও রাজস্ব কর্মচারীকে আলপশাহী পরগণার (মুক্তাগাছা) ইজারাদার নিয়োগ করেন। ইহার ফলে ময়মনসিংহ জিলায় দুইটি বড় হিন্দু জমিদারীর উৎপত্তি হয়। বর্ধমান, নবদ্বীপ (নদীয়া) ও দিনাজপুরের হিন্দু জমিদারীগুলি মুর্শিদ কুলীর পূর্বে খুবই ছোট ছিল। মুর্শিদ কুলীর সময়ে ইহারা অনেকগুলি পরগণার ইজারা পায় এবং ইহাদের আয়তন বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদ কুলী বহু হিন্দুকে রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে নিয়োগ করেন।

সুবাদার মুর্শিদ কুলী:

ফররুখ শিয়ারের সিংহাসন লাভের পর মুর্শিদ কুলী খানকে বাংলার নায়েব সুবাদার নিয়োগ করা হয় (১৭১৩ খৃঃ)। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। দীউয়ানের মত সুবাদার রূপেও মুর্শিদ কুলী যথেষ্ট শাসন দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সুশাসনে বাংলায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয় এবং বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হয়।

মুর্শিদ কুলী বুঝিতে পারেন যে, দেশের সমৃদ্ধি বাণিজ্যের উন্নতির উপর নির্ভর করে। এইজন্য তিনি সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীকে বাণিজ্য প্রসারে উৎসাহ দিতেন। তিনি বিশেষ করিয়া ইরাণী বণিকদেরকে খাতির করিতেন এবং তাঁহাদের ব্যবসায়ে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার সময়ে হুগলী একটি সমৃদ্ধ বন্দরে পরিণত হয় এবং সেখানে অনেক ইরাণী বণিক বাণিজ্য উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহারা আরব পারস্য ও অন্যান্য

দেশের সহিত বাণিজ্য করিত। বাংলায় য়ুরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ ইরেজ বণিকদের বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। ইহারা ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফররুখ শিয়ারের নিকট হইতে বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ সুবিধা লাভ করে। মাত্র তিন হাযার টাকা বার্ষিক নযরানার বিনিময়ে ইহারা সমগ্র প্রদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে সুযোগ পায়। প্রদেশের বহু স্থানে ইহাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। ইংরেজদের কলিকাতা বাণিজ্য-কেন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়। পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, ইরাণী ও হিন্দু ব্যবসায়ীরা কলিকাতায় উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সময় ইংরেজ বণিকরা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় ওলন্দাজ বণিকদেরকেও ছাড়াইয়া যায়। স্পেনের সহিত যুদ্ধের ফলে এবং নিজেদের মধ্যে কলহের দরুন ফরাসী বণিকদের বাণিজ্যের অবনতি হইয়াছিল। সম্রাট ফররুখ শিয়ার ওলন্দাজ বণিকদের জন্য বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস করিয়া শতকরা ২ ধার্য করিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলী ফরাসী বণিকদেরকেও শুল্ক বিষয়ে অনুরূপ সুবিধা দান করেন। ইহার ফলে ফরাসীদের বাণিজ্য আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

মুর্শিদ কুলী শাসক হিসাবে বাংলায় সুনাম অর্জন করিয়াছেন। সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক সলীমুল্লাহ তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, শায়েস্তা খানের পরে মুর্শিদ কুলীর ন্যায় এরূপ ধর্মপরায়ণ বিজ্ঞ, বদান্য, ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রজাদরদী শাসনকর্তা দেখা যায় নাই। সকালের নাশতার পর হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত তিনি কুরআন শরীফ নকল করিতেন। কুরআন শরীফ পাঠ ও ধর্মানুষ্ঠানের জন্য তিনি ২০০০ কারী ও ধার্মিক লোক নিয়োগ করেন। মুর্শিদ কুলী বিলাসিতা পছন্দ করিতেন না, তিনি পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহারে আড়ম্বরহীন ছিলেন। তিনি খুব শিক্ষিত ছিলেন এবং আলেম ও ধর্মপরায়ণ লোকদেরকে সমাদর করিতেন। তাঁহার শাসনকালে অতি সাধারণ প্রজাও অত্যাচার হইতে নিরাপত্তা ভোগ করিত। মুর্শিদ কুলী সপ্তাহে দুই দিন বিচারকার্য করিতেন এবং সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করিতেন। তিনি অত্যাচারীকে এরূপ কঠোর শাস্তি দিতেন যে, কেহ অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। গোলাম হোসেন সলিম লিখিয়াছেন যে, মুর্শিদ কুলীর পারিবারিক জীবন খুব সরল ও শান্তিপূর্ণ ছিল। তাঁহার একজন মাত্র স্ত্রী ছিল। বিশ্বস্ত খোজা বা স্ত্রীলোক ছাড়া তাঁহার অন্তপুরে আর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। চরিত্র ও ধর্মপরায়ণতায় সম্রাট আওরঙ্গযেব মুর্শিদ কুলীর আদর্শ ছিল।

সুবাদার মুর্শিদ কুলী ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন মৃত্যু মুখে পতিত হন। সুবাদাররূপে তিনি কার্যতঃ স্বাধীনভাবে বাংলা, উড়িষ্যা শাসন করিয়াছেন। সম্রাট আওরঙ্গযেবের বংশধরদের মধ্যে সিংহাসন নিয়া গৃহবিবাদ, আমীরদের স্বার্থপরতা, ইত্যাদি কারণে মুগল সাম্রাজ্যের অবনতি হয় এবং এই সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। দুর্বল সম্রাটদের পক্ষে সাম্রাজ্যের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভবপর হয় নাই। মুর্শিদ কুলী নাম মাত্র সম্রাটের আনুগত্য মানিয়া চলিতেন এবং তাহাকে বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাইতেন। শাসন ব্যাপারে মুর্শিদ কুলী নিজ প্রদেশে সর্বেসর্বা ছিলেন। মুর্শিদ কুলীর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন খান বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। এইভাবে বাংলার সুবাদারী বংশগত হইয়া যায় এবং বাংলায় আবার স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নবাব সুজাউদ্দীন খান

মুর্শিদ কুলীর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন খান বাংলা-উড়িষ্যার মসনদ লাভ করেন (জুলাই, ১৭২৭)। সুজাউদ্দীন আফশার তুর্কী ছিলেন। তাঁহার পিতা দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুরে মুগল সরকারে চাকুরী করিতেন। সেখানে মুর্শিদ কুলীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং মুর্শিদ কুলীর কন্যা জিনাতুন্নেসার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সরজরাজ খান ও নফিসা বেগম সুজাউদ্দীন ও জিনাতুন্নেসার সন্তান ছিলেন। মুর্শিদ কুলী যখন বাংলার দীউয়ান ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন তখন তিনি সুজাউদ্দীনকে উড়িষ্যার নায়েব নাযিম (নায়েব সুবাদার) নিয়োগ করেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি দৌহিত্র সরফরাজ খানকে পুত্রবৎ পালন করেন এবং তাঁহার নামে চুনাখালীর জমিদারী ক্রয় করেন। মৃত্যুর পূর্বে মুর্শিদ কুলী সরফরাজ খানকে সুবাদারীতে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবার জন্য সম্রাটের অনুমতি লাভের চেষ্টা করেন। বাংলার সুবাদারীর প্রতি সুজা-উদ্দীনের দৃষ্টি ছিল। তিনিও সুবাদারীর জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন করেন এবং এক বিরাট সৈন্য দল নিযা মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। তিনি যখন মেদেনীপুর পেঁীছেন তখন তিনি সম্রাটের ফরমান প্রাপ্ত হন। এই ফরমানের দ্বারা সম্রাট তাঁহাকে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার নিয়োগ করেন। সুজাউদ্দীন মুর্শিদাবাদ পেঁীছিবার পূর্বে মুর্শিদ কুলীর মৃত্যু হয়। সুজাউদ্দীন রাজধানীতে প্রবেশ করেন এবং চেহেল সেতুন (চল্লিশ স্তম্ভ বিশিষ্ট মুর্শিদ কুলী নির্মিত দীউয়ানখানা) প্রাসাদে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলার মসনদে আরোহন করেন। সরফরাজ খান পিতার আনুগত্য স্বীকার করেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মুহম্মদ শাহ সুজাউদ্দীনকে বাংলা-উড়িষ্যা ছাড়াও বিহারের সুবাদার নিয়োগ করেন। নবাব সুজাউদ্দীন আলীবর্দী খানকে বিহারের নায়েব নাযিম নিয়োগ করেন। তাঁহার পুত্র মুহম্মদ তকী খান (সরফরাজের বৈমাত্রেয় ভাই) উড়িষ্যার নায়েব নাযিম ছিলেন।

নবাব সুজাউদ্দীনের জামাতা (দুর্দানা বেগমের স্বামী) মুর্শিদ কুলী জাফর খান (দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী নামে পরিচিত) সুবাদার মুর্শিদ কুলীর

সময় হইতে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাযিম ছিলেন। সুবাদার সুজাউদ্দীন তাঁহাকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী তাঁহার সহকারী মীর হাবিবকে ত্রিপুরা রাজ্য জয় করিবার জন্য প্রেরণ করেন। পাটপ-সারের জমিদার আগা সাদেক তাঁহাকে সাহায্য করেন। মীর হাবিব তাঁহার সৈন্য বাহিনী লইয়া চণ্ডীগড় দুর্গ আক্রমণ করেন। ত্রিপুরা রাজ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লন। তাঁহার দুর্গ ও রাজধানী মীর হাবিবের হস্তগত হয়। ত্রিপুরা রাজ্য রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেওয়া হয় এবং আগা সাদিককে সেখানকার ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। মীর হাবিব বহু ধনরত্ন ও হাতী লইয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী ইহার অধিকাংশ নবাব সুজাউদ্দীনের নিকট প্রেরণ করেন। নবাব সুজা-উদ্দীন ত্রিপুরার নাম পরিবর্তন করিয়া রওশনাবাদ রাখেন। তিনি মীর হাবিবকে বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন এবং আমীরের মর্যাদা প্রদান করেন। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ তকীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী উড়িষ্যার নায়েব নাযিম নিযুক্ত হন এবং তাঁহার জায়গায় প্রথমে গালিব আলী খান ও পরে নফিসা বেগমের পুত্র মুরাদ আলী খানকে নায়েব নাযিম নিয়োগ করা হয়।

নবাব সুজাউদ্দীন মুর্শিদ কুলীর মাল জামিনী ব্যবস্থা ও ইজারাদারদের সহিত রাজস্ব বন্দোবস্ত বজায় রাখেন। দিনাজপুরের জমিদার ও কুচবিহারের রাজা নবাবের প্রতি অবাধ্য আচরণ করেন। এই সময় হাজী আহমদের দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আহমদ ঘোড়াঘাট রংপুরের নায়েব ফৌজদার ছিলেন। তিনি তাঁহাদেরকে দমন করেন এবং নিয়মিত রাজস্ব দিতে বাধ্য করেন। বীরভূমের জমিদার রাজা বদিউজ্জামান নবাবকে রাজস্ব দিতে গড়িমসি করেন এবং ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হন। নবাব সুজাউদ্দীন তাঁহার বিরুদ্ধে মীর সরফুদ্দীনের অধীনে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। আলীবর্দী খানকে বিহার হইতে বীরভুম আক্রমণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বদিউজ্জামান বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি মুর্শিদাবাদে নীত হন। মীর শরফুদ্দীনের মধ্যস্থতায় সুজাউদ্দীন তাঁহাকে মাফ করেন। তিন লক্ষ টাকা জরিমানা ও বাৰ্ষিক রাজস্ব রীতিমত আদায়ের প্রতিশ্রুতিতে বদিউজ্জামানকে তাঁহার জমিদারীতে প্রত্যাবর্তন করিতে দেওয়া হয়।

নবাব সুজাউদ্দীন মুর্শিদ কুলীর রাজস্ব ব্যবস্থার কিছুটা সংশোধন করেন। ইহার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং ইহা ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা

নির্ধারিত হয়। তিনি জমিদারদের নিকট হইতে কয়েকটি আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর আদায় করিতেন। (১) নযরানা মুকররী; ইহা জমিদারদের প্রতি অনুগ্রহ ও তাঁহাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ধার্য করা হয়। (২) জর মাহুত; ইহা পুন্যার নযর, জমিদারদেরকে পোষাক প্রদানের জন্য খরচ এবং জমিদার বা প্রধান পিয়নের মফস্বল হইতে রাজস্ব আনার খরচ বাবদ আদায় করা হইত। (৩) মাহুত-ই-ফিলখানা; সুবাদার ও দীউয়ানের হাতী রাখাব খরচ এবং (৪) ফৌজদারী আবওয়াব; সীমান্ত জিলাগুলিতে সৈন্যদের ব্যয় বাবদ আদায় করা হইত। এই সকল আবওয়াব হইতে সুজাউদ্দীনের সময়ে ১৯,১৪,০৯৫ টাকা আয় হইত। নবাব সুজাউদ্দীন মুগল সম্রাটকে বাৎসরিক ১,২৫,০০,০০০ টাকা রাজস্ব দিতেন। তিনি ১১ বৎসর ৮ মাসের সুবাদারীতে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৩৮ টাকা সম্রাটকে রাজস্ব স্বরূপ দিয়াছেন।

নবাব সুজাউদ্দীন য়ুরোপীয় বণিকদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখিতেন এবং ইহাদের কোন রকম অবাধ্যতা সহ্য করিতেন না। ইহারা প্রায়ই নবাবকে বহু টাকা নযরানা পাঠাইয়া খুশী রাখিতেন। হুগলীর ফৌজদার সুজা কুলী খান ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের নিকট হইতে উচ্চহারে শুল্ক দাবী করেন। কলিকাতা ও কাসিমবাজারের ইংরেজ বণিকরা ইহার বিরোধিতা করে এবং ফৌজদার ইহাদের কিছু রেশম আটক করেন। ইহার ফলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষের উপক্রম হয়। শেষে কাসিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ নবাবকে তুষ্ট করিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা নযরানা প্রেরণ করেন। ইংরেজ বণিকরা বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য সম্রাটের নিকট হইতে ফরমান পাইতে চেষ্টা করে (১৭৩২ খৃঃ)। সম্রাট অবশ্য ইহাদের পক্ষে একটি ফরমান জারী করেন; কিন্তু তাহা ইহাদের মনঃপুত না হওয়ায় ইহারা আর একটি ফরমানের জন্য তদবির করে। কিন্তু নবাবের প্রতিপত্তির দরুন ইংরেজ বণিকরা ইহাদের সুবিধাজনক ফরমান লাভে অসমর্থ হয়। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দীন ইংরেজদের নিকট হইতে ইহাদের বাণিজ্য কুঠির বাবদ ভূমিকর (rent) দাবী করেন। ওলন্দাজ বণিকদের নিকট হইতেও অনুরূপ কর দাবী করা হয়। ইংরেজ বণিক সংঘের কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্য করিত এবং এই কার্যে বেআইনী ভাবে বণিকসংঘের দস্তক ব্যবহার করিত ও শুল্ক ফাঁকি দিত। বণিক সংঘের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের ফলে ইংরেজদের বাণিজ্য বিস্তার

লাভ করে। এই কারণে তিনি ইহাদের নিকট হইতে ভূমিকর দাবী করেন। ভূমিকর আদায়ের জন্য নবাব ইহাদের লবণ-মাটির (Saltpetre) ব্যবসায় বন্ধের আদেশ দেন। উপায় নাই দেখিয়া ইংরেজ বণিক সংঘ নবাবকে তুষ্ট করিতে বাধ্য হয়। ইহারা ভূমিকর বাবদ নবাবকে ৫৫,০০০ টাকা দেয়।)

সমসাময়িক ইতিহাস-লেখকরা নবাব সুজাউদ্দীনের শাসন দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন। সুজাউদ্দীন নিজে শাসনকার্যের সব কিছু তত্ত্বাবধান করিতেন এবং প্রজাদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেন। তিনি সদাশয় ও উদার ছিলেন। তিনি পুরাতন বন্ধু-বান্ধব ও কর্মচারীদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। নবাব সুজাউদ্দীন ছোট বড় সকলকে সমান চোখে দেখিতেন এবং সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করিতেন। গোলাম হোসেন তাবাতাবাই লিখিয়াছেন যে, নবাব সুজাউদ্দীন নিরপেক্ষ বিচারে দরিদ্রতম প্রজা ও নিজের পুত্রের মধ্যে তারতম্য করিতেন না। ভয়ার্ত প্রজা নির্বিঘ্নে তাঁহার নিকট আশ্রয় লইতে পারিত। প্রজারা মনে করিত যে, তাহারা ন্যায়পরায়ণ নওশেরোয়ার রাজত্বে বাস করিতেছে। সুজাউদ্দীনের সুশাসনে প্রজারা সুখ-শান্তিতে ছিল। তাঁহার শাসনকালে জিনিসপত্র খুব সুলভ ছিল; এক টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত। শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকার দুর্গের পশ্চিম তোরণ-দ্বার বন্ধ করা হইয়াছিল। সুজাউদ্দীনের সময়ে ইহা আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হয়।

নবাব সুজাউদ্দীন খুব জাঁকজমকে থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি রাজত্বের শেষের দিকে খুব বিলাসপ্রিয় হইয়া পড়েন এবং শাসন ব্যাপারে তাঁহার মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের উপর বেশী নির্ভরশীল হন। আলীবর্দী খানের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহমদ, রায়রায়ান আলমচাঁদ ও ব্যাংকার জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ নবাবের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। এই উপদেষ্টারাই প্রকৃতপক্ষে শাসন বিষয়ে সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। ইহাদের স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্রের দরুন রাজ্য মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত হয়। হাজী আহমদ কূটনীতিবিশারদ ছিলেন। তিনি নানাভাবে নিজের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের উন্নতির ব্যবস্থা করেন। আলমচাঁদ সুজাউদ্দীনের দীউয়ান ছিলেন। তিনিও কূটবুদ্ধিতে হাজী আহমদের সমকক্ষ ছিলেন। মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ পরিবার এই সময় বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কার ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন

বন্দর ও শহরে তাহার ব্যবসায়ের শাখা ছিল। জগৎশেঠের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ব্যবসায়ী ও বণিকরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টাকা ও মাল পাঠাইত। এই ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর আয় হইত। জমিদাররা তাঁহার ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নবাবের রাজকোষে রাজস্ব জমা দিতেন। অনেক সময় জগৎশেঠ তাঁহাদের রাজস্বের জন্য নবাবের নিকট জামিন হইতেন। নবাব সুজাউদ্দীন জগৎশেঠের মাধ্যমে সম্রাটের নিকট রাজস্ব পাঠাইতেন। সমৃদ্ধ ব্যাঙ্কার হিসাবে সর্বত্র জগৎশেঠের খাতির ছিল। নবাবের দরবারে তাঁহার অসামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুজাউদ্দীনের আমলে আলমচাঁদ ছাড়াও বহু হিন্দু দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়। যশোবন্ত রায় জাহাঙ্গীরনগরের দীউয়ান ছিলেন। রাজবল্লভ জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাযিমের পেস্কার এবং জানকীরাম বিহারের নায়েব নাযিম আলীবর্দী খানের দীউয়ান নিযুক্ত হন।

সরফরাজ খান :

নবাব সুজাউদ্দীন খান ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ মারা যান। তাঁহার পুত্র সরফরাজ খান বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। পিতার শেষ উপদেশ অনুযায়ী নবাব সরফরাজ খান হাজী আহমদ, আলমচাঁদ ও জগৎ-শেঠকে তাহাদের পদে বহাল রাখেন। তিনি খুব ধর্মানুরাগী ছিলেন। কিন্তু শাসক হিসাবে তিনি দুর্বল ছিলেন। তিনি আরাম-আয়েসে থাকিতে ভালবাসিতেন। কথিক আছে যে, নবাব সরফরাজের হেরেমে ১৫০০ স্ত্রীলোক ছিল। তাঁহার দুর্বলতা এবং নূতন উপদেষ্টাদের কুমন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্রের দরুন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে বিহারের নায়েব নাযিম আলীবর্দী খান তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (৯ই এপ্রিল, ১৭৪০)। ইহার পর আলীবর্দী মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নবাব আলীবর্দী খান

আলীবর্দী খান একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া স্বীয় প্রতিভা বলে তিনি বাংলার মসনদ অর্জন করিয়াছিলেন। নিঃস্ব অবস্থায় তিনি ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় আসেন এবং ৪০ বৎসর বয়সে মাত্র ১০০ টাকা বেতনে রাজস্ব বিভাগে সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেন। ১২ বৎসরের মধ্যে তিনি নবাব সুজাউদ্দীনের সরকারে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন এবং ইহার ৮ বৎসর পরে তিনি নিজের অসামান্য কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতার বলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। নবাব আলীবর্দী অসমসাহসিক ও রণনিপুণ সেনাপতি এবং কর্মদক্ষ ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তিনি বাংলার রাজশক্তিকে পতনের মুখ হইতে রক্ষা করেন এবং ইহাকে সুসংহত করিয়া একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মুগল সাম্রাজ্য যখন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং মারাঠাদের হানায় ভারতের সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল তখন আলীবর্দীর সাহস ও সুযোগ্য সেনাপতিত্বের গুণে বাংলাদেশ মারাঠা হানাদারদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং ইহা শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

আলীবর্দীর প্রথম জীবন:

আলীবর্দী জাতিতে তুর্কী ছিলেন এবং শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পিতা মির্যা মুহম্মদ মদানী সম্রাট আওরঙ্গযেবের তৃতীয় পুত্র মুহম্মদ আযমের অধীনে সামান্য চাকুরী করিতেন। মির্যা মুহম্মদের দুই পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল মির্যা আহমদ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল মির্যা মুহম্মদ আলী। পুত্রদ্বয়ও মুহম্মদ আযমের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গযেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া যে গৃহযুদ্ধ হয় তাহাতে শাহজাদা আযম পরাজিত ও নিহত হন। মির্যা মুহম্মদ ও তাঁহার দুই পুত্র চাকুরীহারা হন এবং খুবই অসুবিধায় পড়েন। দিল্লীতে চাকুরীর সুবিধা করিতে না পারিয়া মির্যা মুহম্মদ আলী তাঁহার

পরিবার লইয়া ভাগ্যান্বেষণে বাংলার দিকে রওয়ানা হন। এই সময় তাঁহার আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল যে, তাঁহার স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তাহাকে পথ খরচের সংস্থান করিতে হয়। তিনি প্রথমে মুর্শিদাবাদে সুবাদার মুর্শিদ কুলীর অধীনে চাকুরীর জন্য চেষ্টা করেন। মুর্শিদ কুলী তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীনের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। মির্যা মুহম্মদ আলী সুজাউদ্দীনের আত্মীয় ছিলেন বলিয়া মুর্শিদ কুলী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর মুহম্মদ আলী উড়িষ্যার নায়েব নাযিম সুজাউদ্দীনের অধীনে চাকুরীর প্রত্যাশায় কটক যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতা মির্যা মুহম্মদ সুজাউদ্দীনের নিকট আশ্রয় লাভ করিয়াছেন (১৭১৯ খৃ:)। যখন মুহম্মদ আলী কটক পৌঁছেন তখন সুজাউদ্দীন তাহাকে ১০০ টাকা বেতনে রাজস্ব বিভাগের চাকুরীতে নিয়োগ করেন (১৭২০ খৃ:)।

কর্মকুশলতার গুণে মুহম্মদ আলী কিছুদিনের মধ্যে সবন্তপুরের থানাদারের পদ ও ৬০০ অশ্বারোহীর মনসব লাভ করেন। এক বৎসর পর তাঁহার ভ্রাতা হাজী আহমদ (মির্যা আহমদ হজ করিয়াছেন।) তাঁহার পরিবার ও তিন পুত্র নওয়াজিশ মুহম্মদ খান, সৈয়দ আহমদ ও জৈনদ্দীনকে লইয়া উড়িষ্যায় আসেন এবং সুজাউদ্দীনের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। মুহম্মদ আলী ও হাজী আহমদ তাঁহাদের কার্যে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং উড়িষ্যায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে তাঁহাকে বিশ্বস্ততার সহিত সাহায্য করেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের বাংলার মসনদ লাভের ব্যাপারে তাঁহারা কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাহাদের কার্যে ও বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট হইয়া নবাব সুজাউদ্দীন হাজী আহমদকে তাঁহার অন্যতম উপদেষ্টার পদে নিয়োগ করেন এবং পরে দীউয়ানের পদে উন্নীত করেন। নওয়াজিশ মুহম্মদ ও সৈয়দ আহমদকে যথাক্রমে বখশী ও রংপুরের ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। মির্যা মুহম্মদ আলী আকবর মহলের (রাজমহল) ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং আলীবর্দী খান উপাধিতে ভূষিত হন (১৭২৮খৃ:)। এই সময় হইতে মির্যা মুহম্মদ আলী আলীবর্দী খান নামে পরিচিত হন।

বিহারের নায়েব নাযিম :

নবাব সুজাউদ্দীন যখন ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে বিহারের সুবাদারী লাভ করেন তখন তিনি আলীবর্দী খানকে ইহার নায়েব নাযিম পদে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার সুপারিশে সম্রাট আলীবর্দীকে পাঁচ হাযারী মনসব প্রদান করেন।

এইভাবে আলীবর্দী ও তাঁহার পরিবার বাংলা-বিহারে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। আলীবর্দীর শাসন দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বিহার প্রদেশে শান্তি ছিল না। জমিদাররা অবাধ্য ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকে লুটতরাজ করিতেন। আলীবর্দী তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাঁহাদেরকে দমন করিয়া নিয়মিত রাজস্ব দিতে বাধ্য করেন। টিকারির জমিদার রাজা সুন্দর সিংহ বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। সুন্দর সিংহ তাঁহার অধীনস্থ মুস্তফা নামক একজন আফগান নায়ককে আলীবর্দীর চাকুরীর জন্য ছাড়িয়া দেন। মুস্তফা পরে আলীবর্দীর সেনাপতি রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। মুঙ্গের জিলার দুরন্ত উপজাতিগুলি ভীষণ উৎপাত করিত। আলীবর্দী ইহাদেরকে শক্ত হাতে দমন করেন। তাঁহার কর্মদক্ষতার ফলে বিহার প্রদেশে সুজাউদ্দীনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার অধিবাসীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়।

বাংলার মসনদ অধিকার :

নবাব সুজাউদ্দীনের মত্যুর পর সরফরাজ খান বাংলার মসনদ লাভ করেন (১৩ই মার্চ, ১৭৩৯)। নবাব সরফরাজ খান আলীবর্দী খানকে বিহারের নায়েব নাযিম পদে বহাল রাখেন। চার পাঁচ মাস নবাব সরফরাজের সহিত আলীবর্দীর স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় থাকে। ইহার পর তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি দেখা দেয়। নবাবের দুর্বল চরিত্র ও তাঁহার নূতন মন্ত্রণাদাতাদের চক্রান্ত ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল। মীর মুরতজা, হাজী লুৎফ আলী ও মর্দন আলী খান সরফরাজ খানের উপদেষ্টা ও বিশ্বস্ত সভাসদ ছিলেন। রাজ্যে আলীবর্দী খানের পরিবারের প্রতিপত্তিতে তাঁহারা ঈর্ষান্বিত হন। আলীবর্দী খান বিহারের নায়েব নাযিম, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহমদ নবাবের দীউয়ান, এবং হাজী আহমদের তিন পুত্র নওয়াজিস মুহম্মদ খান, সৈয়দ আহমদ ও জৈনুদ্দীন এবং তাঁহার (হাজী আহমদের) জামাতা আতাউল্লাহ খান বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাবের উপদেষ্টারা তাঁহাকে আলীবর্দী পরিবারের প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে পরামর্শ দেন। তাহাদের পরামর্শে নবাব হাজী আহমদকে দীউয়ানের পদ হইতে অপসারিত করেন এবং তাঁহার জায়গায় মুরতজা খানকে নিয়োগ করেন। তাঁহারা আতাউল্লাহ খানকে আকবরমহলের ফৌজদারী হইতে সরাইয়া দিতে এবং সৈয়দ আহমদ ও জৈনুদ্দীনকে কারারুদ্ধ করিতে নবাবকে

উপদেশ দেন। তাঁহারা হাজী আহমদের প্রতি অপমানজনক মন্তব্য করেন। সমসাময়িক ইতিহাস লেখক ও নবাব সরফরাজ খানের জামাতা য়ুসুফ আলী লিখিয়াছেন যে, শত্রুরা হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খানকে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ গোপনে হাজী আহমদকে নবাবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। নবাবের নূতন উপদেষ্টাদের আবির্ভাবে ইহাদের প্রভাব নষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য ইহারা সরফরাজ খানের প্রতি রুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খানকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তৃতীয়তঃ, হাজী আহমদ তাঁহার প্রতি নবাবের উপদেষ্টা ও অনুচরদের অপমানজনক আচরণের কথা অতিরঞ্জিত করিয়া আলীবর্দীকে জানান এবং সরফরাজকে মসনদ হইতে অপসারিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

য়ুসুফ আলী ও অন্যান্য ইতিহাস-লেখকরা লিখিয়াছেন যে, নবাব সরফরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোনরূপ সঙ্কল্প আলীবর্দী খানের ছিল না। কিন্তু হাজী আহমদ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সংবাদ পাঠাইতে থাকেন যে, তাঁহার পরিবারের প্রতি অপমান প্রদর্শন করা হইতেছে এবং শত্রুরা তাঁহাকে সপরিবারে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করিতেছে। ইহাতে স্বভাবতঃই আলীবর্দী খান বিচলিত হইয়া পড়েন এবং নিজের ও পরিবারের সম্মান ও নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি নবাব সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষের দিকে তিনি পাটনা হইতে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। রাজমহল হইতে আলীবর্দী খান নবাবকে লিখিয়া জানান যে, তাহার ভ্রাতা ও তাহাদের পরিবারকে অপমানের হাত হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন এবং নবাবের প্রতি আনুগত্য ব্যতীত তাহার অন্য কোন মনোভাব নাই। তিনি আশা করেন যে, নবাব হাজী আহমদ ও তাহার পরিবার-পরিজনদেরকে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া তাহার নিকট আসিতে অনুমতি দিবেন। ইহাতে সরফরাজ খান হতভম্ব হইয়া পড়েন এবং তাহার উপদেষ্টাদের পরামর্শে হাজী আহমদ ও তাহার পরিজনদেরকে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিতে অনুমতি দেন। হাজী আহমদ আলীবর্দীর সহিত মিলিত হন এবং সরফরাজকে অপসারিত করিয়া মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করার জন্য তাহাকে প্ররোচিত করেন। অন্যদিকে, সরফরাজ খান তাহার উপদেষ্টাদের পরামর্শে সৈন্যবাহিনী লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে আলীবর্দীর

বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। আলীবর্দী নবাবের সহিত আপোষ করিতে চেষ্টা করেন। যে সকল লোক অশান্তির জন্য দায়ী তিনি তাহাদের পদচ্যুতির দাবী করেন। নবাবের পক্ষ ইহা মানিতে পারে নাই। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

মুর্শিদাবাদের ২৬ মাইল উত্তর—পশ্চিমে গিরিয়া নামক স্থানে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল সরফরাজ খান ও আলীবর্দীর সৈন্যদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খান পরাজিত ও নিহত হন। যুদ্ধের দুই তিন দিন পর আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন এবং বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। নবাব আলীবর্দী সরফরাজ খানের মৃত্যুতে খুবই মর্মাহত হন। তিনি সরফরাজের ভগ্নী নফিসা বেগমের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি নফিসা বেগম, সরফরাজের শিশু পুত্র আকা বাবা ও তাহার আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করেন এবং তাহাদেরকে তাহাদের সম্পত্তির অধিকার দেন এবং তাহাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন।

সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দীন আলীবর্দী ও তাহার পরিবারের মহা-উপকার করিয়াছিলেন। সুজাউদ্দীন তাহাদের সকলকে চাকুরীতে নিয়োগ করিয়া তাহাদের উন্নতি ও প্রতিপত্তির পথ সুগম করিয়াছিলেন। এত বড় উপকারীর পুত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ায় ও তাঁহাকে নিহত করায় আলীবর্দীকে সাধারণতঃ অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে করা হইত। সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করিলে আলীবর্দীকে অপরাধী করা যায় না। কারণ তিনি নিছক নিজের ও পরিবারের সম্মান ও নিরাপত্তার জন্য সরফরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নবাবের সহিত তাঁহার তিক্ত সম্পর্কের ও সংঘর্ষের জন্য প্রধানতঃ নবাবের উপদেষ্টারা দায়ী ছিলেন। নবাব ও তাঁহার পরামর্শদাতাদের বিরুদ্ধে হাজী আহমদের প্রতিহিংসাও এই পরিণতির জন্য দায়ী ছিল।

মসনদ হস্তান্তরের ফলে বাংলার রাজনৈতিক জীবনের উপকার হইয়াছিল। গোলাম হোসেন তাবাতাবাই লিখিয়াছেন, "ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, সরফরাজ খানের শাসন যোগ্যতা ছিল না ; তাহার রাজত্ব আর কিছুকাল চলিলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হইত এবং ইহাতে দেশের ও লোকের সর্বনাশ হইত।" বহিঃশত্রুর উল্লেখ করিয়া তাবাতাবাই লিখিয়াছেন, "এই সমৃদ্ধ প্রদেশগুলির প্রতি মারাঠাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

কিছুদিন পরেই ইহারা চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রদেশগুলির খুবই সৌভাগ্য যে, এই হানাদার লুটেরাদেরকে আলীবর্দীর মত একজন প্রতিভাসম্পন্ন শাসক ও সেনাপতির মুকাবিলা করিতে হইয়াছে; অসামান্য রণনৈপুণ্য, অক্লান্ত পরিশ্রম ও কটবুদ্ধির সাহায্যে তিনি হানাদারদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছেন এবং ইহাদেরকে সম্পর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াছেন।"

নবাব আলীবর্দী খান যখন বাংলার মসনদে আরোহণ করেন তখন তিনি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ। কিন্তু তিনি যুবকের উদ্যম ও কর্মশক্তি নিয়া রাজ্যে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের কার্যে ব্রতী হন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজিশ মুহম্মদ খানকে বাংলা সুবার দীউয়ান ও জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাযিম নিয়োগ করেন। হোসেন কুলী খানকে জাহাঙ্গীরনগরে নওয়াজিশ খানের নায়েব নিযুক্ত করা হয়। নবাব তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জৈনুদ্দীনকে বিহারের নায়েব নাযিম নিয়োগ করেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগ্নী শাহ খানমের স্বামী মীর মুহম্মদ জাফর খান (মীর জাফর) পুরাতন সৈন্যদলের বখশী পদে নিযুক্ত হন এবং নূরুল্লাহ বেগ খানকে নূতন সৈন্যদলের বখশী পদে নিয়োগ করা হয়। আলীবর্দী চিনরায়কে খালসা বিভাগের দীউয়ান এবং জানকীরামকে নিজের পারিবারিক দীউয়ান নিয়োগ করেন। গোলাম হোসেন খানকে হাজিব পদ দেওয়া হয়। নবাব তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহমদ খানকে রংপুরের ফৌজদার এবং আতাউল্লাহ খানকে আকবরমহল ও ভাগলপুরের ফৌজদারীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। আলীবর্দীর পিতৃব্যপুত্র ও গোলাম হোসেন তাবাতাবাইর মাতুল আবদুল্লাহ খানকে ত্রিহুত জিলার ভার দেওয়া হয়। কামান-বারুদ ও নৌবহরের দারোগা পদগুলিতে যোগ্য লোক নিয়োগ করা হয়। মসনদ অধিকারের কয়েক মাস পরে আলীবর্দী খান সম্রাট মুহম্মদ শাহের নিকট হইতে সনদ লাভ করেন (নভেম্বর, ১৭৪০)। এই সনদের দ্বারা সম্রাট তাঁহাকে বাংলা ও বিহারের সুবাদার নিয়োগ করেন এবং তাঁহাকে ও পরিবারের লোকদেরকে উপাধি ও মনসব দান করেন। ইহার ফলে বাংলার মসনদে আলীবর্দীর অধিকার বৈধ বলিয়া গণ্য হয়।

নবাব সুজাউদ্দীনের সময় হইতে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী উড়িষ্যার নায়েব নাযিম ছিলেন। তিনি নবাব আলীবর্দীর আনুগত্য স্বীকার করেন নাই।

তাহার স্ত্রী দুর্দানা বেগম ও জামাতা মির্যা বাকর খান তাহাকে সরফরাজের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উত্তেজিত করেন। আলীবর্দী মুর্শিদ কুলীর নিকট হইতে বিপদের আশঙ্কা করেন। এইজন্য তিনি উড়িষ্যায় অভিযান করেন। বালেশ্বরের নিকট ফুলয়ারী নামক স্থানে মুর্শিদ কুলী তাহাকে প্রতিরোধ করেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। মুর্শিদ কুলী পরাজিত হন এবং উড়িষ্যা ত্যাগ করেন। তিনি পরিবার-পরিজন নিয়া হায়দরাবাদের নিযামুল মুলকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলীবর্দী সৈয়দ আহমদ খানকে উড়িষ্যার নায়েব নাযিম রূপে কটকে রাখিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। সৈয়দ আহমদ যুবক ছিলেন এবং শাসন ব্যাপারে তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে তাঁহার সৈন্যদের অনেকে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলীর জামাতা মির্যা বাকর এই সময় উড়িষ্যা সীমান্তে ছিলেন। তিনি সুযোগ বুঝিয়া একদল মারাঠা সৈন্যসহ কটকের দিকে অগ্রসর হন। সৈয়দ আহমদের বিদ্রোহী সৈন্যরা মির্যা বাকরের সহিত যোগ দেয়। মির্যা বাকর সহজেই কটকে প্রবেশ করেন এবং সৈয়দ আহমদকে পরিবারসহ বন্দী করিয়া বড়বাটি দুর্গে কারারুদ্ধ রাখেন (আগষ্ট, ১৭৪১)। এই সংবাদ পাইয়া নবাব আলীবর্দী আবার উড়িষ্যা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি মির্যা বাকরকে রায়পুর নামক স্থানে এক যুদ্ধে পরাজিত করেন (ডিসেম্বর, ১৭৪১)। মীর জাফর বড়বাটি দুর্গ হইতে সৈয়দ আহমদ ও তাঁহার পরিজনদেরকে মুক্ত করেন। আলীবর্দী তিন মাস কটকে অবস্থান করেন এবং উড়িষ্যায় শান্তি স্থাপন করেন। ইহার পর তিনি শেখ মাসুম পানিপথীকে উড়িষ্যার নায়েব নাযিম ও দুর্লভরামকে তাঁহার পেশকার নিয়োগ করিয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। যখন তিনি মেদিনীপুরে পৌঁছেন তখন তিনি জানিতে পারেন যে, মারাঠা হানাদাররা বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে।

আলীবর্দী ও মারাঠা আক্রমণ:

১৭৪২ হইতে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর নবাব আলীবর্দী খানকে বাংলায় মারাঠাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ প্রতিরোধ করার কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। এই সময় তাঁহাকে আবার তাঁহার আফগান সেনাপতি গোলাম মুস্তফা খান ও তাঁহার আফগান সৈন্যদের ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের

মুকাবিলা করিতে হয়। এরূপ ভীষণ বিপদের মধ্যে তেজস্বী যুবক সেনাপতিরাও দিশাহারা হইয়া পড়িতেন এবং শত্রুদের সহিত আপোষ করিতেন। কিন্তু ষাট বৎসরের অধিক বয়সের বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দী খান আপোষবিহীন ভাবে এই ভয়ঙ্কর শত্রুদের বিরুদ্ধে বৎসরের পর বৎসর অবিরাম সংগ্রাম করিয়াছেন এবং হানাদার ও বিদ্রোহীদেরকে বিতাড়িত করিয়া বাংলার মসনদের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন এবং লোকের সুখ শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সম্রাট আওরঙ্গযেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে মারাঠারা আবার তাহাদের শক্তি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। মারাঠা নায়করা শিবজীর পৌত্র রাজা শাহূর নাম মাত্র আনুগত্য মানিয়া লইয়া দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের হানাদার বাহিনী দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে লুটতরাজ করিয়া ভীষণ উপদ্রবের সৃষ্টি করে এবং চৌথ নামক কর আদায় করে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের মারাঠা নায়ক ও মারাঠাদের অন্যতম খ্যাতনামা সেনাপতি রঘুজী ভোসলা তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিতকে ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ বাংলা আক্রমণ করিতে পাঠান। ইহার পূর্বে বাঙ্গালীরা মারাঠাদের নামও শুনে নাই। উড়িষ্যা সীমান্তের অরণ্য ও ঝাড়খণ্ড জঙ্গলের মধ্য দিয়া ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহার বিরাট বর্গী বাহিনী লইয়া বাংলায় প্রবেশ করেন এবং বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে লুটতরাজ আরম্ভ করেন। আলীবর্দী উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে মারাঠা বর্গীদের লুটতরাজ ও উপদ্রবের সংবাদ পান। এই সময় তাঁহার সহিত অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল। এই সামান্য সৈন্য নিয়া তিনি হুগলী জিলার মুবারক মঞ্জিল হইতে বিরাট হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি বর্ধমানের নিকট ইহাদের সাক্ষাৎ পান (১৫ই এপ্রিল, ১৭৪২)।

ভাস্কর পণ্ডিত আলীবর্দীর মত সেনাপতির সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হন নাই; তিনি মারাঠাদের অভ্যস্ত অনিয়মিত যুদ্ধপদ্ধতি অনুসরণ করেন। ইহাতেও তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই। তিনি নবাবের নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে দশ লক্ষ টাকা দিলে তিনি মারাঠাদেরকে নিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন। আলীবর্দী এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ হওয়ার দরুন এক সময় মারাঠাদের একটি বড় সৈন্যদল আলীবর্দীকে ঘিরিয়া ফেলে। তখন তাঁহার সঙ্গে খুব অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল। নবাব নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন হন।

সুযোগ বুঝিয়া ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহার নিকট এক কোটি টাকা দাবী করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। আলীবর্দী এই অপমানজনক প্রস্তাবে রাযী হন নাই। এই সময় মীর হাবিব ইস্পাহানী নবাবের সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত যোগ দেন। আশ্রয়হীনভাবে অবরুদ্ধ থাকায় খাদ্যের অভাবে নবাব ও তাঁহার সৈন্যরা ভীষণ দুর্দশায় পতিত হয়। এই অবস্থায়ও আলীবর্দী সাহসের সহিত মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবেন এবং ইহাদের মধ্য দিয়া পথ করিয়া তিনি কাটোয়ায় পেঁ ছেন। ভাস্কর পণ্ডিত নিরাশ হইয়া বাংলা ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু মীর হাবিবের প্ররোচনায় তিনি হঠাৎ আক্রমণ করিয়া নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ লুন্ঠন করিবার পরিকল্পনা করেন। তিনি মুর্শিদাবাদে একদল বর্গী সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহারা জগৎশেঠের কুঠি হইতে তিন লক্ষ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য লুন্ঠন করে এবং শহরের উপকন্ঠে লুটতরাজ ও ধ্বংসকার্য করিয়া আলীবর্দী খানের মুর্শিদাবাদ পেঁ ছিবার পূর্বেই ইহাদের কাটোয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে (৭ই মে, ১৭৪২)। বিশ্বাসঘাতক মীর হাবিবের সাহায্যে মারাঠারা হুগলী শহর লুন্ঠন করে ও দখল করে (জুন, ১৭৪২)। শাহরা ও হুগলীর শাসনকর্তা ও মীর হাবিব ইহার দীউয়ান নিযুক্ত হন। গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরের জিলাগুলিতে মারাঠা বর্গীদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ইহাদের উপদ্রবে এই অঞ্চলের লোকের দুর্দশা চরমে পেঁ ছে। অনেকে বাড়ীঘর ছাড়িয়া নদীর অপর তীরে গোদাগারীতে আশ্রয় লয়। এইজন্য গোদা-গারীকে ভাগনগর বলা হইত।

নবাব আলীবর্দী মারাঠাদেরকে বিতাড়িত করার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে অগ্রসর হইয়া কাটোয়ায় মারাঠা শিবির আক্রমণ করেন। ভাস্কর পণ্ডিত মহা ধুমধামের সহিত দুর্গা পূজা করিতেছিলেন। আলীবর্দীর আক্রমণে ভীত হইয়া তিনি কাটোয়া হইতে পলায়ন করেন (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৭৪২)। তাঁহার বর্গী হানাদাররা অন্যান্য স্থান হইতেও পলায়ন করে। ইহারা উড়িষ্যায় যায় এবং শেখ মাসুমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া কটক দখল করে। আলীবর্দী উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হন। তখন ভাস্কর পণ্ডিত ভয় পাইয়া উড়িষ্যা ত্যাগ করেন (ডিসেম্বর, ১৭৪২)। আলীবর্দী তাঁহার আফগান সৈন্যাধ্যক্ষ গোলাম মুস্তফার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রসুল খানকে উড়িষ্যার নায়েব নাযিম নিয়োগ করেন। ইহার পর তিনি মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে দুই দল মারাঠা সৈন্য দুইদিক হইতে বাংলায় প্রবেশ করে। রঘুজী ভোসলার অধীনে বর্গী হানাদাররা লুটতরাজ করিতে আরম্ভ করে। সম্রাটের অনুমতি ক্রমে আর একটি মারাঠা সৈন্যদল পেশোয়া বালাজীরাওয়ের সৈন্যাধ্যক্ষে রঘুজী ভোসলার হানাদার বাহিনী হইতে বাংলাদেশ রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু লুটতরাজের ব্যাপারে এই রক্ষক বাহিনী রঘুজী ভোসলার হানাদারদের পিছনে পড়িয়া থাকে নাই। আলীবর্দী বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার ক্লান্ত সৈন্যদেরকে নিয়া দুই বিরাট মারাঠা সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে বলক্ষয় ব্যতীত আর কোন ফল হইবে না। তিনি পেশোয়া বালাজীরাওয়ের বন্ধুত্ব গ্রহণ করা সমীচিন মনে করেন। নবাব মারাঠাদের রাজা শাহূকে চৌথ দিতে স্বীকার করেন এবং পেশোয়াকে তাঁহার সৈন্যদের খরচের জন্য ২২ লক্ষ টাকা দেন। ইহার বিনিময়ে বালাজীরাও মারাঠা হানাদারদের আক্রমণ হইতে বাংলাদেশ রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করেন। পেশোয়ার সহিত নবাবের এই চুক্তির সংবাদে রঘুজী ভোসলা ভয় পাইয়া যান এবং তাঁহার বর্গী বাহিনী নিয়া পলায়ন করেন (এপ্রিল, ১৭৪৩)। বালাজীরাও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া পরাজিত করেন এবং তাঁহার লুণ্ঠন সামগ্রী হস্তগত করেন।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মারাঠা বর্গীরা তৃতীয় বার বাংলায় হানা দেয়। রঘুজী ভোসলা ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। পেশোয়া রঘুজী ভোসলার সহিত একচুক্তি করিয়া নবাবকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হইতে সরিয়া পড়েন। রঘুজীর বর্গী বাহিনী পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং লুটতরাজ করিতে থাকে। ইহারা সম্মুখ যুদ্ধে আসিত না। এইজন্য ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উপায় ছিল না। আলীবর্দী বুঝিতে পারেন যে, শঠতাই মারাঠাদের নীতি এবং ইহাদের মুকাবিলা করিতে হইলে শঠতা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। তিনি ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট মূল্যবান উপহার ও বন্ধুত্বপূর্ণ বাণী প্রেরণ করেন। তাঁহার বন্ধুত্বে আকৃষ্ট হইয়া ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁহার ২২জন নায়ক সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের জন্য তাঁহার শিবিরে আসেন। এই সময় নবাবের সৈন্যরা ইহাদেরকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। ইহাদের একজন প্রাণ বাঁচাইয়া কাটোয়ার মারাঠা শিবিরে পৌঁছিতে সমর্থ হন। সেনাপতি ও নায়কদের শোচনীয় পরিণতির সংবাদ পাইয়া বর্গী হানাদাররা কালবিলম্ব না করিয়া স্বদেশে পলায়ন করে (৩১শে মার্চ, ১৭৪৪)। নবাব আলীবর্দী

মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁহার সহকারীদেরকে বন্ধুভাবে ডাকিয়া আনিয়া হত্যা করেন। তিনি এইভাবে তাঁহাদেরকে হত্যা করিয়া রাজনৈতিক অপরাধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নীতিজ্ঞানহীন দস্যুদেরকে তাহাদের অস্ত্রেই মুকাবিলা করিয়াছেন। ইহাদের উপদ্রবে প্রজাদের দুর্দশা চরমে পৌছিয়াছিল।

আফগান বিদ্রোহ:

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নবাব আলীবর্দীর আফগান সেনাপতি গোলাম মুস্তফা খান বিদ্রোহী হন। মারাঠারাও এই সুযোগ গ্রহণ করে। গোলাম মুস্তফা সামান্য নায়কের পদ হইতে উন্নতি করিয়া সেনাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। আলীবর্দী তাহাকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাকে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এই পদ মর্যাদার ফলে গোলাম মুস্তফা অহঙ্কারী, উদ্ধত ও উচ্চকাংখী হইয়া উঠেন। তাঁহার অধীনে একটি বড় আফগান সৈন্যদল ছিল। তিনি মনে করিতেন যে, আলীবর্দীর রাজ্যের স্থায়িত্ব তাহার ও আফগান সৈন্যদলের বাহু বলের উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি আলীবর্দীর নিকট বিহারের নায়েব নাযিমের পদ দাবী করেন। নবাব তাহার এই দাবী মিটাইতে পারেন নাই, তিনি তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়া এবং আরও নানাভাবে অনুগৃহীত করেন। কিন্তু উদ্ধত সেনাপতি কিছুতেই তুষ্ট হন নাই। তিনি মসনদ দখল করার আকাঙ্খা করেন এবং আফগান বাহিনী লইয়া নবাবের রাজধানী আক্রমণ করেন। মুর্শিদাবাদ দখল করিতে ব্যর্থ হইয়া তিনি আযিমাবাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও উড়িষ্যার নায়েব নাযিম আবদুর রসুল তাঁহার সহিত যোগ দেন। বিহারের নায়েব নাযিম জৈনুদ্দীন মুস্তফা ও তাঁহার আফগান বাহিনীর আযিমাবাদ আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন এবং ইহাদেরকে বিহার হইতে বিতাড়িত করেন। গোলাম মুস্তাফা মারাঠাদেরকে আমন্ত্রণ করেন। নবাব আলীবর্দীকে আবার মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হয়। এই সুযোগে গোলাম মুস্তাফা আবার আযিমাবাদের দিকে অগ্রসর হন। জৈনুদ্দীন তাঁহাকে ভোজপুরের নিকট এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন (৩০শে জুন, ১৭৪৫)। গোলাম মুস্তাফার পুত্র মুর্তাজা খানের অধীনে আফগানরা পশ্চাদপসরণ করে।

ইতিমধ্যে রঘুজী ভোসলা ২৪০০০ মারাঠা সৈন্য নিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং নবাবের নবনিযুক্ত নায়েব নাযিম দুর্লভরামকে বন্দী করেন। ইহার পর তাঁহার বর্গী বাহিনী মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূমে লুটপাট ও উপদ্রব করিয়া বিহারের দিকে অগ্রসর হয়। ইহারা বিহারে লুটতরাজ করে এবং আফগানদের সহিত যোগ দেয়। মারাঠাদেরকে অনুসরণ করিয়া আলীবর্দী বিহারে আসেন এবং মুহিব-আলীপুর নামক স্থানে ইহাদেরকে পরাজিত করেন (১৪ই নবেম্বর, ১৭৪৫)। মীর হাবিবের মন্ত্রণায় রঘুজী ভোসলা নবাবের অনুপস্থিতিতে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। আলীবর্দীও ত্বরিৎগতিতে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ঠিক সময় মত রাজধানীতে পৌছিতে এবং রঘুজীর দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিতে সমর্থ হন। পলায়মান মারাঠাদের অনুসরণ করিয়া তিনি কাটোয়ার নিকটে ইহাদেরকে আবার পরাজিত করেন এবং ইহাদের দ্রব্যসামগ্রী হস্তগত করেন (ডিসেম্বর, ১৭৪৫)। রঘুজী নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মীর হাবিব মেদিনীপুরের দিকে পলায়ন করেন। ক্লান্ত সৈন্যদের বিশ্রামের জন্য আলীবর্দী মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসেন। কয়েক মাস পর তিনি আবার মারাঠাদের বিরুদ্ধে রওয়ানা হন এবং ইহাদেরকে বাংলা হইতে বিতাড়িত করেন (এপ্রিল, ১৭৪৬)। উড়িষ্যা পুনরুদ্ধারের কার্য তাঁহাকে স্থগিত রাখিতে হয়। কারণ, তাঁহার অন্য দুই আফগান সৈন্যাধ্যক্ষ সমশের খান ও সরদার খানের বিশ্বস্ততায় তিনি সন্দিহান হইয়া পড়েন। মারাঠাদের সহিত তাহারা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, এই সন্দেহে তিনি তাহাদেরকে পদচ্যুত করেন এবং তাহারা তাহাদের নিবাস দ্বারভাঙ্গায় চলিয়া যান। নবাবকে তাঁহার সৈন্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হয়।

এই সময় পেশোয়া সম্রাটের সহিত এক চুক্তি করেন যে, বাংলার জন্য ২৫ লক্ষ ও বিহারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা চৌথ রূপে রাজা শাহূকে দেওয়া হইলে তিনি ইহার বিনিময়ে এই প্রদেশ দুইটি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। পেশোয়ার পূর্বের অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া নবাব আলীবর্দী সম্রাটকে জানান যে, মারাঠাদের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই এবং তিনি তাঁহার ভূভাগ রক্ষার জন্য নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন (অক্টোবর, ১৭৪৬)। তিনি মীরজাফরকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (নভেম্বর ১৭৪৬)। মীর জাফর মেদিনীপুরে কিছুটা সাফল্য লাভ করেন, কিন্তু যখন মীর হাবিব ও রঘুজীর পুত্র জানুজীর মিলিত

বাহিনী উড়িষ্যা হইতে অগ্রসর হয় তখন তিনি পলায়ন করেন ও বর্ধমানে আশ্রয় লন। আলীবর্দী আতাউল্লাহ খানকে মীরজাফরের সাহায্যে পাঠান। কিন্তু তাঁহারা মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া আলীবর্দী খানকে হত্যা করিতে এবং তাঁহার রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। নবাব স্বয়ং মারাঠাদের বিরুদ্ধে রওয়ানা হন। মীর জাফর অনুতপ্ত না হইয়া নবাবের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। আলীবর্দী মীরজাফর ও আতাউল্লাহ খানকে পদচ্যুত করেন। ইহার পর বৃদ্ধ নবাব নিজে মারাঠাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং জানুজীকে বর্ধমানের নিকট এক যুদ্ধে পরাজিত করেন (মার্চ, ১৭৪৭)। মারাঠারা মেদিনীপুরে আশ্রয় লয়।

যখন আলীবর্দী মারাঠাদের বিরুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন তখন বিহারে এক সঙ্কট দেখা দেয়। বিহারের নায়েব নাযিম জৈনুদ্দীন সৈন্য বৃদ্ধির জন্য পদচ্যুত আফগান সৈন্যাধ্যক্ষ সমশের খান ও সরদার খানকে স্বীয় সৈন্যদলে গ্রহণ করেন। তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া একদিন জৈনুদ্দীন ও তাঁহার পিতা হাজী আহমদকে হত্যা করেন এবং তাঁহার স্ত্রী আমেনা বেগম ও সন্তানদেরকে বন্দী করেন (২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৮)। এই মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ পাইয়া আলীবর্দী বিহার অভিমুখে যাত্রা করেন। মীর হাবিবের অধীনস্থ মারাঠা সৈন্যরা বিদ্রোহী আফগানদের সহিত যোগ দিতে অগ্রসর হইতেছিল। ভাগলপুরের নিকট এক যুদ্ধে নবাব ইহাদেরকে পরাজিত করেন। ইহার পর পাটনার ২৬ মাইল দূরে কালা দিয়ারা নামক স্থানে এক যুদ্ধে তিনি মারাঠা ও আফগানদের মিলিত বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া কন্যা আমেনা ও তাঁহার সন্তানদেরকে মুক্ত করেন এবং বিহার পুনরুদ্ধার করেন (১৬ই এপ্রিল, ১৭৪৮)। নবাব তাঁহার বেগম শরফুন্নেসার পরামর্শে জৈনুদ্দীনের পুত্র ও তাহাদের প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বিহারের নায়েব নাযিম মনোনীত করেন এবং রাজা জানকীরামকে বিহারে সিরাজের নায়েব নিয়োগ করেন।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পূর্ণিয়ার ফৌজদার সাইফ খান মারা যান। নবাব আলীবর্দী সম্রাটের নিকট হইতে ইহার শাসনভার লাভ করেন। পূর্ণিয়া আলীবর্দীর রাজ্যভুক্ত হয়।

নবাব আলীবর্দী উড়িষ্যা হইতে মারাঠাদেরকে বিতাড়নের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি মেদিনীপুর হইতে জঙ্গলাকীর্ণ পথে মীর হাবিব ও মারাঠা-

দেরকে অনুসরণ করিয়া উড়িষ্যায় উপস্থিত হন এবং ইহার রাজধানী কটক ও অন্যান্য স্থান পুনরুদ্ধার করেন (মে, ১৭৪৯)। তিনি আবদুস সালাম নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে উড়িষ্যার নায়েব নাযিম নিয়োগ করেন এবং মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার কিছু দিন পর মীর হাবিব মারাঠাদেরকে লইয়া উড়িষ্যা আক্রমন করেন এবং ইহা পুনরধিকার করিয়া বাংলায় হানা দিতে আরম্ভ করেন। আবার আলীবর্দী খানকে ইহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। সিরাজউদ্দৌলা এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। মারাঠা বর্গীদেরকে প্রতিহত করার জন্য নবাব মেদিনীপুরে কয়েকটি সামরিক ঘাটি নির্মাণ করেন। এই সময় প্রধান বখশী মীর জাফরের হিসাব-নিকাশে নানা রকমের দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ পায়। আলীবর্দী মীর জাফরকে ভর্ৎসনা করেন এবং মীর জাফরের ভ্রাতা মির্যা ইসমাইলের স্থলে খাজা আবদুল হাদীকে সহকারী বখশী নিয়োগ করেন।

এই সময় আর একটি ঘটনার দরুন নবাবকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান স্থগিত রাখিতে হয়। নবাবের প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার পিতার পুরাতন কর্মচারী মেহদী নিসার খানের কুমন্ত্রণায় মাতামহের স্নেহের প্রতি সন্দিহান হইয়া পড়েন এবং আযিমাবাদে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন। আলীবর্দী সিরাজের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হন। মীরজাফর ও দুর্লভরামের উপর মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানের ভার দিয়া তিনি মেদিনীপুর হইতে মুর্শিদাবাদ আসেন এবং বিহার রওয়ানা হন। সিরাজউদ্দৌলা রাজা জানকীরামের নিকট হইতে আযিমাবাদ অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। যখন নবাব আযিমাবাদের নিকটে পৌঁছেন তখন স্নেহময় মাতামহের সহিত দৌহিত্রের চিত্তাকর্ষক পুনর্মিলন হয় (জুন, ১৭৫০)। আযিমাবাদ হইতে ফিরিবার পথে বৃদ্ধ নবাব সাং-ঘাতিক রূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি হাকিম তাজুদ্দীন ও হাকিম হাদী আলী খানের চিকিৎসায় নিরাময় হন, কিন্তু তাঁহার শারীরিক দুর্বলতা থাকিয়া যায়। মীর জাফর ও দুর্লভ রাম মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কালক্ষেপ করিতেছিলেন।

শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও বৃদ্ধ নবাব মারাঠাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনে মারাঠা বর্গীরা পালাইতে থাকে। তিনি ইহাদেরকে মেহেদীপুর, বর্ধমান ও বীরভুম হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার পর তিনি কিছুদিন কাটোয়ায় অবস্থান করেন (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫১)। এই সময়

রঘুজী ভোসলা আলীবর্দীর সহিত শান্তি স্থাপন করিতে উদ্‌গ্রীব হন। দশ বৎসর বাংলায় হানা দিয়া মারাঠারা দুর্ভোগ ব্যতীত বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারে নাই। নবাবের সেনাপতিত্ব ও ক্ষিপ্রতার দরুন ইহাদের লুন্ঠন অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে। রঘুজী ভোসলা ও মীর হাবিব মীর জাফরের মধ্যস্থতায় সন্ধি প্রস্তাব করেন। নিজের বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতা, সৈন্যদের ক্লান্তি ও সেনাপতিদের পরিশ্রম বিমুখতার কথা বিবেচনা করিয়া এবং বিশেষতঃ মারাঠা দস্যুদের হইতে বাংলার লোকের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নবাব আলীবর্দী রঘুজীর সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হন। কয়েকদিন আলাপ আলোচনার পর তাঁহাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (মে, ১৭৫১)। (১) এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মীর হাবিব আলীবর্দীর নায়েবরূপে উড়িষ্যা শাসন করিবেন এবং ইহার উদ্বৃত্ত রাজস্ব হইতে রঘুজীর সৈন্যদেরকে বেতন দিবেন। (২) বাংলার জন্য নবাব রঘুজীকে বার্ষিক বারলক্ষ টাকা চৌথ দিবেন। (৩) রঘুজী নবাবের রাজ্য আক্রমণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। জালেশ্বরের নিকট সুবর্ণরেখা নদী বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত নির্দিষ্ট হয়। ইহার ফলে দক্ষিণ মেদিনী-পুর উড়িষ্যার সহিত যুক্ত হয়। এই চুক্তির পর মারাঠারা আর বাংলায় হানা দেয় নাই।

এক বৎসর পর জানুজীর সৈন্যরা মীর হাবিবকে হত্যা করে (২৪শে আগষ্ট, ১৭৫২)। মুসালেহউদ্দীন মুহম্মদ খান নামক রঘুজীর এক সভাসদকে উড়িষ্যার শাসনভার দেওয়া হয়। ইহার ফলে উড়িষ্যার উপর কার্যতঃ বাংলার নবাবের কর্তৃত্ব লোপ পায়। নামমাত্র উড়িষ্যা বাংলার অধীন থাকে; প্রকৃতপক্ষে ইহা মারাঠাদের নাগপুর রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

মারাঠাদের সহিত শান্তি স্থাপনের পর নবাব আলীবর্দী প্রজাদের সুখ স্বচ্ছন্দ বিধানের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্গীদের হানা ও লুটতরাজের দরুন পশ্চিম বাংলার প্রজাদের জানমালের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবনতি হইয়াছিল। আলীবর্দীর ব্যবস্থা ও উৎসাহে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হয় এবং বাংলা আবার ঐশ্বর্য-শালী হইয়া উঠে। বৃদ্ধ নবাব বেশীদিন বাংলার শান্তি ও ঐশ্বর্য উপভোগ করিতে পারেন নাই। মারাঠা হানাদার ও আফগান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন বিরামহীন সংগ্রামের দরুন তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

তদুপরি তাঁহার পরিবারের কয়েকজনের অকাল ও শোচনীয় মৃত্যুতে তিনি হৃদয়ে মর্মান্তিক আঘাত পান। হাজী আহমদ, জৈনুদ্দীন, নওয়াজিশ মুহম্মদ খান ও দৌহিত্র ইকবামুদ্দীনের মৃত্যুতে তিনি খুবই শোকাভিভূত হন। আলীবর্দী হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল মারা যান।

আলীবর্দী ও ইংরেজ বণিক:

নবাব আলীবর্দীর শাসনকালে য়ুরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। পূর্বে ইংরেজ বণিকদের মাত্র ৪ হইতে ৫টি জাহাজে বাণিজ্য চলিত। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহারা বাংলার বাণিজ্যে ৪০ হইতে ৫০টি জাহাজ ব্যবহার করে। ইংরেজ বণিকরা সময় সময় শুল্ক ফাঁকি দিত এবং বাণিজ্য প্রতিযোগিতা হইতে অন্য বণিকদেরকে সরাইয়া দিবার জন্য বল প্রয়োগ করিত। এরূপও সন্দেহ করা হইত যে, ইহারা মারাঠাদেরকে সাহায্য করিয়াছে। যদিও ইহাদের বাণিজ্যে উন্নতি হয়, তবুও ইহারা মারাঠা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য নবাবকে অর্থ সাহায্য করিতে গড়িমসি করে। অবশেষে জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় ইহারা ৪ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য করে। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকরা বাংলার আর্মেনিয়ান ও মুগল বণিকদের কয়েকটি জাহাজ আটক করিয়া রাখে। আর্মেনিয়ান ও মুগল বণিকরা নবাবের শরণাপন্ন হয়। ইহাদের জাহাজ ছাড়িয়া দিবার জন্য নবাব কলিকাতার গবর্ণর বারওয়েলের নিকট পরওয়ানা পাঠান। ইহা অমান্য করায় নবাব ইংরেজদের বাণিজ্য সুবিধা বন্ধ করিয়া দেন। উপায় না দেখিয়া ইহারা আর্মেনিয়ান ও মুগল-দের জাহাজগুলি ছাড়িয়া দেয় এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাযার টাকা ক্ষতি-পূরণ দিতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা বাণিজ্য সুবিধা ফিরিয়া পায়।

সকল বণিকদের প্রতি আলীবর্দী ন্যায় নীতি অনুসরণ করেন। তিনি বিধিবদ্ধ শুল্ক ছাড়া বণিকদের নিকট হইতে অতিরিক্ত কিছু আদায় করিতেন না। কেবল মারাঠা যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য তিনি সকল বণিকদের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে বাধ্য হন। ইহাতে বাণিজ্যের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয় এবং বণিকরা তাহাদের লাভজনক ব্যবসা বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দী এক পরওয়ানা জারী করিয়া ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদেরকে তাঁহার রাজ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে

এবং তাহাদের উপনিবেশে দুর্গ নির্মাণ করিতে নিষেধ করেন। তিনি প্রায়ই ইহাদের প্রতিনিধিদেরকে বলিতেন, "আপনারা বণিক, আপনাদের দুর্গ নির্মাণের কি প্রয়োজন? আমি আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বহন করিতেছি; আপনাদের কোন শত্রু ভয় থাকিতে পারে না।" এইভাবে নবাব আলীবর্দী যেমন একদিকে য়ুরোপীয় বণিকদেরকে বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়াছেন, তেমন অন্যদিকে ইহাদের উপর নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছেন।

আলীবর্দীর কৃতিত্ব ও চরিত্র :

নবাব আলীবর্দী শাসক হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী ও আফগানদের বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যের ঐক্য ও আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখেন। তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর দুর্ধর্ষ মারাঠা হানাদারদের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করিয়া ইহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেন এবং বাংলার লোকের ধন-প্রাণ রক্ষা করেন। বহু অসুবিধা সত্ত্বেও নবাব আলীবর্দী আপোষবিহীন মনোভাব নিয়া পঙ্গপালের মত বিরাট বর্গী বাহিনীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণের মুকাবিলা করেন। তাঁহার রণনৈপুণ্যে বার বার বিপর্যস্ত হইয়া শত্রুরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং তাঁহার সেনাপতিত্বের নিকট নতি স্বীকার করিয়া সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

আলীবর্দী শান্তিপ্রিয় ও প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। গোলাম হোসেন তাবাতাবাই লিখিয়াছেন যে, প্রজাদের শান্তি ও কল্যাণ নবাব আলীবর্দীর কাম্য ছিল এবং তাঁহার শাসনকালে প্রজারা এরূপ সুখ শান্তিতে ছিল যে, যেন তাহারা পিতা বা মাতার ক্রোড়ে শায়িত আছে। জমিদাররা যাহাতে প্রজাদের উপর উৎপীড়ন না করিতে পারে সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। নবাব আলীবর্দী মুর্শিদ কুলী ও সুজাউদ্দীনের রাজস্ব ব্যবস্থা বজায় রাখেন এবং জমিদারদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। রাজস্বের হার পরিমিত হওয়ায় জমিদাররা কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা করিতে উৎসাহিত হয়। তাঁহার সময়ে জমিদাররা নবাবের অনুগত ছিলেন। মারাঠা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহারা আলীবর্দীকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

নবাব আলীবর্দী হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি অনুসরণ করেন। বাংলার শাসকরূপে ইহার উন্নতির জন্য তিনি জাতীয় নীতি অবলম্বন করেন এবং ধর্মনির্বিশেষে বাঙ্গালীর গুণ ও প্রতিভার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই নীতির ফলে হিন্দুরা শাসনকার্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিতে এবং জমিদারী

ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে সুযোগ পায়। মুর্শিদ কুলীর রাজস্ব ব্যবস্থায় অনেকগুলি হিন্দু জমিদারীর উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। আলীবর্দীর আমলে ইহাদের আরও সমৃদ্ধি হয়। ইহার ফলে বাংলায় নাটোর, নদীয়া, বর্ধমান, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের হিন্দু জমি-দারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আলীবর্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ, কলিকাতার উমিচাঁদ এবং আরও অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন। নবাব আলীবর্দী অনেক হিন্দুকে শাসনকার্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। রবার্ট ওর্ম লিখিয়াছেন যে, নবাব আলী-বর্দী হিন্দুদেরকে শাসনকার্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিতেন এবং ইহার ফলে শাসনকার্যে ইহাদের অভূতপূর্ব প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়। বস্তুতঃ রাজস্ব শাসনের কয়েকটি প্রধানপদ ব্যতীত রাজস্ব বিভাগের চাকুরী হিন্দুদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। চিন রায়, বীরুদত্ত, রাজা কিরাৎচাঁদ ও উমেদরায় আলীবর্দীর দীউয়ান ছিলেন। সহকারী দীউয়ানের পদেও হিন্দু ছিলেন। জানকীরাম ও রামনারায়ণ যথাক্রমে বিহারের নায়েব নাযিম ও দীউয়ান নিযুক্ত হন। জগৎশেঠ আলীবর্দীর বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ছিলেন। গোকুল-চাঁদ জাহাঙ্গীরনগরের দীউয়ান ছিলেন। তাঁহার পরে রাজা রাজবল্লভ দীউয়ান নিযুক্ত হন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি নায়েব নাযিমের পদেও উন্নীত হন। আরও অনেক হিন্দু বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। ইহার ফলে আলীবর্দীর শাসনকালে হিন্দুরা সর্বক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠে।

সমসাময়িক ইতিহাস লেখকরা ও য়ুরোপীয় বণিকরা নবাব আলীবর্দীর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ধর্মনিষ্ঠা ও সদাশয়তার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন তাবাতাবাই লিখিয়া-ছেন, "আলীবর্দী যৌবনকাল হইতে পবিত্র ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি জীবনে মদ্য স্পর্শ করেন নাই এবং এক স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ইবাদৎ ও ধর্মকর্ম করিয়া এবং পবিত্র কুরআন ও ইতিহাস পাঠ করিয়া সময় কাটাইতেন।" রবার্ট ওর্ম লিখিয়াছেন যে, আলীবর্দী খুব মিতাচারী ছিলেন; তাঁহার আরাম-আয়েশ ও হেরেম বলিতে কিছু ছিল না এবং তিনি এক স্ত্রী নিয়াই সুখী ছিলেন। আলীবর্দীর দৈনন্দিন কর্মসূচী হইতে তাঁহার সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের আভাস পাওয়া যায়। তিনি সূর্যোদয়ের দুই ঘন্টা পূর্বে ঘুম হইতে উঠিতেন এবং নামায আদায়

করিতেন। ইহার পর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়া তিনি কফি পান করিতেন। তিনি সকাল সাতটার সময় দরবারে বসিতেন এবং শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি সামরিক ও বেসামরিক প্রধানদেরকে সাক্ষাৎ দিতেন এবং তাঁহাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। নয়টা হইতে দুই ঘন্টা নবাব তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ, ভ্রাতুষ্পুত্র ও বন্ধুদেরকে নিয়া কবিতা, গল্প ইত্যাদি শুনিতেন ও আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি ভোজন-প্রিয় ছিলেন এবং সময় সময় নূতন রকমের খাদ্য তৈরীর নির্দেশ দিতেন ও নিজে ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি অনেক অতিথি নিয়া আহার করিতে ভালবাসিতেন। আহারের পর তিনি গল্প শুনিতে শুনিতে সামান্য নিদ্রা যাইতেন। আলীবর্দী যথাসময়ে মধ্যাহ্নের নামায পড়িতেন, কুরআন শরীফ পাঠ করিতেন এবং অপরাহ্নের নামায আদায় করিতেন। ইহার পর তিনি এক পেয়ালা ঠাণ্ডা পানি পান করিতেন এবং আলেম ও ধার্মিক লোকদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। বিকালে দুই ঘন্টা তিনি শাসন ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন। সন্ধ্যা ও রাত্রির নামায সমাপ্ত করিয়া তিনি তাঁহার বেগম ও পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া ফল ও মিষ্টি খাইতেন। রাত্রে তিনি সামান্য নিদ্রা যাইতেন এবং রাত্রের মধ্যে কয়েকবার জাগিতেন।

নবাব আলীবর্দী খুব স্নেহ-প্রবণ লোক ছিলেন। স্ত্রী শরফুন্নেসার প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা ছিল। দৌহিত্র সিরাজের প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা ছিল না। কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ-ভালবাসা ছিল। বন্ধু-বান্ধব ও তাঁহাদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম মমতা ছিল। শত্রুদের প্রতিও তিনি মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সমশের খান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জৈনুদ্দীনকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং আমেনা বেগম ও তাঁহার সন্তানদেরকে বন্দী করিয়া-ছিলেন। আলীবর্দী বিদ্রোহী সমশের খান ও অন্যান্য আফগান সরদার-দেরকে পরাজিত ও নিহত করেন। তিনি তাঁহাদের পরিবার-পরিজনদের সহিত খুব উদার ও সদয় ব্যবহার করেন; তিনি নবাবের প্রাসাদে ইহাদের থাকার ব্যবস্থা করেন এবং ইহাদের সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দের বন্দোবস্ত করেন। নবাব নিজে সমশের খানের কন্যার বিবাহ দেন এবং খুব ধুম-ধামের সহিত ইহা সম্পন্ন করেন। ইহাদের বসবাস ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি দ্বারভাঙ্গায় কয়েকটি গ্রাম দান করেন। পরম শত্রুর পরিবারের

প্রতি এরূপ মহানুভবতার নযীর খুব কমই পাওয়া যায়। এইজন্য গোলাম হোসেন তাবাতাবাই তাঁহাকে 'মহৎ-প্রাণ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। মীর হাবিব বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নবাবের সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া মারাঠা-দের সহিত যোগ দেন এবং ইহাদের লুন্ঠনকার্যে সাহায্য করেন। তাঁহার স্ত্রী-পরিবার মুর্শিদাবাদে ছিলেন। নবাব তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কয়েক বৎসর তিনি তাঁহাদেরকে বিশ্বাসী লোকের তত্ত্বাবধানে মীর হাবিবের নিকট পাঠাইয়া দেন।

নবাব আলীবর্দী জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাযিম নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের নায়েব হোসেন কুলী খানকে পদচ্যুত করেন। পরে তাঁহাকে সিরাজউদ্দৌলার আদেশে হত্যা করা হয়। হোসেন কুলীর হত্যার সঠিক কারণ জানা যায় না।

নবাব আলীবর্দী শিক্ষিত ছিলেন। শিক্ষার প্রতি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁহাদের সমাদর করিতেন ও পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার আমলে বাংলায় ফার্সী সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। গোলাম হোসেন তাবাতাবাই লিখিয়াছেন যে, নবাব আলীবর্দী প্রতিদিন দুই ঘন্টা আলেমদের সহিত জ্ঞানালোচনায় কাটাইতেন। মুহম্মদ আলী ফাযিল, হাকিম হাদী আলী খান, নকী কুলী খান, মির্যা হোসেন সেসেবী এবং আরও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই আলোচনায় যোগ দিতেন। মুহম্মদ আলী ফাযিল ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হাকিম হাদী আলী খান চিকিৎসা শাস্ত্রে খুব খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সে যুগের গ্যালেন ও প্লেটো বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছিল। হাকিম তাজুদ্দীন মুর্শিদাবাদের আর একজন বড় চিকিৎসা বিশারদ ছিলেন। কাযী গোলাম মুজাফফর, মুহম্মদ হাযিন, শাহ মুহম্মদ হাসান, আবুল কাসিম ও সৈয়দ মুহম্মদ আলী আলীবর্দীর আমলের খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। ইতিহাস-লেখক য়ূসুফ আলী নবাব আলীবর্দীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া-ছেন। বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীণ' রচয়িতা গোলাম হোসেন তাবাতাবাই ও নবাব আলীবর্দীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন।

আলীবর্দীর সময়ে ফার্সী সাহিত্যের ভাবধারা এবং পারসিক সংস্কৃতি ও আদব-কায়দা বাংলায় বিস্তার লাভ করে। বাঙ্গালী সমাজে পারসিক রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব পড়ে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ফার্সী সাহিত্যের দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত ও সমৃদ্ধ হয়। বাংলা

সাহিত্যের মুসলমান লেখকরা ফার্সী সাহিত্যের ভাবধারা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন। হিন্দু গ্রন্থকাররাও ফার্সী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও রামপ্রসাদের রচিত গ্রন্থে এই প্রভাব দেখা যায়।

নবাব আলীবর্দী অনেক কৃতিত্বপূর্ণ কার্য করিয়াছেন। তাঁহার সুশাসনে বাংলা ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর জন্য তিনি বাংলার শাসকদের মধ্যে উচচ আসন পাইবার যোগ্য। কিন্তু তিনি কয়েকটি রাজনৈতিক ভুল করেন এবং এইজন্য তাঁহার উত্তরাধিকারী সিরাজকে খুব অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। তিনি মীরজাফরের মত অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতককে প্রধান সেনাপতি ও বখশীর পদে বহাল রাখিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে মীরজাফর একবার পদচ্যুৎ হন। এক বৎসর পর নবাব আলীবর্দী আবার তাঁহাকে পুনর্নিয়োগ করেন। মীরজাফর আবার দুর্নীতির দায়ে ধরা পড়েন। আলীবর্দী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ছাড়িয়া দেন। এরূপ বিশ্বাসঘাতক ও দুর্নীতিপরায়ণ লোককে দায়িত্বপূর্ণ পদে রাখিয়া নবাব আলীবর্দী অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, নবাব আলীবর্দী জানিতেন যে, কোন কারণবশতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম সিরাজউদ্দৌলাকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতেন। আলীবর্দী যদি চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে ঘসেটির মন হইতে ভাগিনেয়ের প্রতি বিদ্বেষ দূর করিতে পারিতেন। যদি ইহা করা হইত, তাহা হইলে ঘসেটি বেগম নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে মীরজাফরকে সাহায্য করিতেন না। তৃতীয়তঃ, জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাযিম ও দীউয়ান রাজবল্লভ রাজকোষের বহু অর্থ আত্মসাৎ করেন। নবাব আলীবর্দী তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বিলম্ব করেন এবং পরে অসুস্থ হইয়া পড়েন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ এই বিপুল অর্থসহ কলিকাতায় পলায়ন করেন এবং ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইংরেজ বণিকরা কয়েকবার নবাব আলীবর্দীর অবাধ্য হয়। প্রতিবারই পরে ইহারা নবাবের আদেশ ও নির্দেশ মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতে ইংরেজ বণিকরা নবাবের বিপদ ঘটাইতে পারে। সেজন্য তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজরা শক্তিশালী নৌবহরের অধিকারী এবং ইহাদেরকে আয়ত্বে রাখিতে হইলে নৌবহরের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তিনি সেরূপ নৌবহর প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন নাই। নৌবহর না থাকায় তাঁহার উত্তরাধিকারী ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষে সুবিধা করিতে পারেন নাই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজউদ্দৌলা ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসর তাঁহার মাতামহ আলীবর্দী খান বিহারের নায়েব নাযিম নিযুক্ত হন। ইহার কিছুদিন পূর্বে সিরাজের জন্ম হয়। এইজন্য তাঁহার মাতামহ ও মাতামহী তাঁহাকে সৌভাগ্যের সন্তান বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহারা সিরাজকে পুত্রবৎ লালন-পালন করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে সিরাজের পিতা ও বিহারের নায়েব নাযিম জৈনুদ্দিন আফগান বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারান। নবাব আলীবর্দী বিদ্রোহীদেরকে দমন করেন। এই সময় তিনি তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজকে বিহারের নায়েব নাযিম মনোনীত করেন এবং বিহারের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাজা জানকীরামকে সিরাজের নায়েব নিয়োগ করেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার মাতামহের সহিত মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতার পুরাতন কর্মচারী মেহদী নিসার খানের কুমন্ত্রণায় মাতামহের স্নেহে সন্দিহান হইয়া আযিমাবাদ (পাটনা) দখলের জন্য মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন; কিন্তু জানকীরামের প্রতি-রোধের দরুন তিনি নগরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। তাঁহার নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আলীবর্দী খান বিহারে যান এবং পাটনার নিকটে স্নেহময় মাতামহের সহিত সিরাজের পুনর্মিলন হয়। মৃত্যুর পূর্বে নবাব আলীবর্দী সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

মাতামহের মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স প্রায় ২২ বৎসর। নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী যুবক ছিলেন। রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি যথেষ্ট সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি খুব সরল-চিত্তের লোক ছিলেন এবং অকপটে সকলকে বিশ্বাস করিতেন। শাসক হিসাবে ইহা তাঁহার দুর্বলতা ছিল, কারণ শত্রুরা ইহার সুযোগ নিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। মসনদে আরোহণের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিজের বিশ্বস্ত কর্মচারীদেরকে

দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। তিনি তাঁহার পারিবারিক দীউয়ান মোহনলালকে সচিব পদে উন্নীত করেন এবং তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর সর্ব ক্ষমতা ও মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। মোহনলাল কাশ্মীরের হিন্দু ছিলেন। তিনি খুব বিশ্বস্ততার সহিত নবাব সিরাজউদ্দৌলার দায়িত্ব পালন করেন। সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালের পিতৃব্য জানকীরামকে দীউয়ান নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে 'রায় রায়ান' উপাধিতে ভূষিত করেন। নবাবের অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর মীরমদনকে বখশী পদে নিয়োগ করা হয়।

নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনারোহণের সময় হইতে অনেকের শত্রুতা ও নানা রকমের সমস্যার মুকাবিলা করিতে হয়। তাঁহার খালা ঘসেটি বেগম তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তিনি সিরাজের সিংহাসনারোহণের বিরোধিতা করেন এবং সিরাজের অন্যতম খালাত ভাই শওকত জঙ্গকে* মসনদে বসাইবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। সিরাজের সিংহাসনে বসার পরেও ঘসেটি বেগম তাঁহার বিপুল সম্পদ ও প্রতিপত্তি নূতন নবাবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। নবাবের প্রধান সেনাপতি ও বখশী মীরজাফরের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। মীরজাফরের নিজের উচ্চাকাঙ্খা ছিল। তিনি গোপনে শওকত জঙ্গের পক্ষে কাজ করিতেন এবং ঘসেটি বেগম তাঁহাকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের সমর্থনে উৎসাহিত হইয়া শওকত জঙ্গ সিরাজউদ্দৌলাকে নবাব বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন এবং মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকারের জন্য প্রস্তুত হন। জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাযিম ও দীউয়ানের পদে ঘষেটি বেগমের নায়েব রাজবল্লভ বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করায় নবাব আলীবর্দী তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করিয়া রাখেন। বৃদ্ধ নবাব যখন সাংঘাতিক অসুখে পড়েন তখন ঘসেটি বেগমের প্রভাবে রাজবল্লভ মুক্তি লাভ করেন। নবাব জানিতে পারেন যে, ঘসেটি বেগম তাঁহার ধনরত্ন তাঁহার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির কাজে নিযোগ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদ অবরোধ করিয়া ধনরত্নসহ তাহাকে নবাবের প্রাসাদে লইয়া আসেন। ইহার পর নবাব শওকত জঙ্গকে দমনের জন্য পূর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি রাজমহল পেঁৗছিলে শওকত জঙ্গ ভয় পাইয়া যান এবং নবাবের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন (২২ মে, ১৭৫৬)। এই সময়

*শওকত জঙ্গ সৈয়দ আহমদের পুত্র ও পূর্ণিয়ার ফৌজদার ছিলেন।

ইংরেজ বণিকদের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হওয়ায় নবাব রাজমহল হইতে মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া আসেন।

ইংরেজদের সহিত বিবাদঃ

ইংরেজ বণিকরা নবাব আলীবর্দীর সময়ে কয়েক বার অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রতাপে ভীত হইয়া ইহারা তাঁহার আদেশ ও নির্দেশ মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। নূতন নবাবের প্রতি ইহাদের আচরণে অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অন্যান্য য়ূরোপীয় বণিকরা সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনারোহন উপলক্ষে তাঁহাকে উপহার—উপঢৌকন সহ অভিনন্দন জ্ঞাপন করে; কিন্তু ইংরেজ বণিকরা তাহা করে নাই। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাবের অবাধ্য ও অপরাধী কর্মচারীদেরকে আশ্রয় দেন। জাহাঙ্গীরনগরের দীউয়ান রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ নবাবের রাজস্বের বহু অর্থ লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করেন এবং ইংরেজদের আশ্রয় লন। কৃষ্ণবল্লভের বিচারের জন্য তাঁহাকে নবাবের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার গভর্ণর ড্রেককে নির্দেশ দেন। ড্রেক নবাবের আদেশ অমান্য করেন এবং নবাবের দূত নারায়ণ দাসকে কলিকাতা হইতে বাহির করিয়া দেন। তৃতীয়তঃ কোম্পানীর কর্মচারীরা বেআইনী ভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসা করিতেন এবং কোম্পানীর দস্তকের অপব্যবহার করিয়া বাণিজ্য কর ফাঁকি দিতেন। শুধু কোম্পানীর বণিকদেরকেই বাণিজ্যকর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহারা গভর্ণরের দস্তক দেখাইলে তাহাদের নিকট বাণিজ্য কর দাবী করা হইত না। কোম্পানীর গভর্ণর দুর্নীতি করিয়া কর্মচারীদেরকে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য দস্তক দিতেন। এইভাবে শুল্ক ফাঁকি দেওয়ায় নবাবের রাজকোষের খুব ক্ষতি হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ড্রেককে দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করিতে নির্দেশ দেন; কিন্তু ইংরেজ গভর্ণর ইহা উপেক্ষা করেন। চতুর্থতঃ, নবাব আলীবর্দী য়ূরোপীয় বণিকদেরকে তাঁহার রাজ্যে দুর্গ নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ১৭৫৬খৃষ্টাব্দে য়ূরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ (সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ) বাধিবার উপক্রম হয়। ইহার প্রভাব এদেশের ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের উপর আসিয়া পড়ে। ইংরেজরা কলিকাতায় এবং ফরাসীরা চন্দননগরে নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইহাদেরকে দুর্গ নির্মাণের কাজ বন্ধ করিতে আদেশ দেন।

ফরাসী বণিকরা তাঁহার আদেশ মানিয়া লয়। কলিকাতার গভর্ণর ড্রেক নবাবের আদেশ অমান্য করেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নূতনভাবে নির্মাণ করিয়া ইহা দুর্ভেদ্য করিয়া তোলেন।

ইংরেজ বণিকদের অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইহাদেরকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন নবাব ইহাদের কাসিমবাজার বাণিজ্য কুঠি অধিকার করেন এবং ইহার পর কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। ইংরেজরা নবাবের সৈন্যদেরকে বাধা দিতে অসমর্থ হয়। ড্রেক তাঁহার পরিষদের সদস্য ও অন্যান্য ইংরেজদেরকে নিয়া জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব কলিকাতা দখল করেন (২০শে জুন)। কুক লিখিয়াছেন যে, কলিকাতা জয়ের পর নবাব ইংরেজদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। ড্রেকের হিসাব অনুসারে, নবাব ৩৯ জন ইংরেজ বন্দীকে ১৮ ফুট লম্বা ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত একটি কামরায় আটক করিয়া রাখেন। বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন আহত সৈন্য ছিল। ইহাদের ১৬ জন রাত্রে মারা যায়। হলওয়েল এই ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়াছেন যে, কামরায় ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দী রাখা হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ২৩ জন ব্যতীত আর সকলেই দম বন্ধ হইয়া মারা যায়। ইংরেজদেরকে নবাবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য তিনি এই ঘটনাকে 'অন্ধকূপ হত্যা' (**Blackhole Tragedy**) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। নিরপেক্ষ ইংরেজ লেখকরা হলওয়েলের বর্ণনাকে একটি মস্ত বড় ধাপ্পা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা সৈন্যাধ্যক্ষ মাণিকচাঁদের উপর কলিকাতার ভার অর্পণ করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শওকত জঙ্গকে দমনের উদ্দেশ্যে পূর্ণিয়া যাত্রা করেন। মণিহারী নামক স্থানে এক যুদ্ধে নবাব তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (১০ই অক্টোবর, ১৭৫৬)। শওকত জঙ্গের মৃত্যুতে নবাবের একটি বড় বিপদ দূর হয়।

কলিকাতা পতনের পর যদি উমিচাঁদ, নবকিষেণ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, মাণিকচাঁদ প্রভৃতি হিন্দুপ্রধানরা ড্রেক ও তাহার লোকদেরকে সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে ইংরেজদের জন্য আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীরা ইংরেজদেরকে ফুলতায় আশ্রয় দেন এবং ইহাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেন। নবাবের সন্দেহ

দূর করার উদ্দেশ্যে ইহারা বাণিজ্য সুবিধা ফিরিয়া পাইবার জন্য নবাবের নিকট আবেদন করিতে থাকে। জগৎশেঠ ও অন্যান্যরা ইহাদের আবেদন গ্রহণের জন্য নবাবকে পরামর্শ দেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ কোম্পানীর মাদ্রাজ পরিষদ কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য রবার্ট ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে একদল সৈন্য ও নৌবহর পাঠান। ক্লাইভ কর্ণাটকে ফরাসী বণিকদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং সে অঞ্চলে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইংরেজ নৌবহর ১৪ই ডিসেম্বর (১৭৫৬) ভাগীরথী নদীতে প্রবেশ করে এবং বিনা বাধায় ফুলতায় পৌঁছে। নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ মাণিকচাঁদ ইংরেজদেরকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন নাই। ক্লাইভের সহিত তাঁহার যে পত্রের আদান-প্রদান হয় তাহা হইতে জানা যায় যে, মাণিকচাঁদ নিজেকে ইংরেজদের বন্ধু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাদেরকে ফুলতায় আসিতে সাহায্য করিয়াছেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলিকাতা আক্রমণ করেন। মাণিকচাঁদের অধীনে পর্যাপ্ত সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ইংরেজদেরকে বাধা না দিয়া কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়েন। ক্লাইভ সহজেই কলিকাতা পুনরুদ্ধার করেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সুরক্ষিত করেন। নবাবের কর্মচারীদের অকর্মণ্যতার দরুন ইংরেজ বণিকরা শোচনীয় অবস্থা হইতে আবার শক্তিশালী হইয়া উঠে।

নবাবকে আবার ইংরেজ বণিকদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। তিনি তাঁহার সৈন্য বাহিনী লইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে প্রবেশ করেন (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭)। ক্লাইভ ও ওয়াটসন ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে অতর্কিত আক্রমনে নবাবের সৈন্যদের মধ্যে কিছুটা গোলযোগের সৃষ্টি করেন; পাল্টা আক্রমনের পর তাঁহারা কলিকাতার দুর্গে পলায়ন করেন। কলিকাতা জয় করার মত নবাবের যথেষ্ট সৈন্য ছিল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, কারণ তাঁহারা তাঁহাকে ইংরেজদের সহিত আপোষ করিতে পরামর্শ দেন। এই সময় আবার আহমদ শাহ আবদালীর বিহার আক্রমনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় নবাব ইংরেজদের সহিত সন্ধি করেন। ইহা আলীনগরের সন্ধি নামে অভিহিত হয় (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭)। নবাব ইংরেজদের বাণিজ্য সুবিধা প্রত্যর্পণ করেন এবং ইহাদেরকে কলিকাতার দুর্গ সুরক্ষিত করিতে অনুমতি দেন। এই সময় হইতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে দৃঢ়সঙ্কল্প

ও তেজস্বিতার অভাব দেখা দেয়। যদি তিনি শক্ত হাতে অসৎ সৈন্যাধ্যক্ষ ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ইহারা ভয় পাইয়া যাইত। ইহার পর তিনি ক্ষিপ্রগতিতে কলিকাতা আক্রমন করিলে ইংরেজদেরকে আবার জাহাজে আশ্রয় লইতে হইত।

ইংরেজরা আলীনগরের সন্ধিকে শুধু সাময়িক যুদ্ধ বিরতি বলিয়া গ্রহণ করে। এক মাস পর ইহারা নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া চুক্তিভঙ্গ করে। এই সময় য়ূরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে "সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ" শুরু হয় এবং কলিকাতার ইংরেজরা ফরাসীদের চন্দরনগর আক্রমনের জন্য প্রস্তুত হয়। নবাব ইহাদেরকে তাঁহার রাজ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে নিষেধ করেন। তিনি হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে এই মর্মে আদেশ দেন যে, যদি ইংরেজরা চন্দরনগর আক্রমন করে তাহা হইলে তিনি যেন তাঁহার সৈন্য লইয়া ফরাসীদেরকে সাহায্য করেন। ক্লাইভ নবাবের আদেশ উপেক্ষা করিয়া চন্দরনগর আক্রমন করেন এবং ইহা অধিকার করেন (২৩ মার্চ)। নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ নন্দকুমার, রায়দুর্লভ ও মানিকচাঁদ ফরাসীদেরকে সাহায্য করেন নাই। নিজের সাফাইয়ের জন্য নন্দকুমার নবাবকে জানান যে, ফরাসীরা এত বেশী দুর্বল ছিল যে, ইহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইলে অযথা নবাবের সৈন্যদের শক্তি ক্ষয় হইত। নবাব তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল বিহারের উত্তর সীমান্তে আহমদ শাহ আবদালীর সম্ভাব্য আক্রমন প্রতিরোধের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল এবং যে সৈন্যাধ্যক্ষরা তাঁহার নিকটে ছিলেন তাঁহাদের অনেককে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। এইজন্য তিনি ইংরেজদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন নাই, বরং ইহাদেরকে তুষ্ট করিবার জন্য তিনি ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ মসিয়ে ল'কে তাঁহার সৈন্য বাহিনী হইতে অপসারিত করিয়া পাটনায় পাঠাইয়া দেন।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র :

ক্লাইভ ও তাঁহার সহকর্মীরা বুঝিতে পারেন যে, নবাবের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে তাঁহারা হিন্দু প্রধানদের সহযোগিতা পাইবেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিল কলিকাতা পরিষদ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার পক্ষে প্রস্তাব পাশ করে। নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সংগঠনের জন্য ক্লাইভ উমিচাঁদকে দালাল নিয়োগ করেন। নবাবের প্রধান সেনাপতি ও বখশী

মীরজাফর নবাব আলীবর্দীর সময় হইতেই অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কুখ্যাত ছিলেন। বাংলার মসনদ পাইবার লোভে মীরজাফর নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। ইয়ার লুৎফ খান ও খাদিম হোসেন নামক দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য মীরজাফরের অনুসরণ করেন। জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র (নদীয়ার জমিদার) ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিরা শেঠ ভবনে মিলিত হন। মীরজাফর এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ এজেন্ট ওয়াটস স্ত্রীলোকের জন্য ব্যবহৃত পালকিতে করিয়া জগৎশেঠের প্রাসাদে অনুষ্ঠিত সভায় আসেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে মসনদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। ওয়াটস অঙ্গীকার করেন যে, ইংরেজরা সর্বতোভাবে মীরজাফরকে সাহায্য করিবে। ইংরেজ এজেন্টরা চুক্তিনামার খসড়া প্রস্তুত করেন। তাঁহারা ১৯শে মে চুক্তিনামায় দস্তখত করেন এবং ইহা মীরজাফরের নিকট পাঠান। মীরজাফর ৪ঠা জুন চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন। তিনি ইংরেজদেরকে কয়েকটি বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা এবং বিপুল অর্থ দিতে অঙ্গীকার করেন। উমিচাঁদকে ২০ লক্ষ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তাঁহাকে প্রতারিত করার জন্য ক্লাইভ চুক্তিনামার দুইটি নকল করেন। আসল চুক্তিনামায় উমিচাঁদের টাকা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হয় নাই। নকল চুক্তিনামায় ইহা উল্লেখ করা হয়; ইহার সব দস্তখতগুলি ক্লাইভ জাল করেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও গোপন চুক্তির কথা জানিতে পারেন। কিন্তু তিনি দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত ষড়যন্ত্রকারীদেরকে শাস্তি দিতে অসমর্থ হন। তিনি মীরজাফরকে প্রধান সেনাপতি ও বখশীর পদ হইতে অপসারিত করেন এবং আবদুল হাদী খানকে প্রধান সেনাপতি ও বখশী নিয়োগ করেন। আবদুল হাদী ও মীরমদন ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার পূর্বে মীরজাফরকে ধ্বংস করিবার জন্য নবাবকে পরামর্শ দেন। কিন্তু জগৎশেঠ ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক উপদেষ্টারা তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, মীরজাফরকে তুষ্ট করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তি বৃদ্ধি করা নবাবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি নবাব আলীবর্দীর নাম করিয়া মীরজাফরের নিকট সাহায্যের জন্য মর্মস্পর্শী আবেদন করেন। মীরজাফর পবিত্র কুরআন হাতে নিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অঙ্গীকার করেন।

নবাব তাঁহার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পদে পুনর্বহাল করেন। বিবেকহীন মীরজাফরকে বিশ্বাস করিয়া নবাব মারাত্মক ভুল করেন। তিনি যদি এই সময় মীরজাফরকে বন্দী করিতেন, তাহা হইলে ষড়যন্ত্রকারীরা ভয় পাইয়া যাইত এবং ক্লাইভ তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়া কলিকাতার দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেন।

পলাশীর যুদ্ধঃ

গোপন চুক্তির পর ক্লাইভ সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়া মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। হুগলী ও কাটোয়ার ফৌজদাররা তাঁহাকে বাধা দেন নাই। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ৫০,০০০ সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করেন এবং পলাশী প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মীরজাফর, খাদিম হোসেন ও রায়দুর্লভ তাঁহাদের সৈন্যদের নিয়া দূরে দাঁড়াইয়া নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। মোহনলাল, মীরমদন ও সিনফ্রের আক্রমনে ক্লাইভের সৈন্যরা পিছে হটিতে বাধ্য হয় এবং আম্রকুঞ্জের আড়ালে আশ্রয় লয়। নবাবের এই বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষরা ইংরেজ সেন্যদেরকে ইহাদের আশ্রয়স্থল হইতে বিতাড়নের জন্য অগ্রসর হয়। এমন সময় ইংরেজ সৈন্যদের একটি বিক্ষিপ্ত গুলিতে মীরমদন নিহত হন। বিশ্বস্ত মীরমদনের মৃত্যুতে নবাব মনের বল হারাইয়া ফেলেন এবং তিনি মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠান। মীরজাফর সেদিনের মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে নবাবকে পরামর্শ দেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে, পরের দিন তিনি তাঁহার সর্বশক্তি নিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। মীরজাফরের পরামর্শে নবাব মোহনলাল ও সিনফ্রেকে ডাকিয়া পাঠান। মোহনলাল ও সিনফ্রে ক্লাইভের সৈন্যদেরকে ভীষণ অসুবিধায় ফেলিয়াছিলেন এবং আর কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিলে ইংরেজদেরকে আম্রকুঞ্জ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইত। তাঁহারা এরূপ নিশ্চিত জয়ের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। নবাব আবার মীরজাফরের পরামর্শ গ্রহণ করেন। মীরজাফর তাঁহার পূর্ব পরামর্শের পুনরাবৃত্তি করেন। মীরজাফরের পরামর্শে নবাব মোহনলাল ও সিনফ্রেকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেন। অগত্যা তাঁহাদেরকে নবাবের আদেশ মানিতে হয়।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিতে হওয়ায় সৈন্যরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ক্লাইভ এই সুযোগে আম্রকুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া ইহাদেরকে আক্রমন করেন। ইহাতে নবাবের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। মীরজাফর ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিরা দূরে সরিয়া গিয়া ক্লাইভের সহিত যোগ দেন। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয় হয়। নবাব পলাশী হইতে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন।

নবাব তাঁহার বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ইহার পর স্ত্রী লুৎফুন্নেসা ও কন্যাকে লইয়া রাজমহলের দিকে যাত্রা করেন। তিনি পাটনার নায়েব নাযিম রামনারায়ণের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন। পথিমধ্যে তিনি মীরজাফরের জামাতা মীর-কাসিমের হাতে ধরা পড়েন এবং মুর্শিদাবাদে নীত হন। মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে মুহম্মদী বেগ* নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে।

পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু একমাত্র মীরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতাতেই সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় হয় নাই। নবাবের মনের দুর্বলতা তাঁহার পরাজয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। মসনদে আরোহণের পর কিছুকাল তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সাহসের সহিত অনেক সমস্যা সমাধান করেন। দ্বিতীয় বার কলিকাতা আক্রমনের সময় হইতে তিনি মনের বল হারাইয়া ফেলেন। আহমদ শাহ আবদালীর বিহার আক্রমনের আশঙ্কা করিয়া নবাব সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। তখন হইতে তিনি কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতা উপেক্ষা করিয়া চলেন, ইংরাজদের প্রতি তোষণ নীতি অনুসরণ করেন এবং মীরজাফরকে রাজদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারী জানিয়াও তাঁহাকে প্রধান সেনাপতি পদে বহাল রাখেন। দৃঢ়তার সহিত মীরজাফরের শাস্তির ব্যবস্থা করিলে নবাব পলাশীর পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইতেন। তৃতীয়তঃ, তখন বাংলায় চরিত্রের মারাত্মক অভাব ছিল। সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতিতে সমাজজীবন কলুষিত ছিল। কর্মচারী, সেনাপতি ও সেনারা তুচ্ছ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতেন। মীরজাফর ছাড়াও, খাদিম হোসেন, ইয়ার লুৎফ খান, মাণিকচাঁদ, নন্দকুমার, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এবং আরও অনেকে রাজদ্রোহিতা করেন এবং বাংলার স্বাধীনতা বিসর্জন দেন।

*মুহম্মদী বেগ সিরাজের পিতা জৈনুদ্দীনের অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইয়াছিল।

বাংলার শাসকদের নৌবহর না থাকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁহাদের খুবই অসুবিধা হয়। যদিও নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদেরকে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তবুও তিনি ইহাদেরকে ভাগীরথী নদী হইতে বহিষ্কার করিতে পারেন নাই। যখন ক্লাইভ ও ওয়াটসন মাদ্রাজ হইতে সৈন্য ও নৌবাহিনী লইয়া হুগলী নদীতে প্রবেশ করেন তখন তাহাদেরকে প্রতিরোধ করার মত নৌশক্তি নবাবের ছিল না।

পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন শাসনের পতন হয়। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন শাসক। তাঁহার পরাজয় ও মৃত্যুর পর বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয় এবং ইহার জাতীয় জীবন সংগঠনের পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। বাংলায় ইংরেজদের প্রাধান্যের সূত্রপাত হয় এবং এখানে বিদেশী শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মীরকাসিম

পলাশীর ষড়যন্ত্রকালে ও পরে মীরজাফর কোম্পানী ও কোম্পানীর বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যে বিপুল অর্থপ্রদানে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা তিনি পুরাপুরি শোধ করিতে অসমর্থ হন। ইংরেজদের কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি ওলন্দাজ ও আর্মেনিয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করারও চেষ্টা করেন। এই দুই অপরাধে মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হন (অক্টোবর ১৭৬০)। মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিমের সঙ্গে কোম্পানীর এক নূতন চুক্তি হয়। চুক্তিমতে মীরকাসিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম–এই তিনটি জেলা কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন। পরিবর্তে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষিত হন।

মীরকাসিম ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও কর্মদক্ষ প্রশাসক। তিনি বুঝিতে পারন যে কোম্পানীর নাগপাশ হইতে রেহাই পাইতে হইলে প্রথম প্রয়োজন সমস্ত চুক্তিবদ্ধ ঋণ পরিশোধ করা। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন এবং কোম্পানীকে দেয় সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন। মীরকাসিম কোম্পানীকে প্রভুর ভূমিকা হইতে নামাইয়া পূর্বের মত সাধারণ ব্যবসায়ীর পর্যায়ে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান।

নবাব মীরকাসিম আরও বুঝিতে পারেন যে, মুর্শিদাবাদ কলিকাতার অতি নিকটে অবস্থিত। এইজন্য কলিকাতার কর্তৃপক্ষের পক্ষে নবাবের কার্য-কলাপের উপর নযর রাখিতে ও তাঁহার শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সুবিধা হয়। দূরবর্তী স্থানে নবাবের রাজধানী স্থানান্তরিত করিলে ইহাদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা সহজ হইবে না। ইংরেজদের কর্তৃত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মীরকাসিম মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। নবাব তাঁহার সৈন্যদলের শক্তি বৃদ্ধি করিতে সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আর্মেনিয়ানদেরকে সৈন্যদলে ভর্তি করেন এবং গুর্গিন খান নামক একজন আর্মেনিয়ান নায়কের উপর সৈন্যবাহিনী সংগঠনের ভার দেন। তিনি গোলন্দাজ ও পদাতিক সৈন্যদেরকে য়ুরোপীয় প্রণালী

অনুসারে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করেন। মুহম্মদ তকীখান নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষও সৈন্য সংগঠনের কার্যে মীরকাসিমকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

শক্তি বৃদ্ধির কার্যে মীরকাসিকে নানারূপ আভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ইংরেজদেরকে বিপুল অর্থ ও উপহার দিতে হওয়ায় তাঁহার রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অর্থ সঙ্কটের জন্য তাঁহার উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। তা'ছাড়া জমিদাররা রীতিমত রাজস্ব আদায় করেন নাই। বড় বড় জমিদাররা তাঁহার অবাধ্য হন এবং তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া চলেন। বর্ধমানের জমিদার তিলকচাঁদ, বীরভূমের জমিদার আসাদুজ্জামান ও নদীয়ার জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র মীরকাসিমের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। দিনাজপুর ও নাটোরের জমিদাররাও নবাবকে রাজস্ব দিতে গড়িমসি করিতেছিলেন। বিহারের কয়েকজন জমিদার মীর কাসিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য মীরকাসিমকে এই সকল জমিদারদের বিরুদ্ধে সৈন্য পবিচালনা করিতে হয়। বহুদিন যুদ্ধের পর তিনি ইহাদেরকে দমন কবিতে এবং রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হন। তিনি জমিদারদের সহিত রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করেন।

নবাবের উচচপদস্থ কর্মচারীরা মীরকাসিমের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না। বিহারের নায়েব নাযিম রাজা রামনারায়ণ অতুল সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। মীরকাসিম বিহার প্রদেশের হিসাব পরীক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং হিসাব পরিদর্শনের জন্য রাজা রাজবল্লভকে পাটনায় প্রেরণ করেন। রামনারায়ণ নানা ছলে হিসাব প্রস্তুত করিতে বিলম্ব করেন। ক্লাইভের সময় হইতে ইংরেজদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। রামনারায়ণ ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। মীরকাসিম ইংরেজদেরকে পত্র লিখিলেন যে, অর্থাভাবে তিনি ইংরেজদের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে পারিতেছেন না এবং রামনারায়ণ প্রচুর অর্থ কুক্ষিগত করিয়াছেন। পরে মীরকাসিম রামনারায়ণকে আয়ত্বের মধ্যে প্রাপ্ত হন। রামনারায়ণ হিসাব দেখাইতে বাধ্য হয়। তাঁহার হিসাবে বহু গোলযোগ প্রকাশ পায়। তখন মীরকাসিম রামনারায়ণকে কারারুদ্ধ করেন। গুপ্ত পুলিশের প্রধান রাজা মুরলী ধর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি আরও কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে উত্যক্ত হইয়া মীরকাসিম তাঁহাদেরকে মুঙ্গেরে আটক করিয়া

রাখেন। পরে তাঁহার আদেশে রামনারায়ণ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও তাঁহার পুত্র উমিদ রায় ও তাঁহার পুত্র এবং আরও কয়েকজনকে গঙ্গায় ডুবাইয়া মারার ব্যবস্থা করা হয়।

মীরকাসিম শাসন ব্যাপারে স্বাধীন নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের ইহা পছন্দ হয় নাই। তাঁহারা মীরকাসিমকে সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকেন। ইহার পর ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের ব্যাপারে নবাবের সহিত তাহাদের বিবাদের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলায় ব্যবসায়ের জন্য কর দিতে হইত না। কোম্পানীর কর্মচারীরা এই সুবিধার অপব্যবহার করিতেন। তাঁহারা বেআইনীভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসা করিতেন এবং কোম্পানীর দস্তক ব্যবহার করিতেন ও বাণিজ্য কর ফাঁকি দিতেন। ইহাতে নবাবের রাজকোষের ক্ষতি হইত এবং অন্যান্য বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যের ভীষণ অসুবিধা হইত। অন্যান্য বণিকদেরকে বাণিজ্য কর দিতে হইত। এইজন্য ইংরেজ বণিকদের সহিত তাহারা বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না। মীরকাসিম ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং ইহা বন্ধের জন্য দাবী করেন। কলিকাতা পরিষদ তাঁহার অভিযোগ উপেক্ষা করেন। নবাব আদেশ দেন যাহাতে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য কর আদায় করা হয়। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারীরা কর দিতে অস্বীকৃত হয়। ইহাতে নবাবের কর আদায়-কারীদের সহিত ইংরেজ কর্মচারীদের সংঘর্ষ দেখা দেয়। তখন মীর-কাসিম বাংলায় সকল বণিকদের উপর হইতে বাণিজ্য কর উঠাইয়া লন এবং এই মর্মে আদেশ জারী করেন। এই ব্যবস্থার ফলে ইংরেজ বণিকদের স্বার্থে আঘাত লাগে, কারণ ইহাতে তাহাদের বিশেষ সুবিধা বন্ধ হইয়া যায় এবং অন্যান্য বণিকরা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় তাহাদের সহিত সমান অধিকার লাভ করে। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মীরকাসিমের প্রতি রুষ্ট হয়।

নবাবের সহিত বুঝাপড়ার জন্য গভর্ণর ভেনসিটার্ট এমিয়েটকে পাঠান। এমিয়েটের দৌত্যকার্য নিষ্ফল হয়। পাটনার ইংরেজ কুঠির এজেন্ট ইলিস পাটনা শহর আক্রমন করেন। মীর কাসিমের সৈন্যরা ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমন ব্যর্থ করিয়া দেয় এবং পাটনায় ইহাদের সৈন্য ছাউনি বিধ্বস্ত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নবাবের কর্মচারীরা এমিয়েটকে হত্যা করেন। ইহার পর কলিকাতা পরিষদ মীরকাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে বাংলা-বিহারের শাসনভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। তাঁহারা মনে করেন যে, মীরজাফরের মত এরূপ অনুগত নবাব পাওয়া যাইবে না। এইজন্য ইংরেজ প্রধানরা স্থির করেন যে, মীরকাসিমকে সরাইয়া মীরজাফরকে পুনরায় মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিলে ইংরেজদের স্বার্থ সর্বতোভাবে রক্ষা পাইবে। তাঁহারা মীরজাফরের সহিত নূতন সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করেন এবং তাঁহাকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন। মেজর এডামসের সৈন্যদল কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়। মীরজাফর কলিকাতা হইতে ইহাদের সহিত যোগ দেন। ইংরেজ সৈন্যদের সহিত মীরজাফর মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় প্রাসাদ অধিকার করেন। মেজর এডামস তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুর্শিদাবাদের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন (২৪শে জুলাই, ১৭৬৩)।

ইংরেজ ও মীরজাফরের মিলিত সৈন্যদল মীরকাসিমকে কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, সোতি ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত করেন। মীরকাসিম মুঙ্গেরে আশ্রয় নন। শত্রু সৈন্যরা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া মুঙ্গের দখল করে। ইহার পর ইংরেজ সৈন্যরা পাটনার দিকে অগ্রসর হয়। পাটনার যুদ্ধে মীরকাসিমের সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় (৬ই নভেম্বর, ১৭৬৩)। ইংরেজ সৈন্যরা পাটনা অধিকার করে। তখন নিরুপায় হইয়া মীরকাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মীরকাসিম নবাব সুজাউদ্দৌলা ও সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাংলা-বিহারে ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা মীরকাসিমের সহিত যোগ দেন এবং তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনী বিহারের দিকে অগ্রসর হয়। ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মনরো বক্সারের নিকট মিত্র বাহিনীর গতিরোধ করেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর বক্সারে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মিত্র বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। মীরকাসিমের শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। বহু বৎসর অজ্ঞাত অবস্থায় কাটাইয়া তিনি ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর নিকটে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্যরা অযোধ্যায় প্রবেশ করে। নবাব সুজাউদ্দৌলা রাজ্য ছাড়িয়া রোহিলখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট

দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। নবাব সুজাউদ্দৌলা নিরুপায় হইয়া ইংরেজদের নিকট সন্ধি ভিক্ষা করেন। কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাব সুজাউদ্দৌলাকে তাঁহার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

নবাব মীরকাসিমের অর্থনৈতিক দুর্বলতা ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে তাঁহার পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। মীরজাফরের ঋণের বাবদ তাঁহাকে বহু টাকা ইংরেজদেরকে দিতে হয়। তা'ছাড়া মসনদ লাভের জন্য তিনি দুই লক্ষ পাউণ্ড ইংরেজ প্রধানদেরকে দিতে বাধ্য হন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ তিনি ভালভাবে সৈন্যদল সংগঠন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, জমিদার ও কর্মচারীরা তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না। জমি-দাররা রাজস্ব দিতেন না। জমিদার ও কর্মচারীদের অনেকে গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেন। তাঁহারা নবাবের জন্য আভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টি করেন। ইহার ফলে মীরকাসিম তাঁহার শক্তি সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। তৃতীয়তঃ মীরকাসিমের গোলন্দাজ বাহিনীর আর্মেনিয়ান সৈন্যাধ্যক্ষ মরকা ও আরাটুন উদয়নালার যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তাঁহারা গোপনে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া ইহাদেরকে রাত্রে নবাবের শিবির আক্রমন করিতে সাহায্য করেন। ইহাতে উদয়নালায় মীরকাসিমের পরাজয় হয়। চতুর্থতঃ, নবাব সুজাউদ্দৌলার ওযীর ও অযোধ্যা-এলাহাবাদের শাসনকর্তা মহারাজা বেণী বাহাদুর বক্সারের যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ইহার ফলে মিত্র বাহিনী খুবই অসুবিধায় পড়ে। এই সময় সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের দীউয়ান সিতাব রায়ও ইংরেজদেরকে সাহায্য করেন। পঞ্চমতঃ, ইংরেজদের গোলন্দাজ বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইংরেজ সৈন্যদের নিয়মানু-বর্তিতা ও রণকৌশল তাহাদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। পলাশীর যুদ্ধে এদেশীয় সৈন্যদের সহিত ইংরেজদের সামরিক শক্তির পরীক্ষা হয় নাই। বক্সারের যুদ্ধে দুই পক্ষের সামরিক নৈপুণ্যের পরীক্ষা হয় এবং ইংরেজ সৈন্যদের রণকৌশল ও নিয়মানুবর্তিতার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসং-বাদিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিশেষে, মীরকাসিম সেনাপতিরূপে রণ-নৈপুণ্য ও সংগঠনদক্ষতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও সংগঠনের অভাব ছিল। এইজন্য তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মুগল আমলে বাংলার শাসন

শাসন ব্যবস্থা

সম্রাট আকবরের সময় বাংলাদেশ নাম মাত্র মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বার ভূঁইয়াদের বিরোধিতার দরুন বাংলাদেশে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে সুবাদার ইসলাম খানের কর্মকুশলতার ফলে বারভূঁইয়ারা মুগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং বাংলাদেশে মুগল শাসন কার্যকরী করা হয়। বাংলাদেশ মুগল সাম্রাজ্যের অন্যতম সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয়। সুবাদার ইসলাম খান রাজমহল হইতে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং ইহার নাম সম্রাটের নামানুসারে জাহাঙ্গীরনগর রাখেন।

সম্রাট আকবর প্রদেশ শাসনের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা প্রচলন করেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্যকরী ছিল। সুবার শাসন সম্পূর্ণরূপে সম্রাটের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন ছিল। কেন্দ্রীয় ও সুবা শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব সম্রাটের হাতে ছিল। সম্রাট আকবর সুবার শাসন দায়িত্ব সুবাদার, দীউয়ান, বখশী, সদর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করেন এবং ইহাদের প্রত্যেকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট করিয়া দেন। কেন্দ্রীয় শাসনের তত্ত্বাবধানাধীন থাকিয়া ইহারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করিতেন।

বাংলা সুবার প্রধান প্রশাসক ছিলেন সুবাদার। তিনি নাযিম ও সিপাহ-সালার নামেও অভিহিত হইতেন। সুবাদার সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তিনি তাঁহার শাসনকার্যের জন্য সম্রাটের নিকট দায়ী থাকিতেন। সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী (উকীল) সুবাদারের কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিদ্রোহ দমন করা, সম্রাটের আদেশ-নির্দেশ কার্যকরী করা ইত্যাদি সুবাদারের দায়িত্ব ছিল। তাঁহাকে শুধু সাধারণ শাসনের ভার দেওয়া হয়; অর্থ, সৈন্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর তাঁহার হাত ছিল না। এইসব বিভাগের ভার অপরাপর কর্মচারীদের

দায়িত্বে ছিল। ইহার ফলে, সুবাদারের পক্ষে প্রদেশে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সুবাদারকে সাধারণতঃ চার পাঁচ বৎসরের মেয়াদে নিয়োগ করা হইত এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অন্য কোন আমীরকে প্রদেশের সুবাদার নিয়োগ করা হইত।

মুগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের সুবাদারদের তুলনায় বাংলাদেশের সুবাদারের পক্ষে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা ছিল। বাংলা সুবা সম্রাটের রাজধানী হইতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইহা একটি সমস্যা-সংকুল প্রদেশ ছিল। জমিদারদের বিরোধিতাব দরুন বাংলায় মুগল শাসন কার্যকরী করিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সুবাদার ইসলাম খান জমিদারদেরকে দমন করিয়া এক বিশেষ মর্যাদা অর্জন করিয়াছিলেন। এই সুযোগে তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য কর্মচারীদেরকে তাঁহাকে কুর্ণিশ করিতে বাধ্য করেন। সম্রাটের অনুকরণে ইসলাম খান ঝারোকায় বসিতেন। সম্রাটের অনুমোদন ব্যতিরেকে তিনি কর্মচারীদেরকে কঠিন দণ্ড দিতেন। ইসলাম খানের এই সব কার্য-কলাপের খবর পাইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে সতর্ক করিয়া এক ফরমান জারী করেন। সম্রাট তাঁহাকে ঝারোকায় বসিতে, কুর্ণিশ আদায় করিতে ও কঠোব দণ্ড দিতে নিষেধ করেন।

প্রত্যেক সুবায় একজন দীউয়ান নিযুক্ত হইতেন। সাম্রাজ্যের প্রধান দীউয়ানের পরামর্শে প্রাদেশিক দীউয়ান নিয়োগ করা হইত। প্রধান দীউয়ান প্রাদেশিক দীউয়ানের কার্যেব তত্ত্বাবধান করিতেন এবং তাঁহাকে আদেশ-নির্দেশ দিতেন। প্রদেশের অর্থের দায়িত্ব প্রাদেশিক দীউয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল। রাজস্বের আয়-ব্যয়, হিসাব-নিকাশ এবং রাজস্ব-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করা তাঁহার দায়িত্ব ছিল। তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত সুবাদার প্রদেশের রাজকোষ হইতে টাকা ব্যয় কবিতে পারিতেন না। এবং টাকার জন্য সুবাদারকে দীউয়ানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। এই জন্য দীউয়ানের সহিত সহযোগিতার সম্পর্ক রক্ষা না করিয়া চলিলে সুবাদারের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা কঠিন হইয়া পড়িত। বাংলার সুবাদার কাসিম খানের সহিত দীউয়ান মির্যা হোসেন বেগের বনিবনা হয় নাই। কাসিম খান মির্যা হোসেন বেগ ও তাঁহার পুত্রদেরকে আটক করেন এবং তাঁহাদের সম্পত্তি বাযয়াফত করেন। ইহা জানিতে পারিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর সুবাদার ও দীউয়ানের বিবাদের তদন্তের জন্য কর্মচারী

পাঠান। তদন্তের ফলে সুবাদারের অপরাধ প্রমাণিত হয় এবং কাসিম খান দীউয়ানকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন। কাসিম খান পরবর্তী দীউয়ান মুখলিস খানের সহিতও বিবাদ করেন। তখন সম্রাট কাসিম খানকে অপসারিত করেন।

প্রদেশের সামরিক বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য একজন বখশী নিযুক্ত হইতেন। প্রাদেশিক বখশীকে কেন্দ্রের মীর বখশীর পরামর্শে নিয়োগ করা হইত। বখশী তাঁহার কার্যের জন্য মীর বখশীর নিকট দায়ী থাকিতেন। তিনি প্রদেশের মনসবদারদের অধীনস্থ সৈন্যদের প্রশিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা ও যোগ্যতার তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি ইহাদের প্রশিক্ষা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না হইলে সৈন্য ও মনসবদারদের বেতন বন্ধ করিতে পারিতেন। তিনি প্রদেশের সামরিক ব্যাপারে সুবাদারকে পরামর্শ দিতেন এবং প্রয়োজন মত অভিযানের ব্যবস্থা করিতেন। সামরিক দায়িত্ব ছাড়াও বখশীর অন্য একটি দায়িত্ব ছিল। তিনি প্রদেশের প্রধান ওয়াকিয়ানবিসের (সংবাদ সরবরাহকারী) কার্য করিতেন। প্রদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি সম্রাটকে লিখিয়া জানাইতেন।

প্রদেশের সদর সাম্রাজ্যের সদর-ই-সুদূরের (প্রধান সদর) পরামর্শে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। সদর তাঁহার কার্যের জন্য প্রধান সদরের নিকট দায়ী থাকিতেন। তিনি প্রদেশের ধর্মীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রদেশে কাযী না থাকিলে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার সুপারিশে ধার্মিক, শিক্ষিত, এতিম প্রভৃতি লোকদেরকে এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিষ্কর জমি ও অন্যান্য প্রকারের সাহায্য দেওয়া হইত। তিনি ইহাদের দেখাশুনা করিতেন। প্রদেশের বিচারকার্যের জন্য কাযী নিয়োগ করা হইত। কাযী সাম্রাজ্যের প্রধান কাযীর অধীন ছিলেন। বিচারকার্যে কাযীর সাহায্যের জন্য একজন মীর আদল নিযুক্ত হইতেন।

বাংলা সুবা নদী-প্রধান ছিল এবং সামরিক প্রয়োজনে এই প্রদেশে নৌবহর রাখিতে হইত। মীর বহর এই নৌবহরের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি প্রয়োজন মত সুবাদার ও বখশীকে তাঁহার নৌশক্তি দিয়া সাহায্য করিতেন। বার ভুঁইয়াদেরকে দমন করিতে, কুচবিহার, কামরূপ ও আসাম অভিযানে এবং মগদেরকে বিতাড়িত করিয়া চট্টগ্রাম জয় করিতে নৌবহর বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

প্রদেশে কয়েকজন ওয়াকিয়ানবিস নিয়োগ করা হইত। সুবাদার দীউয়ান প্রভৃতি কর্মচারীদের কার্যকলাপ ও স্থানীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইহারা সম্রাটকে লিখিয়া জানাইতেন। ইহার ফলে সম্রাট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য কোতোয়াল নিযুক্ত হইতেন। কোতোয়াল সুবাদারের অধীন ছিলেন। তিনি পুলিশ বিভাগের প্রধান ছিলেন।

বাংলা সুবা ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সরকারে একজন ফৌজদার নিযুক্ত হইতেন। সরকারের শাসন, শান্তিরক্ষা ইত্যাদি তাঁহার দায়িত্ব ছিল। প্রত্যেক সরকারে অনেকগুলি পরগণা ছিল। বাংলা সুবায় মোট ৬৮২টি পরগণা ছিল। আমিল পরগণার প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় করিতেন ও পরগণায় শান্তিরক্ষা করিতেন।

নবাবী আমলে শাসন ব্যবস্থা :

নবাব মুর্শিদ কুলীর সময় হইতে বাংলাদেশ কার্যতঃ স্বাধীন ছিল। তিনি ও তাঁহার পরবর্তী মুর্শিদাবাদের নবাবরা নাম মাত্র মুগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতেন এবং তাঁহাকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতেন, কিন্তু শাসন ব্যাপারে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তাঁহারা বাংলার মসনদ বংশগত করিয়া লন। নবাব স্বয়ং সকল পদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিতেন এবং সম্রাট শুধু নবাবের কার্য অনুমোদন করিতেন। নবাব কয়েকজন দীউয়ান নিয়োগ করিতেন। সুবার দীউয়ান সম্রাটের রাজস্বের জন্য দায়ী থাকিতেন। দীউয়ান-ই-খালসা নবাবের রাজস্বের দেখাশুনা করিতেন এবং দীউয়ান-ই-তান সৈন্যদের বেতন, ভাতা, ইত্যাদির দায়িত্ব বহন করিতেন। রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শের জন্য নবাব একজন প্রধান কানুনগো নিয়োগ করিতেন। সামরিক বিভাগের জন্য কয়েকজন বখশী, মীরবহর প্রভৃতি কর্মচারী, বিচারকার্যের জন্য কাযী এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য কোতোয়াল নিয়োগ করিতেন।

নবাবদের আমলে উড়িষ্যা ও বিহার বাংলার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ ছিল। উড়িষ্যার জন্য একজন নায়েব নাযিম ও একজন নায়েব দীউয়ান এবং বিহারের জন্য অনুরূপ কর্মচারীদেরকে নিয়োগ করা হইত। জাহাঙ্গীর-নগর অঞ্চলও একটি প্রদেশ ছিল। এই প্রদেশের জন্যও একজন নায়েব

নাযিম ও একজন নায়েব দীউয়ান নিযুক্ত হইতেন। নবাব ইহাদেরকে নিয়োগ করিতেন।

নবাব মুর্শিদ কুলী বাংলার শাসন ও রাজস্ব বিভাগগুলির পুনর্গঠন করেন। তিনি বাংলাদেশকে ১৩টি চাকলায় ভাগ করেন। প্রত্যেক চাকলায় একজন ফৌজদার নিয়োগ করা হইত। ফৌজদার শাসনকার্যের জন্য নবাবের নিকট দায়ী থাকিতেন এবং নায়েব নাযিমের তত্ত্বাবধানে কাজ করিতেন। তিনি চাকলার শান্তিরক্ষা করিতেন এবং অবাধ্য জমিদারদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে প্রয়োজন মত রাজস্ব কর্মচারী-দেরকে সাহায্য করিতেন। মুর্শিদ কুলী পূর্বের পরগণাগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া ১৬৬০টি মহালে বিভক্ত করেন। মহাল প্রধানতঃ রাজস্ব বিভাগ ছিল। আমিল ইহার প্রধান কর্মচারী ছিলেন। রাজস্ব নির্ধারণ ও রাজস্ব আদায় ইত্যাদির দায়িত্ব আমিলের উপর ন্যস্ত ছিল। রাজস্ব নির্ধারণের ব্যাপারে আমীন তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। আমীনকে মুন্সেফ ও মুশরেফও বলা হইত। মহলে কারকুন, খাজাঞ্চী, কানুনগো, চৌধুরী প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। কারকুন রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের কাগজ-পত্র ও হিসাব রক্ষার কাজ করিতেন এবং খাজাঞ্চী রাজস্ব গ্রহণ করিতেন এবং মহালের রাজকোষের জন্য দায়ী ছিলেন। কানুনগো ও চৌধুরী আধা-সরকারী কর্মচারী ছিলেন। ইহারা প্রজাদের প্রতিনিধিত্ব করিতেন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার ও প্রজা উভয়ের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব বহন করিতেন।

সামাজিক জীবন:

মুগল শাসন বাংলাদেশের জীবনে কয়েকটি ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলাদেশ মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় উত্তর ভারতের সহিত ইহার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। বাহিরের জগৎ বাংলাদেশের সংস্পর্শে আসে এবং বাংলাদেশও বহির্বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। ঘনিষ্ঠতা ও আদান-প্রদানের মধ্যে নূতন ভাবধারা এই প্রদেশে প্রবেশ করে এবং ইহা লোকের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে।

মুগল সম্রাটরা প্রজাবৎসল, উন্নত-মনা ও উদার প্রকৃতির শাসক ছিলেন। বাংলাদেশের সুবাদার, দীউয়ান ও অন্যান্য কর্মচারীরা সুশাসক ও

প্রজাবৎসল ছিলেন। ইহার ফলে প্রজারা সুখ শান্তিতে ছিল এবং তাহাদের উন্নতির পথ সুগম হইয়াছিল। মুগল সমাজ শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত ছিল। বাংলাদেশে যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত হন তাঁহারা উচ্চ শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাহাদের সঙ্গে বহু কবি, পণ্ডিত, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত লোক বাংলাদেশে আসেন। তাঁহাদের প্রভাবে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নব জীবনের সূত্রপাত হয়। সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী রাজা টোডর মল সরকারী কার্যে ফার্সীভাষা বাধ্যতামূলক করেন। শিক্ষার প্রসারের জন্য আকবর নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই সময় বাংলাদেশে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য প্রসার লাভ করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মুগল সমাজের আদব-কায়দা ও রীতিনীতি বাংলাদেশের সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি অভিজাত হিন্দু জমিদাররাও পোষাক-পরিচ্ছদ, খানাপিনা ও আদব-কায়দায় মুগলদের অনুসরণ করেন।

মুগল আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। ফার্সী ভাষা খুবই সমৃদ্ধ ভাষা ছিল। ইহার বিষয় ও ভাবধারার অনুকরণে বাংলা সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। মুসলমান কবিরা ফার্সী সাহিত্যের শব্দ, বিষয়বস্তু ও ভাবধারা বাংলা সাহিত্যে প্রচলন করেন। হিন্দু কবিরাও ইহার অনেক কিছু গ্রহণ করেন। ফার্সীর অনুকরণে বাংলায় গযল ও সুফী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়। মুগল যুগে বাংলায় মিশ্র সুফীবাদের উদ্ভব হয়। ফকীরী, দরবেশিয়া, বাউল প্রভৃতি মরমিয়াবাদের উৎপত্তি হয়। এই মরমিয়াবাদ মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ে বিস্তৃত হয়। বাউল গান বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে। মুগল শাসনকালে বহু ইরাণী শিয়া কর্মচারী ব্যবসায়ী, কবি, পণ্ডিত ও চিকিৎসক বাংলাদেশে আসেন। ইহাতে বাংলাদেশের সমাজে শিয়া অনুষ্ঠানগুলির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুহররম বাংলার মুসলমানদের জাতীয় অনুষ্ঠান রূপে পরিণত হয়। মুসলমান কবিরা মার্সিয়া গান রচনা করেন। সকল মুসলমানের নিকট ইহা সমাদর লাভ করে।

মুগল যুগে বাংলার হিন্দু সমাজে বিবর্তন দেখা দেয়। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার-লাভ করে এবং ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের প্রতিবাদে হিন্দুধর্মের গোড়ামির মূলে আঘাত করে। তা'ছাড়া, বাংলার প্রকৃতির প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী, শক্তি প্রভৃতি ধর্মমত প্রসার লাভ করে। ইহাদের উপকরণের উপর বাংলা সাহিত্যের বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়।

মুগল শাসনকালে বাংলাদেশে নূতন ধরনের স্থাপত্য শিল্প প্রচলিত হয়। ইহা মুগল স্থাপত্য শিল্প নামে পরিচিত। মুগল শাসকরা বাংলার সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্প পছন্দ করেন নাই। তাঁহারা দিল্লী, আগ্রা ও ফতেহপুর সিক্রির স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে বাংলাদেশে অট্টালিকা, মসজিদ, দুর্গ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এই অট্টালিকাগুলি খুবই প্রকাণ্ড। জমকালো গুম্বজ, খিলানের মনোরম কারুকার্য ও সুন্দর বৃত্তাংশখচিত স্তম্ভ-রাজি মুগল যুগে নির্মিত মসজিদগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল। ফতেহপুর সিক্রির বুলান্দ দরওয়াজার অনুকরণে বাংলাদেশে কয়েকটি প্রকাণ্ড দরওয়াজা নির্মিত হয়। কাটরা দালান মুগল আমলের স্থাপত্যশিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ইহা অতিথি ভবন হিসাবে নির্মাণ করা হইত। সম্রাট আকবরের সময়ে পুরাতন মালদহে একটি কাটরা দালান, একটি সুউচ্চ মিনার ও একটি মসজিদ নির্মিত হয়। বগুড়া জিলার শেরপুরে সুবাদার রাজা মানসিংহ একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং ইহার নাম রাখেন সলিমনগর।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় মুগল আমলের স্থাপত্য শিল্পের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। সুবাদার শাহজাদা আযম বুড়ীগঙ্গার তীরে বড় কাটরা নির্মাণ করেন। সুবাদার শাহজাদা আযম লালবাগের শাহী মসজিদ নির্মাণ করেন। বিশাল লালবাগ দূর্গ তাঁহার কীর্তি। তিনি ইহার নির্মাণ কার্য শেষ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরে সুবাদার শায়েস্তা খান অর্ধ-সমাপ্ত লালবাগ দুর্গের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। তিনিও ইহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। ফলে লালবাগ দুর্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। লালবাগ দুর্গ বাংলায় মুগল স্থাপত্য শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শায়েস্তা খান বড় কাটবার অনতিদূরে ছোট কাটরা নির্মাণ করেন।

বাংলার নবাবরা মুর্শিদাবাদে বহু সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। এইগুলির মধ্যে মুর্শিদ কুলী নির্মিত চেহেল সেতুন খুবই উল্লেখযোগ্য। ইহা চল্লিশ স্তম্ভ বিশিষ্ট দরবার ভবন ছিল। তিনি একটি কাটরা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। ঘষেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদ ও নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ সে যুগে স্থাপত্য সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল।

আর্থিক জীবন :

স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলাদেশ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধ ছিল। মুগল শাসনকালে ইহা আরও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। মুগল

সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় উত্তর ভারত, মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সহিত বাংলাদেশের ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মুগল-পূর্ব যুগে পর্তুগীজরা বাংলায় একমাত্র য়ুরোপীয় বণিক ছিল। মুগল যুগে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকরা এই প্রদেশের বাণিজ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহার উদ্বৃত্ত কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য ব্যাপকভাবে বিদেশে রপ্তানী হয় এবং ইহার প্রচুর অর্থাগম হয়। ব্যাপক রপ্তানী বাণিজ্যের ফলে বাংলার কৃষি ও শিল্পের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়।

এখনকার মত মুগল যুগে বাংলাদেশ কৃষি-প্রধান ছিল। কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা খুবই কম ছিল, দেড় হইতে দুই কোটির মধ্যে ছিল। এই অল্প সংখ্যক অধিবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি ছিল। বহু নদনদী বিধৌত ও পরিমাটিপূর্ণ বাংলার বিরাট সমতল ভূমি খুবই উর্বর ছিল। আবুল ফযল লিখিয়াছেন যে, বাংলার ধানের চারাগুলি এক রাত্রে ৬০ গজ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ভূমিতে বৎসরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, বাংলায় নানা প্রকারের ধান উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক রকমের একটি ধান সংগ্রহ করা হইলে সেগুলিতে একটি বড় ভাণ্ড ভরিয়া যাইবে। তখন বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হইত। বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন যে, বাংলার উদ্বৃত্ত চাউল উত্তর ও দক্ষিণ ভারত, সিংহল, মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত। বাংলায় গমের চাষ ছিল এবং উৎকৃষ্ট ধরণের গম উৎপন্ন হইত। গম ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে রপ্তানী হইত। ইংরেজ কোম্পানীর সময়ে বাংলার গম চাষ বন্ধ হইয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের ডাল, আদা, রসুন, পেয়াজ, মরিচ, সরিষা, তিসি, শাক-শবজী প্রভৃতি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হইত। মরিচ, হলুদ এবং আদা এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে রপ্তানী হইত। আম, কাঁঠাল, আনারস লিচু প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

বাংলায় ইক্ষুর প্রাচুর্য ছিল। য়ুরোপীয় পর্যটক ও বণিকরা বাংলার ইক্ষুজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বার্ণিয়ার বলিয়াছেন যে, বাংলার গুড় ও চিনি বিপুল পরিমাণে দক্ষিণ ভারত, আরব, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ওলন্দাজ বণিকরা জাভা হইতে চিনি আমদানী করে এবং জাভা চিনির প্রতিযোগিতায় বাংলার চিনির রপ্তানী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুগল আমলে বাংলায় পাট উৎপন্ন হইত এবং পাট হইতে শাড়ী, ধুতি প্রভৃতি

তৈরী হইত। ফরাসী বণিক টেভারনিয়ার সর্বপ্রথম পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রতি য়ুরোপীয় বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় হইতে বাংলার পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। বাংলায় বহু যুগ হইতে নীল চাষ ছিল। য়ুরোপীয় বণিকদের চাহিদার ফলে নীলচাষ বৃদ্ধি পায়। কোম্পানীর আমলে ইংরেজ নীলকরদের দৌরাত্মের দরুন নীলের চাষীরা বিদ্রোহী হয় এবং নীলচাষ বন্ধ করিয়া দেয়। উত্তর বাংলার কয়েকটি জিলায় আফিম চাষ হইত। য়ুরোপীয় বণিকরা ইহা চীন ও অন্যান্য দেশে বিক্রী করিত। উত্তর বাংলায় লাক্ষা উৎপন্ন হইত এবং ইহা বিদেশে রপ্তানী হইত।

মুসলমান আমলে বাংলায় উৎকৃষ্ট কাঁপাস উৎপন্ন হইত। এই কাঁপাসে বিখ্যাত মসলিন বস্ত্র তৈরী হইত। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, যশোহর ও রাজশাহী জিলায় কাঁপাসের চাষ ছিল। জে, বি, টেইলার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঢাকায় ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্ট ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, লক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদীগুলির অববাহিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাঁপাস উৎপন্ন হইত। বাংলার কাঁপাস সুরাট ও মিশরের কাঁপাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল। আর একজন ইংরেজ এজেন্ট জে, বেবও বাংলার কাঁপাস ও সুতার সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। মালদহ, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জিলায় রেশমের চাষ ছিল।

মুগল যুগে বাংলার শিল্পজাত দ্রব্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহার বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি সমগ্র সভ্য জগতে বিস্তৃত হইয়াছিল। ঢাকা অঞ্চলের মসলিন শিল্প উন্নতির শীর্ষ স্থানে পৌঁছিয়াছিল। মসলিন বস্ত্র এত মিহিন সূতায় তৈরী হইত যে, একটি শাড়ী একটি আংটিতে ভরা যাইত। সম্রাটের দরবারে এবং আমীর ওমরা ও অভিজাত মহলে ইহার খুব চাহিদা ছিল। বিদেশের রাজসভায় অভিজাতদের মধ্যে ইহার খুব সমাদর ছিল। মিহিন সূতা ও মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করার কাজে তাঁতিরা যে নিপুণতা দেখাইয়াছে তাহা খুবই বিস্ময়কর ছিল। নানা প্রকারের বস্ত্র তৈরী হইত। ইহাদের নাম ছিল :—(১) মলমল, চিক্কণ মসলিন; (২) তানজিব, শরীরের অলঙ্কার, (৩) আবরোয়ান, খরস্রোতা নদীর পানির মত স্বচ্ছ; (৪) আল্লাবালি, অতি সূক্ষ্ম মসলিন; (৫) নয়নসুক, মোটা মসলিন; (৬) বদন খাস, মিহিন মসলিন, (৭) সরবতী, সরবতের মত অর্ধ স্বচ্ছ, (৮) তেরিনডাম,

মসলিন; (৯) সরকার আলী, নবাবের দরবারের জন্য প্রস্তুত মসলিন; (১০) জামদানী, কারুকার্য খচিত মসলিন শাড়ী; (১১) হাম্মাম, মোটা মজবুত সূতার কাপড়; (১২) দোরিয়া, ডোরাকাটা মসলিন; (১৩) সিরবন্দ, পাগড়ীর জন্য মসলিন বস্ত্র; (১৪) জঙ্গলখাসা, ইহাকে বিকালের শিশির বলা হইত; (১৫) ঝুনা, জালের মত স্বচ্ছ মসলিন কাপড়; সাধারণতঃ নর্তকীরা ব্যবহার করিত; (১৬) রঙ্গ, ঝুনার মত স্বচ্ছ; (১৭) বাফ্তা, সান্নু ও গুরারহ, মোটা ধরনের মসলিন; (১৮) অমৃতি ও চিনাটজ, মোটা ধরনের নকসা-করা কাপড়। ইহা ছাড়াও মুক্তা, মুগা, মোয়ামি, লাহি প্রভৃতি নামের শাড়ী প্রস্তুত হইত।

বাংলার সুবাদার, নবাব ও আমীর-ওমরার পৃষ্ঠপোষকতায় মসলিন শিল্পের ন্যায় রেশম শিল্পও উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দেশীয় তাঁতিরা সুন্দর সুন্দর রেশম বস্ত্র তৈয়ার করিত। ওলন্দাজ বণিকরা কাসিমবাজারে রেশম প্রস্তুতের বিরাট কারখানা খুলিয়াছিল। রেশম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। বাংলায় গালিচা, কাগজ, ইস্পাত, নৌকা প্রভৃতি শিল্পও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অলঙ্কার তৈরী ও হাতের কাজের জন্য বাংলার কারিগরদের খুব সুনাম ছিল।

বাংলার কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের খুবই প্রাচুর্য ছিল এবং অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটাইয়া ইহা বহুল পরিমাণে উদ্বৃত্ত থাকিত। ইহার অসংখ্য নদনদী ও সমুদ্র উপকূল ইহার ব্যবসা বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়াছিল। নৌকাযোগে ইহার অভ্যন্তরের যে কোন স্থানে যাওয়া যাইত এবং ব্যবসায় করা চলিত। নদী তীরে বহু বন্দর ছিল। চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, ঢাকা, সপ্তগ্রাম, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, কাসিমবাজার, চন্দরনগর প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর ছিল। নবাবদের আমলে কলিকাতা বন্দর উন্নতি লাভ করে এবং ইহা হুগলী বন্দরের স্থান অধিকার করে। জল ও স্থল উভয় পথে বাংলার বাণিজ্য চলিত। স্থলপথে উত্তর ভারত, তুরাণ ও ইরানের সহিত বাণিজ্য ছিল। জলপথে বার্মা, সিংহল, ভারতের পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। পারস্য উপকূল ও পূর্ব-উত্তর আফ্রিকা হইতে বহু বণিক বাংলার সহিত বাণিজ্য করিত। বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকরা একটা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা বাংলার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া একদিকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, সুমাত্রা ও জাপান প্রভৃতি দেশে, অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়া ও য়ুরোপে বিক্রয় করিত। যে সকল পণ্য বাংলা হইতে বিদেশে যাইত সেগুলির মধ্যে কাঁপাস বস্ত্র, রেশমী কাপড়, লবণমাটি (Salt Petre),

চাউল, চিনি, ঘি, মাখন, তেল, চন্দনকাঠ, আফিম, লাক্ষা, মরিচ, আদা, সুপারী; পান, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি প্রধান ছিল। কাঁপাস বস্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানী হইত। রেশমের দ্বিতীয় স্থান ছিল। বাংলার কাঁপাস বস্ত্র ও রেশমের বিপুল রপ্তানী বাণিজ্যের উল্লেখ করিয়া বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন যে, তিনি দুনিয়ার কোথাও এত মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের সমাবেশ দেখেন নাই। তিনি বাংলাকে মুগল সাম্রাজ্য, ভারত ও য়ুরোপের কাঁপাস ও রেশম বস্ত্রের ভাণ্ডার বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। বাংলার ওলন্দাজ বণিকরা ইহা পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে ও জাপানে এবং য়ুরোপে রপ্তানী করিত। বাংলার অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকরাও বহুশ পরিমাণে এই মূল্যবান পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিপুল লাভ করিত। বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন যে, বাংলার বিপুল উদ্বৃত্ত চাউল নানাদেশে রপ্তানী হইত। ইহা পাটনা হইয়া উত্তর ভারতে, ভারতের পূর্ব-উপকূল, সিংহল ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইত। চিনি, ঘি, মাখন, প্রভৃতি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত।

বাংলার রপ্তানী বাণিজ্যের তুলনায় আমদানী দ্রব্য খুবই নগণ্য ছিল। ইহাকে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত না। বাংলার ব্যাপক বস্ত্র শিল্পের জন্য ইহাকে গুজরাট হইতে তুলা এবং রেশম শিল্পের জন্য চীন হইতে কাঁচা রেশম আমদানী করিতে হইত। আমীর ওমরার জন্য কিছুটা সৌখিন দ্রব্য, ইরান হইতে গালিচা ও কারুকার্য করা বস্ত্র এবং আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাস আমদানী করা হইত। বিদেশী বণিকরা স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথর বাংলায় আমদানী করিত এবং ইহাদের বিনিময়ে বাংলার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিত। ইহার ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ুরোপের স্বর্ণ ও রৌপ্য বাংলায় আসিয়া জমা হইত। আলেকজাণ্ডার ডোউ (**Alexander Dow**) লিখিয়াছেন যে, কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা একটি ডোবার* মত ছিল। এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য এরূপ-ভাবে অদৃশ্য হইয়া যাইত যে এগুলি ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যাকিং প্রথা অত্যাবশ্যক। মুগল যুগে বাংলায় ব্যাংকিং প্রথা প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। বাংলায় বহু মহাজন, সাহা ও শেঠ ছিল। তাহারা হুণ্ডির কারবার করিত। এই হুণ্ডি বর্তমানের ব্যাংক চেকের মত কাজ করিত; ইহা দেশের যে কোন শহরে জমা দিলে নগদ টাকা পাওয়া যাইত।

* **Sink**; যেখানে কিছু রাখিলে বা পড়িলে ডুবিয়া যায়, যেমন **Wash-Basin.**

এমনকি বিদেশের সহিত লেনদেনের জন্য হুণ্ডি ব্যবহৃত হইত। বাংলার নবাবদের সময়ে মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ পরিবার ব্যাংকিং কারবারে উন্নতি লাভ করে। জগৎশেঠের ব্যাংকিং সমগ্র ভারতে বিস্তৃত ছিল। টাকা আদান-প্রদান ও পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে বণিকরা তাহার হুণ্ডি ব্যবহার করিত। ব্যাংকিং কারবারে সাধারণতঃ চার প্রকারের হুণ্ডি প্রচলিত ছিল। (১) দর্শনী হুণ্ডি, ইহা দেখাইলেই নগদ টাকা পাওয়া যাইত। (২) মিথি হুণ্ডি, ইহাতে নির্দিষ্ট তারিখে টাকা দিবার নির্দেশ থাকিত। (৩) শাহযোগ হুণ্ডি, ইহা নোটের মত যে কোন লোকের নিকট বিক্রয় করা যাইত। (৪) জোখামি হুণ্ডি, ইহা ব্যবসায়ীরা পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে ব্যবহার করিত; ইহা বিনিময় বিলের (**Bill of Exchange**) মত ছিল।

মুগল যুগে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং বিপুল রপ্তানী বাণিজ্যের ফলে বাংলা ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য খুবই সুলভ ছিল। সমসাময়িক য়ুরোপীয় বণিক পর্যটকরা ইহার প্রাচুর্য ও সুলভতা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। ফরাসী পর্যটক সিবাষ্টিয়ান মানরিক (১৬৪০ খৃঃ) লিখিয়াছেন যে, বাংলায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত সুলভ যে, তাহার দিনে অনেকবার খাইতে লোভ হইয়াছে এবং নামমাত্র মূল্যে তিনি ও তাহার সঙ্গীরা তৃপ্তির সহিত পর্যাপ্ত আহার করিয়াছেন। বাংলার সুলভতা ও সৌন্দর্যের জন্য পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের মধ্যে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, বাংলায় প্রবেশের জন্য হাযারটি দরওয়াজা আছে, কিন্তু ইহা হইতে বাহির হইবার জন্য একটিও দরওয়াজা নাই। সুবাদার শায়েস্তা খান ও নবাব সুজাউদ্দিনের সময়ে বাংলায় এক টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। বাংলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যে কিরূপ সস্তা ছিল ইহা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার সুবাদার মানসিংহের সমসাময়িক কবি মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন যে, তাহার সময়ে ১৮টি কড়িতে (আধা পয়সারও কম) একটি মোটা কাপড় পাওয়া যাইত। সাধারণ মজুররাও প্রচুর খাইতে পাইত। গোলাম হোসেন সলীম লিখিয়াছেন যে, মাসিক এক টাকা আয় হইলে একজন লোক দুই বেলা খুব ভাল খাবার খাইতে পারিত। একজন সাধারণ মজুর দিনে ২ দাম* মজুরী পাইত। ইহাতে সে মাসে ৬০ দাম বা দেড় টাকা উপার্জন করিত। সুতরাং সে স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করিতে পারিত।

* দাম : তাম্র মুদ্রা ; ৪০ দামে এক টাকা হইত।

পরিশিষ্ট-ক

বাংলায় পর্তুগীজ জাতি

সুলতানী ও মুগল যুগে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি সামুদ্রিক ব্যবসায়ী জাতির সহিত বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাহাদের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথম এই দেশে আসে এবং সবার আগে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় বা চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু বহু আগে চলিয়া গেলেও পর্তুগীজ জাতি এমন অনেক স্থায়ী অবদান রাখিয়া গিয়াছে এবং সমকালীন ঘটনাপ্রবাহে এমন ঘনিষ্ঠভাবে তাহারা জড়িত ছিল যে ইংরেজ ছাড়া বাকী সব বিদেশীদের কথা আমরা প্রায় ভুলিয়া গেলেও পর্তুগীজদের কথা এখনও স্মরণ করিতে হয়।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজেরা প্রথম বাংলাদেশে আগমন করে। কিন্তু প্রথম দুই দশক পর্যন্ত তাহারা এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে নাই। ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী গোয়ায় ছিল তাহাদের স্থায়ী ঘাঁটি। সেখান হইতে তাহারা মৌসুমী বাতাস ধরিয়া বাংলায় আসিত এবং কিছুকাল ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আবার মৌসুমী বাতাস ধরিয়া গোয়ায় প্রত্যাবর্তন করিত। বাংলায় তখন স্বাধীন সুলতানী আমলের শেষ পর্ব। মাহমুদ শাহ তখন বাংলার সুলতান (১৫৩৩—১৫৩৮)। তাঁহার শত্রু শের শাহ। শের শাহকে প্রতিরোধ করার জন্য মাহমুদ শাহ পর্তুগীজদের সাহায্যপ্রার্থী হন। কেননা তাহাদের সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র আছে, আছে সুকৌশলী সৈন্য ও রণতরী। সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে মাহমুদ শাহ পর্তুগীজদের চট্টগ্রাম ও সাঁতগাঁও বন্দরে প্রচুর জমি দান করেন এবং তথায় স্থায়ী কুঠি স্থাপনের অধিকার দান করেন। মাহমুদ শাহের পক্ষে পর্তুগীজরা শের শাহর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কিন্তু তবুও শেরশাহর হস্তে মাহমুদ শাহর পরাজয় ঘটে।

স্বাভাবিক কারণেই শের শাহ ক্ষমতালাভ করিয়া পর্তুগীজদের এই দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু মুগল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর পর্তুগীজেরা এই দেশে বসবাস ও বাণিজ্য করিবার অধিকার ফিরিয়া পায়। সম্রাট আকবর হুগলীতে তাহাদের নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার দান করেন (১৫৮০)। পর্তুগীজ কর্তৃক হুগলী শহর

প্রতিষ্ঠার ফলে নিকটবর্তী বিখ্যাত সাতগাঁও বন্দরের পতন ঘটে। সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য ধীরে ধীরে হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। অবশ্য সাতগাঁয়ের পতনের জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী হুগলী নদীর গতি পরিবর্তন। কালক্রমে হুগলী বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ আমদানী-রপ্তানী কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার পর্তুগীজ ও অন্যান্য বাণিজ্যিক জাহাজ এই বন্দরে আসিয়া নোঙ্গর ফেলিত।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পর্তুগীজ জাতি বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য, ধর্মপ্রচার, দাস-ব্যবসা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত থাকে। প্রায় এক শতাব্দীকাল বাংলাদেশে পর্তুগীজদের সক্রিয় অবস্থিতি এই দেশের ইতিহাসে নানাদিক দিয়া স্মরণীয়।

পর্তুগীজদের আনাগোনা পূর্ব বাংলায় ছিল সবচাইতে বেশী। ইহার কারণ, এই এলাকায় তখনও মুগল শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই অঞ্চলে বড় বড় ভূস্বামীরা প্রায় স্বাধীন নরপতির মত আধিপত্য বজায় রাখে। বারভূঁইয়া নামে পরিচিত বৃহৎ ভূস্বামীরা শক্তিবৃদ্ধির জন্য অনেক পর্তুগীজ সৈন্য নিয়োগ করে। এইসব ভাড়াটিয়া সৈন্যদের প্রভাব ছিল অত্যধিক। এমনকি তাহাদের মধ্যে দুইএকজন দুঃসাহসিক ব্যক্তি নিজস্ব রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর্যন্ত প্রয়াস পায়। ঢাকার শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের পর্তুগীজ সেনাপতি কারবাল্হো ১৬০২ খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপ জয় করিয়া নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। সন্দ্বীপ রক্ষার জন্য আরাকানীয়দের সহিত কারবাল্হোকে কয়েকবার যুদ্ধ করিতে হয়। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে কারবাল্হোর কয়েক দফা যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে সে নিহত হয়। কারবাল্হোর পরে গঞ্জালেস নামে আরেক পর্তুগীজ ভাড়াটিয়া সেনা সন্দ্বীপ দখল করে (১৬০৯)। গঞ্জালেস বাকলারও (আধুনিক বরিশাল-পটুয়াখালী) কিছু অংশ দখল করে। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজা গঞ্জালেসের সন্দ্বীপ-বাক্লা 'রাজ্য' দখল করিয়া লন। কিন্তু ঢাকা, শ্রীপুর, যশোহর ও বাকলায় পর্তুগীজদের প্রভাব বিনষ্ট হয় নাই। কেন্দ্রীয় মুগল সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য বা প্রতিবেশী জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য ঐ অঞ্চলের জমিদারগণ তাহাদের পালন করেন।

বাংলাদেশে পর্তুগীজদের ব্যবসা ও উপনিবেশের অবসান ঘটে মুগল সম্রাট শাহজাহানের সময়। শাহজাহানের প্রতিজ্ঞা ছিল এই দেশ হইতে পর্তুগীজদের তিনি বিতাড়িত করিবেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে

তাহাদের ক্ষমতা ও প্রভাব এত বৃদ্ধি পায় যে জোরপূর্বক এদেশবাসীদের ধর্মান্তরিত করিতে, মানুষ দাস হিসাবে ক্রয় করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিতে, এমনকি মুগল-শত্রু আরাকান রাজাকে সক্রিয় সাহায্য করিতে তাহারা সাহস পায়। এই সব রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে শাহজাহান তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন। বিদ্রোহী শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসন দখলের জন্য পর্তুগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহাদের কোন সাহায্য তিনি পান নাই। বিদ্রোহকালে শাহজাহান যখন বাংলায় আসেন তখন পর্তুগীজ জলদস্যুরা তাঁহার স্ত্রী মমতাজ মহলের চারিজন রূপসী দাসীকে অপহরণ করে। দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার পর পরই তিনি বাংলার শাসনকর্তা কাশিম খানকে বাংলাদেশ হইতে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করিতে আদেশ দেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কাশিম খান এক তীব্র সমরে পর্তুগীজদের পরাজিত করিয়া হুগলী শহর দখল করেন। এই দেশে অবাধে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিবার অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হয় এবং দাস ব্যবসা করিতে বারণ করা হয়। অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে পর্তুগীজরা এই দেশে হইতে ব্যবসা গুটাইতে শুরু করে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ পর্তুগীজ শক্তি বাংলাদেশ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিদায় নেয়। তারপর আসে ফরাসী ও ইংরেজ জাতির পালা।

পর্তুগীজদের আমদানী-রপ্তানী নীতি ও স্থায়ী অবদানের কথা কিছু বর্ণনা করা প্রয়োজন। তাহারা চীন দেশ হইতে আমদানী করিত কারুকার্য খচিত রেশমী কাপড়; মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ হইতে আনিত লবঙ্গ, এলাচি, দারচিনি প্রভৃতি গরম মসলা; বর্ণিও হইতে আনিত কর্পূর; সিংহল হইতে চীনাবাদাম; মালাবার হইতে গোলমরিচ। মালদ্বীপ হইতে আনিত কড়ি। বাংলাদেশে তখন কড়িই ছিল কেনাবেচার প্রধান মাধ্যম। পর্তুগীজরা বাংলাদেশ হইতে যে সব পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিত তাহার মধ্যে প্রধান ছিল চাউল, ডাইল, ঘি, তৈল, মোম ও মধু। আভ্যন্তরীণভাবে পর্তুগীজেরা কতিপয় শিল্প নিয়ন্ত্রণ করিত। যেমন মিষ্টি ও আচার শিল্প। নানা প্রকার রসাল ও শুকনা মিষ্টি তৈরীতে ছিল তাহারা সিদ্ধহস্ত। তখন দুধ ও চিনি উভয়ই ছিল প্রচুর সস্তা। নানা প্রকার সুস্বাদু মিষ্টি তৈরী করিয়া পর্তুগীজেরা সুনাম অর্জন করে। নানাবিধ আচার তৈরীতেও ছিল পর্তুগীজেরা অত্যধিক পটু। মিষ্টি ও আচার শিল্প প্রকৃতপক্ষে পর্তুগীজদের একক দান।

পর্তুগীজদের মধ্যে অনেকে এদেশে বিয়ে-সাদী করিয়া স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করে এবং বাঙ্গালী সমাজে সম্পৃক্ত হইয়া যায়। এইসব স্থায়ী বসবাস-কারী পর্তুগীজেরা বাংলার কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আমাদের দেশে এমন অনেক শস্য ও ফল-ফুল আছে যাহা পর্তুগীজ—পূর্বকালে ছিল না। নানাদেশ হইতে তাহারা এইগুলি আনিয়া বাংলাদেশে চালু করে। উত্তর আমেরিকা হইতে আনে গোলআলু ও তামাক, ব্রাজিল হইতে বাদাম, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া হইতে পেঁপে, আনারস, কামরাঙ্গা ও পেয়ারা, ইউরোপ হইতে আনে জলপাই ও কৃষ্ণকলি।

বাংলা ভাষা উন্নয়নেও পর্তুগীজেরা শ্রেষ্ঠ অবদান রাখে। অনেক পর্তুগীজ শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়, যেমন, বালতি, ছবি, সাবান, তোয়ালে আলপিন, বারান্দা, জানালা, কেদারা, মেজ, প্রভৃতি। বাংলা গদ্যে প্রথম বই পর্তুগীজেরা লিখে। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ এবং অভিধানও তাহারা রচনা করে।

অতিরিক্ত পাঠের জন্য গ্রন্থপঞ্জী:

J.N. Sarkar (ed.) : History of Bengal, vol. II, Dacca University Publication, Dacca, 1948. 2nd Imp. 1972.

M.A. Rahim : Social and Cultural History of Bengal, vol. I & II, Karachi, 1963 & 1966.

A. Karim : Social History of the Muslims of Bengal down to 1538, Dacca, 1959.

: Murshid Quli Khan and His Times, Dacca, 1963.

M.R. Tarafdar : Husain Shahi Bengal, Dacca, 1965.

T.K.Raychoudhuri: Bengal under Akbar and Jahangir, Delhi, 1968.

K.M. Karim : Bengal under Shahjahan, Dacca, 1975.

B.K. Gupta : Sirajuddoulla and the East India Company.

রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত) : বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, কলিকাতা,

সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, কলিকাতা, ১৯৬২

সুশীলা মণ্ডল : বঙ্গদেশের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৩

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১৭

তৃতীয় পর্ব

আধুনিক যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তার

বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা মনে করা ভুল যে পলাশীর বিপর্যয় একটিমাত্র বিশ্বাসঘাতকতার ফল। যখন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে (১৬৩৩ খৃঃ) তখন হইতেই রচিত হইতে থাকে পলাশীর পটভূমি। কিন্তু কি ভাবে? এদেশের সঙ্গে ইংরেজের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সমকালীন ইউরোপে ভৌগোলিক আবিষ্কার ও তৎপ্রসূত বাণিজ্যিক বিপ্লবের ফল এবং সেই বাণিজ্যিক বিপ্লবের ওপর ভিত্তি করিয়া যে শিল্প বিপ্লব ও তৎপ্রসূত ঔপনিবেশিকতা দানা বাঁধিয়া উঠে তাহারই পরিণতি পলাশী। এই তত্ত্বের বিস্তারিত আলোকপাত না করিয়া এখানে শুধু কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তারের প্রধান প্রধান ধাপসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে।

১৬৩৩ সনের মে মাসে মহানদীর মুখে হরিহরপুরে ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। দীর্ঘকাল পর তাহারা ১৬৫১ সনে হুগলী শহরে আরেকটি কুঠি স্থাপন করে। ঐ বৎসর বাংলার সুবাদার শাহজাদা সুজা ইংরেজদের এদেশে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার দেন। শর্ত ছিল এই যে, কোম্পানী সরকারকে বাৎসরিক মাত্র তিন হাজার টাকা রাজস্ব দিবে। অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করিয়া কোম্পানী তাহার বাণিজ্য দ্রুত সমপ্রসারণ করিতে থাকে। যে সব স্থানে নূতন কুঠি স্থাপন করা হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে কাশিমবাজার (১৬৫৮), পাটনা (১৬৫৮), ঢাকা (১৬৬৮), রাজমহল ও মালদহ। ১৬৮০ সন নাগাদ কোম্পানীর বাণিজ্য দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায় সরকারের বিরুদ্ধে কোম্পানীর নানা অভিযোগ। কোম্পানীর অভিযোগ ছিল যে, সরকারী কর্মচারীরা কোম্পানীর কর্মচারীদের অযথা হয়রানি করে, উৎপীড়ন করিয়া উৎকোচ দিতে বাধ্য করে ইত্যাদি। সরকারেরও অভিযোগ ছিল যে কোম্পানী শর্ত মোতাবেক বাণিজ্য না করিয়া অসদোপায় অবলম্বন করিতেছে।

এই সব অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া ১৬৮৬ সনে মুগল সরকার ও কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৬৮৯ সন পর্যন্ত জলে ও স্থলে এই যুদ্ধ চলে। ১৬৯০ সনে কোম্পানী সম্রাট আওরংজেবের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি করে। সেই চুক্তি মোতাবেক কোম্পানী সারা দেশে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা রাজস্বের বিনিময়ে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। কোম্পানীর এজেণ্ট জব্ চার্ণক সুতানাটি নামক গ্রামে তাঁহার দফতর স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ কলিকাতা নগরী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৬৯৮ সনে কোম্পানী কলিকাতা, সুতানাটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদারী সনদ লাভ করে। সরকার বার্ষিক বার হাজার টাকা রাজস্ব লাভ করিলেন। একই সনে অর্থাৎ ১৬৯৮ সনে কলিকাতায় ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা উইলিয়মের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গ নির্মিত হয়। মুগল সরকার তখন বুঝিতে পারেন নাই যে এই জমিদারী ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া একদিন সারা দেশই কোম্পানীর রাজত্বে পরিণত হইবে।

কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তারের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্রাট ফারুখ-শিয়ারের নিকট হইতে ফরমান লাভ (১৭১৭)। আওরংজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর হইতে সিংহাসন ও অন্যান্য উচ্চপদ নিয়া বিবাদ ও গৃহযুদ্ধ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কোম্পানী প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় উৎকোচ ও পুরস্কার দিয়া নানারকম সুযোগ সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করে। ১৭১৩ সনে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ফারুখশিয়ার সম্রাট হইলে কোম্পানী তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার দান করে এবং পরিবর্তে লাভ করে অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ফরমান। ফারুখশিয়ারের ফরমানের প্রধান ধারাগুলি নিম্নরূপঃ

১। কোম্পানী সরকারকে বাৎসরিক মাত্র তিন হাজার টাকা রাজস্ব দানের পরিবর্তে সারাদেশে বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্য করিবে।

২। কোম্পানীর মালামাল কোথাও চুরি হইলে সরকার তাহা ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে বা সমমূল্যের ক্ষতিপূরণ দিবে।

৩। কোন শুল্ক-চৌকিতে কোম্পানীর নৌকা-জাহাজ কোন রকম অজুহাতে আটক করা যাইবে না।

৪। মুর্শিদাবাদের টাকশালে কোম্পানী তাহার নিজস্ব টাকা তৈরী করিবে।

৫। সুবাদার কলিকাতার আশে পাশে আরও আটত্রিশটি গ্রামের উপর জমিদারী সনদ কোম্পানীকে দিবে।

৬। কোম্পানীর অধীনস্থ দেশীয় কর্মচারীদের বিচার করার অধিকার কোম্পানীর থাকিবে।

ফারুখশিয়ারের ফরমান দ্বারা দেশের সার্বভৌমত্বকে আংশিকভাবে বিলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাংলার শাসন তখন কেন্দ্রের মত দুর্বল ছিল না। মুর্শিদকুলী খানের সবল ও দক্ষ শাসনের ফলে কোন বৈদেশিক শক্তি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছিল না। কোম্পানী সম্রাট ফারুখশিয়ারের নিকট হইতে সুযোগ সুবিধার ফরমান লাভ করিলেও মুর্শিদ কুলী খান সেই ফরমান কার্যকরী করিতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁহার পরবর্তী সুবাদার সুজাউদ্দীন খান (১৭২৭—১৭৩৯) ও আলীবর্দী খানের (১৭৪০—১৭৫৬) সময়ও অনুরূপ নীতি অনুসৃত হয়। সেই জন্য মুর্শিদ কুলী খানের আমল হইতে প্রত্যেক সুবাদারের বিরুদ্ধে কোম্পানীর অভিযোগ ছিল এই যে তাঁহারা ফরমান মোতাবেক কাজ না করিয়া কোম্পানীর প্রতি ইচ্ছাকৃত বৈরীভাব পোষণ করিতেছেন। কিন্তু প্রত্যেক সুবাদার অতি কৌশলে কোম্পানীর সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্ব এড়াইয়া চলেন। কিন্তু আলিবর্দী খাঁনের মৃত্যুর (১৭৫৬) পর সেই কৌশলের রাজনীতির অবসান ঘটিল এবং সেই সঙ্গে শুরু হইল এই দেশে কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপনের তৃতীয় পর্যায়।

মুর্শিদ কুলী খানের পর হইতে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের যুগ এবং সেই ষড়যন্ত্রের ঘোলা পানিতে মাছ ধরার চেষ্টা করে কোম্পানী। মুর্শিদ কুলী খান তদীয় কন্যার পুত্র সরফরাজ খানকে উত্তরাধিকারী করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন খান ষড়যন্ত্র করিয়া নিজ পুত্র সরফরাজ খানকে উৎখাত করিয়া নিজে বাংলা বিহার উড়িষ্যার মসনদে বসেন। ১৭৩৯ সনে সুজাউদ্দীন তাঁহার পুত্র সরফরাজ খানকে (যাহাকে তিনি উৎখাত করিয়াছিলেন) উত্তরাধিকারী করিয়া মারা যান। আবার শুরু হইল ষড়যন্ত্র। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রীরা সরফরাজকে উৎখাত করিয়া আলীবর্দী খাঁনকে মসনদে বসান। আলীবর্দী খানের উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধেও শুরু হয় একই ষড়যন্ত্র। এই হেন ষড়যন্ত্রমূলক পরিবেশে কোম্পানীর নিয়ত চেষ্টা ছিল এমন দলকে সহযোগিতা করা যাহারা ফারুখ-শিয়ারের সেই ফরমান বাস্তবায়িত করিতে সাহায্য করিবে। সেই দলটি কারা?

সপ্তদশ শতকের শেষ নাগাদ ইউরোপের প্রায় প্রতিটি বাণিজ্যিক জাতি বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতেই দেখা যায় যে পাশ্চাত্য কোম্পানীগুলির, বিশেষভাবে ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর, সঙ্গে জড়িত দেশীয় বানিয়া-মুৎসদ্দীরা প্রচুর ধনার্জন করিয়া এক মহাপ্রভাবশালী বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই নব পুঁজিপতি শ্রেণী অচিরেই রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আপন শ্রেণী স্বার্থে, পুঁজির স্বার্থে ও মহাপুঁজিপতি কোম্পানীর স্বার্থে যখন যাহা প্রয়োজন তাহা সাধনে তাহারা প্রবৃত্ত হয়। মুর্শিদ কুলী খানের পর হইতে তাঁহারাই মসনদে নবাব বসান, নবাব উঠান। সিরাজউদ্দৌলার ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সিরাজউদ্দৌলার পতনের কথা পূর্ববর্তী এক পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। এখানে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে পলাশীর মাধ্যমে ফারুখশিয়ারের ফরমান পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হইল। শুধু তাহাই নহে, কোম্পানীকে কলিকাতার দক্ষিণে কল্পি পর্যন্ত জমিদারী সনদ দান করা হইল এবং কোম্পানীর অনুমতি ব্যতিরেকে নবাব অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন চুক্তি করিতে পারিবেন না এই মর্মে একটি সন্ধিও করা হইল। অর্থাৎ কোম্পানী এখন অদ্বিতীয় শক্তি হিসাবে বাংলার রাজনীতিতে আবির্ভূত হইল।

পলাশীর যুদ্ধের ফলে কোম্পানী অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করে, অকল্পনীয় প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই। রাজ্য স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয় পলাশীর পর হইতে। মীরজাফর ভাবিয়াছিলেন তিনি সুজাউদ্দীন খাঁন ও আলীবর্দী খাঁনের মত বিপ্লব করিয়া নিজে স্বাধীন নবাব হইবেন। কিন্তু তাঁহার নির্মাতা ক্লাইভের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। ক্লাইভ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের সমস্ত উপাদান নিশ্চিত করেন। কোম্পানীর জমিদারী আরও বিস্তার করিয়া চব্বিশ পরগণা জেলা ইহার অন্তর্গত করা হইল। দেশরক্ষার দায়িত্বভার কোম্পানী গ্রহণ করিলেন। সমগ্রদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার শুধু কোম্পানীই পায় নাই, কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসাও বিনাশুল্কে করার অলিখিত অধিকার তাহারা পায়। অর্থাৎ মীরজাফর কোম্পানীর ক্রীড়নক বৈ আর কিছুই রহিলেন না। ১৭৬০ সনে কোম্পানী বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলারও জমিদারী লাভ করে। এইভাবে বাংলার প্রায় অর্ধেক রাজস্বভূমি কোম্পানীর করতলগত হয়। চার বৎসর যাবৎ

উক্ত তিন জেলার উপর জমিদারী শাসন করিয়া কোম্পানী দেশের সম্পদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। অবশেষে বক্সারের যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সনে রবার্ট ক্লাইভ সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানী সনদ লাভ করিয়া দক্ষিণ এশিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৬৫১ সনে শাহ সুজা ইংরেজদের সুযোগ সুবিধা দিয়া যে সনদ দান করেন তাহারই শেষ পরিণতি ১৭৬৫ সনের দিউয়ানী সনদ। এই শত বৎসর ব্যবধানে অনেক সংঘর্ষ, অনেক যুদ্ধ, অনেক চুক্তি, অনেক ষড়যন্ত্র ও হঠকারিতা হইয়াছে। সব ঘটনার লক্ষ্য ছিল একই—এদেশে কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীউয়ানী ও দ্বৈত শাসন

১৭৬৫ সনের ১২ই আগষ্ট দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানী সনদ লাভ করে। সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে সুবাদার দুই রকমের ক্ষমতা ভোগ করিতেন। একটি দীওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব শাসনের ক্ষমতা, আরেকটি ফৌজদারী অর্থাৎ সামরিক ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতা। সুবাদারের প্রথমুক্ত ক্ষমতা কোম্পানীকে অর্পণ করা হয়। কেন ও কোন শর্তে এই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়? পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে সম্রাট সুবে বাংলা হইতে নিয়মিত রাজস্ব পাইতেন না। তখন হইতে নামে না হউক কাজে কর্মে ও ক্ষমতায় কোম্পানীই ছিল দেশের অধিকর্তা। সুবে বাংলা আবার দিল্লীর নিয়ন্ত্রণে আসিবে, আগের মতো নিয়মিত রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ করা হইবে, এই আশা সম্রাট প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় রবার্ট ক্লাইভ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া যখন সন্তোষজনক উপঢৌকন দিয়া নিয়মিত নির্ধারিত রাজস্ব প্রেরণের বিনিময়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দীউয়ানী প্রার্থনা করেন তখন সম্রাট শাহ আলম ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া সানন্দে তাঁহাকে দীউয়ানী সনদ দান করেন। শর্ত হইল, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আয় হইতে কোম্পানী সম্রাটকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দিবে আর নবাবকে দিতে হইবে বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা। নবাব ঐ ৫৩ লক্ষ টাকার মধ্যে নিজামত শাসন পরিচালনা করিবেন। দীউয়ানী ও ফৌজদারী শাসনের এই দ্বিধা বিভক্তি সাধারণভাবে দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত।

প্রশাসনে এই দ্বৈততা পূর্বেও ছিল (মুর্শিদ কুলী খানের সময় হইতে দীউয়ানী ও নিজামত ক্ষমতা এক হাতে আসে)। কিন্তু মুগল শাসনতন্ত্রের দ্বৈততা ও ক্লাইভের দ্বৈত শাসনের মধ্যে পার্থক্য বিরাট। পূর্বে ক্ষমতার দ্বৈততার সঙ্গে ছিল দায়িত্বের দ্বৈততা এবং দীউয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতার ভারসাম্যতা তদারক করিতেন সম্রাট নিজে। কিন্তু ক্লাইভের দীউয়ানী লাভের পর যে দ্বৈততা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে একচেটিয়া ক্ষমতা স্থাপিত

হইল কোম্পানীর হাতে, কিন্তু সেই ক্ষমতা ছিল নিতান্তই দায়িত্ব ছাড়া ক্ষমতা। অপরপক্ষে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, জনগণের দায় অধিকার দেখার দায়িত্ব নবাবের থাকা সত্ত্বেও তাঁহার হাতে কোন ক্ষমতা রহিল না। অর্থাৎ কোম্পানীর ক্ষমতা আছে দায়িত্ব নাই, আর নবাবের দায়িত্ব আছে কিন্তু ক্ষমতা নাই।

দ্বৈত শাসনের দুর্বোধ্যতা ও দুর্ভোগ চরমে উঠে যখন ক্লাইভ নিজ হাতে দীউয়ানী শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ না করিয়া দ্বৈতের ভিতরেও আরেক দফা দ্বৈত সৃষ্টি করেন। ক্লাইভের পক্ষে সরাসরি দীউয়ানী শাসন গ্রহণ করার অনেক অসুবিধা ছিল। কোম্পানীর লোকশক্তির অভাব ছিল, অভাব ছিল রাজস্ব শাসনে অভিজ্ঞতা। রাজস্ব ব্যাপারে স্থানীয় আইন কানুন আচার প্রথা সম্পর্কে কোম্পানীর কর্মচারীরা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই ক্লাইভ দীউয়ানী শাসন পরিচালনার জন্য রাজস্ব বিশারদ সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানকে নায়েব দীউয়ান নিযুক্ত করেন। পূর্বেকার মুগলী প্রথায় রাজস্ব শাসন পরিচালনার জন্য রেজা খানকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইল। ভূমি বন্দোবস্ত, রাজস্ব সংগ্রহ, কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজ সম্পূর্ণভাবে রেজা খানের হাতে ন্যস্ত করা হইল। কোম্পানীর সঙ্গে রেজা খানের চুক্তি ছিল এই যে কোম্পানী রাজস্ব শাসন ব্যাপারে প্রচলিত প্রথায় কোন পরিবর্তন আনিবেনা। রেজা খান রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া সমস্ত খরচ মিটাইবার পর উদ্বৃত্ত রাজস্ব কোম্পানীকে প্রদান করিবেন। কোম্পানীর পক্ষ হইতে একজন ইউরোপীয় প্রতিনিধি মুর্শিদাবাদ দরবারে উপস্থিত থাকিবেন।

ক্লাইভের এই দ্বৈত ব্যবস্থায় একটি ভাল দিক ছিল এই যে ইহা মুগল শাসন ব্যবস্থাকে অটুট রাখে। কোম্পানীর কর্মচারীরা রাজস্ব ব্যাপারে প্রথম প্রথম কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। অন্ততঃ ক্লাইভ যতদিন কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর ছিলেন ততদিন রেজা খান পূর্ণ কৃতিত্ব সহকারে মুগলী প্রথায় শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার দ্বৈত ব্যবস্থায় ফাটল ধরে, রেজা খান ক্রমশঃই নানা অসুবিধা ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হন। কোম্পানীর কর্মচারী ও গোমস্তাদের লুন্ঠন নীতির ফলে দেশের দুরাবস্থা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রেজা খান নিরূপায়। তিনি কলিকাতার সিলেক্ট কমিটিকে অবহিত করেন যে, কোম্পানীর কর্মচারী ও গোমস্তাগণ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন

করিয়াছে, তাহারা বলপূর্বক অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি কিনিয়া অধিক মূল্যে বিক্রি করে, রাইয়তদেরকে তাহারা নানাবিধ জিনিস সরবরাহ করিতে বাধ্য করে, প্রথানুসারে শুল্ক দিতে তাহারা অস্বীকার করে, দেশীয় ব্যবসায়ীদেরকে উৎপীড়ন করে। কিন্তু কোম্পানী তাঁহার প্রতিবাদের কোন প্রতিকার করা প্রয়োজন মনে করে নাই।

কোম্পানীর কর্মচারী-গোমস্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও অত্যাচারের দরুন দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। তার উপর আসে রাজস্ব বৃদ্ধির চাপ। পলাশীর পর হইতে দেশের সম্পদ কমিতে থাকে। অথচ রাজস্বের হার প্রতি বছর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেমন, ১৭৬৯ সনে রেজা খান অভিযোগ করেন যে, আলিবর্দী খাঁর আমলে পূর্ণিয়া জেলার বাৎসরিক রাজস্ব যেখানে মাত্র চার লক্ষ টাকা ছিল সেখানে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৬৯ সালে ২৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। এমনিভাবে, দিনাজপুর জেলার রাজস্ব ১২ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া সতর লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। সম্পদ অতিরিক্ত এই রাজস্ব সংগ্রহ করিতে রেজা খানের উপর ভীষণ চাপ আসে। রেজা খানকে বাধ্য হইয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। ফলে অনেক পরগণা হইতে রাইয়তেরা আমিলদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যত্র পলায়ন করে বা পেশা পরিবর্তন করে। ১৭৬৯ সনের মার্চ মাসে রেজা খান কোম্পানীকে হুশিয়ার করিয়া দেন যে কোম্পানী যদি শোষণ নীতি পরিহার না করেন, কর্মচারী ও গোমস্তাদের ব্যক্তিগত একচেটিয়া ব্যবসা যদি বন্ধ না করেন, দেশের কৃষির উন্নতির দিকে যদি মনোনিবেশ না করেন, তবে অচিরেই একটি বড় রকমের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিবে। তিনি কলিকাতা সিলেক্ট কমিটিকে লিখেন,

"(২৮শে মার্চ ১৭৬৯) ইতিপূর্বে এদেশ এত সম্পদশালী ছিল যে দূরদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা এখানে পণ্য দ্রব্য কেনা বেচার জন্য আসিত। আলীবর্দী খানের আমলে ইউরোপীয়রা ছাড়াও আগ্রা, লাহোর, মুলতান, গুজরাট, ফেরকাবাদ, হায়দ্রাবাদ ও সুরাট বন্দর হইতে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিগণ এদেশ হইতে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার কাপড় ও রেশম কিনিত। এর ফলে রাইয়ত, স্থানীয় ব্যবসায়ী, সরকার সবাই উপকৃত হইত। এখন বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রত্যেকটি শাখা ধ্বংস হইয়াছে। ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিরা অবসর গ্রহণ করিয়াছে। বৎসরে এখন ৭ লক্ষ টাকার অধিক মালামাল

রপ্তানী হয় না। ফলে টাকার অভাবে রাজস্ব দিতে জনগণ ব্যর্থ হইতেছে। অক্ষম জনগণের নিকট হইতে বলপূর্বক রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হইতেছে। ইতিমধ্যেই ইহার ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আশু প্রতিকার না করিলে মহাবিপর্যয় আর রোধ করা যাইবে না।"

কিন্তু রেজা খানের এই হুশিয়ারী সত্ত্বেও অর্থনীতির অধোগতি রোধ করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। আগের মতোই কোম্পানীর কর্মচারী ও তাঁহাদের গোমস্তাদের অত্যাচার চলিতে থাকে। ফলে সেই 'মহাবিপর্যয়' ১৭৬৯ সালের শেষ হইতে শুরু হইল। ১৭৬৮ সালে বৃষ্টির অভাবে ভাল ফসল হয় নাই। পর বৎসর আট মাস যাবৎ কোন বৃষ্টি হয় নাই। দীর্ঘ খরায় মাঠ ঘাট সব শুকাইয়া চৌচির হইয়া যায়। গভর্ণর ভেরেলসট কোর্ট অব ডাইরেক্টারকে অবহিত করিয়া লেখেন, (২৩শে নভেম্বর ১৭৬৯), "মহাশঙ্কার সহিত আপনাদের জানাইতেছি যে আমরা এখানে এক মহা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতেছি। অভূতপূর্ব খরার জন্য শস্য বিনষ্ট হওয়াতে খাদ্য শস্যের চরম অভাব দেখা দিয়াছে। এক মহা-প্রলয়ঙ্করী দুর্ভিক্ষ অতি আসন্ন।" ১৭৭০ সনের গ্রীষ্মে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। টাকায় একমণ হইতে চাউলের মূল্য বাড়িতে বাড়িতে টাকায় ৩ সেরে আসিয়া পেঁাছাইল। যে যৎসামান্য চাউল ডাউল খোলা বাজারে ছিল তাহা কোম্পানীর কর্মচারী ও গোমস্তারা কিনিয়া অধিক মোনাফার জন্য মওজুত করিল। অনাহারে চতুর্দিকে মৃত্যু আর মৃত্যু। মুর্শিদাবাদ হইতে কোম্পানীর আবাসিক প্রতিনিধি রিচার্ড বেচার রিপোর্ট দেন (২৫ জুন, ১৭৭০). "ইহা এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। ইহার বর্ণনা অসম্ভব। দেশের কয়েকটি অংশে যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষকে ভক্ষণ করিতেছে তাহা গুজব নয়, অতি সত্য। অনাহার জনিত মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি ষোল জনের মধ্যে ছয় জন।"

দুর্ভিক্ষের দুঃখ প্রশমনের জন্য সরকার কি করিয়াছে? কিছুই যে করে নাই তাহা নয়। মুর্শিদাবাদে কয়েকটি লঙ্গরখানা খোলা হয়। বিভিন্ন জেলায় লঙ্গরখানা খোলার জন্য সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করেন তাহা নিম্নরূপঃ

মুর্শিদাবাদ	১,৫২,৪৪৩ টাকা
বীরভূম	২,৯৪০ ,,
হুগলী	৪,৪৭৬ ,,
পূর্ণিয়া	১৭,২৯৪ ,,

ইউসুফপুর	১,০৬২ ,,
বাগলপুর	৫,০৬৭ ,,

কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য ছিল জ্বলন্ত চুল্লীতে এক ফোটা পানি মাত্র। চার্লস গ্রান্ট মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষের দৃশ্য বর্ণনা করিয়া বলেন, "আমি স্বচোখে যাহা দেখিলাম, মুর্শিদাবাদে ৭৭ হাজার লোককে অনেক মাস যাবৎ খাওয়ানোর পরও প্রত্যহ সেখানে প্রায় পাঁচ শত লোক মৃত্যুর কোলে চলিয়া পড়ে। বিশেষ এক দল লোক রাস্তাঘাট হইতে মৃতদেহ কুড়াইবার জন্য নিয়োজিত হয়। মৃতদেহ যাহারা কুড়ায় তাহারাও ক্ষুধার জ্বালায় একে একে মৃত্যু বরণ করে। রাস্তা ঘাটে ও ঘরের ভিতর পড়িয়া থাকা মৃতদেহ শিয়াল, কুকুর, শকুনী খাইতে থাকে। পঁচাদেহের পুঁতিগন্ধ ও অর্ধজীবিতের কান্না-কাতরানির জন্য রাস্তার বাহির হওয়া দায়। পরিস্থিতি এমন পাশবিক যে শিশু মৃত পিতামাতাকে খায়, মাতা তাহার মৃত বাচ্চাকে খায়।"

১৭৭০ সালের শেষে দুর্ভিক্ষ অনেকটা প্রশমিত হয়। কিন্তু মৃত্যু বন্ধ হয় নাই। চতুর্দিকে কলেরা বসন্ত মহামারী আকারে দেখা দেয়। যাহারা এতদিন কোনমতে জীবিত ছিল তাহারাও এইবার মহামারী রোগের কবলগ্রস্ত হয়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ঠিক কত লোক মারা যায় তাহার কোন সঠিক হিসাব আমাদের কাছে নাই। সরকার ইহার কোন গনণা করেন নাই। তবে বিভিন্ন সমসাময়িক সূত্রে বলা হয় যে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক এই দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষজনিত মহামারীতে মারা যায়। কিন্তু এত বড় ধ্বংসযজ্ঞেও কোম্পানী আগের মতোই রাজস্ব আদায় করে। ১৭৬৫–৭০ সনে গড়ে বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৪৩,০০,০০০ টাকা। আর দুর্ভিক্ষ-বৎসর ১৭৭০ সালে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৩৬,৯৯,৫৩৮ টাকা। অবশ্য ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে এই দুর্ভিক্ষে বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলা সমূহ তেমন আক্রান্ত হয় নাই। বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলাগুলিতে তেমন শস্যহানি হয় নাই। এই অঞ্চল হইতে সরকারী রাজস্ব পূর্ণভাবে সংগৃহীত হয়। কিন্তু তবুও বাংলার বৃহত্তর অংশ যেখানে দুর্ভিক্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত, সেখানে রাজস্ব সংগ্রহ যদি পূর্বেকার বৎসরের প্রায় সমান হয় তবে ইহা বলিতে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে এই রাজস্ব সংগ্রহ করিতে বৃটিশরা নিশ্চয়ই অতি ঘৃণ্য পাশবিক বর্বরোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পন্থার বিরুদ্ধে

রেজা খানের যুক্তিতর্ক বাদ-প্রতিবাদ তাহাদের নির্মম কানে প্রবিষ্ট হয় নাই। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছিল এই যে অনেক রাইয়ত সরকারী আমিলের অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বাড়ীঘর ফেলিয়া পলায়ন করে, দস্যুবৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। তাহাদের জমি অনাবাদ পড়িয়া থাকে। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও পলায়নের ফলে বাংলাদেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি পতিত ও জংগলাকীর্ণ হইয়া পড়ে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভূমি ব্যবস্থা ও ভূম্যধিকারী সমাজ

১৭৬৯-৭০ সনের দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতা ও সাধারণভাবে আইন, শৃঙ্খলা ও অর্থনীতির পতন দ্বৈত শাসনের ব্যর্থতা প্রমাণ করিল। কোম্পানী বাহাদুরের প্রত্যয় হইল এইবার দায়িত্বহীন দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটাইয়া নিজ হাতে দীউয়ানী শাসন গ্রহণ করা উচিত। ১৭৭২ সনে কোর্ট অব ডাইরেক্টরের আদেশ বলে নায়েব দীউয়ান রেজা খানকে অপসারিত করিয়া কোম্পানীর সরকার নিজ হাতে দীউয়ানীর ভার গ্রহণ করে।

গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংসের উপর এমন একটি ভূমি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব পড়িল যাহা দেশবাসী ও কোম্পানী উভয়ের জন্যই লাভজনক হইবে। কিন্তু এ হেন ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হেষ্টিংসের সম্মুখে তিনটি বড় অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ দেশের গোটা সম্পদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন জরীপ না হওয়ায় হেষ্টিংস জানিতেন না কোন্ ভিত্তিতে তিনি রাজস্ব নির্ধারণ করিবেন। পূর্বেকার রাজস্ব রেকর্ডকেও মান হিসাবে ধরা যায় না; কেননা পলাশীর পরে রাজস্ব শাসনে অব্যবস্থা ও মহাদুর্ভিক্ষে লোকক্ষতির দরুন ভূমি সম্পদে যে ঘাটতি দেখা দিয়াছে তাহার কোন সঠিক পরিসংখ্যান জ্ঞান না থাকায় হেষ্টিংসের পক্ষে রাজস্ব নির্ধারণের কোন একটি গ্রহণযোগ্য ভিত্তি মানিয়া নেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। তাঁহার দ্বিতীয় বড় অসুবিধা ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করার মাধ্যম নির্ধারণ করা। কাহার মাধ্যমে কোম্পানী রাজস্ব সংগ্রহ করিবে? কোম্পানীর এত লোক নাই যে প্রত্যেক এলাকায় নিজস্ব এজেন্ট নিয়োগ করিয়া রাইয়তের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিবে। তা' ছাড়া, ভাষা, স্থানীয় প্রথা আচার, রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতাও ছিল সীমাহীন। সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহে প্রশাসনিক খরচও পড়ে অনেক। অতএব দেশীয় এজেন্সির মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করাই উত্তম। ইহার মধ্যেই নিহিত ছিল হেষ্টিংসের তৃতীয় অসুবিধা। কাহারা হইবে এই দেশীয় এজেন্সি? জমিদার? ইজারাদার? জমির সঙ্গে জমিদার বা ইজারাদারের সম্পর্ক কি হইবে? অর্থাৎ জমির মালিক কে? সরকার, জমিদার-

ইজারাদার, না রাইয়ত ? যেই জমির মালিক হউক না কেন রাজস্ব সংগ্রহ-কারীর সঙ্গে রাইয়ত ও সরকারের সম্পর্ক কি হইবে ? তাহাদের পারস্পরিক দায় অধিকার কিভাবে এবং কোন ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে ?

ওয়ারেন হেষ্টিংসের বুঝিতে দেরী হয় নাই যে এদেশের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন স্থায়ী সিদ্ধান্তে পেঁছার আগে ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। সেই অভিজ্ঞতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িক স্বল্পমেয়াদী ভূমি বন্দোবস্ত নীতি অবলম্বন করার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহার নিকট সর্বপ্রথম সমস্যা ছিল দেশের সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং সেই সম্পদ অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব স্থির করা। কোম্পানীর সরকার মনে করেন যে জমিদার তালুকদারগণ কোন অবস্থাতেই সঠিক তথ্য পরিবেশন করিবে না ; তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিবে দুভিক্ষজনিত ক্ষতির অজুহাতে জমির প্রকৃত মূল্য গোপন করিতে এবং সম্পদের তুলনায় অনেক কম রাজস্ব বন্দোবস্ত আদায় করিতে। জমিদারগণ যেন ইহা না করিতে পারে সেই জন্য হেষ্টিংস পাঁচ বৎসরের জন্য জমি নিলামের মাধ্যমে ইজারা দিবার সিদ্ধান্ত নেন। নিলামে যাহারা সর্বোচ্চ ডাক দিবে তাহাদের সঙ্গেই জমি পাঁচ বৎসরের মেয়াদে বন্দোবস্ত করা হইবে। সরকারের ধারণা হইল যে সম্পদের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত জমিদার চেষ্টা করিবে জমিদারী নিজের দখলে রাখার জন্য। এমনিভাবে জমির আসল মূল্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধনী ফটকাবাজেরা জমিদারদের চাইতে বেশী নিলাম ডাকিয়া পঞ্চসনা ইজারা লাভ করে। অধিকাংশ জমিদার জমিদারী পরিচালনা হইতে বঞ্চিত হইয়া পেনশনভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার কিছু পূর্বেই হেষ্টিংস পঞ্চসনা বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া কি তাহা জানিতে চেষ্টা করেন। পঞ্চসনা বন্দোবস্ত পরিচালনার জন্য পাঁচটি প্রাদেশিক কাউন্সিল করা হইয়াছিল। ঐ সব প্রাদেশিক কাউন্সিলকে পঞ্চসনা বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া জানাইতে বলা হইল। তাহাদের রিপোর্টে জানা যায় যে পঞ্চসনা বন্দোবস্ত সারাদেশে অত্যাচার উৎপীড়ণের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বেশীর ভাগ ইজারাদারই সম্পদোতিরিক্ত নিলাম ডাকে। অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করিতে তাহারা অমানসিক অত্যাচার উৎপীড়ন শুরু করে। তাহাদের অত্যাচারে অনেক রাইয়ত বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলায়ন করে। ঢাকা প্রাদেশিক কাউন্সিলের

প্রধান রিচার্ড বারওয়েল রিপোর্ট দেন (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৫), "দেওয়ানী লাভের পর হইতে বিশেষ করিয়া ১৭৭২ সালের ইজারাদারী বন্দোবস্তের পর হইতে দেশের কৃষি ও কৃষক সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" সব প্রাদেশিক কাউন্সিলই অনুরূপ মত প্রকাশ করে। হেষ্টিংস নিজে স্বীকার করেন যে পঞ্চসনা বন্দোবস্তের ফলে দেশের কৃষি শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ১৭৭৫ সনের ৮ই মার্চ তারিখে তিনি এক মিনিটে লেখেন, "১৭৭২ সালে দেশের রাজস্ব সম্পর্কে কোম্পানীর জ্ঞান এত সীমিত ছিল যে নিলামী বন্দোবস্ত ছাড়া উপায় ছিল না। জমির মূল্য শুধু জমিদারেরাই জানিতেন। তাঁহারা সরকারের নিকট তাঁহাদের সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য ফাঁস করিয়া দিবেন এমন আশা করা বাতুলতা। তাহাদের অধীনস্ত জমির সত্যিকারের মূল্য যাচাই করার একমাত্র উপায় ছিল জমি নিলামে বন্দোবস্ত করা। কিন্তু বিপদ হইল যে এই ব্যবস্থার ফলে ফটকাবাজদের মধ্যে এমন জোর প্রতিযোগিতা হইয়াছে যে, অনেক স্থলেই জমির আসল মূল্যের অনেক অধিক ডাকা হইয়াছে। ফলে কৃষকের উপর নিদারুণ চাপ পড়িয়াছে।" জমি ও কৃষকের সঙ্গে ইজারাদারদের কোন স্থায়ী স্বার্থ ও সম্পর্ক ছিল না। অতএব, ইজারার মেয়াদ যতই ঘনাইয়া আসে ততই ইজারাদারগণ তাহাদের শোষণ প্রক্রিয়া আটাইয়া আনে। তাহাদের স্বাভাবিক ভয় ছিল যে মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে তাহাদের পক্ষে বকেয়া রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না।

পঞ্চসনা বন্দোবস্তের ফলাফল কোর্ট অব ডাইরেক্টারকে জানানো হইলে কোর্ট ইজারাদারী নিলামী ব্যবস্থা বিলোপ করিয়া বাৎসরিক মেয়াদে প্রধানতঃ জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্ত করার জন্য পরামর্শ দেন। নিলামী বন্দোবস্তের সঙ্গে প্রাদেশিক কাউন্সিলও উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ইহার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি শক্তিশালী বোর্ড অব রেভেনিউ। বোর্ড প্রত্যেক জেলায় কালেক্টার নিযুক্ত করিয়া বাৎসরিক মেয়াদে জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্ত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাৎসরিক মেয়াদে সরকারী রাজস্ব দাবী যে সব জমিদার গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হয় তাহাদের জমিদারী ইজারাদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়। অনেক জমিদারই সরকারের উচ্চ রাজস্ব দাবী মানিয়া নেয় নাই। তাহারা বাৎসরিক শতকরা ১০ টাকা মালিকানা ভাতার পরিবর্তে জমিদারী ইজারাদারের তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দেয়। কৃষকের উপর ইজারাদারদের শোষণ পেষণ থাকিয়াই গেল। ১৭৮৪ সনের পিট্‌স ইণ্ডিয়া বিল আলোচনায় ইজারাদারী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা

হয়। পিট্স ইণ্ডিয়া আইনে শুধুমাত্র জমিদারদের সঙ্গে ভূমি বন্দোবস্ত করার সুপারিশ করে। একটি স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ইহার বাস্তবায়নের জন্য চিরস্থায়ী আইন কানুন প্রণয়ন করার জন্যও পিট্স ইণ্ডিয়া আইন কলিকাতার কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়।

চিরস্থায়ী আইন প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট আদেশ নিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৬ সনে গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। কর্ণওয়ালিস নিজে ছিলেন একজন ভূম্যধিকারী। বৃটিশ পার্লামেন্টেও ছিল ভূম্যধিকারীদের আধিপত্য। কলিকাতা কর্তৃপক্ষ ও বৃটিশ সরকার উভয়েই বাংলাদেশে বিদ্যমান জমিদার শ্রেণীকে বৃটিশ ভূম্যধিকারী সমাজের সমজাতীয় মনে করিলেন। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মুগল আমলে জমিদার ছিল সরকারী রাজস্বের সংগ্রাহক। রাইয়তেরা নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব দিত। সেই রাজস্ব সংগ্রহ করার জন্য সরকার বংশানুক্রমিক জমিদার নিযুক্ত করেন। সংগৃহীত রাজস্বের $\frac{১}{১০}$ ভাগ জমিদার নিজে রাখিতেন আর বাকী ৯ ভাগ পাইতেন সরকার। সরকারের অনুমতি ছাড়া জমিদার জমি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না, কেননা জমির মালিকানা ছিল সার্বভৌম সরকারের হাতে। যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হইলে জমিদারকে জরিমানা করা হইত, বন্দি করা হইত, প্রয়োজন হইলে শারীরিক নির্যাতন করা হইত বা পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে জমিদার করা হইত। কিন্তু কোন অবস্থাতেই জমিদারী হইতে গোটা পরিবারকে বঞ্চিত করা হইত না। রাইয়তের বেলায়ও ছিল একই প্রথা। নিরিখ-মতে তাহারা রাজস্ব দিত। রাজস্ব দিলে জমি হইতে তাহাদেরকে জমিদার উৎখাত করিতে পারিত না। এক কথায় মুগল আমলে জমিদার ছিলেন সরকারের বংশানুক্রমিক স্থানীয় প্রতিনিধি। রাইয়তের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ছিল প্রথা ও সামাজিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল।

হেষ্টিংসের আমলে মুগল ভূমি ব্যবস্থা পরিহার করিয়া পঞ্চসনা ও পরে বাৎসরিক মেয়াদে রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রচলন করাতে সরকার ও রাইয়ত উভয়েরই ক্ষতি হইয়াছে। ১৭৮৪ সনের আইন মোতাবেক কর্ণওয়ালিস চাহিলেন ভূমি ব্যবস্থার চিরস্থায়ী আইন প্রণয়ন করিতে। কিন্তু চিরস্থায়ী আইন প্রণয়নের নামে কর্ণওয়ালিস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন তাহা মুগলী আইন বা পিটের আইন, কোনটার মধ্যেই পড়ে না। তিনি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন তাহা ছিল সম্পূর্ণ বৃটিশ মডেলের। ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত করার আগে তিনি ১৭৮৯-৯০ সনে জমিদারদের সঙ্গে একটি দশসনা বন্দোবস্ত করেন এবং ঘোষণা করেন যে তাঁহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিকল্পনা কোর্ট অব ডাইরেক্টার অনুমোদন করিলে এই দশসনা বন্দোবস্তকেই তিনি চিরস্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করিবেন। কোর্ট অব ডাইরেক্টার তাঁহার পরিকল্পনা অনুমোদন করে ১৭৯২ সনে। ১৭৯৩ সনের মার্চ মাসে কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করেন। ইহার অর্থ এই যে, এখন হইতে জমির একচেটিয়া মালিক হইবে জমিদার। রাইয়তগণ হইবে তাহাদের প্রজা। মালিক হিসাবে জমিদার জমি বিক্রয় করিতে, দান করিতে বা যে কোন কার্যে ব্যবহার করিতে পারিবে; সরকারের পূর্ব সম্মতি নিতে হইবে না। প্রজার সঙ্গে তাহাদের দায় অধিকার নির্ধারণেও সরকারের কোন সম্মতি নিতে হইবে না। সর্বোপরি দশসনা বন্দোবস্তকালে যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে ভবিষ্যতে তাহার আর পরিবর্তন হইবে না। চিরকালের জন্য তাহা স্থির বলিয়া গৃহীত হইবে। তবে শর্ত হইল এই যে এখন হইতে জমিদারদের রাজস্ব কিস্তি নিয়মিত শোধ করিতে হইবে, নচেৎ জমি নিলামে বিক্রী করিয়া বকেয়া রাজস্ব আদায় করা হইবে। আঞ্চলিক অভিজাত শ্রেণী হিসাবে আগে জমিদারদের হাতে যে বিচার ও পুলিশ ক্ষমতা ছিল তাহা এখন আর থাকিবে না। সায়ের বা শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা হইতেও জমিদার বঞ্চিত হইল। অর্থাৎ পূর্বের সামন্ত-ক্ষমতা হইতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য কি ছিল? ১৭৭২ সনের পর হইতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোচনা শুরু হয়। ইহার পক্ষে যুক্তি ছিল এই যে, ভূমি ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আসিলে জমিদারগণ ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করিবেন। নিজের স্বার্থেই জমিদার তাহার উদ্বৃত্ত অর্থ জমির উন্নয়নে ব্যবহার করিবেন। তাহার ফলে জমি উন্নত হইবে, কৃষি শিল্পে উৎপাদন বাড়িবে, দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধশালী হইবে। ইংলণ্ডে যেমন ভূম্যধিকারী সমাজ কৃষি শিল্পে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে তেমনি বাংলাদেশেও জমিদারদের নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লব হইবে। তা ছাড়া, জমিদার সমাজ শত সুবিধার বিনিময়ে সরকারের অনুগত থাকিবে। সামাজিক শাসক হিসাবে এমনিভাবে জমিদার শ্রেণী হইবে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি।

পাঁচসনা, একসনা, দশসনা ও পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের সমাজবিন্যাসে, বিশেষভাবে ভূম্যধিকারী সমাজে, যে পরিবর্তন আসিয়াছে

তাহার সামান্য আলোচনা প্রয়োজন। পাঁচসনা ইজারাদারী বন্দোবস্তের ফলে অধিকাংশ জমিদার তাহাদের জমিদারী ব্যবস্থাপনা হইতে বঞ্চিত হয় এবং তাহাদের স্থান দখল করে নতুন পুঁজিপতি, যাহাদের ইতিপূর্বে ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। কোম্পানীর কর্মচারী, মুৎসদ্দী, বানিয়ারা তাহাদের প্রভাব প্রয়োগ করিয়া ইজারা লাভ করে। উচচপদস্থ কর্মচারীরা তাহাদের ব্যক্তিগত বানিয়াদের নামে বেনামী ইজারা লাভ করে। এমনকি গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস পর্যন্ত তাঁহার ব্যক্তিগত বানিয়াদের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার ইজারা গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিতে বানিয়া-মুৎসদ্দীর অনুপ্রবেশ এদেশের সামাজিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করে। এই বানিয়া-মুৎসদ্দী শ্রেণীই ধীরে ধীরে স্থায়ী ভূম্যধিকারী শ্রেণীতে পরিণত হয়, এবং আধুনিক বাংলার প্রথম কাতারের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্মান ও শক্তি লাভ করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূম্যধিকারী সমাজে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোন জরীপের উপর ভিত্তি করিয়া সম্পন্ন হয় নাই। ফলে অনেক জমিদারীতে সম্পদতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য করা হয়, আবার অনেক জমিদারীতে সম্পদের চাইতে অনেক কম রাজস্ব ধার্য করা হয়। ফলে অধিক রাজস্ব জর্জরিত জমিদারীগুলি অল্পকালের মধ্যেই সূর্যাস্ত আইনে নিলামে বিক্রী হইয়া যায়। বাংলার বড় বড় জমিদারীগুলিই সাধারণতঃ সূর্যাস্ত আইনের শিকার হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে দেশের গোটা রাজস্বের প্রায় অর্ধেক রাজস্ব দিত ছয়টি বড় জমিদারী। এইগুলি হইতেছে বর্ধমানের জমিদারী, নাটোরের জমিদারী, দিনাজপুরের জমিদারী, নদীয়ার জমিদারী, বীরভূমের জমিদারী ও বিষ্ণুপুরের জমিদারী। এই সব বিশালাকার জমিদারদের মুগল সরকার রাজা, মহারাজা উপাধি দেন। এইসব রাজাদের মধ্যে একমাত্র বর্ধমানের রাজা ছাড়া বাকী সব কয়টি রাজাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম সাত বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইয়া যান। পরবর্তীকালে জমিদার হিসাবে তাহাদের যে স্বত্ব থাকে তাহা পূর্ব আয়তনের ছায়া মাত্র। এইসব মহাজমিদারীগুলি যাহাদের কাছে হস্তান্তরিত হয় তাহাদের বেশীর ভাগই ছিল সরকারী ও জমিদারের কর্মচারী, বানিয়া-মুৎসদ্দি, ব্যবসায়ী, মহাজন ইত্যাদি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে যে সব বড় বড় নতুন জমিদার পরিবারের আবির্ভাব হয় তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশিমবাজার জমিদারী। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ছিলেন গভর্ণর জেনারেল

ওয়ারেন হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত বানিয়া ; মুর্শিদাবাদের কান্দির জমিদারী, ইহার প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গা-গবিন্দ সিং ছিলেন হেষ্টিংসের মুৎসদ্দি। নড়াইলের (যশোর) জমিদারী, ইহার প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ রায় ছিলেন নাটোর জমিদারীর প্রধান গোমস্তা ; কলিকাতার ঠাকুর জমিদারী, ইহার প্রতিষ্ঠাতা গোপীনাথ ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথমে সরকারী কর্মচারী ও পরে ব্যবসায়ী ; ঢাকার খাজা পরিবার, ইহার প্রতিষ্ঠাতা খাজা আলিমুল্লা (নবাব আবদুল গনিব পিতা) ছিলেন ব্যবসায়ী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে আবির্ভুত এইসব প্রকাণ্ড নতুন জমিদারেরা প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে রাজা, মহারাজা, নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন।

উইলিয়ম হান্টারের অনুকরণে অনেকে মনে করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদার সব ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহাদের স্থান দখল করেন নব্য হিন্দু পুঁজিপতি। এই ধারণার ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা নাই। মুগল আমল হইতে ভূমি প্রশাসনে হিন্দুদের ছিল একচেটিয়া আধিপত্য, আর মুসলমানদের ছিল বিচার বিভাগে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে ছয়টি বৃহৎ জমিদারীর মধ্যে একমাত্র বীরভূমের রাজা ছিলেন মুসলমান, বাকী সবাই হিন্দু। ক্ষুদ্র জমিদারদের মধ্যেও বেশীরভাগ ছিলেন হিন্দু। যে যৎসামান্য জমিদার ছিলেন মুসলমান তাহাদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র জমিদারগণ সূর্যাস্ত আইনে খুব কমই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব ফলে ভূম্যধিকারী সমাজের গঠন ও মানসিকতায় যে পরিবর্তন আসে তাহার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইতেছে জমিদারদের অনুপস্থিতি ও পর্যায়ক্রমে মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যেই বাংলার প্রায় অর্দ্ধেক রাজস্বভূমি নূতন জমিদারদের হস্তগত হয়। এইসব নূতন জমিদারদের অনেকেই শহরে বসবাস করিয়া পুরাতন ব্যবসায় লিপ্ত থাকে। জমিদারীকার্য পরিচালিত হয় স্থানীয় নায়েব গোমস্তা কর্তৃক। জমিদারী পরিচালনার ঝামেলা এড়াইবার জন্য অধিকাংশ অনুপস্থিত নব্য জমিদার নানা রকমের মধ্যস্বত্ব প্রথা সৃষ্টি করে। মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব বাংলার গ্রামীন সমাজের এক নূতন সমস্যা। কৃষকের সঙ্গে জমিদারের সরাসরি সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। শুধু জমিদারের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। মধ্যস্বত্বভোগীদেরও অনেকে পাতি মধ্যবিত্ত সৃষ্টি করিয়া নিজে অনুপস্থিত হইয়া যায়। এমনিভাবে কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর কয়েকটি স্তর সৃষ্টি হয়।

সমাজ বিন্যাসে সৃষ্টি হয় নূতন স্তর, নূতন সমস্যা। এক কথায় বৃটিশ শাসনের ভূমি ব্যবস্থার ফলে প্রচলিত ভূম্যধিকারী সমাজে যে অভূত-পূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয় তাহার প্রতিক্রিয়া শুধু ভূপতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। উৎপাদন ক্ষেত্রে, সমাজ বিন্যাসে, আচার উৎসব ও চিন্তাধারায় সর্বত্র অনুভূত হয় বৃটিশ ভূমি ব্যবস্থার সুদূর প্রসারী প্রভাব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংস্কার আন্দোলন

পলাশীর পর হইতে বাংলাদেশের কলা-কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেখা দেয় নিদারুণ অবক্ষয়। প্রচলিত নৈতিক কাঠামো ও শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, বিদেশে সম্পদ পাচার, রৌপ্য মুদ্রার অভাব, রাজস্ব শাসনে চরম অনিয়ম ও অনিশ্চয়তা, অবাধ অত্যাচার, শোষণ প্রভৃতি কারণে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে; সামাজিক নেতৃত্বদানকারী অভিজাত শ্রেণীর পতন ঘটে এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইত সেগুলিরও অবসান হইল। ইংরেজ সরকারের অধিকার ছিল রাজস্ব আদায়ের, কিন্তু দেশের সামাজিক আর্থিক ও আত্মিক উন্নতি বিধানের কোনই দায়িত্ব ছিল না। ইংরেজ শাসনের প্রথম অর্ধশতকের দায়িত্বহীন শাসনের ফলে বাঙ্গালী সুস্থ মনীষার মৃত্যু ঘটে। রাজনৈতিক শূন্যতা, অর্থনৈতিক শোষণ, সমাজ কাঠামোর উলট-পালট, ধর্মীয় জীবনে চরম কুসংস্কার—এই যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতকের প্রথম হইতে অলক্ষ্যে দেখা দেয় আঁধারের মধ্যে আলোর রেখা। আবির্ভাব ঘটে দুইজন যুগান্তকারী মনীষীর—একজন রাজা রামমোহন রায়, অপরজন হাজী শরীয়ত-উল্লাহ। সংস্কার আন্দোলনে প্রথম আসেন রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায়

রামমোহনকে বলা হয় বাংলা তথা ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ। তিনি ১৭৭২ সনে (অনেকের মতে ১৭৭৪) হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন স্বল্প বেতন ভোগী মুগল রাজ কর্মচারী। নিজ গ্রামের পাঠশালায় তিনি প্রথম শিক্ষালাভ করেন। সে যুগের হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা আরবী-ফারসী শিখিতেন। রামমোহনও পাটনায় যাইয়া আরবী-

ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা লাভ করেন। পাটনায় তিনি সুফী মতবাদে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং সেই প্রভাব হইতে জীবনের কোন সময়ই তিনি বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে পারদর্শী রামমোহন পরে কিছুকাল তিব্বতে বাস করেন, বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার জন্য।

১৮০৩ সনে তিনি 'তুহ্ফাত-উল-মোয়াহিদ্দীন' (একেশ্বরবাদ সৌরভ) নামে আরবী ও ফারসী ভাষায় একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে রামমোহন ধর্মে পৌত্তলিকতা ও নানাবিধ কুসংস্কারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করিয়া একটি বিশ্বজনীন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। প্রায় একই সময় বাহির হয় তাঁহার "নানা-জারাতুল আধিয়ান" (বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা)। তুহ্ফাতের মত ইহাও ছিল একেশ্বরবাদ প্রচারে নিবেদিত। ১৮০৫ সনে জন ডিগবি নামে কোম্পানীর এক রাজস্ব কর্মচারীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। ডিগবির বানিয়া হিসাবে তিনি কিছুকাল কাজ করেন। ডিগবি ১৮০৯ সনে রংপুর জেলার কালেক্টার নিযুক্ত হইলে রামমোহনও রংপুরে গমন করেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ডিগবির অধীনে সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন। ১৮১৪ সন পর্যন্ত তিনি রংপুরে সেরেস্তাদারী করেন। সে যুগে কালেক্টারের অধীনে সেরেস্তাদারের বেতন ছিল অনেক কম। মাসিক ৬০ টাকা মাত্র। কিন্তু উপরি সুবিধা ছিল অনেক বেশী। পাঁচ বৎসর সেরেস্তাদারী করিয়া রামমোহন যে অর্থোপার্জন করেন তাহা বহু বৎসর স্বাধীনভাবে চলার জন্য যথেষ্ট ছিল। ১৮১৪ সনে ডিগবি চাকুরী ছাড়িয়া স্বদেশ গমন করিলে রামমোহনও সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করেন (১৮১৫) এবং কলিকাতার মানিকতোলায় একটি বাসভবন ক্রয় করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৮১৫ সনে রামমোহনের কলিকাতা আগমন একটি যুগের সূচনা করে।

ধর্মীয় সংস্কারে রামমোহন ঃ

দীর্ঘদিনের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার ফলে ধর্মীয় জীবনে যে কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করে সেই কুসংস্কার দূর করিয়া আদি একেশ্বরবাদের উপর হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল রামমোহনের দৃঢ় সঙ্কল্প। তাঁহার মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি ১৮১৫ সনে "আত্মীয় সভা" নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

সে যুগের কলিকাতার প্রভাবশালী অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক ভদ্রলোক ছিলেন আত্মীয় সভার সক্রিয় সদস্য। আত্মীয় সভার উদ্দেশ্যে যাহারা ছিলেন বিশেষভাবে নিবেদিত তাহারা হইলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর (ঠাকুর পরিবারের বড় শাখা), টাকীর জমিদার কালীনাথ, ভূ-কৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, নন্দকিশোর বোস, নিলরতন হালদার, তেলিনীপাড়ার জমিদার আনন্দ প্রসাদ বানার্জী, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীস ইত্যাদি। তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন নব্যধনী। কোম্পানীর বানিয়া-মুৎসদ্দী হিসাবে তাঁহাদের কর্মজীবন শুরু। ইউরোপীয়দের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহারা যথেষ্ট মুক্তিবুদ্ধির অধিকারী হন। রামমোহনের মানিকতোলা ভবনে তাঁহারা নিয়মিত মিলিত হইয়া কিভাবে হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। প্রাচীন শাস্ত্র বিষয়ে রামমোহনকে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেন পণ্ডিত শীবপ্রসাদ মিশ্র, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীস। ১৮১৯ সনের পরে আত্মীয় সভার আর কোন কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় না।

উপনিষদের পৌত্তলিকতাশূন্য একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য রামমোহন 'বেদান্ত সূত্রের' অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৮১৫)। ১৮১৬ হইতে ১৮১৯ পর্যন্ত তিনি বাংলায় উপনিষদের ইসা, কেনা, কথা, মুণ্ডক প্রভৃতি খণ্ড প্রকাশ করেন। এইগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রামমোহন বলেন, "পৌত্তলিকতা আত্মাকে ধ্বংস করে, ধ্বংস করে সমাজের রন্ধ্র। মিথ্যা ও ভুলের তন্দ্রা হইতে দেশবাসীকে জাগানো, সর্বব্যাপী ভগবানের ঐক্য প্রচারই আমার উদ্দেশ্য।"

তাঁহার ধর্মবিষয়ক রচনাবলী হিন্দু রক্ষণশীল মহলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিশেষ করিয়া তাহার মতবাদ খৃষ্টান মিশনারী মহলে প্রশংসিত হওয়ার ফলে গোড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আতঙ্কিত হইয়া উঠে এবং রামমোহনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় সমালোচনা শুরু করে। বেদান্তের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ প্রথম রামমোহন করেন। ইতিপূর্বে বেদান্ত উপ-নিষদের চর্চা এদেশে প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ১৮২৫ সালে তিনি বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের পাশাপাশি বেদান্ত শিক্ষা দেওয়াই ছিল উক্ত কলেজের উদ্দেশ্য। কিন্তু কলেজটি বেশী-দিন স্থায়ী হয় নাই।

১৮২০ সাল হইতে রামমোহন খৃষ্টান মিশনারীদেরও সমালোচনার শিকার হন। ইহার কারণ তিনি যীশুর অলৌকিকতাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া

'Precepts of Jesus' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ইহাতে ভীষণভাবে ক্ষুন্ন হয়। শ্রীরামপুর মিশনারী কর্তৃক প্রকাশিত "সমাচার দর্পণে" রামমোহন ও হিন্দু ধর্মের নিষ্ঠুর সমালোচনা বাহির হইতে থাকে। রামমোহনও এই সবের সমুচিত জবাব দিতে থাকেন তাঁহার প্রকাশিত **'Brahmunical Magazine'** পত্রিকায়। তাঁহার লিখিত বাদ প্রতিবাদগুলি প্রকাশিত হইত শীবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে। এদিকে রক্ষণশীলেরাও রামমোহনের সমালোচনা অটুট রাখে। মিশনারী ও হিন্দু রক্ষণশীলদের সমালোচনার জবাবে রামমোহন অনেক পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র প্রকাশ করেন। রক্ষণশীলদের মধ্যে তাঁহার ঘোর সমালোচক ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব ও ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায়। ভবানী চরণ রামমোহন ও তাঁহার সহযোগীদের কটাক্ষ করিয়া কয়েকটি ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশ করেন। এমনিভাবে ধর্মক্ষেত্রে যে আলোচনা সমালোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ সৃষ্টি হয় তাহার ফলে সৃষ্টি হয় অনেক নতুন জিজ্ঞাসা, নতুন ধর্মমত ও পথ। ১৮২৮ সালের ২০শে আগষ্ট রামমোহন "ব্রাহ্ম সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

১৮৩০ সনে তিনি প্রথম ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব উপাসনাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপাসনাগারে সকল ধর্মের ও সকল স্তরের লোকের উপাসনা করার অধিকার ছিল। কিন্তু এখানে পরম সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করা ছিল নিষিদ্ধ। আরও নিষিদ্ধ ছিল এখানে কোন মূর্তি বা চিত্র রাখা। এবং নিষিদ্ধ ছিল উপাসনার নামে অন্য কোন ধর্ম বা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক উক্তি করা। রামমোহনের উপাসনাগারের আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে পরম সৃষ্টিকর্তা, দয়া, দান, নৈতিক চরিত্র, নানা ধর্ম ও মতের মধ্যে মিলন স্থাপন প্রভৃতি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে বক্তৃতা করা ছিল বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

ব্রাহ্ম মতাদর্শের আবেদন ছিল মুষ্টিমেয় কলিকাতা নিবাসী শিক্ষিত ও ধনী লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সতীদাহ প্রথা নিবারণ সমর্থন, বিধবা বিবাহ সমর্থন, মূর্তিপূজা বর্জন প্রভৃতি কারণে সাধারণ হিন্দু সমাজ রামমোহনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠে। তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হয়, এমনকি তাঁহার প্রাণনাশের পর্যন্ত চেষ্টা করা হয়। গোঁড়া হিন্দু নেতবৃন্দ ব্রাহ্ম আন্দোলনকে রোধ করার জন্য "ধর্মসভা" নামে একটি পাল্টা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে (১৮৩০)। ইহার নেতৃত্ব দেন রাজা রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণ বন্দো-

পাধ্যায়। কিন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলন দিন দিন জনপ্রিয় হইয়া উঠে। পরবর্তী কালে মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম মতবাদ সারা বাংলাদেশে এমনকি বাংলার বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে। ব্রাহ্ম আন্দোলনের মুখপত্র "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" শুধু ধর্মক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য ও মননশীলতার ক্ষেত্রেও আনয়ন করে যুগান্তকারী পরিবর্তন।

রামমোহনের সজাগ দৃষ্টি শুধু ধর্মীয় সংস্কারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজ সংস্কারেও তাঁহার ভূমিকা অতুলনীয়। কৌলীন্যের নামে তখন উচ্চবর্ণের লোকেরা বহু বিবাহ করিত। অনেক কুলীনের পেশাই ছিল বিবাহ করা, স্ত্রীর সম্পত্তি পাইবার জন্য অনেকে কয়েক ডজন, এমনকি শতাধিক বিবাহ করিত। নিজের বাড়িতে রাখিয়া স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করাব বালাই তাহাদের ছিল না। কিঞ্চিত্ত কৌলীণ্য লাভের লোভে পিতা কন্যা দান করিত কুলীন সন্তানের কাছে। কৌলীন্য সঞ্চয়কারী কন্যার ও কন্যার সন্তানাদির ভরণ পোষণের ভার ছিল পিতার। কৌলিণ্যদান-কারী স্বামী ঘুরিয়া বেড়াইত এক শ্বশুরালয় হইতে আরেক শ্বশুরালয়ে। বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল সমাজের সকল বর্ণে, সকল স্তরে। কন্যার দশ এগার বৎসর পূর্তি হইলেও বিবাহ না দিতে পারিলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা সমাজ কর্তৃক নিগৃহীত হইত। সবচাইতে বর্বর ও পাশবিক কুসংস্কার ছিল মৃত স্বামীর চিতাদাহে জীবন্ত স্ত্রীকেও পুড়িয়া হত্যা করা। সতীদাহ নামে এই প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতি বর্বরোচিত সামাজিক কুসংস্কার দূর করাব জন্য রামমোহন ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নারী মুক্তির অগ্রনায়ক এই মহামানব দাবী জানাইলেন পুরুষের সহিত নারীর সমকক্ষতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য, নারীর আদি সমঅধিকার ফিরাইয়া দিবার জন্য। শিক্ষার ব্যাপারে, সম্পত্তিভোগের ব্যাপারে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে নারীরও যে সমান অধিকার আছে তাহা প্রমাণ করিয়া তিনি লেখেন (১৮২২ খৃঃ) **"Brief Remarks Regarding Modern Encroachments On The Ancient Rights of Females"**।

শিক্ষা বিস্তারেও ছিল রামমোহনের অবিস্মরণীয় অবদান। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে গত অর্ধ শতাব্দীতে এদেশে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের নিজেদের মঙ্গল ও দেশের সার্বিক মুক্তির জন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রয়োজন। তাই নিজে একজন প্রবল সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ১৮২৩ সনে প্রস্তাবিত সরকারী

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধিতা করেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট এক পত্রে তিনি এদেশবাসীদের প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার বদলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষা দিবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। ইংরেজ সরকারের তখন একটি দ্বন্দ্ব ছিল এদেশে কোন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা উচিত—প্রাচ্য ভাষায় না পাশ্চাত্য ভাষায়। স্মরণ রাখা উচিত যে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজও ছিল পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষা দানের পক্ষপাতি। অবশেষে ১৮৩৫ সনে সর্ব প্রথম পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেন। ১৮২২ সালে তিনি কলিকাতায় 'এ্যাংলো-হিন্দু' স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে শিক্ষা দেওয়া হইত ইংরেজী ভাষা, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই স্কুলের ছাত্র। বলা হইয়া থাকে যে ১৮১৬ সনে কলিকাতা হিন্দু কলেজ স্থাপনে রামমোহনের অবদান ছিল। এই ধারণা ভুল। কলিকাতার রক্ষণশীল অভিজাত শ্রেণী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে রামমোহনের কোন ভূমিকা ছিল না।

রামমোহন তাঁহার মতবাদ প্রচারের জন্য ১৮২১ সনে "সংবাদ কৌমুদী" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে খবরাখবর ও চিন্তাধারা পরিবেশন করা। ১৮২২ সনে তিনি প্রকাশ করেন ফারসী ভাষায় আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, নাম 'মীরাত-উল-আখবার' (খবরের আয়না)। এই পত্রিকায় বিশেষ করিয়া লেখা হইত সমসাময়িক ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা এবং ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা। উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের মতো এদেশেও জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগাইয়া তোলা। ১৮২৩ সনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া একটি প্রেস অর্ডিনেন্স জারী করা হয়। রামমোহন এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানান। প্রথমে সুপ্রীম কোর্টে, পরে লণ্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে তিনি তাঁহার প্রতিবাদের স্মারকপত্র প্রেরণ করেন। উনবিংশ শতকের প্রথমের পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা একটুখানিক কথা নয়। ইহা তাঁহার অত্যাধুনিক মনের পরিচায়ক, পরম সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

দিল্লীর নামেমাত্র সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁহার দাবী দাওয়া বৃটিশ সরকারের কাছে পেশ করার জন্য রামমোহনকে প্রতিনিধি করিয়া ১৮৩০ সনে লণ্ডনে প্রেরণ করেন। সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার আভি-

স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা থাকা প্রয়োজন, তাই সম্রাট রামমোহনকে সেই বৎসর (১৮৩৩) রাজা উপাধি দান করেন। রাজা রামমোহন লণ্ডনে গিয়া কোম্পানীর শাসনে ভারতীয়দের দুরাবস্থার কথা বৃটিশ পার্লামেন্টকে অবহিত করেন। তিনি প্রকাশ করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলার কৃষকশ্রেণী জমিদারদের শোষণ-নির্যাতনের শিকার হইয়াছে। তাঁহার মতে মুগল আমলে কৃষকদের যে স্বচ্ছলতা ছিল তাহা এখন কালের স্মৃতিতে পরিণত হইয়াছে। রাজা রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের জন্য পার্লামেন্টের কাছে সুপারিশ করেন। তাঁহার মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া উচিত কৃষকের সঙ্গে, জমিদারের সঙ্গে নয়। বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্যও তিনি পার্লামেন্টের কাছে জোর দাবী জানান।

রামমোহন ১৮৩২ সনে ফ্রান্স ভ্রমণে যান ও ফরাসী চিন্তাবিদদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ফরাসী রাজা লুই ফিলিপের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেন। ১৮৩৩ সনে তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন এবং সেই বৎসরই ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি বৃষ্টল শহরে মৃত্যু বরণ করেন। ইউরোপীয় জ্ঞান গরিমায় সমৃদ্ধ হইয়া দেশে ফিরিয়া রামমোহন যে অবদান রাখিতে পারিতেন তাহা হইতে দেশ বঞ্চিত হইল। কিন্তু যে অবদান তিনি বিলাত গমনের পূর্বেই রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই এই মহামনীষীকে বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

ফরায়েজী আন্দোলন

রাজা রামমোহন যখন কলিকাতায় হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলনে রত, প্রায় একই সময়ে পূর্ববঙ্গে হাজী শরীয়ত-উল্লাহ মুসলমান সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। রামমোহনের ন্যায় হাজী শরীয়ত-উল্লাহরও উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের আদি অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া, কুসংস্কার দূর করা। তাঁহার অনুসারীদের বলা হয় ফরায়েজী। এই শব্দটি আরবী 'ফরজ' (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ হইতে উদ্ভূত। যাহারা ফরজ পালন করেন তাঁহারাই ফরায়েজী। তবে হাজী শরীয়ত-উল্লাহ্ যে ফরজের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন সেই ফরজের অনুসারীদেরকেই শুধু বলা হয় ফরায়েজী। ফরায়েজী আন্দোলনের ধারা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার আগে ইহার প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়ত-উল্লাহর জীবনী সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার শামাইল গ্রামে হাজী শরীয়ত-উল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন (১৭৮১)। তাঁহার বয়স যখন মাত্র আট বৎসর তখন তাঁহার পিতা আবদুল জলিল তালুকদার মারা যান। তাঁহার চাচার আশ্রয়ে তিনি মানুষ হইতে থাকেন। বার বৎসর বয়সে চাচার সঙ্গে রাগ করিয়া তিনি কলিকাতায় পলাইয়া যান। সেখানে তিনি বাশারত আলী নামক এক মৌলানার নিকট কোরাণ পাঠ করেন। তারপর হুগলী জেলার ফুরফুরায় আরবী-ফার্সী ভাষা শিক্ষার জন্য যান এবং তথায় প্রায় দুই বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি ১৭৯৯ সনে তাঁহার উস্তাদ মৌলানা বাশারত আলীর সহিত মক্কায় হজ্জ করিতে যান।

১৭৯৯ সন হইতে ১৮১৮ সন পর্যন্ত তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত তাহের সম্বলের নিকট ধর্মশিক্ষা লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাহার ফরায়েজী মতবাদ প্রচার শুরু করেন। দীর্ঘ ২২ বৎসর যাবৎ সংস্কার আন্দোলনের পর ১৮৪০ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁহার আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল? সমকালীন মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার সামান্য আলোচনা করিলে শরীয়ত-উল্লাহর সংস্কার আন্দোলনের কারণ সহজে বুঝা যাইবে।

ইহা জানা কথা যে, ধর্মান্তকরণের পূর্বে এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই ছিলেন হিন্দু, বৌদ্ধ বা প্রকৃতি উপাসক। মুসলিম শাসনের রাজনৈতিক প্রভাব, পীর ফকীরদের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব, চরম বর্ণ-সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে স্থানীয় অধিবাসীগণ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু মুসলমান হইলেও তাহাদের মধ্যে পূর্ব ধর্ম-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায়। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, সামাজিক উৎসব উপলক্ষে তাহারা অসংখ্য পূর্ব ধর্মজাত অমুসলিম আচার অনুষ্ঠান পালন করে। বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঐ সব আচার অনুষ্ঠানের মাত্রা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। মক্কা গমনের পূর্বে ঐ সব আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব হাজী শরীয়ত-উল্লাহ বিশেষ অনুভব করেন নাই। অন্যদের মত তিনিও ঐ সব আচার অনুষ্ঠানে ছিলেন অভ্যস্ত। কিন্তু মক্কায় ওহাবী সংস্কারের পরিবেশে দীর্ঘকাল অবস্থান ও শিক্ষালাভ করিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হইতে অধি-কাংশ বাঙ্গালী মুসলমান কত দূরে। অতএব, দেশে ফিরিয়াই তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন বাঙ্গালী মুসলমান সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করিতে। তিনি মুসলমান কর্তৃক অনৈসলামিক কার্যাবলীকে মহাপাপ বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐ

পাপকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করেন—বে'দাত ও শেরক। কবর পূজা পীর পূজা, সেজদা দেওয়া প্রভৃতিকে তিনি শেরক পাপ বলিয়া ঘোষণা করেন। আর যে সব আচার অনুষ্ঠানকে তিনি বে'দাত বা ইসলামননুমুদিত নতুন আচার ব্যবস্থা বলিয়া ফতুয়া দেন সেইগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে গাজী কালুর প্রশস্তি গাওয়া, পঞ্চপীর, পীর বদর, খাজা খিজিরের দোহাই দেওয়া, ভেরা ভাষানো, জারী গান গাওয়া, জন্মের সময় ছটি পালন করা, মহররমে শোক করা ইত্যাদি।

শরীয়ত-উল্লাহ ফতুয়া দেন যে অমুসলিম শাসিত দেশে জুম্মার নামাজ পড়া এবং দুই ঈদ উদ্‌যাপন করা নিষিদ্ধ। চির প্রচলিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে শরীয়ত-উল্লাহর প্রচার ও জুম্মা এবং ঈদ নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি কর্মকে সাধারণ মুসলমান স্বাভাবিক কারণেই প্রতিরোধ করে। প্রচলিত আচার প্রথার প্রতি আস্থা ও সংস্কারের প্রতি ভয় ও সন্দেহ চিরকালের নিয়ম। যাহারা নতুন বাণী নিয়া আসেন তাঁহারা স্বাভাবিক কারণেই প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনপন্থী কর্তৃক নির্যাতিত হন। শরীয়ত-উল্লাহর ব্যাপারেও এই সনাতন নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি প্রাচীনপন্থী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন, নির্যাতিত হন। কিন্তু অচিরেই তাঁহার মতবাদ পূর্ববঙ্গের জেলা সমূহে প্রসারলাভ করে।

হাজী শরীয়ত-উল্লাহর ধর্মপ্রচারে কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল না। তাঁহার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গীয় ইসলামকে সংস্কারমুক্ত করা, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান হইতে হিন্দু প্রভাব বিদূরিত করা। তাঁহার সংস্কার আন্দোলনের ফলে তিনি একাধারে প্রাচীনপন্থী মুসলমান ও হিন্দু জমিদার কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতির উপর আঘাত হানার প্রতিবাদে বহু মুসলমান তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করে। অপরপক্ষে তাঁহার মতবাদ নির্যাতিত মুসলমান কৃষককে অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে উস্কাইয়া দিতে পারে এই ভয়ে হিন্দু জমিদারগণও তাঁহার বিরোধিতা করিতে থাকে। জমিদার কর্তৃক গো-হত্যা নিষেধ ও নানাপ্রকার পূজা-পার্বন উদ্‌যাপনের জন্য মুসলমান কৃষকের উপর কর আরোপ করা প্রভৃতি অমান্য করার জন্যও হাজী শরীয়ত-উল্লাহ তাঁহার শিষ্যদের আহ্বান জানান। ইহার ফলে ফরায়জী কৃষক ও হিন্দু জমিদারদের মধ্যে শুরু হয় অসন্তোষ। শরীয়ত-উল্লাহর সাবধান-নীতির ফলে সেই অসন্তোষ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পর্যবসিত হইতে পারে নাই। কিন্তু ১৮৪০ সনে তাঁহার মৃত্যুর পর জমিদার ও

ফরায়জীদের সম্পর্কে অনেক অবনতি ঘটে। ফলে নানা স্থানে শুরু হয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এই সশস্ত্র প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেন তাঁহার পুত্র দুদু মিঞা (১৮১৯—১৮৬২)।

ফরায়জী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়ত-উল্লাহ। কিন্তু ইহাকে যিনি সারা দেশে একটি সুসংঘটিত ভ্রাতৃত্বের রূপ দেন তিনি হইলেন তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র মুহসিনউদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিঞা। পিতার মত তিনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু সংগঠক হিসাবে তিনি পিতাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। পিতার মৃত্যুর (১৮৪০) পর দুদু মিঞা ফরায়জী সম্প্রদায়ের ওস্তাদ বা গুরু বলিয়া মনোনীত হন।

ওস্তাদ দুদু মিঞা নিজে লাঠি চালনা শিক্ষালাভ করেন। তিনি জালালউদ্দীন মোল্লা নামক এক লাঠিয়াল বীরকে সেনাপতি করিয়া একটি সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়িয়া তোলেন। এই লাঠিয়াল বাহিনীর কাজ ছিল ইসলাম বিগর্হিত কর আদায়কারী জমিদারদের প্রতিরোধ করা। অনেক জমিদারের সঙ্গে দুদু মিঞার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে শত শত ফরায়জী কর্মীকে কারাবরণ করিতে হয়। কিন্তু কৃষক সমাজে দুদু মিঞার জনপ্রিয়তা এতই প্রবল ছিল যে সরকার দুদু মিঞাকে বন্দী করিতে সাহস পায় নাই। জমিদারগণ চেষ্টা করেন ইউরোপীয় নীল-সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া দুদু মিঞার পরিচালিত প্রজা অভ্যুত্থান দমন করিতে, কিন্তু ব্যর্থ হন। দুদু মিঞার বিরুদ্ধে বহু ফৌজদারী মামলা রুজু করা হয়, কিন্তু আদালতে দুদু মিঞার বিরুদ্ধে সাক্ষীর অভাবে প্রত্যেকবারই তিনি রেহাই পান। অবশেষে সরকার দুদু মিঞাকে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে ১৮৫৭ সালে কলিকাতায় অন্তরীণ রাখে। সিপাহী বিদ্রোহ অবসানের পর ১৮৬০ সনে তাঁহাকে মুক্ত করা হয়। দুই বৎসর পর, অর্থাৎ ১৮৬২ সালে, দুদু মিঞা ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

দুদু মিঞার মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফরায়জী আন্দোলন দুর্বল হইয়া পড়ে। জমিদারেরা ফরায়জীদের উপর অত্যাচার শুরু করে। এদিকে মৌলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ফরায়জী মতবাদকে 'খারিজি' ঘোষণা করিয়া ইহাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য এই অঞ্চলের সর্বত্র জোর প্রচার শুরু করেন। ঊনবিংশ শতকের শেষে বাংলাদেশে ফরায়জী আন্দোলন অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে চাপা পড়িয়া যায়। মৌলানা কেরামত আলীর তাই-উয়ানী মতবাদ আধিপত্য বিস্তার করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাতীয়তাবাদের বিকাশ--বাংলার নবজাগরণ

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক সৃষ্টিশীল চিন্তাধারা ও আবিষ্কারের যুগ। এই শতকে ইউরোপে যে উদারনৈতিক চিন্তাধারা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ হয় তাহার ঢেউ বাংলাদেশেও আসিয়া লাগে। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য ব্রিটিশ ভারতে, বাংলাদেশ ভারতীয় জাতীগঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইহার অন্যতম কারণ বাংলাদেশ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে যে জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় তাহা এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চেতনার প্রত্যক্ষ ফল। যান্ত্রিক সভ্যতার আঘাতে এই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা ও গতানুগতিক রীতিনীতির স্থলে যুক্তিবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়।

ব্রিটিশ শাসনের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল কলিকাতা। ফলে ইংরেজদের জীবনযাত্রা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে বাঙ্গালীদেরই সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। সেইজন্য সর্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীরা ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকে পরিণত হয়। তাহারা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হয়। নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে তাহারা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ ও সরকারী অফিস আদালতে চাকুরী গ্রহণ করে। মিশনারীদের উদ্যোগে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য-শিক্ষা শুরু হয়। কোম্পানীর কয়েকজন প্রশাসকের উদারনৈতিক মনোভাব ও উৎসাহের ফলে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যেরও উন্নতি হয়। ইহাদের মধ্যে লর্ড হেষ্টিংস, এ্যালফিনিষ্টোন, ম্যালকোম, মনরো ও ম্যাটকাফের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে পরিচিত করানোকে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক কর্তব্য মনে করিত।

১৮৩৫ সনে লর্ড মেকলে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে যে জোরালো মতামত ব্যক্ত করেন উত্তরকালে তাহা এই দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার এবং জাতীয়তাবাদ বিকাশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হিসাবে পরিগণিত হয়। সেই সময় কিছু কিছু ইংরাজের মনে এই ভীতি দেখা দিয়াছিল যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইউরোপের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন পাঠ করিয়া ভারতবাসী স্বদেশ ও গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবে এবং ক্রমশঃ ইংরাজের প্রভুত্ব না মানিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইবে। মেকলে ১৮৩৩ সনে ইহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যদি এমন দিন সত্য সত্যিই আসে তবে আমি উহার প্রতিবন্ধকতা করিব না। ইহাকে ইংল্যাণ্ডের সর্বাপেক্ষা গৌরব ও অহঙ্কারের দিন বলিয়া গণ্য করিব।"

লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থার ফলে দেশে যে জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, অনতিকাল পরে তাহারাই সমাজের ভিত্তি ও অর্থনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড হইয়া দাঁড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই ইহারা ইংরেজ সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থা ও সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল ছিল। এবং ধীরে ধীরে তাহারা ইংরাজী শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের প্রতি প্রথম আনুগত্য ও পরে একপ্রকারের আকর্ষণ অনুভব করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে এই শ্রেণী দেশে নানাপ্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করে। যদিও তাহাদের এই আন্দোলন প্রধানতঃ শহর কেন্দ্রিক ছিল, তথাপি ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। এই সকল অভিজাত ও মধ্যশ্রেণী হইতে সমাজ-সংস্কারক, কবি সাহিত্যিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব হয়। তাহারাই পরবর্তীকালে জাতীয় জাগরণের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন।

ইহা অনস্বীকার্য যে আধুনিক যুগে জাতীয় রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিকাশ লাভ করে। ইংরেজ আগমনের পূর্বে ভারতে উহা বিদ্যমান ছিল কিনা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তি এবং লক্ষণ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ আছে। বিখ্যাত দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, "একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমায় সহঅবস্থান, এক রাজার শাসনে বাস, এবং ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতি জাতীয়তার মূল ভিত্তি। পরাধীন হইলে তাহার পরিবর্তে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আকাংখা এবং পরস্পরের

মধ্যে সহানুভূতি ও ঐক্য থাকা চাই।" এই উপাদানগুলি জাতীয়তাবাদ বিকাশের সহায়ক, কিন্তু জাতীয় চেতনার জন্য একান্ত অপরিহার্য নহে। আধুনিক জাতীয়তাবাদের সজ্ঞানুসারে উনিশ শতকের ভারতে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। বলা বাহুল্য, জাতীয়তাবোধ উন্মেষ এবং স্বাধীকার আন্দোলনের প্রেরণা ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানদর্শনেরই প্রত্যক্ষ ফসল। বাংলা-দেশেই রাজনীতিক সচেতনাবোধ হয় সর্বাগ্রে এবং বাঙ্গালীরাই জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করে। ক্রমশঃ এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে সমগ্র ভারতে। পূর্বে ভারতবাসীর মধ্যে সামাজিক ও রাজনীতিক ঐক্যবোধ বলিতে কিছুই ছিল না। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধই ছিল বিভিন্ন প্রদেশের বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে মারাঠাদের দ্বারা অত্যাচারিত বাঙ্গালী কোন দিনই মহা-রাষ্ট্রীয়দের আপনজন হিসাবে ভাবিতে পারে নাই। বিদেশী ইংরেজদের ন্যায় তাহারা মারাঠাদিগকে সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখিত। ভাষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের অন্তরায় ছিল। ফলে কেহই নিজেকে ভারতীয় হিসাবে পরিচয় দিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং ইংরেজ শাসন, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমশঃ ভারতীয়দের মধ্যে একাত্মবোধ জন্মে।

কিন্তু ভারতের দুই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রধানতঃ ধর্মগত মৌলিক পার্থক্য হেতু তাহাদের চিন্তাধারা পরস্পর বিপরীতমুখী ছিল। তাহাদের মধ্যে সামাজিক আহার বিহার, বৈবাহিক যোগসূত্রের একান্ত অভাব। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস দুই সম্প্রদায়ের একক ও নিজস্ব। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রচলিত সজ্ঞানুসারে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিকাশের অনুকূল পরিবেশ ভারতে ছিল না। অবশ্য, বহুকাল সহঅবস্থানের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ রাজনীতিবিদদের হাতে আবার মাথা ছাড়া দিয়া উঠে এবং সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। ফলে এই শতকের প্রথমভাগে মুসলমানরা পৃথক নির্বাচন ও পৃথক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের রাজনীতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রধান উপাদানগুলি ভারতে অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, স্থানীয় শাসন প্রবর্তন এবং একই প্রকার শাসন প্রণালী ও আইন ব্যবস্থার ফলে ক্রমশঃ ভারতীয়দের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবাদর্শ জন্মে। এবং তাহারা রাজনীতিক সচেতন হইয়া উঠে। এই রাজনীতিক সচেতনতা ও সামাজিক ঐক্যবোধই তাহাদিগকে জাতীয়তা ও রাজনীতিক দল গঠনে প্রেরণা যোগায় উনবিংশ শতকের শেষার্ধে।

বাংলার এই নবজাগরণের প্রধান পুরোহিত ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩২)। মানবধর্মী রামমোহনের জন্ম হয় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার এক মধ্যবিত্ত জমিদার বংশে। অল্পবয়সেই তাঁহার মধ্যে বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় ও ধর্মের প্রতি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাজগতে তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী। পাশ্চাত্য-শিক্ষা এবং মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার ফলে তিনি তৎকালীন হিন্দুসমাজের বহুবিধ সংকীর্ণতার উর্ধে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষার আলোকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার বিবর্জিত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই ছিল তাঁহার মূল লক্ষ্য। তিনি হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যেকার বিবাদবিসম্বাদ দূর করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় একাধারে একজন ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষা প্রসারক ও দেশপ্রেমিক হিসাবে সর্বত্র বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, তাঁহার সংস্কার-মুক্তমন ও অনুসন্ধিৎসা এবং দার্শনিক সুলভ প্রজ্ঞার জন্য অনেক ঐতিহাসিক তাঁহাকে আধুনিক ভারতের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। সর্বপ্রকার পশ্চাদ্‌মুখীতার বিরুদ্ধে আমরণ আপোষহীন সংগ্রাম করিয়া তিনি ভারতকে আত্মবিলোপ্তির অভিশাপ হইতে রক্ষা করেন। রামমোহন বাঙ্গালীর চিন্তাবোধ ও সংস্কৃতিতে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের বীজ বপন করেন। তাহারই ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই পরবর্তী উনিশ শতকের বাংলার জ্ঞান, বিবেক ও সাহিত্যের সমারোহ। ইতালীর নবজাগরণে পেত্রার্ক, বোকাচো প্রভৃতি যে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন বাংলার বা ভারতের নবজাগরণে রামমোহনের ভূমিকা ছিল তদ্রূপ।

রামমোহন হিন্দুধর্মের প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন এবং সব ধর্মের সারমর্ম একেশ্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। হিন্দুধর্মের গতানু-

গতিক চিন্তাধারা ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি প্রথমে আত্মীয় সভা এবং পরে প্রয়োজনমত ধর্মকে সংস্কার করিয়া ১৮২৮ সনে নূতন ধর্মসমাজ 'ব্রাহ্ম সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মকে কুসংস্কার মুক্ত করিয়া প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করা। পরবর্তীকালে ১৮৪৬ সনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় এবং তাঁহার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্ম সভা হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজে রূপান্তরিত হয়। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে এই ধর্মান্দোলন সর্বভারতে ছড়াইয়া পড়ে। এই ব্রাহ্মসমাজ উনবিংশ শতকে ভারতীয়দের প্রগতিশীল আন্দোলনের খোরাক জোগাইয়াছিল।

বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন মূলতঃ সমাজ সংস্কারক। বিদ্যাসাগর সমাজের নিপীড়িত ও লাঞ্ছিতদের মুক্তির জন্য আজীবন আন্দোলন করিয়া গিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার দান অপরিসীম।

এই নবজাগরণ সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখা দেয়। বহু কবি সাহিত্যিক মাতৃভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেন। ইহাদের লেখনীর প্রচেষ্টায় শিক্ষিত সমাজ দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। ইহাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। তাঁহার নাটক ও কাব্য বাংলা সাহিত্য জগতে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বাংলাকাব্যের যোগ সাধন করিয়া মাইকেল বাংলা সাহিত্যের যুগান্তর আনয়ন করেন। দীনবন্ধু মিত্র রচিত "নীলদর্পণ" নাটকটি উপনিবেশিক ইংরাজদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পরিচয় বহন করে। লালবিহারী দে কর্তৃক রচিত "বাংলার রূপকথা", কালীপ্রসাদ দত্ত রচিত 'ভারত গীতিকা' প্রভৃতি বাঙ্গালীদের মনে জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ ঘটায়। ইহা ছাড়া গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি নাট্যকার বাংলার নাট্যজগতে নূতন দিগন্তের সূচনা করেন। বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার রচনায় প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে এবং ভারতীয়দিগকে নূতন করিয়া জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অর্ধশতাব্দীর উর্ধে বাংলা সাহিত্যের কর্ণধার

ছিলেন। তাঁহার অনন্য ও অজস্র লেখনী দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যান্যদের মধ্যে কালী প্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দো-পাধ্যায়, নবীন সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের রচনা শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে নাই, বরঞ্চ সমগ্র ভারতীয় জাতীয়তাবোধ জাগরণে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের যে সূচনা হয় তাহার অগ্রণী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। ১৮৬৬ সনে তিনি **"Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal"** নামে এক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাঙ্গালীর চিন্তাজগতে এই সমাজ এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮৭৬ সনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "স্বদেশানুরাগ" প্রবন্ধে ইহার অবদান সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয় যে ইংরাজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মনে স্বদেশ প্রীতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারত যে এক সুপ্রাচীন সভ্যদেশ সে সম্বন্ধে তাহাদের মনে এক গভীর আত্মবিশ্বাস জন্মে। দেশীয়, ধর্মীয় আচার-ব্যবহার যে উপেক্ষনীয় নয় সেই বিষয়ে তাহাদের আত্মপ্রত্যয় জন্মে।

রাজনারায়ণ বসুর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'ন্যাশনাল পেপার' বা স্বজাতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। অতঃপর স্বজাতীয়ভাব ও স্বদেশ অনুরাগ সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপন প্রস্তাব নামে একটি প্রস্তাব ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভার দান অনস্বীকার্য। এই মেলা কলিকাতার কোন একটি উদ্যানে প্রতি বৎসর তিন চারিদিন ধরিয়া চলিত। সেইখানে দেশীয় জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে জনমনকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিত। হিন্দুমেলার পর নবগোপাল মিত্র **National Society** ও **National Paper** প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়ভাব বিকাশের চেষ্টা করেন। মিত্র মহাশয় হিন্দুদিগকে একটি স্বতন্ত্রজাতি হিসাবে দেখিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ধর্ম—সমগ্র ভারতে যেখানে হিন্দু আছে তাহাদের লইয়াই হিন্দুজাতি। পরবর্তীকালে এই ধর্মাশ্রিত জাতীয়তা-বোধই রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়িকতায় পরিণত হয়। বস্তুতঃ উনিশ

শতকের মধ্যবিত্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই জাতী ও ধর্ম সম্প্রদায়কে নিজেদের চিন্তায় এক করিয়া দেখিতেন। ফলে জাতীয় উন্নতি ও মুক্তি বলিতে তাহারা নিজেদের ধর্মসম্প্রদায়ের উন্নতি ও মুক্তিকেই বুঝাইতেন। ১৮৭২ সনে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারত কলঙ্ক' ভারতবর্ষ পরাধীন কেন--এই প্রবন্ধে তিনি হিন্দুদিগকে স্বতন্ত্রজাতি হিসাবে গণ্য করেন। তাঁহার প্রচারিত জাতীয়তাবাদ ছিল অতি সংকীর্ণ, তাহাতে হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতির কোন স্থান ছিল না। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকের রচনায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত হিন্দু সভ্যতা ও কৃষ্টির মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রবণতা দেখা যায়। ইহাদের রচনা ছিল মুসলিম বিদ্বেষ এবং হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যের গুণকীর্তনে পূর্ণ। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইহাদের রচনা ও প্রচারকর্ম হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি সাধনের পক্ষে মোটেই সহায়ক ছিল না।

বাংলার রেঁনেসাঁস বা নবজাগরণে হিন্দু কলেজের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় হাইড ইষ্ট, ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব ও রামমোহনের প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন একদিকে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার পূজারী এবং ইংরেজ শাসনের প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন, অন্যদিকে এই শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ১৮২৩ সনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া যে **Press Ordinance** প্রচলিত হয় রামমোহন ও তাঁহার সহযোগীগণ ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। এই আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট মূল্য ছিল। প্রাগ্রসর চিন্তা এবং রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়া হিন্দু কলেজের ছাত্ররা অত্যন্ত অগ্রগামী ছিল। স্বনামধন্য আদর্শবাদী শিক্ষক ভিভিয়ান ডিরোজিও ও লেষ্টার রিচার্ডসনের শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম, যুক্তিবাদ এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটে। ইংরেজ শাসনের নানা প্রকার দোষত্রুটি সম্পর্কে তাহারা সচেতন হয় এবং তৎসম্পর্কে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করে। আমেরিকার স্বাধীনতার সময়, ফরাসী বিপ্লব এবং ১৮৩০ সনের ইউরোপীয় রাজনৈতিক, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তা ভিত্তিক স্বাধীনতার যে জোয়ার আসে সে সম্বন্ধে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সংবাদ রাখিত এবং এই সকল খবর তাহাদিগকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগাইত। এই সময় কাশী প্রসাদ ঘোষ দেশাত্মবোধক কবিতা

রচনা করেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, বিশেষতঃ মিল, স্পেন্সার, বেন্থাম, বেকন, গিবন প্রভৃতি মনীষীদের রচনাবলী ও উদার দর্শন পাঠ করিয়া তাহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার ও যুক্তিবাদের স্ফুরণ ঘটে। হিন্দু কলেজের এই স্বাধীনচেতা সংস্কারমুক্ত তরুণ দল Young Bengal বা যুব বাঙ্গালী নামে পরিচিত। উহাদের প্রতিষ্ঠিত Society for the Acquisition of General Knowledge এর মাধ্যমে ইহাদের বলিষ্ঠ ও স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সংবাদপত্র হইল সমাজের দর্পণ। ইহাতে সমাজের মনোভাব প্রতিফলিত হয়। স্বাধীন এবং বলিষ্ঠ জনমত গঠনের দায়িত্ব সংবাদপত্রের। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এই সংবাদপত্র এবং সভাসমিতির মাধ্যমে 'যুব বাঙ্গালী' শিক্ষিত জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা চালায়। এই দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Calcutta Journal পত্রিকার সম্পাদক J. S. Buckingham এর নাম বিশেষ বিখ্যাত। ইংরেজ শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৩১ সনে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর Indian Reformer প্রকাশ করেন। ইহা নব্য বাংলার প্রগতিশীলদলের মুখপত্র বলিয়া গৃহীত হয়। ইহাই প্রথম ভারতীয় পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্র। এই পত্রিকায় রাজনৈতিক বিষয় বিশেষতঃ ইংরেজ শাসনের দোষত্রুটি ও উহার সংস্কার লইয়া আলোচনা করা হইত। এই যুগের আরেকখানি সংবাদপত্র ছিল Bengal Horkaru, দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পত্রিকার মালিক ছিলেন। প্রধানতঃ রাজনৈতিক বিষয় লইয়াই ইহাতে আলোচনা চলিত। জাতীয় ভাবের উদ্বোধক ও প্রচারক হিসাবে অন্যান্য পত্রিকাগুলির মধ্যে Bengal Spectator, Hindu Pioneer যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৫৩ সনে Hindu Patriot প্রকাশিত হয়। স্বনামধন্য সংবাদপত্রসেবী হরিশচন্দ্র মুখার্জী ইহার সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক এবং রাজনীতিবিদ হিসাবে উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে হরিশচন্দ্র একটি বিশিষ্ট নাম। ইহা ছাড়া ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা, 'বঙ্গ দর্শন', 'সঞ্জিবণী' 'হিতবাদী' প্রভৃতি সাপ্তাহিকগুলি উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে এবং রাজনৈতিক চেতনা উদ্বোধনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ১৭৯৩ সনে কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে যে মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, পরবর্তীকালে উহারাই ভারতের নবজাগরণে নেতৃত্ব দেয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সামাজিক এবং কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় এবং কোম্পানী কর্তৃক নিষ্কর ভূমির উপর কর ধার্য করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৮৩৭ সনে 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ প্রদর্শক স্বরূপ। অল্পদিনের মধ্যে জমিদার শ্রেণী নিজেদের অধিকার এবং স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভূম্যধিকারী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে (১৮৩৭)। রাজা রাধাকান্ত দেব ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এই সমাজের প্রাণ-কেন্দ্র ছিলেন। ১৮৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত ভূম্যধিকারী সভা **Bengal Landholders Society** আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সমাজের অবদান সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলেন যে, "এই সমাজ সর্বপ্রথম জনসাধারণকে বিধিসঙ্গত উপায়ে (**Constitutionally**) নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ন্যায্য অধিকারের দাবী করা এবং এই বিষয়ে প্রকাশ্য স্বাধীনমত প্রকাশের পথ প্রদর্শন করে। বাহ্যতঃ জমিদারদিগের স্বার্থের দিকেই ইহার দৃষ্টি ছিল। কিন্তু জমিদার ও প্রজাদের স্বার্থ এমনভাবে বিজড়িত যে একের উপকারে অন্যের উপকার, একের অপকারে অন্যের অপকার। সুতরাং এই সমাজের দ্বারা পরোক্ষে প্রজাদেরও স্বার্থ রক্ষা হইত।" এই উক্তি সর্বত্র গ্রহণযোগ্য না হইলেও এই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ভূম্যধিকারী সমাজের যে ভূমিকা ছিল তাহা অনস্বীকার্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এই সমাজের প্রধান প্রাণকেন্দ্র। তিনি ১৮৩৯ সনে রামমোহন রায়ের বন্ধু মিঃ এ্যাডাম ও জর্জ টমসন কর্তৃক ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত **British India Society**র সহিত যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন :

১। নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করণের ব্যবস্থা রহিত করা।

২। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্রিটিশের ভারতীয় রাজ্যে সর্বত্র প্রচলিত করা।

৩। সর্বসাধারণের সুখ, সুবিধা ও আত্মরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার, পুলিস ও রাজস্ব বিভাগে সংস্কার সাধন করা।

৪। পতিত জমিগুলি সুবিধাজনক শর্তে ইজারা দেওয়া।

১৮৪২ সনের শেষের দিকে জর্জ টমসন ভারতে আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা দেন তাহাতে এই দেশের জনগণের জন্য তাহার অকৃত্রিম ভালবাসা প্রমাণিত হয় এবং ইংলাণ্ডবাসীদের ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি মন্তব্য করেন যে, ইংল্যাণ্ডের লোকেরা ভারতের কল্যাণ কামনা করে, "কিন্তু তাহারা এই দেশের বিষয় বৃত্তান্ত অবগত না থাকায় এই দেশের ইংরেজ শাসনের দোষত্রুটি শোধনের উপায় করণে অক্ষম।"

১৮৪৩ সনে টমসন কলিকাতায় একটি নূতন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠান **Bengal British India Society** গঠন করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল যে ইহা জমিদার সভা না হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভা হইবে এবং সর্বশ্রেণীর প্রজার জন্য ন্যায্য অধিকার ও দাবী প্রতিষ্ঠাই ছিল ইহার লক্ষ্য। এই প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম ভারতে জনমত গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। টমসন বলেন যে, জনমত সৃষ্টি করিতে না পারিলে বৃটিশ সরকার কখনও ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার ও আশা আকাংখা প্রতিষ্ঠার এবং শাসনতান্ত্রিক দোষ ত্রুটি সংশোধনের প্রতি নজর দিবে না। টমসন এই সমিতির সভাপতি হইলেন। **G. F. Remfrey** ও রামগোপাল ঘোষ ইহার সহকারী সভাপতি এবং প্যারীচান্দ মিত্র সম্পাদক নির্বাচিত হন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ প্রথা এবং অন্য কয়েকটি শাসন সংস্কার প্রধানতঃ এই নূতন রাজনৈতিক সমাজের চেষ্টার ফল।

১৮৪৯ সনে আইন সদস্য মিঃ বেথুন প্রচলিত "কালো আইন" এর সংশোধনের জন্য একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। এই বিল আইনে কার্যকরী হইলে কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের বাহিরেও, অর্থাৎ মফঃস্বল আদালতে, ইংরেজদের বিচার হইতে পারে এই ভয়ে ইংরেজগণ এই বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করে। ফলে সরকার বাধ্য হইয়া বিলটি প্রত্যাহার করে। শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজদের ব্যবহারে মর্মাহত হয় এবং সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে।

অতঃপর ১৮৫৩ সনের সনদকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন সক্রিয় হইয়া উঠে। সনদ প্রাপ্তির পূর্বে ভারতবাসীর অভাব অভিযোগগুলি বিলাতের কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিতে পারিলে আশু লাভ হইতে পারে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ১৮৫১ সনে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া

এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার সভাপতি এবং দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদক ছিলেন। পূর্বোক্ত ভূম্যধিকারী সমাজ ও Bengal British Indian Society সম্ভবতঃ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া British India Association এর সঙ্গে যোগদান করে। সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও রাজনীতিক কৃষ্ণদাস পাল প্রথমে ইহার সহকারী সম্পাদক এবং পরে ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৪ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। কৃষ্ণদাস পালের মত প্রগতিশীল লোক এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকিলেও এই এসোসিয়েশন প্রধানতঃ জমিদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। British India Association এর অনুপ্রেরণায় বোম্বাই ও মাদ্রাজে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

১৮৫২ সনে এই এসোসিয়েশন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট ভারতের বিবিধ সমস্যা এবং শাসন সংস্কার সম্বলিত একটি দীর্ঘ স্মারক লিপি প্রেরণ করে। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উক্ত পত্রখানির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

১৮৮৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ৩৩ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনা যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল এবং পরবর্তী-কালে উহা রাজনৈতিক আন্দোলন ও চিন্তাধারার উপর যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই British India Association ই সর্বপ্রথম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি এবং দাবী আদায়ের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন প্রধানতঃ শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর মিলন ভূমি ছিল। জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে সেইদিকে তাহাদের বিশেষ নজর ছিল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রগতির সহিত ইহা তাল রাখিতে ব্যর্থ হয়। তবে দেশের সার্বিক উন্নতিকল্পে রাজনৈতিক সংস্কার এবং চেতনাবোধ সৃষ্টি করা এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে জনগণের ক্ষমতাবৃদ্ধি ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু জমিদার দ্বারা পরিচালিত এবং বাৎসরিক চাঁদার হার অত্যাধিক ছিল সেইজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী ইহাকে কৃষক এবং নিম্নমধ্যবিত্তের আশা-আকাংখার প্রতীক বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া বাংলার

মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিল কৃষক। ফলে তাহারাও নিজেদেরকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিত না।

বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে দিবার প্রস্তাব অনগ্রসর মুসলমান সমাজ কিছুতেই অনুমোদন করে নাই। সেইজন্য লর্ড এ্যালেনবরা আইন প্রণয়নে দুইটি পৃথক সমিতি গঠনের সুপারিশ করেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্টন ও অর্থনৈতিক কারণে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উদ্ভব হয়। ১৮৫৬ সনে কলিকাতায় মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠিত হয় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন এই নতুন প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাগতম জানায়। প্রসঙ্গক্রমে এইখানে উল্লেখ্য যে ১৮৫৮ সনের পূর্ব হইতেই রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ক্রমশঃ জমিদার শ্রেণীর হাত হইতে বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর হাতে আসিতে শুরু করে। ১৮৫৭ সনের মহাবিপ্লবের প্রতি উচ্চ ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা সত্যই নিন্দনীয় ছিল। নিজেদের কায়েমী স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহারা এই বিপ্লবের প্রতি বিশেষ সমর্থন প্রকাশ অথবা সহযোগিতা করে নাই।

১৮৫৭ সনের পরাজয়ের ফলাফল ভারতীয়দের জন্য মারাত্মক হইয়াছিল। সরকার বৃটিশ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দেয় এবং ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া ভারতীয় শিল্পের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে এবং এই দেশের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে। ফলে শিক্ষিত মধ্য-শ্রেণীর ইংরেজ প্রীতিতে ক্রমশঃ ভাটা পড়ে।

সরকারের এই সমস্ত বৈষম্য নীতিতে ইংরেজভক্ত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মনে ক্রমশঃ হতাশা ও সংঘাত দেখা দেয়। তাহারা সরকারের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মধ্যশ্রেণীর মনে জাতীয় চেতনার বীজ উপ্ত হয় এবং তাহারা ক্রমশঃ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে সরকার বিরোধী ভূমিকা পালন করে। ইহা ছাড়া দেশীয় ভাষার উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার যেমন—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাক বিভাগ প্রভৃতির আধুনিকীকরণে জাতীয়তাবোধের প্রসারণ দ্রুত হয়। তদুপরি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে Asiatic Society এর প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার হয়। ইহা ব্যতীত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্‌ঘাটন বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের প্রেরণা

যোগাইয়াছিল। উইলিয়ম জোন্‌স্‌, উইলসন, ম্যাক্স মূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণ এই দেশের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। যাহার ফলে ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর মনে নিজস্ব কৃষ্টির প্রতি নতুন করিয়া অনুরাগ জন্মে। কানিংহাম এবং অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদদের আবিষ্কারের ফলে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে কাহারও আর দ্বিমত রহিল না। এইসকল বিভিন্ন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবার ফলে ভারতবাসীর মনে হীনমন্যতাভাব বহুলাংশে দূর হয় ও তাহারা ক্রমশঃ আত্মসচেতন হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের রূপ পরিবর্তনের সূচনা হয়। ১৮৩৩ সনের চার্টার আইনে জাতি, ধর্ম ও বর্ণবৈষম্য দূর করিয়া কোম্পানীর উচ্চতর চাকুরীক্ষেত্রে ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বর্তৃপক্ষের রক্ষণশীল নীতির ফলে বাস্তব পদক্ষেপে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় নাই। ১৮৫৩ সনে লর্ড মেকলের প্রচেষ্টায় চাকুরীক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রথা প্রবর্তন হয়। ১৮৫৮ সনে রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় পূর্বোক্ত ১৮৩৩ এর চার্টার আইনের পুনরুক্তি করা হয় এবং ভারতে কোম্পানী শাসনের অবসান করিয়া ভারতীয়দিগকে বৃটিশ প্রজাবর্গের সমপর্যায়ভুক্ত এবং চাকুরীক্ষেত্রে ভারতীয়দের অধিকতর সুযোগ দানের অঙ্গীকার করা হয়। এই সময় কিছু কিছু বাঙ্গালী ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করে এবং সেখানকার শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেভাবে অবগত হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিযোগিতামূলক Indian Civil Service এ উত্তীর্ণ হইয়া শাসনকার্যে শরীক হইবার জন্য উৎসাহ বোধ করে। ১৮৬৪ সনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় I.C.S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আরও তিনজন ভারতীয়—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ভারতীয়দের সাফল্যে ইংলণ্ডে দারুন সাড়া পড়ে এবং ১৮৮৭ পর্যন্ত ১২ জন ভারতীয় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উচ্চতর চাকুরীতে এতদিন পর্যন্ত ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। সেই অধিকার সীমিত হইবার আশঙ্কায় তাহারা ক্ষুব্ধ হয়। কার্যতঃ ব্রিটিশ সরকার এই সময় নানারকম প্রতিবন্ধকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ভারতীয়দিগকে তাহাদের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিতে তৎপর হয়। ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বাঙ্গালী উচ্চ শিক্ষার্থে এবং আইন অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে গমন করে এবং সেখানকার শাসন-

ব্যবস্থা ও নেতৃবৃন্দের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। তাহাদের মধ্যে অনেকে তৎকালীন প্রসিদ্ধ উদারনৈতিক চিন্তাবিদদের সংস্পর্শে আসে এবং তাহাদের ভাবধারা ও রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে এই সকল তরুণ বাঙ্গালীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। তাহাদের উপলব্ধি করিতে কষ্ট হইল না যে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের মাতৃভূমি কতটা বঞ্চিত ও অনুন্নত। স্বদেশের অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্র এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এবং স্বায়ত্বশাসন যে অপরিহার্য সেই বিষয়ে তাহাদের চেতনা জাগরিত হয়। ১৮৬৭ সনে ইংল্যাণ্ডে এক বক্তৃতায় বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বপূর্ণ সরকার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। আনন্দমোহন বসু ইংল্যাণ্ডের ব্রাইটন শহরে ১৮৭৩ সনে অনুরূপ মন্তব্য করেন। ১৮৭৪ সনে কৃষ্ণদাস পাল **Hindu Patriot** পত্রিকায় ভারতের স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে এব প্রবন্ধ লেখেন।

ইতিমধ্যে আনন্দমোহন বসু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কলিকাতায় এক ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ছাত্রদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও ভারতের একতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন। তিনি বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক সভার অভাব বোধ করিলেন। তিনি শিশির কুমার ঘোষ, মনমোহন ঘোষ এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করেন। ১৮৭৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষের উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়া লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কয়েক মাস পরেই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও আনন্দমোহনের প্রচেষ্টায় **Indian Association** বা ভারত সভার পত্তন হয় ১৮৭৬ সনের জুলাই মাসে। এই দুই সভার উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয়ই নবীন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ইণ্ডিয়া লীগ স্বল্পকাল স্থায়ী হইলেও ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে ইহার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন" নিম্নলিখিত চারিটি উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়:

(১) দেশে জনমত গঠন করা, (২) রাজনৈতিক স্বার্থ ও লক্ষ্যের ঐক্য ভিত্তি করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা, (৩) হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর প্রসার এবং (৪)

যাহাতে রাজনৈতিক আন্দোলনে অশিক্ষিত জনসাধারণ যোগ দেয় তাহার ব্যবস্থা করা। ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষা এবং জাতীয়তাবোধ জাগরণই ইহার লক্ষ্য ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহন প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জাতীয়তা-বাদকে সংকীর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তার উর্ধে রাখিবার প্রয়াস পাইয়া-ছিলেন। ইহার নিদর্শন স্বরূপ এই সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে নবাব মোহাম্মদ আলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতে রাজনৈতিক জাগরণের যে প্রবল বন্যা বহে এবং যাহার ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৮৫ সনে তাহার প্রধান কৃতিত্বের দাবীদার এই ভারত সভা এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত ও আদিগুরু।

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৪৮ সনে কলিকাতায়। তাঁহার পিতা দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি পুত্রকে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ১৮৬৮ সনে সুরেন্দ্রনাথ বি.এ. পাশ করেন। ১৮৬৯ সনে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করেন। পরে ১৮৭১ সনে সিলেটের মৌলবী বাজারে এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সামান্য ত্রুটির জন্য তাহাকে বরখাস্ত করা হয়। নানা চেষ্টা করিয়াও তিনি এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারেন নাই। তাহার ব্যারিষ্টারী পড়িবার অনুমতিও অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর তিনি ইংরাজী ভাষা ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অধ্যাপনা ও সাংবাদিকতা গহণ করেন।

ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তিনি উনিশ শতকে ইউরোপীয়, বিশেষতঃ আয়ারল্যাণ্ডের স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন এবং ইতালীয় একত্রীকরণে মাৎসিনির আদর্শে যুব ইতালী গঠনে অনুপ্রাণিত হন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার ছাত্রসভায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয়গুলি ছিল 'শিখ জাতির অভ্যুদয়' ও 'মাৎসিনি ও যুব ইতালী'। তাহার তেজস্বী বক্তৃতায় তরুণদের মনে একদিকে যেমন দেশ-প্রেমের জোয়ার আসে অন্যদিকে বিদেশী শাসনের প্রতি দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তাহাদের মনে দেশাত্ববোধ এবং স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। নূতন ইতালীয় সমস্যা ও তাহাদের মুক্তি সংগ্রামের সহিত তাহারা একাত্মতা অনুভব করে। সুরেন্দ্রনাথ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে

দাবী দাওয়া আদায়ে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেইজন্য ছাত্রদিগকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ দিতেন। তাঁহার প্রচারিত জাতীয়তাবাদ ছিল সর্বভারতীয়। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তিনি বলিয়াছিলেন, "আইস আমরা পুরাতন কলহ, বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির দুঃখ ঘুচাইবার জন্য একযোগে একত্রে অগ্রসর হই।" বাস্তবিক পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতে চাহিযাছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৮৭৬ সনে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের আদেশে সিভিল সার্ভিস পরিক্ষার্থীদের ঊর্ধতন বয়স ২১ হইতে কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল। এই আদেশ যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে সমগ্র ভারতে এক গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন কয়েকটি ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্বে ইংরেজ রক্ষণশীল মহলে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভবিষ্যতে যাহাতে ইংরেজদের এই একচেটিয়া অধিকার ক্ষুন্ন না হয় সেইজন্য এই নূতন বিধি নির্ধারিত হয়। কারণ ১৯ বৎসর বয়স্ক কোন ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে সুদূর বিলাতে যাইয়া নূতন পরিবেশে ইংরেজ ছাত্রদের সহিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করা দুরূহ হইয়া দাড়াইল। এই কারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে তীব্র ক্ষোভ এবং হতাশা দেখা দিল। দেশের এই সঙ্কটমুহূর্তে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব আসিল বাংলাদেশ হইতে। ভারত সভা এই আদেশের প্রতিবাদে কলিকাতায় এক সভা আহ্বান করে। সুরেন্দ্রনাথ ইহাকে সমগ্র ভারতব্যাপী এক মহা আন্দোলনে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে লাহোর, অমৃতশহর, বারানসী, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি উত্তর ভারতের বড় বড় শহর এবং পরবর্তী বৎসরে বোম্বাই এবং মাদ্রাজ পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে বিরাট সভায় বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন শহরে যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল তিনি তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই নূতন বিধির বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সচেষ্ট হন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিযোগীদের বয়ঃসীমা বাড়াইয়া ২১ বৎসর করা, এবং যুগপৎভাবে ইংল্যাণ্ড ও ভারতে এই পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করা। কিন্তু ইহার পিছনে আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক তথা জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা।

তাঁহার এই পরিভ্রমণ সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। সর্বত্র প্রবল গণচেতনা পরিলক্ষিত হইতে থাকে। সর্ব ভারতীয় নেতা হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ বরণ-মালা প্রাপ্ত হন। সুরেন্দ্রনাথের এই বিরাট সাফল্য সম্পর্কে হেনরী কটন মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "২৫ বৎসর পূর্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে পাঞ্জাবে বাঙ্গালী কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। কিন্তু আজ সুরেন্দ্রনাথের নাম ঢাকা হইতে সুদূর মুলতান পর্যন্ত সমান উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং বাঙ্গালী বাবুরাই এখন পেশওয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জনমত গঠন করে।"

এই আন্দোলন এইখানেই শেষ হয় নাই। ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন আরও স্থির করিল যে একজন প্রতিনিধির মারফৎ ভারতীয় দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি ব্রিটিশ কমন্‌স সভায় পেশ করা হইবে। বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ এই প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। জন ব্রাইটের সভাপতিত্বে লণ্ডনে এক বিরাট সভা হয়। সেখানে লালমোহন তাহার অসাধারণ বাগ্মিতার সহিত ভারতীয় দাবীগুলি ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়মকানুনগুলি পরি-বর্তনের প্রস্তাব কমন্‌স্ সভায় গৃহীত হয় (১৮৯৩ সনে)।

সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিব জন্য জাতীয় আন্দোলন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। এই সময় গণআন্দোলনের আর একটি সুযোগ আসে। ১৮৭৮ সনে লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদপত্রগুলির কন্ঠরোধ করিবার উদ্দেশ্যে Vernacular Press Act পাশ করেন। কারণ দেশীয় পত্রিকা-গুলি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের পুঞ্জিভূত অসন্তোষকে সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরে। ইহার পরে আরও দুইটি প্রতিক্রিয়াশীল আইন পাশ হয় যেমন Arms Act এবং Licence Act। এই দুইটি আইনই ভারতীব স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। India Association এই সকল আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল। বস্তুতঃ সেক্রেটারী অব ষ্টেট লর্ড সলস্‌বেরীর নীতির পরোক্ষ ফল হিসাবে ভারতে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। যাহার ফলে ক্রমে তাহারা স্বায়ত্বশাসনের দাবী উত্থাপন করিল। ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারী কর্মচারীদের দৌরাত্ম কমাইয়া দেশীয় সদস্যদের ক্ষমতা বৃদ্ধির আবেদন করে।

এই সময় জাতিগত বৈষম্যমূলক ব্যবহার বৃটিশ শাসনের প্রধান নীতি হইয়া দাঁড়ায়। ফলে বৃটিশ ও ভারতীয়দের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটিয়া-

ছিল। জওহারলাল নেহেরু যথার্থ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "সেই সময় ভারত দুইটি জগতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—একটি হইল ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর জগৎ এবং অপরটি অগণিত ভারতবাসীর জগৎ। ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।" ১৮৮৩ সনে ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশী শাসকদের প্রতি ঘৃণার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় চেতনাবোধ এবং রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। উদারনৈতিক ভাইসরয় লর্ড রিপনের আদেশে বিচার বিভাগে বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তাঁহার আইন সদস্য মিঃ সিবিল ইলবার্ট, ইউরোপীয় এবং ভারতীয় বিচারকগণের ক্ষমতার সমতা বিধান করিয়া এক বিল প্রস্তুত করেন। ইহাই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ইলবার্ট বিল। দেশীয় শ্বেতাঙ্গরা এবং তাহাদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকাগুলি এই বিলটির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে এবং ভাইসরয়কে অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক ভাবে আক্রমন করে। সকল ইংরেজ, এমনকি সরকারী কর্মচারীরাও এই বিলের বিরোধিতা করে। উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ানরা এই আন্দোলনে সমর্থন ও উস্কানী দিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত বিলটির অধিকাংশ রদবদল হয় এবং ইউরোপীয়দের শ্বেতাঙ্গ জুরির মাধ্যমে বিচারের অধিকার দেওয়া হইল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইলবার্ট বিলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইলেও, ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে দেশময় যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহাতে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় ঐক্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাহারা আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। ইংরেজ ও শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে একটি ব্যবধান সৃষ্টি হইল। ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করিয়া দেশময় যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহার পুরোভাগে ছিল বাঙ্গালী ছাত্ররা। ভারতে ছাত্রদিগের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ইহাই প্রথম নিদর্শন।

১৮৮৩ সনে কলিকাতায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। বহু ভারতীয় নেতা এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে কলিকাতায় জমায়েত হইতে পারেন সেই কথা বিবেচনা করিয়া ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতার আলবার্ট হলে এক জাতীয় মহাসভা আহ্বান করিলেন। ইহার ব্যয়ভার বহনের জন্য জাতীয় তহবিল খোলা হইল। এই মহাসভার উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতীয় কল্যাণ এবং রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং সম্প্রদায় হইতে শতাধিক প্রতিনিধি উহাতে যোগদান করেন। আনন্দমোহন বসু তাঁহার উদ্বোধনী

ভাষণে ইহাকে জাতীয় পার্লামেন্ট গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সনের ডিসেম্বরে কলিকাতার জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন আহ্বান করা হয়। তিনদিন পর্যন্ত এই অধিবেশন চলিল। মুসলমানদের মধ্যে **Central National Mohamedan Association** এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিষ্টার আমীর আলী ইহাতে যোগদান করেন। অধিবেশনে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের উপর আলোচনা হয়: (১) সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সংস্কার এবং একযোগে ইংল্যাণ্ড এবং ভারতে পরীক্ষা গ্রহণ, (২) অস্ত্র আইন রহিত করণ, (৩) সামরিক এবং সাধারণ প্রশাসন বিভাগে ব্যয়ভার হ্রাস এবং (৪) বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক করণ।

কলিকাতায় জাতীয় কনফারেন্স শেষ হয় ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫। ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়, **A. O. Hume** নামক জনৈক ভারত দরদী সিভিলিয়ন ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করিয়া স্বজাতি ইংরেজদের সংকীর্ণতা তাহাকে মর্মাহত করিয়াছিল। এইদিকে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ত হইতে চলিতেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই সন্ধিক্ষণে হিউমের আবির্ভাব অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছিল। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফ্রিনের সহিত হিউমের এক দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং তাহার পরামর্শক্রমে হিউম কংগ্রেস গঠনের উদ্যোগ নেন। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যে প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করিতেছিল তাহা হ্রাস করা এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের মনোভাব এবং তাহাদের মতামত সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকেফহাল করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতেই জাতীয় কংগ্রেস সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল।

বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার মিঃ উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি। জাতীয় কনফারেন্স ও জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। সুরেন্দ্রনাথের সহিত হিউমের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেই কারণে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরই সুরেন্দ্রনাথ তাহার প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কনফারেন্সের দল লইয়া কংগ্রেসে যোগ দিলেন (১৮৮৬)।

কংগ্রেস সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে জন্ম নিলেও মুসলমানেরা প্রথম হইতে এই আন্দোলন হইতে দূরে থাকে। সৈয়দ আহমদ প্রমুখ মুসলিম নেতারা ইহাকে মুসলিম স্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে করিত। তাহাদের

মতে শিক্ষা এবং আর্থিক দিক হইতে অনগ্রসর মুসলমানদের জন্য কংগ্রেসে যোগদান আত্মঘাতী হইবে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে আধুনিক ভারতের নবজাগরণে পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারক ও বাহক বাঙ্গালী জাতি ও বাংলাদেশ ভারতের জাতীয়তাবাদ বিকাশে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছিল। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, ধর্মপ্রচারক বিবেকানন্দ এবং রাজ-নৈতিক আন্দোলনের জনক সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন সহ সকল নেতাই ছিলেন বাঙ্গালী। বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ এবং রাজ-নৈতিক চেতনার সূচনা হয় এবং বাঙ্গালীরাই জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র ও আদর্শ সর্বভারতে ছড়াইয়া দেয়। রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে স্বাধিকার আন্দোলনের সূত্রপাতও হয় বাংলাদেশে। এমনকি বিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতে যে বিপ্লবী চিন্তাধারার সূচনা হয় তাহার সূতিকাগারও এই বাংলাদেশ। সেইজন্যই মহামতি গোখেলের অমর উক্তি এইখানে যথার্থভাবে প্রণিধানযোগ্য—**"What Bengal said to-day the rest of India would say tomorrow."**

কতকগুলি মৌলিক কারণে ভারতের মূল জাতীয় প্রবাহ হইতে মুসল-মানরা দূরে সরিয়া গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকে পলাশী যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক বিপর্যয় শুরু হয় তাহাতে ভুক্তভোগী হইয়াছিল প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়। তাহারা প্রথম হইতে ইংরেজদিগকে অনধিকার প্রবেশকারী হিসাবে মনে করিত। কারণ কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত তাহারা যে এই দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক ছিল এই গর্ববোধ তাহাদের মন হইতে তখনো বিস্মৃত হয় নাই। অন্যদিকে হিন্দুসম্প্রদায় মুসলমান শাসনকে বিদেশী শাসন বলিয়া মনে করিত এবং মুসলিম শাসন উৎখাত করিবার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। তাহারা নির্দ্বিধায় বিদেশী ইংরেজ শাসনকে আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এমনকি রামমোহন রায়ও এই মনোভাবের উর্ধে ছিলেন না। তিনি মুসলিম শাসন ও ইংরেজ শাসনের তুলনা করিয়া ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করিয়াছেন। প্রসন্ন ঠাকুর স্বাধীনতা অপেক্ষা ইংরেজ শাসনে থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। ইংরেজ এবং বাঙ্গালী হিন্দুদের এই অঁতাত সম্পর্ক স্বাভাবিক-ভাবেই মুসলমানেরা সুনজরে দেখিতে পারে নাই। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ

সরকারের নীতি ছিল হিন্দুদিগকে খুশী করা। তাহারা 'বিভেদ সৃষ্টি করো এবং রাজত্ব কর' এই নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। হিন্দুরা কোম্পানী শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং তাহাদের প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। হিন্দুরা উনবিংশ শতকের প্রথম হইতেই ব্রিটিশ শিক্ষার সঙ্গে আপোষ করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়। ক্রমে তাহাদের মধ্যে একদল সরকার ঘেঁষা জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে মুসলমানেরা সরকারের সহিত অসহযোগিতা করিয়া একদিকে সরকারী সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল, অধিকন্তু শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি জীবনের প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই পিছাইয়া পড়িল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দুদের মধ্যে যেমন রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মুক্তিবুদ্ধি এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব হয়, যাঁহারা হিন্দুসমাজকে রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন করেন এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তাহাকে আধুনিক শিক্ষার পথে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হন। অন্যদিকে সেই সময় মুসলমান মধ্যশ্রেণীর কোনরূপ বিকাশ ঘটে নাই যাহার ফলে তাহাদের সমাজে কোন প্রগতিশীল দূরদর্শী প্রাজ্ঞ নেতার আবির্ভাব হয় নাই যিনি নূতন পটভূমিকায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে তাহাদিগকে সঠিক পথনির্দেশ করিতে পারিতেন। মুসলমানদের মধ্যে যে কয়েকজন ধর্মীয় সংস্কারকের আবির্ভাব হয় তাহারা আধুনিক শিক্ষার অভাব হেতু কোনরূপ বাস্তবচিন্তা না করিয়া কল্পনাশ্রয়ী হইয়া মুসলমানদিগকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। ইহার পরিণতি হিসাবে আমরা দেখিতে পাই ফরায়জি আন্দোলন এবং তথাকথিত ওহাবী বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ। আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বর্জনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ আসিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল।

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। কারণ এই বিদ্রোহের পরিণাম তাহাদের জন্য বিশেষ ভয়াবহ হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাহারা বুঝিতে পারিল যে সরকারের সহিত অসহযোগিতা এবং বিদ্রোহের মনোভাব তাহাদের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক ও আত্মঘাতী। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা যে তাহাদের জন্য অপরিহার্য—এই

বিশেষ বাণী ও বাস্তব কর্মপন্থা লইয়া আগাইয়া আসেন বাংলার দুই কৃতি সন্তান, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী, এবং উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ খান। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনেক লেখকের নিকট প্রতিক্রিয়াশীল মনে হয়।

যুগের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে নওয়াব আবদুল লতিফ ও আমীর আলী নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে আমীর আলী অধিকতর প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন ও ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন। ইহাদের কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ক্রমশঃ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে। ১৯০৫ সনের বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করিয়া উভয় সংপ্রদায়ের মধ্যে একটি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়।

এই দুই নেতার মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি ১৮২৮ সনে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় তিনি ইংরেজী শিক্ষা অধ্যয়ন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে আবদল লতিফ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ১৮৪৮ সনে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী ও আরবীর অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। পর বৎসরই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ সনে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। চাকুরী জীবনে আবদুল লতিফ অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৪ সনে তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আবদুল লতিফ তাঁহার কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার কর্তৃক প্রথমে খান বাহাদুর এবং পরে নওয়াব উপাধিতে ভূষিত হন।

আবদুল লতিফ ১৮৬২ সনে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। মুসলমান সমাজের কল্যাণ এবং স্বার্থ-রক্ষা তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। তিনি তাঁহার বাস্তববাদী বিবেচনা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে যুগের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে ব্যর্থতা, ইংরাজী শিক্ষা বর্জন এবং সরকারের সহিত অসহযোগ নীতিই মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল। তাই তিনি আধুনিক শিক্ষার আলোকে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা ও কুসংস্কার দূর করিয়া তাহাদের পুনর্জাগ-রণের চেষ্টা করেন। মুসলমানদের হীনমন্যতা দূর এবং তাহাদের মনে

আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে তিনি সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৫২ সনে নিখিল ভারত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আহ্বান করেন এবং ইহার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ছিল—"ইংরাজী শিক্ষার মুসলিম ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা"। বস্তুতঃ এই রচনা প্রতিযোগিতা মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিস্তর সাড়া পাওয়া যায়। আবদুল লতিফের সক্রিয় প্রচেষ্টায় এই সময় কলিকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো-পারসীয়ান বিভাগ খোলা হয়। তাঁহার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হইল ১৮৬৩ সনে কলিকাতায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা (Mohamedan Literary Society)। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছিল। এই সমিতিতে প্রধানতঃ মুসলমানদের সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা ও তাহার যুগোপযুগী সমাধান সম্পর্কে আলোচনা হইত; এবং প্রগতিশীল ভাবধারার সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় সাধনের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। আলীগড় আন্দোলন ও মুসলিম ভারতের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা সৈয়দ আহমদ খান কলিকাতায় সমিতির এক সভায় ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর এক মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। বস্তুতঃ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "বিজ্ঞান পরিষদ" (১৮৬৪) এই সাহিত্য সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত।

আবদুল লতিফ রাজনৈতিক আলোচনা হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতেন। সম্ভবতঃ ১৮৫৭ সনের বিপ্লব এবং মুসলমান সমাজের উপর উহার ভয়বহ ফলাফল তাঁহার স্মৃতিপটে ভাস্বর ছিল। সেইজন্য তিনি মুসলমানদের স্বার্থে সরকারের সঙ্গে প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনেব চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭০ সনে জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলীকে তাহার সমিতিতে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানান। মওলানা কেরামত আলী প্রচলিত ধারণা 'ব্রিটিশ শাসন দারুল হরব্' এই কথা যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে খণ্ডন করেন।

মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য আবদুল লতিফের যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁহার নেতৃত্বে ১৮৭২ সনে সরকারী সাহায্যে মফস্বলে কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। শিক্ষা বিষয়ে তিনি সরকারী নীতিকে সমর্থন জানান। হিন্দু কলেজের রক্ষণশীলতা এবং জাতিভেদ প্রথা দূর করিয়া ইহার দ্বার সকল মানুষের জন্য

উন্মুক্ত করিবার সরকারী প্রচেষ্টাকে তিনি স্বাগতম জানান। রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের কার্যকলাপে বিতশ্রদ্ধ হইয়া শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি বেথুন সাহেব হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ১৮৫৩ সনে। এই ব্যাপারে তিনি আবদুল লতিফের সক্রিয় সমর্থন লাভ করেন। ইহা ছাড়া আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে হুগলী কলেজ হইতে 'দানবীর হাজী মোহাম্মদ মোহসীন তহবিল' এর প্রদত্ত অর্থ যাহাতে সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়। মোহসীন ফাণ্ডের বদৌলতে বাংলাদেশে মুসলমানদের শিক্ষার পথ কিছুটা সুগম হয়। বাংলার মুসলমানদের জাগরণে নবাব আবদুল লতিফ নিঃসন্দেহে একজন অগ্রণী ছিলেন। ১৮৯৩ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজের ত্রাণকর্তা রূপে আরেকজন নেতার আবির্ভাব হয়। তিনি হইলেন সৈয়দ আমীর আলী। বাংলার মুসলমানদের এক যুগসন্ধিক্ষণে আমীর আলীর জন্ম হয় হুগলীর এক সম্ভ্রান্ত শিয়া পরিবারে (১৮৪৯)। তাঁহার জন্মের ৮ বৎসরের মধ্যেই ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ হয়। মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত সৈয়দ আহমদ ও আব্দুল লতিফ অপেক্ষা তিনি বয়োঃকনিষ্ঠ ছিলেন। সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফের মত তিনিও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষার মশাল হাতে লইয়া তাঁহারা সুষুপ্ত মুসলমান সমাজের আধুনিকীকরণে ব্রতী হন। আমীর আলী ইসলামী ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। ১৮৬৭ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. এবং পর বৎসর বি. এল. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৭৩ সনে তিনি 'লিঙ্কনস্ ইন' হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার হিসাবে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এক প্রতিবশা আইনজ্ঞ হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি নানারকম গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৮৭৮—১৮৮৩ পর্যন্ত বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ সনে তিনি ভাইসরয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। বিচক্ষণ আইনজীবির স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৯০ সনে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯০৪ সন পর্যন্ত ঐ পদ অলঙ্কৃত

করেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনি এই পদে দ্বিতীয় ব্যক্তি। ১৯০৯ সনে তিনি লণ্ডনে পিভিকাউন্সিলের সদস্য নিয়োজিত হন এবং আমৃত্যু অর্থাৎ ১৯২৮ সন পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই এই সম্মানের প্রথম অধিকারী।

আমীর আলী কেবল শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞই ছিলেন না। একাধারে তিনি শক্তিশালী লেখক, দূরদর্শী চিন্তানায়ক, রাজনীতিবিদ এবং প্রাগ্রসর সমাজ সংস্কারক ছিলেন। মুসলমানদের আধুনিকীকরণ তাঁহার স্বপ্ন ছিল। সৈয়দ আহমদ ও নওয়াব আবদুল লতিফ প্রদর্শিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সহযোগ নীতিতে তাঁহার আস্থা ছিল। কিন্তু আবদুল লতিফের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি তাঁহার কোন আগ্রহ ছিল না। সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ মুখ্যতঃ শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ সংস্কারের উপর গুরুত্ব দান করেন এবং সর্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন। কারণ উভয়ই রাজনীতিক আন্দোলন বা চাপ প্রয়োগ দ্বারা সরকারের নিকট দাবী দাওয়া আদায়ের বিপক্ষে ছিলেন। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিলে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হইবে এই ধারণা তাঁহাদের ছিল। আমীর আলীর নিকট তাঁহাদের এই ধারণা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ মনে হয় নাই। এই ব্যাপারে তাঁহার নিজস্ব আদর্শ এবং কর্মসূচী ছিল। তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন। এই চিন্তাধারার বশবর্তী হইয়া তিনি ১৮৭৭ সনে কলিকাতায় Central National Mohamedan Association গঠন করেন। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উম্মেষ ও ঐক্য স্থাপন এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়া পেশ করা ছিল ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ অপেক্ষা তাঁহার কৃতিত্ব অনেক বেশী। বস্তুতঃ আমীর আলী প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশনই ছিল ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁহার সমিতির পক্ষ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড রিপনের নিকট প্রেরিত স্মারকলিপিতে আমীর আলী মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়টি স্বতন্ত্র-ভাবে বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট বিশেষভাবে দাবী করেন। ইহা ছাড়া তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি 'মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ ও তাহার প্রতিকার' সম্বলিত বহু সারগর্ভ নিবন্ধ লেখেন। সরকারের নিকট তাহার বিরামহীন প্রচেষ্টা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অনেকটা ফলপ্রসূ হয়।

১৮৮৭ সনে তিনি সরকার কর্তৃক সি, আই,ই, উপাধি লাভ করেন। আমীর আলী বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দ্রষ্টা অগ্নিপুরুষ জামালউদ্দিন আফঘানীর অনুসারী ও তুর্কি খেলাফতের সমর্থক ছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের নিকট ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ ও মূলনীতি প্রচারে তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনী ও কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালনা করেন। এই বিষয়ে তাঁহার মহৎ কীর্তির মধ্যে **The Spirit of Islam** ও **A Short History of the Saracens** গ্রন্থদ্বয় অন্যতম।

আমীর আলী সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার উর্ধে ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতির দ্বার মুসলমান-অমুসলমান সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এই যে ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমানদের কল্যাণ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তবে রাজনীতিতে হিন্দু মুসলমানের পথ এক নয়। সেইজন্য ১৯০৮ সনে তিনি লণ্ডনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের স্বপক্ষে সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। স্বতন্ত্র নির্বাচনের মধ্যেই স্বতন্ত্র আবাসভূমির বীজ নীহিত ছিল।

দুই সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই বিভেদ চরমে উঠে। সৈয়দ আহমদ প্রমুখ মুসলমান নেতারা ইহাকে মুসলিম স্বার্থবিরোধীরূপে প্রচার করেন। ফলে অধিকাংশ মুসলমান নেতারা কংগ্রেসের সঙ্গে বিশেষ সংশ্রব রাখেন নাই। ১৮৮৭ সনে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিণ ভারত সচিবকে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে মুসলমানরা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করে নাই। তাহারা বেশ বুঝিয়াছে যে বাঙ্গালীর শাসনে তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইবে।"

হিন্দু পুনরুত্থানের ফলে তাহাদের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পায় তাহাদের রাজনীতিতে ও সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। স্বামী দয়ানন্দ পরিচালিত আর্যসমাজ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার প্রচারিত শ্লোগান "ভারত শুধু ভারতীয়দের জন্য"। ইহা ছাড়া বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তি প্রচারিত নবহিন্দু জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ছিল মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ এবং ইহার উৎস ছিল সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের জন্যই মুসলিম বিদ্বেষ হইতে এবং ইহা নিঃসন্দেহে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে তিক্ত করে। অতঃপর বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ

পরস্পর বিরোধী হয়। কংগ্রেস এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়া মুসলমানদের আস্থা হারায়। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে স্বাধিকার এবং স্বরাজ-আন্দোলনের শত্রু বলিয়া মনে করিতে থাকে। অন্যদিকে স্বরাজ বলিতে মুসলমানেরা হিন্দুরাজকেই বুঝাইত। এই সকল কারণেই মুসলমানেরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে (১৯০৬ এর ডিসেম্বর) পূর্ণ সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বঙ্গ ভঙ্গ (১৯০৫) ও তৎকালীন রাজনীতি

১৮৯৮ সনে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। শিক্ষা, কর্মদক্ষতা, দায়িত্বজ্ঞান এবং সর্বোপরি এই দেশের সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লইয়াই তিনি ভারতে আসেন। তাহার শাসনকাল (১৮৯৮—১৯০৫) বিভিন্ন দিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লর্ড কার্জনের শাসনকালের বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলা বিভাগ। তৎকালে সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ লইয়া ছিল বঙ্গদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। এই প্রদেশের লোকসংখ্যা ছিল সমগ্র উপমহাদেশের এক তৃতীয়াংশ। কার্জন প্রথম হইতে এতবড় প্রদেশকে একটি মাত্র প্রশাসনিক ইউনিটের অধীনে রাখা অনুচিত মনে করেন। সুদূর কলিকাতা হইতে পূর্বাঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থা ও জনগণের প্রতি সুবিচার সম্ভব নয়। তাই প্রধানতঃ প্রশাসনিক কারণেই তিনি ১৯০৩ সনে এই বিরাট প্রদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের এই সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে পরিগণিত হয়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তিনি উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করিলেন। এই নবগঠিত প্রদেশের নামকরণ হইল পূর্ব বাংলা ও আসাম। অপরদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা সম্মিলিত হইয়া আরেকটি প্রদেশ হয়—ইহার নাম হইল বাংলাদেশ।

নূতন প্রদেশ গঠনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি লইয়া ব্রিটিশ সরকার বহুদিন হইতে জল্পনা কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৫৩ সনে স্যার চার্লস গ্রান্ট বাংলা প্রদেশকে দুইভাগে বিভক্তকরণের সুপারিশ করেন। ১৮৫৪ সনে লর্ড ডালহৌসী প্রশাসনিক সুবিধার জন্য অনুরূপ মন্তব্য করেন।

১৮৬৬ সনে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের জন্য বাংলা সরকারের ব্যর্থতা এবং তাহার প্রশাসনিক দুর্বলতা যে অনেকাংশে দায়ী সেই বিষয়ে চিন্তা করিয়া তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড নর্থকোর্ট বাংলা প্রদেশের সীমানা রদবদলের

উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ঠিক ঐ সময় বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্ণর স্যার উইলিয়ম গ্রে শুধু বাংলাদেশকে লইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেন, যেখানে প্রদেশের নিজস্ব এক্সিকিউটিভ ও লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল থাকিবে। এই সমস্ত বিষয়ে অভিহিত হইয়া ভারত সচিব, গভর্ণর জেনারেল স্যার জন লরেন্সকে বাংলায় বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রদেশ গঠনের পরামর্শ দেন। গভর্ণর জেনারেল তাঁহাব চিঠিতে ভারতসচিবকে জানান যে তিনি ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক ও জাতিগতভাবে স্বতন্ত্র আসামকে বাংলা প্রদেশ হইতে পৃথক করিয়া একজন চীফ কমিশনারের অধীনে আনিবার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

১৮৭২ সনে সর্বপ্রথম ভারতে আদমশুমারীর প্রবর্তন হয়। পূর্বে বাংলা প্রদেশের জনসংখ্যা সম্বন্ধে সরকারের কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা ছিল না। লোকগণনাতে দেখা গিয়াছিল যে বাংলা প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যা ৬ কোটি ৭০ লক্ষ। সেই হেতু ১৮৭৪ সনে বাংলা প্রেসিডেন্সির তিনটি জিলা সিলেট, গোয়ালপাড়া এবং কাছাড় সহ আসামকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট চীফ কমিশনারশীপ গঠন করা হইল। ১৮৯২ সনে প্রশাসনিক এবং সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া লুসাই পাহাড়কে আসামের সহিত সংযুক্ত করা হইল। ১৮৯৬ সনে আসামের চীফ কমিশনার স্যার উইলিয়ম ওয়ার্ড বাংলা হইতে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামকে আসামের সহিত যুক্ত করিয়া নূতন প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেন। কিন্তু এই প্রস্তাব বাংলার জনসাধারণের বিরোধিতার জন্য নাকচ হইয়া যায়, কারণ অনুন্নত আসামের সঙ্গে যুক্ত হইলে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা নানাদিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। শেষ পর্যন্ত নূতন প্রদেশ গঠনের প্রকল্প কিছুদিনের জন্য বাদ পড়িল। ভাইসরয় নিযুক্তির অল্পদিনের মধ্যেই কার্জন ভারতের প্রদেশগুলির প্রশাসনিক সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করেন এবং বিশেষভাবে বাংলা প্রদেশের সীমারেখা তাঁহার নিকট অযৌক্তিক মনে হয়। সেইজন্য তিনি পূর্বের বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি পুনরায় নিরিখ করিতে বসেন।

১৯০৩ সালে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এনড্রু ফ্রেজার উড়িয়া ভাষাভাষী সম্বলপুরকে বাংলা প্রেসিডেন্সির সহিত সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব করিলে নূতন প্রদেশ গঠনের বিষয়টির আবার সক্রিয় হইয়া উঠে। কেননা,

সম্বলপুরের সংযুক্তির ফলে বাংলার জনসংখ্যা এবং আয়তন আরও বৃদ্ধি পাইবে। সেই হেতু বাংলা গভর্ণমেন্টের প্রশাসনিক দায়িত্ব লাঘব করিবার জন্য তিনি বিহারের ছোট নাগপুরকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করেন। এবং চট্টগ্রাম বিভাগ এবং পার্বত্য-ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে একত্রীকরণের পরামর্শ দেন।

ভারত সরকারের এই সমস্ত রদবদল দ্বারা প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনগণের উন্নতি বিধানই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্তনে যে ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে সেই বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন না। ১৯০৩ সনে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে নূতন প্রদেশ গঠনের কথা অবগত করেন এবং বিশেষভাবে বাংলা ও আসামের ভৌগলিক সীমারেখা পরিবর্তন সম্পর্কে তাহাদের বক্তব্য আহ্বান করেন। প্রশাসনিক সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া বিভিন্ন প্রদেশগুলি নূতন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবটিকে পূর্ণ সমর্থন জানায়।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ রিইজলীর ১৯০৩ সনের ডিসেম্বরে লিখিত এক চিঠি হইতে জানা যায় যে বাংলা সরকারকে বিরাট প্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়াও, রাজস্ব আদায়, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রসার প্রভৃতি এবং আরও অনেক জটিল সমস্যার মোকাবিলা করিতে হয়। এই সমস্ত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বাংলার লেফ-টেনেন্ট গভর্ণরের দায়িত্ব লাঘব অত্যাবশ্যক ছিল। রিইজ্লী ভৌগলিক সীমারেখার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রশাসনিক উন্নতির জন্য এই সমস্ত পরিবর্তন যে সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ সেই বিষয়টি উল্লেখ করেন।

নূতন প্রদেশ গঠনের পশ্চাতে শক্তিশালী প্রশাসনিক যুক্তি ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও যথেষ্ট ছিল। ইহাতে একদিকে যেমন প্রশাসনিক উন্নতি হইবে, অন্যদিকে বহুদিনের উপেক্ষিত পূর্ববঙ্গ ও আসামে একটি কার্যকরী শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিবে। বস্তুতঃ ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিক হইতে এই এলাকা অবহেলিত হইয়া আসিতেছিল। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশ, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। ব্রিটিশ শাসনে এই দেশের যাহা কিছু উন্নতি ও কল্যাণ-মূলক কাজ হইয়াছিল তাহা ছিল রাজধানী কলিকাতা কেন্দ্রিক। বলা বাহুল্য কলিকাতা ছিল ইংরাজ শাসনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের

প্রাণকেন্দ্র। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে একমাত্র কলিকাতাতেই ২২টি কলেজ ও ১টি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। দীর্ঘদিনের অবহেলা, প্রশাসনিক ঔদাসিন্যতা এবং ফলপ্রসূ প্রকল্পের অভাবে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ক্রমাগত অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পূর্ব বাংলার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। কিন্তু কৃষি এবং কৃষকের উন্নতির কোনরূপ প্রচেষ্টা না থাকার ফলে উৎপাদনমূলক কার্য বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। এই অঞ্চলের প্রধান অর্থকরী ফসল হইল পাট, যাহা সোনালী সূত্র হিসাবে জগৎবিখ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের অধিকাংশ কলকারখানা এবং সকল চটকলগুলি স্থাপিত হয় কলিকাতার আশেপাশে হুগলী নদীর তীরে। ফলে বেকারত্ব পূর্ব বাংলার এক বিরাট অভিশাপ হইয়া দাঁড়ায়। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছিল। ইহার একটি কারণ ছিল যে চাকুরীক্ষেত্রে সুদূর কলিকাতায় তাহারা কোনরূপ সহানুভূতি পাইত না। কলিকাতার প্রতি সরকারের অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধতাই পূর্ববঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবনতির অন্যতম কারণ। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে কলিকাতার পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হইত। চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আসাম ও পূর্ববঙ্গের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে প্রসার হইতে পারিত সেই দিকে সরকারের কোন নজর ছিল না। চট্টগ্রামের উন্নতি হইলে ব্যবসা ও বাণিজ্যের দিক হইতে কলিকাতার গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পাইবে এই আশঙ্কা করিয়া কলিকাতা কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণ বা উন্নতির কোন চেষ্টা করে নাই। এই অবহেলা ছিল অনেকটা সুপরিকল্পিত। পূর্ব বংগের অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং কৃষিই হইল তাহাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন। অথচ অধিকাংশ জমিদার ও মহাজন ছিল হিন্দু। চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার ত্রুটির জন্য ইহাদের অত্যাচারে কৃষককুল অতিষ্ঠ ছিল। সরকারী কর্মচারীদের শৈথিল্য এবং তাহাদের যোগসাজসে এই অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের যোগাযাগ, পুলিশ এবং ডাকব্যবস্থা অত্যন্ত সাবেকী আমলের ছিল। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের বিস্তীর্ণ চর ও হাওর অঞ্চল এবং নদীগুলিতে চুরি, ডাকাতি ও বেআইনী কার্যকলাপ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মানষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অভাব সর্বত্র অনুভূত হইতেছিল।

এমতাবস্থায় লর্ড কার্জন প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করা ছাড়াও ভবিষ্যতে পূর্ববঙ্গ যাহাতে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিতে পারে সেইদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল। কার্যক্রমসরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে জমিদার ও তাহাদের আমলাদের শোষণ কিছুটা হ্রাস পাইবে। সেইজন্য প্রদেশে সাবেকী সীমারেখা আধুনিকীকরণ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। কার্জন আশা পোষণ করিয়াছিলেন যে যথারীতি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিলে পূর্ববঙ্গ ও আসামের জনগণের শিক্ষা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন উন্নত হইতে বাধ্য। অতঃপর কার্জন পূর্ব বাংলার সমস্যা সম্বলিত একটি প্রস্তাব ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন।

প্রশাসনিক উন্নতি ও সমতা বিধান ছাড়াও দেশ বিভাগের পশ্চাতে কার্জনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি গভীর ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবিরা ভারতে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মদাতা। সেইজন্য প্রথম হইতে তিনি এই শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ করেন। বাঙ্গালীদের প্রাগ্রসর চিন্তা, ক্রিয়াকর্ম, দাবীদাওয়া ও আশা আকাংখার প্রতি তাহার কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না। সেইজন্য প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে তিনি কংগ্রেস ও নূতন জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করিতে মনস্থ করেন। অনেক লেখকের মতে বাংলা বিভাগ তাহার সুপরিকল্পিত বিভক্তিকরণ নীতির বহিঃপ্রকাশ। ইহাতে একদিকে যেমন পূর্ববঙ্গের মুসলমানদিগকে খুশী করা হইবে এবং তাহারা ক্রমশঃ সরকারের প্রতি অনুগত ও সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিবে, অন্যদিকে এই বিভাগ নীতি হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালীদের অখণ্ডতা তথা ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করিবে।

বঙ্গবিভাগ বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। নূতন প্রদেশের সম্ভাব্য সীমারেখা প্রকাশ হইবার পূর্বেই দেশময় প্রতিবাদের ঝড় বহিল। ইহা অপ্রত্যাশিত ছিল না। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠিল। বণিকসমিতি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রগুলি একযোগে ইহার তীব্র নিন্দা করিল। সমগ্র দেশ সভা-সমিতির মাধ্যমে বংগ বিভাগের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের শপথ নিল। জাতীয় কংগ্রেস ইহার বাৎসরিক সভায় এই বঙ্গ বিভাগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-

প্রণোদিত বলিয়া মন্তব্য করিল এবং ১৯০৩ ও ১৯০৪ সনে সরকারী নীতির প্রতিবাদ করিল।

এই সমস্ত প্রতিবাদের মূল বক্তব্য ছিল এই যে, নূতন প্রদেশ সৃষ্টি বাঙ্গালীদের স্বার্থের পরিপন্থী। ইহা অখণ্ড বাঙ্গালী জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করিবে এবং তাহাদের ক্রমবর্ধমান একাত্মতা—ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হইবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত উন্নয়নগামী বিভাগের জনসাধারণকে আসামের মত একটি অনুন্নত প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করিলে তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইবে। এই অঞ্চলের জনগণ লেঃ গভর্ণরের প্রশাসন, লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল, রেভেনিউ বোর্ড ও হাইকোর্ট হইতে বঞ্চিত হইবে।

১৯০৪ সনের প্রথমদিকে লর্ড কার্জন পূর্ব বঙ্গের কয়েকটি জেলা সফর করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের অবস্থা সরেজমিনে পরীক্ষা করা এবং সেখানকার নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের চেষ্টা করা। তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ সফর করেন। তিনি সর্বত্র বঙ্গবিভাগ বিরোধী উত্তেজনা লক্ষ্য করেন। এই আন্দোলনের কর্ণধার ছিল হিন্দু নেতৃবৃন্দ। এই উত্তেজনার পশ্চাতে যুক্তি অপেক্ষা ভাবাবেগই বেশী ছিল। কার্জন গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেন যে দীর্ঘদিনেয় অবহেলা ও অবিচারের জন্য পূর্ববঙ্গের প্রশাসন যন্ত্র প্রায় অচল অবস্থায় আসিয়া পেঁাছাইয়াছে। ময়মনসিংহের এক জনসভায় তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ গঠন করিয়া সেখানে একটি সক্ষম শাসনযন্ত্র গড়িয়া তুলিবার ইঙ্গিত প্রদান করেন। এই ব্যাপারে তিনি ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি আরও আভাস দিলেন যে—নূতন প্রদেশ একজন লেঃ গভর্ণরের অধীনে থাকিবে এবং ইহার প্রাদেশিক আইনপরিষদ ও নিজস্ব রেভিনিউ বোর্ড থাকিবে। ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ্‌র সঙ্গে কার্জনের দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেখানে লর্ড কার্জন পূর্ব বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন প্রদেশ গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা খুশী হইয়াছিল যে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদিগকে আর বিভিন্ন কাজে সুদূর কলিকাতা পর্যন্ত যাইতে হইবে না। ইহা ছাড়া পূর্ববঙ্গে নূতন প্রদেশ গঠিত হইলে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের উন্নতি এবং ঢাকার লুপ্ত গৌরব পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা ছিল। অনেকদিক ভাবিয়া সলিমুল্লাহ্ সরকারী সিদ্ধান্তকে স্বাগতম জানান। কোন

কোন লেখক প্রচার করেন যে সরকার সুবিধামত শর্তে ঋণ দিয়া সলিমুল্লাহ্‌কে হাত করেন। কিন্তু তাহাদের এই বক্তব্যের বিশেষ নির্ভরশীল কোন প্রমাণ নাই। কারণ প্রদেশ বিভাগের দাবী মুসলমানদের তরফ হইতে আসে নাই। এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে কোন কোন মুসলিম নেতা ও জমিদার ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইহার প্রতিবাদ করে। কিন্তু যখন ঢাকাকে রাজধানী করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব হয় তখন তাঁহারা একযোগে সলিমুল্লাহ্‌র পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ায়। কেননা প্রদেশের রাজধানী ঢাকা হইলে তাহারা কলিকাতার আধিপত্য হইতে নিস্তার পাইবে এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনগ্রসরতা দূর হইবে।

ইতিমধ্যে ১৯০৫ সনে মে মাসে সর্বপ্রথম লণ্ডনের "Standard" পত্রিকায় বঙ্গবিভাগ ভারতসচিবের অনুমোদন লাভ করিয়াছে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। খবরে আরও প্রকাশিত হয় যে নূতন প্রদেশে আসামের সঙ্গে বাংলার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ যুক্ত হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশ সৃষ্টি হইবে। ১৯০৫ সনের ১৯শে মে বিভিন্ন পত্রিকায় নূতন প্রদেশের সীমারেখা প্রকাশিত হয়। দার্জিলিং নূতন প্রদেশ হইতে বাদ পড়িল কিন্তু জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং মালদহ সংযুক্ত হইল। ঢাকা রাজধানী এবং চট্টগ্রাম বিকল্প রাজধানী নির্বাচিত হয়। এই নূতন প্রদেশের আয়তন হইল ১ লক্ষ ৬ হাজার বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ। তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ এবং হিন্দু ১ কোটি ২০ লক্ষ এবং বাকী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী।

বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম হইতেই হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। তাহারা বিভিন্ন যুক্তি ও ভীতি প্রদর্শন করিয়া বিফল হইল। হিন্দুদের প্রবল বাধা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার তাহাদের সিদ্ধান্তে অটল রহিল। নূতন প্রদেশের বিস্তারিত সীমারেখা প্রকাশিত হয় মে মাসে এবং ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর হইতে উহা কার্যকরী হইবে এই সংবাদে হিন্দু নেতাদের মনে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। তাহারা যাহাতে নূতন প্রদেশ বাস্তবায়ন না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তাহাদের পত্রপত্রিকায় বক্তৃতামঞ্চে ইহাকে 'বাঙ্গালী বিরোধী, জাতীয়তাবাদী বিরোধী এবং বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁহার 'বেঙ্গলী'র সম্পাদকীয়তে ইহাকে 'জাতীয়

দুর্যোগ এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সঙ্কটময় মুহূর্ত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তবে তাহার অনেক উক্তিই যে স্ববিরোধী এবং রাজনৈতিক চাল প্রসূত ছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

লর্ড কার্জন তাঁহার জবাবে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে এই বিভাগ দ্বারা এই অঞ্চলের নিপীড়িত জনসাধারণের শিক্ষা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হইলে তাহারা ক্রমশঃ পশ্চিমাঞ্চলের অধিক ভাগ্যবান এবং উন্নত ভাইদের সমতুল্য হইতে পারিবে। ইহাতে ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জাতিরই উন্নতি হইবে। বর্তমানে তাহারা একটি অঞ্চলে নেতৃত্ব করিতেছে, ভবিষ্যতে তাহারা দুইটি অঞ্চলে কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। তিনি বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে স্মরণ করাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে নবগঠিত প্রদেশকে পূর্ণ সমর্থন জানাইতে আহ্বান করেন। কিন্তু কলিকাতার সংবাদপত্রগুলি তাহার উদ্দেশ্যের অপব্যাখ্যা করে এবং কার্জনকে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য দোষারোপ করে। ইহারা আরও প্রচার করে যে কার্জনের বিভেদ নীতির ফলে মুসলমানদের মনে উচ্চাকাংখা জাগিয়াছে এবং ইহার ফলে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত উক্তি ছিল অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এবং ফাঁকা। কারণ কার্জন হিন্দু-মুসলিম বিরোধের জনক ছিলেন না। ঐতিহাসিক ডঃ ষ্ট্যানলী ওলপার্টের মন্তব্য এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য, "হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত নূতন নহে, ইহা ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি সামাজিক সমস্যা। দীর্ঘ কয়েকশত বৎসর পরস্পরের সহঅবস্থান সত্বেও ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘাত দূর হয় নাই।"

হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মূল কারণগুলি গভীরভাবে অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করিলে এই বিরোধিতার তাৎপর্য কিছুটা স্পষ্ট হইবে। বাংলা বিভাগ সত্যই তাহাদের জন্য এক দুর্যোগের ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। নিছক ভাবাবেগ অপেক্ষা বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনা করিয়াই হিন্দু-নেতৃবর্গ ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে শীঘ্রই নূতন ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে এই অঞ্চলের এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মত মুসলিম কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং তৎসঙ্গে নবজাগরণ দেখা দিবে। ফলে পূর্বের ন্যায় আর তাহাদিগকে শোষণ ও নিষ্পেষণ করা যাইবে না। পূর্ববঙ্গের জনগণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হউক ইহা তাহারা কোনদিনই সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করিতে

রাজী হয় নাই। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিপীড়িত মুসলমান কৃষক-সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগরিত হইবে এই ভয়ে রাজনৈতিক নেতারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ তাহাদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। কাশিমবাজারের মহারাজা মহিন্দ্রচন্দ্রনন্দী এক প্রতি-বাদ সভায় সভাপতির ভাষণে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন, "নূতন প্রদেশে মুসলমানরা হইবে সংখ্যাগুরু আর বাঙ্গালী হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। ফলে স্বদেশেই আমরা হইব প্রবাসী। আমাদের জাতীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় আমি উদ্বিগ্ন।" বাস্তবিকপক্ষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু পুন-র্জাগরণ এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে হিন্দুদের মনে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার বীজ মাথা চাড়া দিয়া উঠে। তখন এই আন্দোলন নিছক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। ক্রমশঃ ইহা মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল। হিন্দু নেতৃবর্গের কায়েমী স্বার্থ এবং সংকীর্ণ জাতীয়তা-বোধই তাহাদিগকে এত উত্তেজিত এবং মারমুখো হইতে বাধ্য করিয়াছিল। জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ছিল এই আন্দোলনের পুরোভাগে। ব্রিটিশ শাসনের শুরু হইতে ইহারা নানা প্রকাব সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছিল। এই সমস্ত জমিদারদের অনেকেই এই অঞ্চলের সম্পদ অপহরণ করিয়া তাহাদের ঐশ্বর্যের নিকেতন গড়িয়া তুলিয়াছিল কলিকাতায়। এই সমস্ত অঞ্চলের উন্নয়ন বা জনগণের সুখ সুবিধার দিকে তাহাদের কোন দৃষ্টি ছিল না। অনুপস্থিত জমিদার তাহাদের নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে জমিদারী শাসন করিত। এই সকল নায়েব-গোমস্তাদের উৎপীড়নে পূর্ববঙ্গের কৃষকরা জর্জড়িত ছিল এবং ক্রমশঃই গ্রামের আর্থিক সমৃদ্ধি ধ্বংস হইতেছিল। ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হইলে নূতন প্রদেশে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং নূতন পুঁজিপতির জন্ম হইবে, ফলে তাহাদের একচেটিয়া ব্যবসা এবং মুনাফা নষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দিবে—এই ভয়ে কলিকাতার পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরা এই নূতন প্রদেশ গঠনের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক একদা বলিয়া-ছিলেন, **Politics of Bengal is in reality economics of Bengal"** —"বাংলার অর্থনীতিই বাংলার আসল রাজনীতি।" শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী, আইনজীবি এবং সাংবাদিকরাও অনুরূপ কারণে ভীত ছিল। ঢাকাতে নূতন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হইলে তাহাদের আইন ব্যবসায়ে ভাটা পড়িবার

সম্ভাবনা দেখা দিবে। কারণ অধিকাংশ মক্কেলই ছিল পূর্ববঙ্গের। ইহা ছাড়া ঢাকাতে নূতন সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রের চাহিদাও অনেকাংশে কমিয়া যাইবে। এই কারণে এ্যাংলো ও হিন্দু পরিচালিত পত্রিকাগুলি বাংলা বিভাগের প্রতি বিরূপ ছিল। উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্যই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতা ছিল এই আন্দোলনেব প্রাণকেন্দ্র এবং সুরেন্দ্রনাথ, বিপিণচন্দ্র পাল, অশ্বিনী-কুমাব দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি নেতারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন।

কার্জন লক্ষ্য করিতেছিলেন যে কিভাবে কলিকাতার স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধি-জীবি এবং সাংবাদিক সারা দেশের জনমতকে নিজেদের স্বার্থে নিয়োজিত করিতেছিল। তিনি কলিকাতা কেন্দ্রিক এই আন্দোলনকে সুনজরে দেখেন নাই। তিনি আশা পোষণ করিয়াছিলেন যে, নূতন প্রদেশে ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া এবং পাটনাতে জনমত গড়িয়া উঠিবে। বাংলার অধিকাংশ মুসলিম নেতারা প্রথম হইতেই নূতন প্রদেশে মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির সূচনা হইবে এই আশায় ইহাকে স্বাগতম জানায়। তাই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যখন প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয় তখন সলিমুল্লাহ্ ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর অর্থাৎ নূতন প্রদেশের জন্মদিনটিতে মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করিয়া মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে আগাইয়া আসেন। ১৯০৫ সনের জুলাই মাসে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম ইনিষ্টিটিউট পত্রিকায় "নূতন প্রদেশ এবং ইহাব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা" শীর্ষক একটি সারগর্ভ নিবন্ধ লেখেন। ইহাতে তিনি এই প্রদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আলোচনা কবেন। এই বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করিয়াই খাজা সলিমুল্লাহ্ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৮৭১ সনে ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে তাহার জন্ম হয়। তাহার পূর্ব পুরুষগণ ব্যবসা উপলক্ষে এই দেশে আসেন এবং পরে জমিদারী ক্রয় করিয়া ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পিতামহ খাজা আবদুল গণি এই অঞ্চলের সামাজিক এবং জনহিতকর কার্যের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তাহার জন-দরদী কার্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৭৫ সনে সরকার কর্তৃক তিনি নবাব উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৮৭৭ সন হইতে ইহা তাঁহাদের বংশগত পদবীতে পরিণত হয়। ১৯০১ সনে পিতা খাজা আহসানউল্লাহ মৃত্যুমুখে পতিত

হইলে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে পারিবারিক দায়িত্বভার তাহার উপর পড়ে। তখন তিনি ময়মনসিংহে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন। জনহিতকর কার্যে সলিমুল্লাহ্ কেবল পারিবারিক ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রাখেন নাই বরং নিজে অনেক নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে এই সকল কাজের আরও ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। ঢাকার আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), মিটফোর্ড হাসপাতাল (সলিমউল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ), সলিমুল্লাহ্ এতিম খানা এবং ঢাকা কলেজ হোষ্টেল (বর্তমানে শহীদউল্লাহ হল) এখনও তাহার জনহিতকর কার্যের স্বাক্ষর বহন করে।

পারিবারিক ঐশ্বর্য এবং আরাম আয়াসের মধ্যে মানুষ হইলাও এই দেশের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনীতিক অনগ্রসরতা তাঁহাকে পীড়া দিত। ঢাকার অতীত ঐশ্বর্যের কথা চিন্তা করিয়া এবং ব্রিটিশ শাসনে ইহার অধঃপতন সলিম-উল্লাহ্কে সত্যই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। দারিদ্র্য প্রপীড়িত পূর্ব-বঙ্গবাসীর শিক্ষা এবং সামাজিক অধঃপতন রোধ এবং তাহাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই আদর্শ এবং সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি নূতন প্রদেশ সৃষ্টির প্রস্তাবকে দৃঢ় সমর্থন দান করেন।

১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় সলিমুল্লাহ্র উদ্যোগে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতে উহা বঙ্গভঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। প্রতি বৎসর লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গবিরোধী কার্যাবলীর নিন্দা করা হয়। ১৯১০ সনে ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত **Imperial Council** এ বিষয়টি পুনরুত্থাপনের চেষ্টা করিলে বাংলার মুসলিম নেতা শামসুল হুদা এবং বিহারের মাযহারুল হক উহার তীব্র প্রতিবাদ করে। বস্তুতঃ নূতন প্রদেশটি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানদের সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মুসলিম পত্রপত্রিকাগুলিও নূতন প্রদেশ গঠনে আনন্দ প্রকাশ করে। কলিকাতার মুসলিম সাহিত্য সংসদ ইহাকে আশির্বাদরূপে বর্ণনা করে এবং মুসলিম জনগণকে ইহার সহিত পূর্ণ সহযোগিতার আহ্বান জানায়। বাংলার তফসিল সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুরা বাংলা বিভাগকে পূর্ণ সমর্থন দান করে। কেননা পূর্ববাংলা ও আসামের উন্নতির সঙ্গে তাহাদের স্বার্থ এবং ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্ণহিন্দু কর্তৃক তাহারাও কম অবহেলিত ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে নিখিল ভারত কংগ্রেস এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কংগ্রেস মূলতঃ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল না। বিংশ শতকের প্রথম দশকে কংগ্রেসের চরম ও নরম পন্থীদের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দিয়াছিল এই আন্দোলনে সেইটি কিছুদিনের জন্য ধামাচাপা পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে চরমপন্থী অরবিন্দ ঘোষ, বিপিণচন্দ্র পাল প্রমুখ আসিয়া যোগ দিয়া আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে। বাংলার বাহিরে চরমপন্থী নেতা বল গঙ্গাধর তিলকও ইহাদের সহিত হাত মিলান। শেষ পর্যন্ত ইহাদের চাপে পড়িয়া তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি গোখেলের মত উদারপন্থী নেতাও পূর্ববঙ্গের স্বার্থবিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেন। বঙ্গভঙ্গকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া কংগ্রেস হিন্দুদের ভিতর জনপ্রিয় হইয়া উঠে। তবে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের যে রূপ ছিল তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। কংগ্রেস ক্রমশঃ এই আঞ্চলিক বিরোধকে সর্ব ভারতীয় আন্দোলনের রূপ দিতে থাকে।

যেইদিন বঙ্গভঙ্গ সরকারীভাবে ঘোষিত হইল সেইদিন কংগ্রেস দেশব্যাপী শোকদিবস পালন করে। বাঙ্গালীর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক 'রাখীবন্ধন' অর্থাৎ বাহুতে লাল ফিতা ধারণ করে, ১৬ই অক্টোবর উপবাস করে, সর্বপ্রকার কাজকর্ম বন্ধ রাখে এবং আত্মশুদ্ধির জন্য সকালে খালি পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গাস্নানে যায়। হিন্দুদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগানোই ছিল উক্ত কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন দ্রুত মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে মোড় নিল। ফলে পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হইল। স্বদেশ বন্দনার নামে আন্দোলনকারীরা নবহিন্দুবাদের জনক বঙ্কিম চন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষমূলক সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালু করিল। ইহা ছাড়া মহারাষ্ট্র নেতা তিলকের গো-রক্ষা আন্দোলন, শিবাজী প্রবর্তিত গণপতি উৎসবকে তাহাদের তালিকাভুক্ত করিল। নেতৃবর্গের উস্কানীতে আন্দোলন গুরুতররূপ ধারণ করে। ১৯০৫ সনে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে চরমপন্থীরা কংগ্রেসকে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণে প্ররোচিত করে।

পূর্ব বাংলার এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণ এবং নূতন প্রদেশকে টিকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে সলিমুল্লাহ্ আপোষহীন সংগ্রাম করেন। পূর্ববঙ্গের উদীয়মান নেতা ফজলুল হক, ধানবাড়ীর জমিদার নওয়াব আলী

চৌধুরী তাঁহাকে পূর্ণ সমর্থন জানান। ইঁহারা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া নতুন প্রদেশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং ইহার স্বপক্ষে জনমত গঠনে সচেষ্ট হন।

ইতিমধ্যে ১৯০৫ সনে লর্ড কার্জন পদত্যাগ করেন। প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচিনারের সঙ্গে সামরিক প্রশাসনক্ষেত্রে মতবিরোধই তাঁহার পদ-ত্যাগের কারণ। লর্ড মিন্টো নূতন ভাইসরয় হইয়া আসিলেন। তাহার নিকট ভারত সভার পক্ষ হইতে প্রদেশ বিভক্তিকরণের বিরুদ্ধে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কিন্তু মিন্টোর জবাব বাঙ্গালী নেতা এবং দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ইংল্যাণ্ডে কংগ্রেস সমর্থক পার্লামেন্টের সদস্যরা হেনরী কটনের নেতৃত্বে তোড়জোড় শুরু করে এবং ব্রিটিশ সরকারকে তাহাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার জন্য চাপ দিতে থাকে। ভারত সচিব লর্ড মর্লে ইহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে বাংলা বিভাগ পরিবর্তন সাপেক্ষ নহে। হিন্দু পত্রিকাগুলি মর্লে ও মিণ্টোর নীতির সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠে।

দেশের এই উত্তেজনামূলক পরিস্থিতিতে লর্ড মিণ্টো কংগ্রেসী নেতাদের খুশী করিবার জন্য (আগষ্ট ১৯০৬) পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম লেঃ গভর্ণর ফুলারের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। ফুলার প্রশাসক হিসাবে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদীদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করিতে সচেষ্ট হন। ফুলারের পদত্যাগে মুসলমানরা বিশেষ হতাশ হয় এবং সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে তাহারা ঢাকায় প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নানাভাবে বঙ্গভঙ্গ রোধের প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতে-ছিল। অবশেষে তাহারা বৃটিশ সরকারের উপর ঐক্যবদ্ধভাবে ফলপ্রসূ চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি অভিনব পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা আইরিশ জাতীয়তাবাদের অনুকরণে বৃটিশ দ্রব্য বর্জন ও দেশজ দ্রব্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৯০৫ সনে কলিকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক "সঞ্জীবনী" সর্বপ্রথম বয়কট বা বর্জন আন্দোলনের পরামর্শ দেয়। দেখিতে দেখিতে সমগ্রদেশে বর্জন আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠে। এই আন্দোলন শিক্ষা, রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করে। সকল বৃটিশ পণ্য বিশেষতঃ ব্রিটিশ বস্ত্র, ইহা ছাড়া লবণ, চিনি, সিগারেট

এবং বিলাস সামগ্রী বর্জনের পিছনে যেমন একটি উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি বিধান এবং দেশকে স্বনির্ভরশীল করিয়া তোলা, অন্যদিকে ইহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ করা। আন্দোলনকারীরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকেরা বাধ্য হইয়া নিজেদের স্বার্থে বৃটিশ সরকারকে তাহাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার জন্য চাপ প্রয়োগ করিবে। সারা দেশে দেশজ শিল্প প্রতিষ্ঠার এক নূতন জোয়ার আসে। যুবক ও ছাত্র শ্রেণী এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই সময় জাপানের নিকট ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দেশ রাশিয়ার পরাজয় এই দেশের যুব সমাজের মনে নূতন প্রেরণা যোগায়। স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার দীক্ষা তাহারা গ্রহণ করিল। হিন্দু পত্র-পত্রিকা বুদ্ধিজীবি, ছাত্র, যুবক সম্প্রদায়, জমিদার, মহাজন সকলেই এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে এবং নানাভাবে সরকারকে তাহাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করিতে ও সত্যাগ্রহ প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু জমিদার ও মহাজনেরা বলপূর্বক দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিতে বাধ্য করিত। মুসলমান জমিদার ও ব্যবসায়ীরা যাহারা এই আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করে তাহাদের সহিত স্বদেশীদের নানাপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। স্বদেশী আন্দোলনে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে ভারতের যে ধনীক শ্রেণীর জন্ম হইল ইহাদের অধিকাংশই হইল হিন্দু। এই শিল্পপতিরা কালক্রমে কংগ্রেসের মেরুদণ্ড হইয়া দাঁড়ায় ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। ক্রমশঃ স্বদেশী আন্দোলন স্বরাজ আন্দোলনে পরিণত হয়।

যাহা হউক, স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। বৃটিশ সরকার তাহাদের বঙ্গবিভাগ সিদ্ধান্তে অটল রহিল। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আন্দোলনকারীরা চরমপন্থী নেতাদের প্ররোচনায় নূতন কর্মপন্থা গ্রহণ করিল। ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের পতন ঘটানো। বিপ্লবীরা সমগ্রদেশে অগ্নিমন্ত্র ছড়াইতে লাগিল। দেশে সন্ত্রাসবাদী কাজ শুরু হয়। অভিষ্ট অর্জনের জন্য ইহারা হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ করিল না। প্রধানতঃ ঢাকা ও কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বিপ্লব সংঘ গড়িয়া উঠে।

বিপ্লবীরা নানা গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতার 'যুগান্তর' এবং ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে অনুশীলন বা চর্চা দ্বারা উন্নতি লাভ ও অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে হইবে। প্রমথ মিত্র ও চিত্তরঞ্জন দাস প্রথমে কলিকাতায় ১৯০৩ সনে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সনে প্রমথ মিত্র বিপিণচন্দ্র পালের সহিত ঢাকায় আসিয়া অনুশীলন সমিতির একটি শাখা স্থাপন করেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির দায়িত্ব পড়ে পুলিন বিহারী দাসের উপর। ১৯০৬ সন নাগাদ কলিকাতার সন্ত্রাসবাদীদের দ্বিতীয় দল "যুগান্তর" সমিতির জন্ম হয়। অরবিন্দ ঘোষ ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারিন্দ্র ঘোষ এই 'যুগান্তর' সমিতি পরিচালনা করেন এবং সমিতির মুখপত্র 'যুগান্তর পত্রিকা' প্রকাশিত হইবার ফলে বাংলার যুবসম্প্রদায় ক্রমশঃই এই দলের দিকে আকৃষ্ট হয়। এমনকি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময় এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
।

১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করিয়া যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় বিপ্লবীরা তাহাতে সক্রিয় অংশ নেয়। তাহাদের প্রচেষ্টায় সারা বাংলাদেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন জোরদার হয়। পুলিন দাস ও প্রতুল গাঙ্গুলী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। সমগ্র দেশে গুপ্ত সমিতির বহু শাখা প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত সমিতিতে শারীরিক কসরৎ ছাড়াও যুবকদিগকে মারণাস্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। দেশময় অগ্নি সংযোগ, লুটতরাজ এবং রাজনৈতিক হত্যা অহরহ চলিতে থাকে। সুদূর চীন ও জার্মানী হইতে বিপ্লবীরা উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য পাইত। ইহারা বাংলার গভর্ণর ফ্রেজার এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্ণর ফুলারকে হত্যা করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শত শত যুবক-ছাত্র এই আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৯০৮ সনে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী এই আন্দোলন করিতে গিয়া জীবন দান করেন। ইহা প্রধানতঃ হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত ও বঙ্গ-ভঙ্গ রদই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও কিছু কিছু মুসলমান যুবক এই আন্দোলনের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু-দেবী কালীর নামে শপথ গ্রহণ এবং 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত চালু করা হইলে মুসলমানদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে এবং ইহা হিন্দু আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

কিন্তু দেশে স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার তাহাদের সিদ্ধান্তে অটল রহিল। বরঞ্চ প্রশাসন যন্ত্র ও দমন নীতি সক্রিয় হইয়া উঠিবার ফলে এই আন্দোলন ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইয়া পড়ে। পূর্ববঙ্গ ও আসামের জনগণ এই সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে শুরু করে। ঠিক সেই সময় নূতন প্রদেশের ভাগ্যে নামিয়া আসে এক প্রচণ্ড আঘাত। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার বৃটিশ বণিক এবং কংগ্রেসী নেতাদের চাপের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল এবং তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির স্বার্থে মুসলমানদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করিল না।

১৯১০ সনের শেষের দিকে মিণ্টোর স্থলে লর্ড হার্ডিঞ্জ নূতন ভাইসরয় হইয়া আসেন। তিনি প্রথম হইতেই কংগ্রেসী নেতাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য আপোষ নীতি গ্রহণ করেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে মনস্থ করেন। এই ব্যাপারে তিনি ভারত সচিবের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন। তিনি রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত করেন।

ইহাতে একদিকে যেমন কলিকাতা সন্ত্রাসবাদীদের হাত হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত থাকিবে, অন্যদিকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে উত্তর-ভারতের মুসলমানরাও খুশী হইবে। কারণ দিল্লী একসময় মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর ভারত আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে উহাদিগকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের এক বিরাট আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার ভারতবাসী দিল্লীতে তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। সম্ভবতঃ এই আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীর দরবারে হঠাৎ করিয়া বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করিলেন। পূর্ব বাংলাকে আবার কলিকাতার প্রশাসনে আনা হইল। সমগ্র বাংলাকে লইয়া নূতন প্রদেশ সৃষ্টি হইল। বিহার ও উড়িষ্যা একটি নূতন পরিষদে পরিণত হইল। আসাম পূর্বের ন্যায় চীফ কমিশনারের অধীনে ন্যাস্ত হইল। নূতন ব্যবস্থাটি ১৯১২ সনের জানুয়ারী হইতে কার্যকরী হইল। স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গ রদে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে। ঢাকা এবং কলিকাতায় মুসলমানেরা প্রতিবাদ সভা করিয়া সরকারী বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিবাদ করিল। এই ব্যাপারে সব চাইতে বেশী আঘাত পাইয়াছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ্ নিজে। ভগ্নমনোরথ নবাব হতাশায় রাজ-নীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় ১৯১২ সনে লর্ড হার্ডিঞ্জ

ঢাকা আগমন করিলে নবাব এই অঞ্চলের জনগণের শিক্ষার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। ১৯১৫ সনের জানুয়ারী মাসে সলিমুল্লাহ্‌র মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহার এক যুগ পরেই তাঁহার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। ১৯২১ সনে ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়াই পূর্ব বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবি সমাজের সৃষ্টি হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাংলার রাজনীতি, ১৯৩৭-৪৭

ভারত উপমহাদেশের রাজনীতিক বিবর্তনের ইতিহাসে ১৯৩৭-৪৭ সন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই যুগের শেষের দিকে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাহার ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বৃটিশ সরকারের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এই দেশে তাহাদের প্রায় দুইশত বৎসরের শাসনের যবনিকা টানে। নানাদিক হইতে এই যুগটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল মুসলিম কৃষক শ্রমিকের জাগরণ ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য ইহাদের ফলপ্রদ ব্যবহার। বস্তুতঃ ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় বহুদিন হইতে নিজেদের রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে চিন্তা ও কাজ করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির ও মনোভাবের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারাও কম দায়ী ছিল না। ১৯০৬ সনে হয় মুসলিম লীগের পত্তন। ১৯১৬ সনে লখনৌ চুক্তি, ১৯২৬ সনে বেঙ্গল প্যাক্ট: ১৯২৮ সনে কলিকাতা কংগ্রেস হইতে ওয়াকআউট, ১৯২৯ সনে সর্বদলীয় মুসলিম কনফারেন্স, তৎপর জিন্নাহর ১৪ দফা রচনা, ১৯৩০-৩৩ এ রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান প্রভৃতি হইতে মুসলিম মানসিকতার ও তাহাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার গতি ও পথ পরিবর্তন এবং পরিক্রমার ইতিহাস সম্পর্কে একটি আভাস পাওয়া যায়।

বহু হিন্দু মুসলিম নেতা এই সময় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা ও আপোষনীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের এই চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। কারণ ঐক্যবাদী মুসলিম নেতৃত্ব ও ঐক্যবাদী হিন্দুনেতাদের মধ্যে মৌলিক চিন্তাধারার বিরোধ ছিল। মুসলমানেরা কোনদিনই তাহাদের সত্ত্বা বিসর্জন দিয়া রাজনীতিক উদ্দেশ্য হাসিলে প্রস্তুত ছিল না। দেশের সার্বিক মঙ্গল ও একতার জন্য তাহারা ফেডারেশন

গঠনের পক্ষপাতী ছিল। অন্যদিকে হিন্দু নেতৃবর্গের অধিকাংশ মুসলমানদের রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তাহারা চাহিয়াছিল সার্বিক মিশ্রণ বা ফিউশন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে হিন্দু মুসলমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক মিশ্রণ সম্ভব হয় নাই।

এই সময়কার বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই রাজনীতির প্রবাহ একটি বিশেষদিকে মোড় পরিবর্তন করে যাহা শীঘ্রই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর (১৯২৫) হইতে বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে ভাটা পড়িতে শুরু করে। বস্তুতঃ তাঁহার মত উদার ও দূরদর্শী নেতার অভাবে বাংলার রাজনীতি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকগণ্ডীমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সঙ্কীর্ণতাবোধ হইতে কংগ্রেসী নেতারা চিত্তরঞ্জন দাসের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নাকচ করে এবং ১৯২৮ সনের প্রজাস্বত্ত্ব আইনে কৃষকদের অনুকূলে রদবদল এবং প্রাইমারী শিক্ষা প্রসারের জন্য নূতন কর ধার্যের বিরোধিতা করে। অথচ এই দুইটি বিলের উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম বাংলার কৃষকদের আর্থিক ও মানসিক বিকাশের প্রচেষ্টা। হিন্দু কংগ্রেসী নেতাদের এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া বহু মুসলমান কংগ্রেস নেতা দল ত্যাগ করে।

বাংলার রাজনীতি কংগ্রেসী নেতাদের নিকট ভারতীয় রাজনীতি হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র ছিল। বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্ভবতঃ এই স্বাতন্ত্র্যবোধের অন্যতম কারণ। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুনেতৃবর্গ যেভাবে অবাধ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন—দুঃখের বিষয় বাংলার ক্ষেত্রে সেই নির্ভেজাল গণতন্ত্রের বিরোধিতা করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে এই দেশের হিন্দু নেতারা বাংলার মেজরিটি শাসন ও পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। ১৯০৬ সনে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ইহার প্রমাণ। কারণ তৎকালীন পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের বিকাশ হইলে বাংলার রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে চলিয়া যাইবার আশঙ্কা এবং হিন্দুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার খর্ব হইতে পারে এই ভয়ে হিন্দু নেতারা ভীত ছিল এবং দেশময় আন্দোলনের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারে বাংলার হিন্দুরা সর্বভারতীয় এবং বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার আওতা হইতে নিখিল ভারতীয় হিন্দু সংখ্যাধিক্যের আশ্রয়

নেয়। ফলে বাংলাদেশ তাহাদের নিকট ভারতের প্রদেশ হইল এবং বাঙ্গালী জাতি ভারতীয় জাতীর অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র হইল। বাংলার হিন্দু নেতারা যদি এই রাজনৈতিক বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে সামান্য দূরদর্শী ও বাস্তববাদী ভূমিকা পালন করিতেন তাহা হইলে বাংলার রাজনীতি ১৯৩৭-৪৭ সনে অন্যরূপ ধারণ করিত।

এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলার মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জাগরণ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা, যাহার ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী। এতদিন পর্যন্ত মুসলমান জমিদার ও অভিজাত শ্রেণী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও যোগসাজসে প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে মুসলিম রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করিত। কলিকাতা ছিল এই শ্রেণীর সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। ইহাদের রাজনীতি, আদর্শ ও কৃষ্টির সঙ্গে বাংলার কৃষকসমাজ ও মধ্যবিত্তের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই সময় ভোটাধিকার সম্প্রসারণের ফলে বাংলার রাজনীতিক কর্তৃত্ব ক্রমশঃ এই নবউদ্ভুত মুসলিম মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের হাতে চলিয়া আসে এবং জমিদার ও উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস পাইতে থাকে। আবুল কাসেম ফজলুল হক এই শ্রেণীর নেতৃত্ব দান করেন।

১৯২৯ সনে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়। তাহার ফলে বৃটিশ রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৯৩২ সনে বৃটেনে সর্বপ্রথম শ্রমিকদলের নেতা রামজে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠিত হয়। শ্রমিকদল ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে বিশ্বাসী ছিল। সেই কারণে তাহারা ভারতের জন্য নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সুপারিশ করে। ১৯৩২ সনে বৃটিশ সরকার 'সাম্প্রদায়িক বন্টন' বা **"Communal Award"** ঘোষণা করেন। তাহারা মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনাধিকার গ্রহণ করে এবং বিধান পরিষদগুলিতে সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। ম্যাকডোনাণ্ড রোয়েদাদ অনুযায়ী দেশে শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। তাহারই ফল হইল ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন। এই আইনে সর্বপ্রথম সীমিত আকারে হইলেও ভারতীয় প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করা হয়। বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রথা অনুযায়ী দেশ শাসনের ব্যবস্থা হয়। তাহার ফলে আইন সভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন নেতা কতৃক মন্ত্রীসভা গঠন করিবার রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই আইনে কেন্দ্রে একটি ফেডারেল শাসন প্রবর্তন করা হয়। ইহা ছাড়া রেসিডুয়ারী বা বিশেষ সংরক্ষিত ক্ষমতা প্রদেশ বা কেন্দ্রের হাতে না দিয়া স্বয়ং ভাইসরয়কে অর্পণ করা হয়। শাসন সংবিধানে প্রদেশগুলিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়। সিন্ধুকে বোম্বাই এবং উড়িষ্যাকে বিহার হইতে পৃথক করিয়া দুইটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। সমগ্র উপমহাদেশকে ১১টি গভর্ণর শাসিত প্রদেশ ও ৬টি চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে ভাগ করা হয়। প্রদেশগুলি হইতে ১৯১৯ সনে প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন রদ করা হয় এবং প্রাদেশিক বিষয়গুলি মন্ত্রিসভার নিকট হস্তান্তরিত হয়। নূতন শাসন সংস্কারে ভোটাধিকারের অনেক সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৫ সনের আইন ১৯১৯ সনের আইন অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অনেক উন্নত ও প্রাগ্রসর ছিল। কিন্তু প্রাদেশিক গভর্ণর ও কেন্দ্রে ভাইসরয়ের হাতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়ার ফলে গণতন্ত্র অনুযায়ী প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার গঠনে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

১৯৩৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে নতুন আইন কার্যকরী হইবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৬ সন হইতে সারা দেশে নির্বাচনের তোড়জোড় আরম্ভ হয়। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি রাজনীতিক দলগুলি স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টো বাহির করে এবং তাহারা কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতার বিষয়টি লইয়া দ্বিধা বিভক্ত এবং সঙ্কীর্ণ দলাদলি লইয়াই ব্যস্ত ছিল। বস্তুত এই সময় মুসলিম লীগ উপযুক্ত নেতার অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলাতে তাহাদের অনেক নেতাই ১৯২৯ সনে স্যার আবদুর রহিম প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল বংগ প্রজা সমিতি'র সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ তৎকালে সংগঠন হিসাবে প্রজাসমিতি অনেকটা সক্রিয় এবং শক্তিশালী ছিল। ১৯৩৫ সনে এ. কে. ফজলুল হক এই সমিতির নেতা নির্বাচিত হওয়ায় বাংলার রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত উপমহাদেশে মুসলিম নেতাদের মধ্যে তিনি সর্বাগ্রে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে জন সমর্থন ছাড়া কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে দেশের সার্বিক মঙ্গল সাধন সম্ভব নয়। তাই তিনি দেশের কৃষক, প্রজা ও মধ্যবিত্তকে একত্রে সংঘবদ্ধ করেন। পার্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচী তাহার মৌলিক প্রগতিবাদী

চিন্তাধারা প্রমাণ করে। অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান গ্রাম-বাংলার কৃষক ও মেহনতী মানুষের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ১৯৩৬ সনে এই দলের পক্ষ হইতে "প্রজাসমিতির চৌদ্দ দফা" নামক একটি ম্যানিফেষ্টো বাহির হয়। এই ম্যানিফেষ্টোর প্রধান বিষয়গুলি ছিল এইরূপ—বিনা ক্ষতি পূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, খাজনার নিরিখ হ্রাস, নযর সেলামি রহিত করণ, খাজনা ঋণ মওকুফ, মহাজনি আইন প্রণয়ন, ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন করা, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ, স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন এবং রাজবন্দীদের মুক্তি।

ইতিমধ্যে কলিকাতার রক্ষণশীল মুসলিম নেতারা, মুসলিম ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং অভিজাত ও উচচ মধ্যশ্রেণীর লোকেরা একত্র হইয়া নবাব হাবিবউল্লাহর নেতৃত্বে "ইউনাইটেড মুসলিম দল" গঠন করে। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যোগদানের পর হইতে এইদল শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন ইহার প্রাণস্বরূপ। তিনি বিবাদমান মুসলিম দলগুলিকে আত্মকলহ ভুলিয়া গিয়া জমিদার, প্রজা, শ্রমিক, মালিক সকল শ্রেণীর লোককে এই দলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানান। তাহারা কৃষক-প্রজা সমিতির সঙ্গে আপোষ করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলীয় নেতা নির্বাচন লইয়া আলোচনা ব্যর্থ হয়।

এই সময় ডঃ রফি আহমদ, হাসান ইস্পাহানী ও আবদুর রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে 'নিউ মুসলিম মজলিস' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

১৯৩৪ সনের শেষের দিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লণ্ডন হইতে তাহার স্বনির্বাসন ত্যাগ করিয়া ভারতে আসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই মুসলিম্ লীগের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হইয়া লীগের পুর্নগঠনে আত্ম-নিয়োগ করেন। আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে তিনি মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে প্রচারণা শুরু করেন। এই উপলক্ষে জিন্নাহ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি সফর করেন। মুসলিম বণিক সমিতির আমন্ত্রণে তিনি কলি-কাতায় আগমন করেন। বাংলার মুসলিম নেতাদের সঙ্গে জিন্নাহর খোলাখুলি আলোচনা হয়। জিন্নাহ প্রথম হইতে মুসলমানদিগকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য উপদেশ দেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল নাইট নবাবদের রাজনীতি হইতে মুসলমান সমাজকে মুক্তি এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মাধ্যমে তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। তিনি মুসলিম লীগকে পুন-রুজ্জীবিত করিবার জন্য নতুন গঠনতন্ত্র রচনা করেন। ইহাতে প্রগতি-

শীল সমস্ত দাবী-দাওয়া স্থান পায়। মুসলিম সংহতির জন্য তিনি বিভিন্ন দল উপদলকে মুসলিম লীগের অধীনে নির্বাচন চালাইতে পরামর্শ দেন। জিন্নাহর উপদেশমত সম্মিলিত মুসলিমদল মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করিয়া "মুসলিম লীগে" পরিণত হয়। ফজলুল হক ব্যক্তিগতভাবে পুনরুজ্জীবিত লীগে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কৃষক-প্রজা পার্টির অনেক নেতাই বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রশ্নে আপোষ করিতে রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আলোচনা ব্যর্থ হয়। কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দাবী মুসলিম লীগের মূল নীতি বিরোধী ছিল। অন্যদিকে প্রজাসমিতি এই ব্যাপারে কৃষকদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য ফজলুল হক কলিকাতার অবাঙ্গালী বণিক সম্প্রদায়কে দায়ী করেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদের নেতৃত্ব অবাঙ্গালী ইস্পাহানী এবং নবাবদের উপরে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। কারণ এই শ্রেণীর রাজনীতির সঙ্গে পল্লীর সাধারণ মানুষের কোন সংশ্রব ছিল না।

এইরূপে জিন্নাহর মুসলিম লীগ ও সোহরাওয়ার্দীর ইউনাইটেড মুসলিম দলের সমন্বয়ে বাংলায় মুসলিম লীগ নূতনভাবে সংগঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দী এই দলকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং কঠোর পরিশ্রম করিয়া দেশের সকল অঞ্চলে এই নবগঠিত দলের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সোহরাওয়ার্দীকে সেক্রেটারী করিয়া একটি পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হয়।

অল্পদিনের মধ্যে তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম, বাগ্মিতা এবং সাংগঠনিক প্রতিভাবলে মুসলিম লীগ বাংলা দেশে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। খেলার মাঠে পর পর কয়েক বৎসর উপর্যুপরি কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিজয় এবং ১৯৩৬ সনে কলিকাতা হইতে মুসলমানদের বাংলা মুখপত্র "দৈনিক আজাদ" প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার মুসলমান জনগণের মধ্যে নূতন উদ্দীপনা ও মনোবলের সঞ্চার হয়।

১৯৩৭ সনের নির্বাচন বাঙলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। বাহ্যতঃ এই নির্বাচন যুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিম মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর দল মুসলিম লীগ—এই দুইদলের পার্লামেন্টারী সংগ্রাম হইলেও ইহার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই নির্বাচনে উভয়-দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। মুসলিম লীগ ৩৮টি আসন পায়

এবং ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি পায় ৩৯টি আসন। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে বাংলার মত মুসলিম লীগের সাফল্য সম্ভব হয় নাই। মুসলিম লীগের এইরূপ সফলতার কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীদল অপেক্ষা তাহাদের কয়েকটি বিষয়ে সুবিধা ছিল। যেমন প্রথমতঃ তাহাদের প্রার্থীরা প্রজা-সমিতির প্রার্থী হইতে অপেক্ষাকৃত অবস্থাবান ছিল। ইহা ছাড়া নির্বাচনী প্রচারণার জন্য মুসলিম লীগের নিজস্ব তহবিল ছিল। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম পত্র পত্রিকা 'দৈনিক আজাদ', 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' মুসলিম লীগের পক্ষে মুসলিম সংহতির জন্য প্রচারণা চালায়। ফলে বহু প্রজা নেতা মুসলিম সংহতির প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করিয়া লীগে যোগদান করেন। তৃতীয়তঃ নবোদ্ভূত মুসলিম শিক্ষিত ও মধ্যশ্রেণীর জাগরণ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার পর হইতে যে শিক্ষিত সচেতন মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সমাজের সৃষ্টি হয় তাহারাই বাংলার রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে। সর্বোপরি ছিল সোহরাওয়ার্দীর অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা ও নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণা। পক্ষান্তরে কৃষক প্রজাদলের কতকগুলি নিজস্ব সুবিধা ছিল। এই দলের প্রধান মূলধন ছিল হক সাহেবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা। ইহা ছাড়া জমিদারী প্রথা উচ্ছেদসহ কৃষকদের উন্নতির জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী ইহারা গ্রহণ করেন তাহা সাধারণ জনগণের ও প্রগতিবাদী মুসলিম তরুণদের সমর্থন পায়। হক সাহেব সাধারণ বাঙ্গালীর, কৃষক ও শ্রমিকদের মনোস্তত্ত্ব ভাল বুঝিতেন এবং তাহার নির্বাচনী প্রচারণায় জনসাধারণকে দুইবেলা "ডাল ভাতের ব্যবস্থা" করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। মুসলিম লীগ নেতাদের তুলনায় প্রজা নেতাদের জনসংযোগ ছিল অনেক বেশী। এই সমস্ত কারণে কৃষক-প্রজাদল নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জিলায় বিপুল সংখ্যায় জয়লাভ করে। কিন্তু ৩৭ জন স্বতন্ত্র সদস্যের মধ্যে ২১জন মুসলিম লীগে এবং বাকী ১৬ জন মাত্র কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগদান করে। ফলে পরিষদে কংগ্রেসের সদস্য দাঁড়ায় ৬০ এবং মুসলিম লীগ ও কৃষকপ্রজা পার্টির সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৫৯ ও ৫৫ জন। এই নির্বাচনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই ছিল যে লীগের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা এবং বাংলার গভর্ণরের প্রিয়পাত্র খাজা নাজিম-উদ্দিন নিজের জমিদারী পটুয়াখালীতে হক সাহেবের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ইহাতে একদিকে ফজলুল হকের অভাবনীয় জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে, অন্যদিকে বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব হ্রাস পায় এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মন্ত্রিসভা গঠন লইয়া প্রথম হইতেই সমস্যা দেখা দিল। কারণ পরিষদে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই। গভর্ণর প্রথমে কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুকে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে ডাকেন। শরৎ বসু কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহারা মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে সমর্থন করিতে পারে না। যদিও মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে তাহারা লীগের সঙ্গে আপোষ করিয়া নির্বাচন করে। কিন্তু বাংলার রাজনীতি ছিল তাহাদের নিকট ভারতের রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রজাপার্টি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। একমাত্র ইহার প্রাগ্রসর নীতি জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ দাবীর জন্য বর্ণহিন্দুরা এই পার্টির বিরোধী ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে ফজলুল হক কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলেন। হক সাহেব কংগ্রেসদলের সহিত আপোষ করিতে চাহিলেন। কংগ্রেসের দাবী ছিল রাজবন্দীদের মুক্তি, স্বরাজ প্রভৃতি। অন্যদিকে কৃষক প্রজাপার্টি তাহাদের নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টো অনুসারে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন, মহাজনী আইন এবং ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন প্রভৃতি। শেষ পর্যন্ত সমস্ত আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হয়। ইহার জন্য দায়ী হইল কেন্দ্রীয় কংগ্রেস হাইকমাণ্ড। এই ঘটনা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু নেতাদের অদূরদর্শীতা ও অনুদারতা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দূরত্ব আরও প্রসারিত করে। বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেসী নেতাদের অনমনীয় মনোভাবই শেষ পর্যন্ত ফজলুল হককে সাম্প্রদায়িকদল মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠনে বাধ্য করে। ফলে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগ প্রাধান্য অর্জনের সুযোগ পাইল। মুসলিম লীগ, কংগ্রেস-প্রজাপার্টি কোয়ালিশন গঠিত হইলে মুসলিম স্বার্থ পরিপন্থী হইতে পারে ভাবিয়া হক সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী সহ কৃষক প্রজাপার্টির কার্যসূচী অনেকটা গ্রহণ করিতে রাজী হইল।

অতঃপর ফজলুল হকের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। মন্ত্রীসভার দশজন সদস্যদের মধ্যে মুসলমান পাঁচ, হিন্দু পাঁচ। মুসলমান পাঁচজনের মধ্যে কৃষক-প্রজা দুই, মুসলিম লীগ তিন। পাঁচজন হিন্দুর মধ্যে বর্ণ হিন্দু তিন এবং তফসিলি হিন্দু ২ জন। লীগের পক্ষ হইতে নবাব খাজা হাবিবউল্লাহ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমউদ্দিন। কৃষক প্রজাপার্টির তরফ হইতে সৈয়দ নওশের আলী ও নবাব মোশাররফ হুসেন। বর্ণ হিন্দুদের পক্ষ হইতে নলিনীরঞ্জন সরকার, বিজয় প্রসাদ সিংহ

রায় ও কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীষচন্দ্র নন্দী। তফসিলি হিন্দুদের পক্ষে মুকুন্দ বিহারী মল্লিক ও প্রসন্ন রায়কত। এই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা দুর্বল ছিল। ফজলুল হক কংগ্রেসের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন।

মন্ত্রীসভা গঠনের অল্পদিনের মধ্যেই মন্ত্রিসভার স্থিতিশীলতা ও সংহতির জন্য ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং উহার সভাপতি নির্বাচিত হন। সোহরাওয়ার্দী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেখিতে দেখিতে কৃষক-প্রজাপার্টি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। ফজলুল হক তাহার রাজনৈতিক বিবর্তনের জন্য জনগণকে বুঝাইতে সফল হইলেন যে প্রজাসমিতি এবং মুসলিম লীগ বাংলার কৃষক এবং মুসলিম জনসাধারণের দুইটি প্রতিষ্ঠান। সুতরাং তাহাদের ঐক্যের প্রয়োজন। তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত নেতাদের মধ্যে একমাত্র গণনেতা এবং তাহার প্রজা আন্দোলন ছিল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলিম মধ্যবিত্তের আন্দোলন। এই আন্দোলনে শুধু কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবী ছিল না, তাহাদের সামাজিক মর্যাদার দাবীও ছিল।

ফজলুল হকের নেতৃত্ব এবং সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক কৃতিত্বের জন্যই বাংলাদেশে মুসলিম লীগ একটি শক্তিশালী ও সুসংহত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু এই দুই নেতা প্রধানের মধ্যে চারিত্রিক বৈসাদৃশ্য ছিল অনেক। ফজলুল হক কোন দলীয় শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ছিলেন না—ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রয়োজন হইলে দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন আজন্ম বিদ্রোহী। দলীয় শৃঙ্খলা এবং সাংগঠনিক নিয়মকানুন তাহার মানসিকতার সহিত খাপ খাইত না।

অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী দলীয় শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করিতেন এবং সর্বদা দলীয় স্বার্থকে আপন জনপ্রিয়তার উর্ধে স্থান দিতেন। তিনি নিজের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন না। তৎকালীন মুসলিম নেতাদের মধ্যে তিনিই সর্বদা দলীয় শৃঙ্খলার প্রতি আস্থা রাখিতেন এবং গুরুত্ব দিতেন। এই দুই বিপরীত চরিত্রের সমন্বয় বাংলার রাজনীতিকে সত্যিই মহিমামণ্ডিত করিয়াছিল। এই সময়েই সোহরাওয়ার্দী গ্রাম বাংলাকে জানিবার এবং মুসলিম লীগকে একটি গণমুখী রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পান।

ফজলুল হক পরিচালিত মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা বাংলার মুসলমানদের মনে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। তাহাদের মন হইতে হীনমন্যতা ক্রমশঃ দূর হইতে থাকে। কারণ গুণাগুণের দিক হইতে নেতৃত্বে, শিক্ষা দীক্ষায় এবং বক্তা হিসাবে মন্ত্রীসভার সদস্যরা উচচমানের ছিলেন এবং তাহাদের অনেকেরই সর্বভারতীয় নেতা হইবার যোগ্যতা ছিল। বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম গণতন্ত্র মাফিক জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকার গঠিত হইল। অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কোয়ালিশন সরকার অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি জনহিতকর কার্য করিয়া জনসাধারণের আস্থাভাজন হইল। ১৯৩৮ সনে তাহারা ঋণ সালিসী বোর্ড স্থাপন করে। ১৯৩৯ সনে পাশ হয় প্রজাস্বত্ব আইন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করিয়া কর্পোরেশন পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করে। ১৯৪০ সনে মহাজনি আইন পাশ হয়। প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে স্কুল বোর্ড গঠন, ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের জন্য বিল আনয়ন করে। দোকান কর্মচারীদের স্বার্থে আইন, সালিসী বোর্ড, প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনী আইন এর ফলে বাংলার কৃষক প্রজা ও কৃষিঘাতকদের জীবনে এক শুভ সূচনা হইল। হক সাহেব ফ্লাউড কমিশন গঠন করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমি রাজস্বের নিরিখ করিবার ব্যবস্থা করেন।

ইহা ছাড়া হক মন্ত্রীসভার অন্যান্য কৃতিত্বের মধ্যে একটি হইল রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বাংলার বহু বিপ্লবী ছাড়া পায়। ফজলুল হক বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার নামে কলঙ্ক লেপনকারী হল ওয়েল মনুমেণ্টের অপসারণ করেন। এই ব্যাপারে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সুভাষ বসু তাহাকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেন। হক সাহেবের মন্ত্রীসভার এই তিনটি বছরে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটি শান্ত বিপ্লব সাধিত হয়। কৃষক প্রজাসাধারণ এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্য এই সময়কে স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে।

হক মন্ত্রীসভা কার্যতঃ মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার নামান্তর মাত্র। সুতরাং এই সংস্কারগুলি এই মন্ত্রীসভার আমলে হওয়াতে মুসলিম জনমত ক্রমশঃ মুসলিম লীগের অনুকূলে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সনে। কংগ্রেস যুদ্ধকালীন সরকারী নীতিকে সমর্থন ও সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাতটি প্রদেশ হইতে তাহাদের মন্ত্রীসভাগুলিকে পদত্যাগ করিতে

নির্দেশ দেয়। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পদত্যাগকে মুসলমানরা স্বাগতম জানায় এবং সর্বত্র ত্রাণ দিবস পালন করে। কারণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কতকগুলি ব্যাপারে তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। তাহারা যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে নির্বাচন মৈত্রী অনুযায়ী এই সমস্ত প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণকালে লীগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করে।

নির্বাচনের আগে ও পরে এই দুই রকম নীতিকে জিন্নাহ বিশ্বাসভঙ্গ মনে করেন। ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে আজীবন বিশ্বাসী জিন্নাহ কংগ্রেসের উপর হইতে আস্থা হারায়।

১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই সময় জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্বয়ং ফজলুল হক এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহাতে বাংলার মুসলিম লীগের শক্তি আরও বাড়িয়া যায় এবং ভারতের রাজনৈতিক জীবনে একটি নূতন দিগন্তের সূচনা হয়। এই প্রস্তাব ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিতে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানায়। আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনাধিকার ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দানই ছিল এই প্রস্তাবের ভিত্তিমূল। লাহোর প্রস্তাব মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক আদর্শকে সমস্ত ভারতের রাজনৈতিক দাবীর সহিত সামঞ্জস্য করিয়া তুলে। ক্রমশঃ মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম দাবীদার হইয়া উঠে। নেহেরু এবং কংগ্রেস পত্রিকাগুলি লাহোর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে। তাহারা ইহাকে 'রাজনৈতিক দিক হইতে অসম্ভব' এবং 'অর্থনীতিক দিক হইতে পাগলামী' বলিয়া মন্তব্য করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইতিমধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়। ১৯৪১ সনের মাঝামাঝিতে ইউরোপে হিটলারের তখন জয় জয়াকার। একটির পর একটি যুদ্ধে মিত্রবাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এশিয়ার বৃহত্তম শক্তি জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অক্ষশক্তির ক্রমাগত জয়লাভে ব্রিটিশ সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। ভারতীয় নেতাদের সমর্থন লাভের জন্য বড়লাট লর্ড লিন লিথগো তৎপর হইয়া উঠেন। তিনি শাসন পরিষদকে সম্প্রসারণ করিয়া বেশীর ভাগ ভারতীয় লইবার প্রস্তাব দিলেন। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি সমর পরিষদ গঠন করা হইল। এবং প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীরা পদাধিকার বলে উক্ত সমর পরিষদের সদস্য

হইলেন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পূর্বেই পদত্যাগ করিয়াছিল। সুতরাং কেবলমাত্র বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে মন্ত্রীসভা চলিতেছিল। ফলে মন্ত্রী হিসাবে তাহারাই সমর পরিষদের সদস্য হইলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন মুসলিম লীগ দলের সদস্য। ইতিপূর্বেই জিন্নাহ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বৃটিশ সরকার মুসলিম লীগের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার না করা পর্যন্ত লীগ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না। সেই হেতু জিন্নাহ মুসলিম লীগ প্রধান মন্ত্রীদের সমর পরিষদ ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেন। এই সময় পরিষদকে কেন্দ্র করিয়া জিন্নাহ-হক গুরুতর মতানৈক্য হয়। কারণ হক সাহেব জিন্নাহর নির্দেশমত কাজ করিতে রাজী হইলেন না। ফলে ১৯৪১ সনের আগষ্ট মাসে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি হক সাহেবের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এইদিকে প্রাদেশিক লীগ মন্ত্রীরা ও নেতারা হক সাহেবকে জিন্নাহর সঙ্গে আপোষ করিতে চাপ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪১ সনের ১৮ই অক্টোবর তিনি সমর পরিষদ ত্যাগ করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সঙ্গে হক সাহেবের সম্পর্কের ভাটা পড়িতে থাকে। ১৮ই নভেম্বর তিনি 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' নামে নূতন কোয়ালিশন গঠন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান এবং বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটি স্থায়ী ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি করা। কারণ মুসলিম লীগ তখন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমস্যা মীমাংসার জন্য উদগ্রীব।

এইবার তিনি হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামা প্রসাদের সঙ্গে আপোষ করেন। হক সাহেব দলের নেতা এবং বাংলা কংগ্রেসের শরৎবসু উপনেতা নির্বাচিত হইলেন। ফলে লীগ মন্ত্রীরা একযোগে হক মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করে। ১০ই ডিসেম্বর গভর্ণর ফজলুল হককে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। ১১ই ডিসেম্বর ভারত রক্ষা আইনে শরৎবসু গ্রেফতার হন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত শরৎবসুকে বাদ দিয়াই ১১ জনের পূর্ণ মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। এই মন্ত্রীসভায় হক সাহেব ছাড়া মুসলিম মন্ত্রী হইলেন পাঁচজন ও হিন্দু মন্ত্রী থাকিলেন পাঁচজন। তাহাদের মধ্যে মহাসভার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের সন্তোষ বসুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামাপ্রসাদ অর্থ দফতরের ভার গ্রহণ করেন এবং সেই জন্যই এই মন্ত্রীসভা শ্যামা-হক মন্ত্রীত্ব নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভা ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৩ সনের মার্চ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এই মন্ত্রীসভাকে মুসলিম লীগ সুনজরে দেখে নাই এবং কংগ্রেস হাইকমাণ্ডও ইহার প্রতি কোনরূপ উৎসাহ দেখায় নাই। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলে। এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গঠন করিবার উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দী সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপক সফর করেন। তাঁহার এবং মুসলিম লীগের প্রচারের ফলে হক মন্ত্রীসভা মুসলিম জনমনের, বিশেষতঃ মধ্যশ্রেণী ও ছাত্রদের, আস্থা হারায় এবং ক্রমশঃ অপ্রিয় হইয়া উঠে। ফলে নাটোর ও বালুরঘাট উপনির্বাচনে হক সাহেবের প্রার্থী শোচনীয়ভাবে লীগ প্রার্থীর নিকট পরাজিত হয়। ইহা ছাড়া হক মন্ত্রীসভা এই সময়ে কতকগুলি রাজনৈতিক ভুল করে, যাহার পরিণাম মন্ত্রীসভার জন্য মারাত্মক হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের মে মাসের জরুরী বিধির ১১নং ধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক ও নৈরাজ্যমূলক কার্যে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি মোতাবেক বিচার করা চলিত। এই বিধি প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ হয় এবং রাজনৈতিক মহলে এক তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। মন্ত্রীসভা দ্রুত জনসমর্থন হারাইতে থাকে। বস্তুতঃ হিন্দুনেতার সঙ্কীর্ণতা ও অদূরদর্শীতা হক মন্ত্রীসভার পতনকে ত্বরান্বিত করে। প্রথমতঃ হিন্দুদের চাপে আইন পরিষদে বিবেচনাধীন মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটিকে স্থগিত রাখা হয়। দ্বিতীয়তঃ ১৯৪২ সনে ১১ই ফেব্রুয়ারী সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য জিন্নাহ কলিকাতায় আসিলে তাহার উপর ১৪৪ ধারা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

যুদ্ধকালীন প্রতিষ্ঠিত এ. আর. পি.কে সম্প্রসারণ করিয়া সিভিল ডিফেন্স বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগে কলিকাতার হিন্দুরা অধিকাংশ চাকুরী পায়। ফলে লীগ নেতারা এবং তাহাদের মুখপত্র 'আজাদ' সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্যাপক প্রতিবাদ করে।

১৯৪২ সনে কিশোরগঞ্জ শহরে জামে মসজিদের সম্মুখে হিন্দুদের পূজা উৎসবের গান বাজনাকে কেন্দ্র করিয়া যে দাঙ্গা হয় তাহাতে পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজনের মৃত্যু হয়। মুসলমানরা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করে। হক মন্ত্রীসভার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা মুসলমানদের মনে তীব্র-ক্ষোভের সঞ্চার করে এবং হক সাহেবের প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মুসলমান সমাজে দারুণ অপ্রিয় হইয়া উঠে।

১৯৪২ সনের আগষ্ট মাসে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস "Quit India" 'ভারত ছাড়' দাবী ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে। ভারত সরকার বাধ্য হইয়া দমন নীতির আশ্রয় নেয় এবং বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করে। এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্বেই নেতাজী সুভাষ বসু রহস্যজনক ভাবে অন্তর্ধান করেন এবং তাহারই নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৎপর হয়। এই সময় মেদিনীপুরে কংগ্রেস আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক গভর্ণর স্যার জন হার্বার্টকে এই বিষয়ে একটি কড়া চিঠি লিখেন। দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে।

বাংলাদেশে তখন দারুণ খাদ্যসঙ্কট শুরু হয়। এই খাদ্য সমস্যার মোকাবিলা করিবার মতো জনসমর্থন হক মন্ত্রীসভার ছিল না। হক সাহেব পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

ভারতীয় রাজনীতির এই পটভূমিকায় মুসলিম লীগ বাংলার শাসন ভার গ্রহণ করে। স্যার নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাজিম মন্ত্রীসভা গঠনের অল্পদিনের মধ্যে ১৯৪৩ সনে বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আনুমানিক ৫০ লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। এই সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের জন্য মুসলিম লীগ সরকার দায়ী ছিল না। খাদ্য শস্যের ঘাটতি প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার আমলে এবং লীগ সরকার গঠনের পর আরও অবনতি হয়। তৎকালীন বাংলা সরকার কর্তৃক উডহেড কমিশন যে রিপোর্ট প্রদান করে তাহাতে বলা হয় যে এই দুর্ভিক্ষের জন্য ভারত সরকার, হক মন্ত্রীসভা এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা সকলেই আংশিকভাবে দায়ী ছিল। জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ দখলের ফলে সেখান হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে বিতাড়িত বহু উদ্বাস্তু আসার ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। অনাবৃষ্টির ফলে দেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদনও হ্রাস পায়। দুর্ভিক্ষের আভাস পাইয়া ভারত সরকার সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিবার ফলে খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দেয়। অসাধু ও অর্থলোভী ব্যবসায়ীরাও খাদ্যশস্য গুদামজাত করে। ইহা ছাড়া দেশে কর্ডনিং প্রথা চালু ও সর্বপ্রকার যানবাহন সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য খাদ্যশস্যের

অবাধ চলাচলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাব সরকার বাংলার এই সঙ্কটে গম ও আটা পাঠাইতে রাজী থাকা সত্ত্বেও দেশে কর্ডনিং প্রথার জন্য উহা আমদানী করা সম্ভব হয় নাই। হিন্দু মহাসভাপন্থী কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীবাস্তব বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন থাকায় অন্যান্য প্রদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীতে নানাপ্রকার বাধার সৃষ্টি করেন। বিহার ও উড়িষ্যা সরকার এই সময় তাহাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করিয়া বাংলা সরকারকে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করে। অধিকন্তু সরকারী আমলাদের কর্তব্যত্রুটি ও দায়িত্বহীনতার জন্য অবস্থার আরও অবনতি হইয়াছিল। দেশের এই দুর্যোগে খাদ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী দেশের খাদ্যাভাব দূরীকরণের এবং বিপন্ন জনগণকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু বৃটিশ সরকার তখন সাম্রাজ্য রক্ষার চিন্তায় বিভোর, দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলার মানুষের জীবনমরণ সমস্যা তখন তাহাদের নিকট গৌণ। অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দীর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জিলায় খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হয়। সরবরাহ বিভাগকে তিনি জরুরী বিভাগ ঘোষণা করেন এবং অভিজ্ঞ অফিসার নিয়োগ করিয়া পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার চেষ্টা করেন। সরকারী প্রচেষ্টায় বহু লঙ্গরখানা খোলা হয় এবং বহু নিরন্ন ও দুস্থ জনগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা এবং অন্যান্য শহরে রেশনিং প্রথা চালু করা হয়। লীগ মন্ত্রীসভার ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বহু জীবন রক্ষা পায়।

১৯৪২ সনে প্রাচ্যে বৃটিশ বাহিনীর ক্রমাগত ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিতে থাকে। জাপানীদের অগ্রগতি অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে। বৃটিশ সরকার ভারতের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে ভারতে পাঠান। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার অঙ্গীকার এবং দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নিকট যুদ্ধকালীন সহযোগিতা লাভ ইত্যাদি। কিন্তু ক্রিপ্‌স প্রস্তাব কংগ্রেস এবং লীগের নিকট বিভিন্ন কারণে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। কংগ্রেস অখণ্ড ভারত নীতিতে অটল রহিল; অন্যদিকে মুসলিম লীগ জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে পাকিস্তান দাবীতে কোন প্রকার আপোষ করিতে অস্বীকার করে। ভারতীয় রাজনীতির এই পটভূমিকায় এই সময় কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার রাজা গোপাল আচারী—তাহার দলকে মুসলিম লীগের দাবী বিবেচনা করিয়া দেখিবার পরামর্শ দেন।

১৯৪৪ সনে জিন্নাহ-গান্ধী আলোচনা হয়। কিন্তু কোন প্রকার বাস্তব ফল হয় নাই।

ইতিমধ্যে ১৯৪৫ এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর জয়লাভ হয়। যুদ্ধশেষে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন যুদ্ধে শ্রমিকদলের নিকট চার্চিলের রক্ষণশীলদলের শোচনীয় পরাজয় হয়। ভারতীয় রাজনীতিতে এই পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়। শ্রমিকদল ভারতের স্বাধীনতা দানের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিল এবং ভারতীয়দের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারে বিশ্বাসী ছিল। সেইজন্য নূতন প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ্যাট্‌লী ঘোষণা করিলেন যে ১৯৪৬ সনের জানুয়ারী মাসে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই নির্বাচন মুসলিম ভারতের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ নির্বাচনের ফলাফলের উপর নির্ভর করিবে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতা এবং সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের যথার্থতা।

১৯৪৬ সনের নির্বাচন ভারতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৩৯ সনে সুভাষ বসুর কংগ্রেস-সভাপতি পদ হইতে বহিষ্কারের পর হইতে কংগ্রেস বাংলার রাজনীতিতে প্রাধান্য হারায় এবং ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। "ভারত ছাড" আন্দোলন প্রভৃতি কারণে বহু কংগ্রেসী নেতা সরকারী দমন নীতির শিকার হয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগ সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার গুণে বাংলার রাজনীতিতে সুসংহত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য তাঁহার দান সব চাইতে বেশী। ১৯৪৩ সনে মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হয়। মৌলানা আকরাম খান ইহার সভাপতি এবং আবুল হাশেম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সোহরাওয়ার্দীর মত আবুল হাশেমও একজন শক্তিশালী সংগঠক ও কর্মঠ পুরুষ ছিলেন। শহীদ সাহেব ও আবুল হাশেমের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আবুল হাশেম প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী এবং একজন চিন্তাশীল নেতা ছিলেন। তিনি লীগের নেতৃত্ব অবাঙ্গালী এবং প্রতিক্রিয়াশীল নবাব-নাইটদের হাত হইতে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। ফলে বাংলার রাজনীতিতে কলিকাতার অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের, সামন্তদের এবং প্রগতিবাদী বাঙ্গালীদের মধ্যে লীগের নেতৃত্ব লইয়া দুইটি উপদলের সৃষ্টি হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম লীগের এই দুই উপদলের মধ্যে সংঘাত

বৃদ্ধি পায়। নির্বাচন প্রাক্কালে প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। সভায় মুসলিম লীগের নূতন নেতা নির্বাচন লইয়া তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অদ্ভুত কর্মদক্ষতা, সাহস, সাংগঠনিক প্রতিভা, বাগ্মিতা এবং বাংলাদেশে লীগকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য তাহার আত্মত্যাগ ও অবদানের কথা স্মরণ করিয়া বাংলাদেশের অনেক লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে নেতারূপে নির্বাচিত করিতে রাজী হন। কিন্তু রক্ষণশীল গ্রুপ খাজা নাজিমউদ্দিনকে নেতা নির্বাচনের জন্য জোর চেষ্টা চালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ইহার পর হইতে প্রকৃত নির্বাচন অভিযান শুরু হয়। সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশের প্রতিটি নগর বন্দর এবং অধিকাংশ পল্লীতে সফর করিয়া জনগণকে লীগের বাণী এবং তাহাদের নিকট পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতা প্রচার করেন। মুসলিম সংবাদ-পত্রগুলি এই নির্বাচন সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই সমস্ত পত্রিকাগুলি লীগের প্রতীক 'হ্যারিকেন'কে অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে আলোর দিশারী রূপে বর্ণনা করে। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম এই নির্বাচনে লীগকে পূর্ণ সমর্থন করে। পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রতিটি মুসলিম আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করে। ফজলুল হক ও জিন্নাহর সঙ্গে লীগের নেতৃত্ব লইয়া মতানৈক্য হয়। ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করিয়া তাহার কৃষক প্রজাপার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাহার দল তখন বিচ্ছিন্ন ও মৃতপ্রায়। অন্যদিকে মুসলিম লীগ বাংলার মুসলমান বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলে ১৯৪৬ সনের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর দেখা গেল বাংলার মুসলমান ভোটারগণ পাকিস্তানের দাবীতে তাহাদের স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করিয়াছে। এই নির্বাচনে লীগের অভূতপূর্ব বিজয় বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। অনেকে ইহাকে "ব্যালট বাক্সে বিপ্লব" বলিয়া উল্লেখ করেন। কেবল ফজলুল হক এবং তাহার দলের দুই চারিজন প্রার্থী ব্যতীত কেহই নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। সোহরাওয়ার্দীর যোগ্য নেতৃত্বে লীগ মোট ১২২টি আসনের মধ্যে ১১৭টি আসনেই জয়লাভ করে।

নির্বাচকমণ্ডলীর রায় অনুযায়ী বঙ্গীয় বিধান সভায় লীগ দলীয় সদস্যরা সোহরাওয়ার্দীকে তাহাদের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত করেন এবং

১৯৪৬ সনের এপ্রিল মাসে নূতন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে। অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও লীগের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। মোট ৫০৭টি প্রাদেশিক আইন পরিষদ সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪৭২টি আসন দখল করিয়া নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম লীগ মুসলমানদের সবগুলি আসনই লাভ করে।

ক্রিপ্‌স্ মিশন ব্যর্থ হইবার পর পুনরায় ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা লইয়া আলোচনার জন্য সিমলায় এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে এবং সরকার গঠনে সদস্য সংখ্যা এবং প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যমতে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই বলিয়া উহা ব্যর্থ হয়। ১৯৪৬ সনে নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী কাজ হইবে বলিয়া সিমলা কনফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেই সূত্র অনুসারে ১৯৪৬ সনে শ্রমিকদল 'মন্ত্রীমিশন' নামে একটি প্রতিনিধি দল ভারতে পাঠান। ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে গঠিত এই মিশনের অন্য দুইজন সদস্য ছিলেন স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ও এ. ভি. আলেকজাণ্ডার।

১৯৪৬ সনের এপ্রিল মাসে জিন্নাহ্ দিল্লীতে মুসলিম লীগ হইতে নির্বাচিত সদস্যদের একটি কনভেনশন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল 'ক্যাবিনেট মিশনকে' পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতা বুঝান। নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের ভাবী রূপরেখা লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং উহা অর্জনের জন্য তাহাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষনা করেন। বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও লীগ প্রধান শহীদ সোহরাওয়ার্দীই গুরুত্বপূর্ন প্রস্তাব-গুলি উত্থাপন করেন। বস্তুত ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যবিজড়িত প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলির উত্থাপক ছিলেন বাঙ্গালীরাই।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মন্ত্রী মিশনকে জানাইয়া দেন যে একমাত্র লীগই ভারতের দশ কোটি মুসলমানদের আশা-আকাংখার প্রতীক এবং তাহাদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং তাহাদের পাকিস্তান দাবী মানিয়া না লইলে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান হইতে পারে না। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে দিল্লী প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখিত 'রাষ্ট্রসমূহের' পরিবর্তে 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

ক্যাবিনেট মিশন লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ১৯৪৬ সনের মে মাসে তাঁহাদের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র

ঘোষণা করেন। মিশন তিন স্তর বিশিষ্ট ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করে। (১) এই প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন, (২) বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া একটি স্বায়ত্বশাসিত ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন, এবং (৩) ভারতীয় প্রদেশগুলিকে তিনটি বিশেষ গ্রুপে (শ্রেণী) ভাগ করা ও প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, এই গ্রুপগুলির সদস্যগণ একটি সংবিধান পরিষদে মিলিত হইয়া সমগ্র ভারতের জন্য গঠনতন্ত্র রচনা করিবে। গ্রুপ-গুলি আবার তিন প্রকারের হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। যথাঃ—(ক) হিন্দুপ্রধান গ্রুপ, (খ) মুসলমান প্রধান গ্রুপ এবং (গ) বাংলা ও আসাম গ্রুপ।

প্রদেশগুলির নির্বাচনে প্রতি দশ লক্ষ ভোটার একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। ভারতীয় ইউনিয়নের হস্তে ন্যাস্ত থাকিবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ও মুদ্রা বিভাগ। এই বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়-গুলির ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে ন্যাস্ত থাকিবে।

কেন্দ্রীয় সংবিধান পরিষদের মোট ৩৮৫টি আসনের মধ্যে ৭৮টি মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করা হয়। কোন গ্রুপ ইচ্ছা করিলে দশ বৎসর পর কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে।

ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে ভারতীয় রাজনীতিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে বৃটিশ সরকারের নীতি সুস্পষ্ট হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব-গুলি বারংবার বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ গ্রুপিং ব্যবস্থার মধ্যে তাহাদের পরিকল্পিত পাকিস্থান দাবীর স্বীকৃতি দেখিলেন এবং কংগ্রেস নেতারা দেখিলেন এককেন্দ্রিক সরকার গঠনের মধ্যে তাহাদের অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন।

ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মিশন এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরেব পক্ষপাতী ছিল। প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য দেওয়া হইল। মিশন আরও শর্তারোপ করে যে পরিকল্পনাটি পুরাপুরি গ্রহণ করিতে হইবে—আংশিক ভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। যে দল বা দলসমূহ এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবে তাহার বা তাহাদের হাতেই ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে।

জিন্নাহ, সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য লীগ নেতারা দেখিলেন যে প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে প্রদেশ বা গ্রুপগুলির ব্যবস্থা এবং গ্রুপ-গুলির ভারত ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার যে অধিকার রহিয়াছে তাহা কার্যকরী করিয়া ভবিষ্যতে পাকিস্তান অর্জন সম্ভব হইবে। লীগ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করায় কংগ্রেস প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনা করিতে লাগিল এবং তাহাদের ইঙ্গিতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বড়দুলই প্রস্তাবিত গণপরিষদে গ্রুপিং ব্যবস্থায় যোগদান করিতে অস্বীকার করে। কংগ্রেস নূতন আপত্তি তুলিল যে তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্যদের মধ্যে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করিতে পারে না। তবে তাহারা মিশনের বাকী প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতে পারে।

কংগ্রেস পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করায় লীগের পক্ষ হইতে দাবী করা হইল যে যেহেতু কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে নাই এবং লীগ তাহা গ্রহণ করিয়াছে, সেই হেতু পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সম্মতি দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বড়লাট ওয়াভেল এই প্রস্তাব একদলীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। লীগ এই সিদ্ধান্তকে চুক্তিভঙ্গ ব্যতীত কিছুই ভাবিতে পারিল না। দেশে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা রহিয়াই গেল। ইতিমধ্যে পণ্ডিত নেহেরু প্রস্তাবিত গণপরিষদের ক্ষমতা সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বলিলেন যে কেন্দ্রীয় গণপরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম। ইহা যে সংবিধান প্রণয়ন করিবে বৃটিশ সরকার তাহার কোন রদবদল করিতে পারিবে না। লীগ এই বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ করে।

অতঃপর ১৯৪৬ সনের জুলাই মাসে বোম্বাইয়ে মুসলিম লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী বৃটিশ সরকারকে সতর্ক করিয়া দেন যে "কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ-ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে এবং পাল্টা সরকার গঠন করিবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন রাজস্ব প্রদান করিবে না এবং বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া কেন্দ্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবে।"

রাজনীতিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হইতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৯৪৬ এর ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগ তাহাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে দেশব্যাপী এক 'সক্রিয় অভিযান দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। মিঃ জিন্নাহ

ইহাকে ভারতীয় মুসলমানদের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কর্মপন্থা নির্ধারণের একটি ঘোষণা মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও লীগ সেক্রেটারী আবুল হাশেম বোম্বাই হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া জনসভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। ১৬ই অগাষ্ট কলিকাতায় গড়ের মাঠে সোহরাওয়ার্দীর সভাপতিত্বে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের স্বাধীনতা এবং সংবিধানিক প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা ছিল বিপরীতধর্মী এবং তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। ইহার জন্য প্রধানতঃ পত্রপত্রিকার প্রচারণা, নেতৃবৃন্দের উস্কানীমূলক বক্তৃতা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত লেখা দায়ী ছিল। ইহার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হয়। কলিকাতায় এক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। বহু নিরীহ লোক ইহার শিকারে পরিণত হয়।

কলিকাতার জনসংখ্যার মাত্র একচতুর্থাংশ ছিল মুসলমান। স্বভাবতঃই এই দাঙ্গার ফলে তাহারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। হিন্দুরা এই দাঙ্গার জন্য লীগ মন্ত্রীসভাকে দায়ী করে। দাঙ্গা সম্পর্কে লীগ এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পরস্পরকে দায়ী করিতে থাকে। বাংলা সরকার দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করে। কিন্তু কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিবার পূর্বেই দেশ বিভাগ হইয়া যায় বলিয়া কমিশন বাতিল ঘোষিত হয়। কলিকাতার এই ভয়াবহ দাঙ্গার সময় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় যাইয়া যেভাবে দুর্গত জনগণকে সেবা করেন তাহা অবিস্মরণীয়। শান্তি ও সম্প্রীতি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি দল নির্বিশেষে সকলকে কাজ করিবার জন্য আবেদন জানান।

কলিকাতার দাঙ্গার জন্য হিন্দু নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করিয়া মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করে। সোহরাওয়ার্দী ইহার এক পাল্টা জবাব দেন। দেশের এই সঙ্কটকালে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তিনি অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া মন্তব্য করেন যে, "অনাস্থা প্রস্তাব অসময়োচিত ও অজ্ঞতাপ্রসূত।" শেষ পর্যন্ত অনাস্থা প্রস্তাব ভোটে বাতিল হইয়া যায়। এই দাঙ্গার ফলাফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী। একদিকে ইহা যেমন দেশবিভাগ ত্বরান্বিত করে

অন্যদিকে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রগতিবাদীদের স্থানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জোরদার হইয়া উঠে। বাংলার মুসলিম লীগে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন উপদলটির শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে লর্ড ওয়াভেল লীগের প্রতিবাদসত্ত্বেও নেহেরুর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সনের ২৪শে জুন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে। মুসলিম লীগ প্রথমে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে। পরে নানারূপ চিন্তাভাবনা করিয়া মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে জিন্নাহর নির্দেশক্রমে লীগ মন্ত্রীসভায় যোগদান করিতে সম্মত হয়। কিন্তু ইহাতে বাংলার কোন প্রতিনিধি মন্ত্রী হয় নাই। কেন্দ্রীয় গণপরিষদে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইলে জিন্নাহ বড়লাটকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন যে যতদিন পর্যন্ত মন্ত্রী মিশনের গ্রুপিং পরিকল্পনা কংগ্রেস না মানিয়া লয় ততদিন মুসলিম লীগ উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। কেননা “ব্রুট ম্যাজোরিটি” বলে কংগ্রেস এই পরিকল্পনা বাতিল করিতে পারে।

দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিব যেভাবে দ্রুত অবনতি ঘটিতেছিল তাহার মোকাবিলা করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৪৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ এ্যাটলী ভারতের এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করিবার জন্য পার্লামেণ্টে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যে তাহাদের ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কথা ঘোষণা করেন। সেই উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নূতন এবং শেষ বড়লাট হইয়া আসেন। নূতন ভাইসরয়কে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধান এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। দিল্লীতে পদার্পণ করিয়াই তিনি ঘোষণা করিলেন যে বৃটিশ সরকার ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং কংগ্রেসের দাবীর প্রেক্ষিতে অখণ্ড ভারত রক্ষার্থে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু আপোষের কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা গেল না। জিন্নাহ এবং লীগ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান দাবীতে অটল থাকেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস লীগের দাবী অনুসারে ভারত বিভাগ করণে রাজী হয়। কিন্তু লীগকে ও পাকিস্তানকে জব্দ করিবার জন্য কংগ্রেস এক নূতন দাবী উত্থাপন করিল যে বাংলা ও পাঞ্জাব হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী এলাকা হিসাবে

ভাগ করিতে হইবে। জিন্নাহ, পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার জেনকিন্‌স, বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এবং গভর্ণর ফ্রেডারিক বারোজ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। যে হিন্দু নেতৃবৃন্দ একদা (১৯০৫) বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হইবে এই যুক্তিতে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য দেশময় তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহারাই সময়ের ব্যবধানে সেই বাংলাকে বিভক্ত করিবার জন্য নূতন আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন হিন্দু মহাসভা নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং আরও অনেকে।

বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সনে, সার্বভৌম স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আনয়ন করেন। দেশে তখন সর্বত্র অরাজকতা ও রাজনীতিক অনিশ্চয়তা বিরাজমান ছিল। ইতিপূর্বেই বৃটিশ সরকার তাহাদের ভারত ত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিল। কংগ্রেস পাকিস্তান দাবী সম্পর্কে তাহাদের চূড়ান্ত মতামত ব্যক্ত করে। ভাইসরয় কংগ্রেসের ইচ্ছানুযায়ী বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব করেন। সেই সময় বাংলাকে অবিভক্ত রাখিবার জন্য সোহরাওয়ার্দী যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে লীগ সভাপতি জিন্নাহর পূর্ণ সম্মতি ছিল। বাংলার কংগ্রেস প্রধান অসাম্প্রদায়িক নেতা শরৎবসু ও কিরণশঙ্কর রায় এই প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন—যাহা "বসু-সোহ-রাওয়ার্দী প্রস্তাব" নামে খ্যাত। বস্তুতঃ সুভাষ বসুর পর তাঁহার ভ্রাতা শরৎবসুই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্রের সংগ্রামে তাহার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত নেতৃত্ব দান করেন। কারণ তিনি অনেকদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন যে কংগ্রেস রাজনীতি অবাঙ্গালী বুর্জোয়া রাজনীতিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। সেইখানে উদার ও অসাম্প্রদায়িক বাংলা নেতাদের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। বাংলার স্বার্থকে কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই সমভাবে, সর্ব ভারতীয় ও মুসলিম রাজনীতির স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেই ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সোহরাওয়ার্দী ও শরৎবসু পরিকল্পিত স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন হইলে বাংলার হিন্দু-মুসলমান তাহাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া একটি প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করিতে পারিত। ধন, জন ও সম্পদের দিক হইতে বিবেচনা করিলে বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হইবার যোগ্যতা এই দেশের ছিল। তৎকালীন বাংলার অন্যতম চিন্তাবিদ ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগ

সম্পাদক আবুল হাশেম এই সার্বভৌম বাংলার একজন অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি বেশীদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই। একদিকে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের বিরোধিতা এবং অন্যদিকে কংগ্রেস লীগের পাকিস্তান দাবী মানিয়া লওয়ায় সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটির পরিবর্তন হয়। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হয়। জিন্নাহ এবং অন্যান্য লীগ নেতারা বিভক্ত এবং মাথাকাটা পাকিস্তান মানিয়া লইবেন ইহা কংগ্রেস ভাবে নাই।

এইভাবে 'বসু-সোহরাওয়ার্দীর' বৃহৎ বাংলা গঠনের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়। অন্যথায় বাংলার ইতিহাস হয়তবা অন্যরূপ হইত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বৃটিশ শাসনের প্রভাব

প্রায় দুই শত বৎসর যাবৎ বৃটিশ শাসনের ফলে বাঙ্গালী জীবনে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে? জীবনের নানাক্ষেত্রে বৃটিশ শাসনের প্রভাব লক্ষ্য করিতে হইলে প্রথমে আমাদের দেখা উচিত বৃটিশ-পূর্ব যুগে বাংলার রূপ। এই তুলনামূলক আলোচনার মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করিব বাংলাদেশে বৃটিশ শাসনের প্রভাব। যেসব ক্ষেত্রে আমরা এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিতে চাই তাহা হইতেছে প্রশাসন, সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি।

প্রথমে ধরা যাক প্রশাসনের কথা। বৃটিশ-পূর্ব যুগে প্রশাসকগণ ছিলেন প্রায়ই বংশানুক্রমিক। পুত্র লাভ করিতেন পিতার পদ। অবশ্য মুগল শাসনতন্ত্রে এমন কোন ধরা বাধা নিয়ম ছিল না যে পুত্র পিতার পদ অবশ্যই লাভ করিবে। ইহা ছিল একটি প্রথামাত্র। বৃটিশ যুগের মত পূর্বে সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন সরকারী ব্যবস্থা ছিল না। অভিজ্ঞতাই ছিল তাহাদের প্রশিক্ষণ। পিতার পেশা পুত্র গ্রহণ করিতেন। পিতার কাছে পুত্র শিখিয়া নিতেন পেশাগত খুঁটিনাটি। পরিবারের বাইরে প্রশিক্ষণ লাভের কোন উপায় ছিল না। বংশানুক্রমিক পদের ইহাই প্রধান কারণ। মুগল আমলে প্রশাসনেব নিম্নতম একক ছিল গ্রাম। গ্রাম শাসন করিতে গ্রাম-পঞ্চায়েৎ। গ্রামেব বিশিষ্ট অধিবাসিদের নিয়া গঠিত ছিল এই পঞ্চায়েৎ। ইহার কাজ ছিল গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা। গ্রামের উপরে ছিল পরগণা। উক্ত পরগণা একজন জমিদারের অধীন হইলে ঐ জমিদারকে করা হইত ঐ পরগণার প্রশাসক। জমিদারী রাজস্ব সংগ্রহ করা ছাড়াও জমিদার পরগণার আইন শৃঙ্খলার জন্য দায়ী থাকিতেন। যে পরগণায় অনেক সংখ্যক জমিদারী, তালুকদারী ছিল সেখানে একজন তহশীলদার নিযুক্ত করা হইত। পরগণা শাসক হিসাবে জমিদার, তহশীলদারদের হাতে ছিল বিপুল ক্ষমতা। পরগণার উপরের প্রশাসনিক স্তর ছিল জেলা, জেলার উপরে সদর বা কেন্দ্র। কেন্দ্রে নবাবকে পরামর্শ দিতেন বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত নায়েব বা মন্ত্রী।

মুগলদের এই প্রশাসন ব্যবস্থা আপাতঃ দৃষ্টিতে দক্ষ দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার দক্ষতা নির্ভর করিত নবাবের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও কর্মক্ষমতার উপর। কেননা এই ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করিয়াছে একনায়কত্ব নীতির উপর। নবাবের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত স্থানীয় প্রশাসকদের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা। কর্মচারীগণ তাই ব্যস্ত থাকিতেন শুধু নবাবকে খুশী রাখার জন্য; প্রজাকুলকে শান্ত সুখী রাখার জন্য নয়। তাই নবাব নিজে দক্ষ, কঠোর ও প্রজাহিতৈষী হইলে দেশের শাসনযন্ত্র ভাল চলিত, নিয়মিত চলিত। আর নবাব নিজে অদক্ষ, অদূরদর্শী, কর্মবিমুখ হইলে দেশে অশান্তির আর সীমা থাকিত না। তাঁহার অযোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্থানীয় প্রশাসকগণ উৎপীড়নে লিপ্ত হইত, ধন-দৌলতে ফুলিয়া ফাঁপিয়া বাড়িয়া উঠিত, দেশ যাইত রসাতলে।

এমনি এক পরিবেশে ইংরেজ এদেশে অধিষ্ঠিত হয়। ইহা ছিল এক বিরাট ক্রান্তিকাল। পূর্বে রাজা পরিবর্তন হইলেও দেশের অধিকাঠামোতে বিশেষ পরিবর্তন আসিত না। কেননা যে শাসকই আসুক না কেন প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল সব সময়ই একনায়কত্বের উপর নির্ভরশীল। এইবার বৃটিশ রাজের বেলায় এই নিয়মে বিরাট ব্যতিক্রম ঘটিল। বৃটিশ সরকার মুগল সরকারের মতই ছিল একটি স্বৈরাতন্ত্র; তবে পার্থক্য এই যে মুগল স্বৈরাতন্ত্র ছিল ব্যক্তিক (**Personal**) আর বৃটিশ স্বৈরাতন্ত্র ছিল নৈর্ব্যক্তিক (**Impersonal**)। বৃটিশ যুগে গভর্ণর জেনারেল বা গভর্ণরের ব্যক্তিগত যোগ্যতা যাহাই হউক না কেন প্রশাসনক্ষেত্রে ইহার অভিঘাত খুব একটা পড়িত না। কেননা বৃটিশ প্রশাসন ব্যবস্থা মুগল যুগের ন্যায় কোন ব্যক্তির ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইত না। ইহা নিয়ন্ত্রিত হইত সুনির্দিষ্ট আইনের দ্বারা, নিয়মের দ্বারা। এখানে সব স্তরের প্রশাসক ছিল নিয়মের অধীন। প্রশাসনকে নৈর্ব্যক্তিক ও নিয়মাধীন করা বৃটিশ শাসনের একটি বিরাট অবদান। ইহাতে ভাল মন্দ দুই দিকই ছিল। এই ব্যবস্থায় নিয়ম লংঘন করিয়া কোন প্রশাসকের পক্ষে যেমন অন্যায় উৎপীড়ন করা কঠিন ছিল তেমনি নিয়ম অতিক্রম করিয়া ভাল কাজ করারও অসুবিধা ছিল। সবাই এই ব্যবস্থায় নিয়মের দাস।

নিয়মের শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যক্তির আধিপত্যের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় সংগঠিত আমলাতন্ত্রের আধিপত্য। এদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি ছিল উন্নতমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেধাবী আমলাতন্ত্র। কাঠামোগত-

ভাবে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল ভারতীয় আমলাতন্ত্র। কিন্তু কার্যতঃ এই দুই আমলাতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিরাট। গ্রেট বৃটেন শাসিত হইত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি কর্তৃক। সেখানে পার্লামেণ্ট নিয়ন্ত্রণ করিত মন্ত্রিসভা আর মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণ করিত আমলাতন্ত্র ও সমস্ত প্রশাসন প্রক্রিয়া। তাই সেখানে সরকারী আমলারা ছিল পরোক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জনসেবক (**Public Servant**)। কিন্তু এদেশে সৃষ্ট বৃটিশ আমলাতন্ত্রকে **Public Servant** বলা হইত বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা ছিলেন জনগণের প্রভু। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক পাকাপাকি করার জন্য বৃটিশ শাসনের প্রথম এক শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদস্থ চাকুরী হইতে দেশীয়দের বঞ্চিত করা হয়। "কাল আদমিরা অনুপযুক্ত, অসৎ মিথ্যাবাদী, ফাঁকিবাজ"—এই ছিল তখন দেশীয়দের প্রতি বৃটিশের দৃষ্টিভঙ্গী। সিপাহী যুদ্ধের পর প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে দেশীয় ভদ্রলোকদের আমলাতন্ত্রে অনুপ্রবেশের সুযোগ প্রদান করা হয়। কিন্তু শতাব্দীর বঞ্চনা এবং তৎপ্রসূত অজ্ঞতা ও হীনমন্যতার ফলে জনমনে যে দাসত্ব মনোভাব গড়িয়া উঠে তাহা উৎরাইয়া উঠিতে আরও এক শতাব্দী সময় লাগে। মুগলেরাও ছিল বিদেশী। কিন্তু দেশ শাসনের বেলায় তাহারা নির্ভরশীল ছিলেন দেশীয় লোকের উপর। উচ্চ সামরিক পদ ছাড়া সমস্ত চাকুরী দেশীয়দের জন্য খোলা ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে দেশীয় প্রশাসকরাই দেশ শাসন করিতেন। ফলে বিদেশী শাসন থাকা সত্বেও মুগল আমলে জনগণের মধ্যে বঞ্চণাবোধ ছিল না, দাসত্ব মনোভাব ছিল না।

বৃটিশ নির্মিত প্রশাসনযন্ত্র ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপযোগী করিয়া গঠিত হইয়াছিল। ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোকদের হাতে ন্যাস্ত করা হইয়াছিল অপরিসীম ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা। তাহাদের ক্ষমতা, বিচ্ছিন্নতা ও ঔদ্ধত্য ছিল এত ব্যাপক ও ভীতিপ্রদ যে তাহাদেরকে যুক্তিসঙ্গত কারণেই বলা হইত স্বর্গাগত (**Heaven born**)। উনিবিংশ শতকের শেষার্ধ হইতে যে সকল দেশীয় ভদ্রলোকেরা সিভিল সার্ভিসে অনুপ্রবেশ করে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও অনুরূপভাবে গঠিত হয়। তাহাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঔপনিবেশিক মানসিকতা দেশ বিভাগের পরও থাকিয়া যায়। জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার মানসিকতা ঐতিহ্য হিসাবে আমলাতন্ত্রের মধ্যে এখনও বিরাজ করিতেছে।

সামাজিক ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসনের সুদূর প্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমাজে এমন কতিপয় কুসংস্কার ও পাশবিক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল যাহা যে কোন সভ্য সমাজের জন্য কলঙ্কজনক। যেমন ধর্মের নামে কন্যা সন্তান হত্যা করা, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়া, বিধবা নারীকে মৃত স্বামীর সঙ্গে অগ্নিদাহ করা (সতীপ্রথা), নিরীহ পথচারীকে গলা টিপিয়া হত্যা করা (ঠগী), রথের চাকায় নরবলী দেওয়া (জগন্নাথ), পিঠের দাঁড়ায় বর্শী বিধাইয়া দড়ি দিয়া শূন্যে চক্রাকারে ঘুরানো (চরক), বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, দাসপ্রথা ইত্যাদি। সমাজের নৈতিক চরিত্রও ছিল অতি নিম্নে। পতিতা-বৃত্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট যৌনরোগ ছিল সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত। অষ্টাদশ শতকের শেষ যুগের সমাজের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে নদিয়ার রাজা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র তাঁহার আত্মকথায় বলেন, "পূর্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন তাহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষ পর্ব উপলক্ষে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকেরা পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।"

অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতে, বিশেষ করিয়া পলাশীর পর হইতে, সামাজিক চরিত্রের দ্রুত অবনতি ঘটে। মুগল শাসনের শেষ ও বৃটিশ শাসনের শুরু—এই ক্রান্তিকালে সমাজ কাঠামো, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়ে। হতাশা ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছড়াইয়া যায়। এই অবস্থাকে চিত্রিত করিয়া নদিয়ার রাজার সভাকবি কৃষ্ণচন্দ্র ভাদুরি লেখেন:

> "আজি শুদ্রেতে বেদ্ পড়ে বামন হলো ভেকো।
> ছত্রিশ বর্ণ এক হলো তার সাক্ষী হুকো।
> শ্বশুরে পুত্রবধু হয়ে বাবা হয়ে ঝি
> ইহা দেখে পাখী বলে দেশের হবে কি?"

প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারের নীতি ছিল দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন ধারায় কোন রকম হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু পরবর্তী-কালে খৃষ্টান মিশনারী ও বৃটিশ পার্লামেণ্টের চাপে কোম্পানী সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হয়। বেণ্টিংকের আমলে (১৮২৮—১৮৩৫)

সরকার নির্দিষ্ট সামাজিক নীতি গ্রহণ করে। দেশকে নানাবিধ নিষ্ঠুর কুসংস্কার হইতে মুক্ত করার জন্য বেন্টিংক অনেকগুলি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম সতীদাহ প্রথা, ঠগী প্রথা, শিশু হত্যা, দাস প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বেন্টিংক যে সংস্কারের ঐতিহ্য স্থাপন করেন তাহা অনুসরণ করিয়া পরবর্তী প্রত্যেক শাসকই কোন না কোন কুসংস্কারকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ইহার মূলোৎপাটনের চেষ্টা করেন। ঊনবিংশ শতকের শেষ নাগাদ প্রায় সব কুসংস্কারই দূর করিতে সরকার সমর্থ হয়। কিন্তু বর্ণপ্রথা ও আভিজাত্যের অভিশাপ হইতে সমাজ মুক্ত হইতে পারে নাই। উভয় সমস্যাই বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অনুকূল ছিল। অতএব সামাজিক সমস্যা হিসাবে এইগুলি টিকিয়া থাকে।

কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় তমসা কাটিয়া বাঙ্গালী সমাজ আধুনিকতা লাভ করে। সরকারের সংস্কার নীতি এই প্রক্রিয়াগুলির একটি। আরেকটি হইতেছে সরকারের শিক্ষা নীতি। ১৮১৩ সনের চার্টার এ্যাক্টে জনগণকে শিক্ষা দিবার দায়িত্ব কোম্পানীকে অর্পণ করা হয়। ঐ সনে শিক্ষা খাতে বাৎসরিক ন্যূনপক্ষে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি গৃহীত না হওয়ায় দীর্ঘকাল বরাদ্দকৃত টাকা অব্যয়িত থাকে। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মাধ্যম কি হইবে ইহা নিয়া বিতর্ক চলে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত। একদল প্রাচ্য বিষয় ও প্রাচ্য ভাষায় শিক্ষা দিবার পক্ষে যুক্তি প্রদান করে। আরেক দল ছিল পাশ্চাত্য বিষয় পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতি। অবশেষে ১৮৩৫ সনে দ্বিতীয় দলের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৮৩৫ সন হইতে দেশে ইংরেজী শিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। প্রথম প্রথম ইংরেজী শিক্ষা শুধু শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৫৫ সনের পর হইতে সরকার গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপন করিতে শুরু করে। ইহার ফলে শিক্ষা শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চত্বর অতিক্রম করিয়া গ্রামাঞ্চলে গিয়া পৌঁছায়। তবে বিংশ শতকের দুই দশক পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুল ছিল অতি স্বল্প। শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখার জন্য সরকার ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের কাছে আহ্বান করে। শিক্ষা বিস্তারে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে স্কুল কলেজ স্থাপনে সাহায্যকারীদের সরকার 'রায় বাহাদুর'

'খান বাহাদুর' প্রভৃতি উপাধি দিয়া ভূষিত করে। উপাধি লাভে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক জমিদার ও ধনী ব্যক্তি স্কুল কলেজ স্থাপন করে। ১৯২০ সনের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে দেশের সব কয়টি স্কুল কলেজের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত।

এখানে বলা প্রয়োজন যে উনবিংশ শতকে ইংরেজী শিক্ষা মুসলমান সমাজে খুব একটা অনুপ্রবেশ করে নাই। ফলে তাহারা ছিল চাকুরী-বাকরী হইতে বঞ্চিত, আধুনিকতার আলোক হইতে দূরে। বলা হয় যে মুসলমান জাতি ইংরেজী শিক্ষাকে ধর্মবিগর্হিত মনে করিয়া ইহা হইতে তাহারা ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে থাকে। এই যুক্তি আংশিকভাবে সত্যি বটে। ওহাবী ও ফরায়জী আন্দোলনের ফলে মুসলমান সমাজ ইংরেজীর চাইতে আরবী ফার্সী শিক্ষার দিকেই গুরুত্ব বেশী দেয়। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা বর্জনের জন্য ধর্মীয় গোড়ামীর চাইতে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ছিল সব চাইতে বেশী দায়ী। উনবিংশ শতকে শিক্ষা ছিল অত্যধিক ব্যয়বহুল। ফলে ইহা সমাজের অধিকতর ধনী উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের মুসলমান বেশীর ভাগই ছিল কৃষক। তখন কৃষকদের অবস্থা ছিল অত্যধিক শোচনীয়। অতএব দারিদ্রের দরুন মুসলমান কৃষক পরিবারের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা ছিলেন ধনী তাহাদের সন্তানদের অনেকেই ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ধর্মের নামে তাহারা ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেন নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কৃষি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বাঙ্গালী মুসলমান কৃষকের অর্থনীতি স্বচ্ছল হইয়া উঠে। সেই সঙ্গে তাহাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষাও বিস্তার লাভ করে।

বৃটিশ সরকারের সংস্কার ও শিক্ষানীতির সরাসরি প্রভাব পড়ে বাঙ্গালী মনীষার উপর। উনবিংশ শতকের প্রথম হইতে বাংলা সাহিত্য চর্চায় এক নূতন যুগের সূচনা হয়। বৃটিশ পূর্ব যুগের সাহিত্যে ছিল কাব্যিক, অমানবিক, অশ্লীল, রাজদরবার কেন্দ্রিক, তোষামোদমুখী। ১৮০০ সালে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার পর হইতে শুরু হয় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির নব-যাত্রা। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, উইলসন, কোলব্রোক, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি মনীষীগণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা দেন। তাঁহাদের পরিচালনা ও প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় প্রথম উন্নত ব্যাকরণ, অভিধান, বিশ্বকোষ প্রণীত হয়। বাংলা সাহিত্য লাভ

করে নূতন দিশা, নূতন পদ্ধতি ও পরিচয়। পশ্চিমী সাহিত্যের অনুকরণে বাঙ্গালী লেখকগণ গদ্যে সাহিত্য রচনা শুরু করেন। অমানবিক সুরাসুরকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু না করিয়া তাঁহারা মানুষ ও সামাজিক সমস্যাকে লেখার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য চর্চায় এক অভিনব জাগরণ দেখা যায়। এই জাগরণের মূলে ছিলেন রাম রাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালিনারায়ণ রায়, ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায়, তারিণী চরণ প্রমুখ মনীষীগণ। বাংলা সাহিত্যের নব যাত্রার প্রথম তিনযুগের মধ্যেই চিন্তাধারা ও পদ্ধতিক্ষেত্রে তাঁহারা যে পরিবর্তন আনয়ন করেন তাহা অতি চমকপ্রদ ও অভিনব। এত অল্প সময়ে এত বড় বিশাল পরিবর্তন পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যের ইতিহাসে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। মনীষার ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে বাংলার ইতিহাসে রেঁনেসাস বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

বাঙ্গালী অর্থনৈতিক জীবনে বৃটিশ শাসনের প্রভাব কি ছিল? অন্য কথায় মুগলযুগে বাংলার অর্থনীতি কেমন ছিল এবং বৃটিশ শাসনের ফলে ইহাতে কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে? মুগল যুগে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রামগুলি ছিল স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহার অর্থ এই নয় যে তখনকার গ্রাম ছিল খুব সুখী ধনী। গ্রামীন জীবনের চাহিদা ছিল অতি সীমিত। এই সীমিত চাহিদা গ্রামের উৎপাদন হইতে সহজেই মিটানো যাইত। অর্থনৈতিক লেনদেন গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বেশীর ভাগ চাহিদা মিটানো হইত দ্রব্য বা শ্রমের বিনিময়ে। মুদ্রার প্রয়োজন খুব একটা অনুভূত হইত না। গ্রামের ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, তাঁতী, প্রভৃতি শ্রমশ্রেণী কৃষকের অকৃষি দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করিত কৃষিপণ্যের বিনিময়ে। এই গ্রামীন স্বনির্ভরতার জন্য টাকা-অর্থনীতি (Money Economy) প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। টাকার মাধ্যমে আদান প্রদান ছিল শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। টাকা অর্থনীতির অভাবে সামন্ত অর্থনীতি বিনাশ করিয়া ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। যাহা কিছু ধনতন্ত্রের লক্ষণ আমরা মুগল যুগে দেখিতে পাই তাহা ছিল নিতান্তই শহরকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক ধনতন্ত্র। ঐ বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল অবাঙ্গালী ভারতীয় ও বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থার হাতে। গ্রাম বাংলার আপামর জনসাধারণের অর্থনীতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক।

সেখানে সাধারণ লোকের জীবন ছিল সরল ও সোজা, ধনতন্ত্রের ঝঞ্ঝাট-বর্জিত।

সামন্ত অর্থনীতিকে ধ্বংস করিয়া সেখানে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটানো বৃটিশ শাসনের অন্যতম অবদান। বৃটিশ সরকার মুদ্রা সংস্কারের মাধ্যমে টাকা-অর্থনীতি সর্বত্র প্রচলন করেন। বৃটিশ পূর্ব যুগে এদেশে অনেক রকমের টাকা প্রচলিত ছিল। একেক টাকার মান ছিল একেক রকম। প্রত্যেক রকমের টাকা নির্ধারিত হারে বাঁটা দিতে হইত। সিক্কা টাকার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া বাটার হার নির্ধারণ করা হইত। বাঁটার হার নির্ধারণ করার জন্য ছিল পোদ্দার শ্রেণী। বৃটিশ সরকার সব রকম টাকা বাতিল করিয়া শুধু এক রকম টাকা প্রচলন করিলেন। সরকারী কর্মচারী-দের জমির পরিবর্তে নগদ অর্থে বেতন দিবার ব্যবস্থা করা হয়। কৃষক ও জমিদারদের টাকায় রাজস্ব শোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। জমি কেনা বেচার সুবিধার জন্য জমিকে জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং বকেয়া রাজস্ব সংগ্রহ করার জন্য নিলামে জমি বিক্রির ব্যবস্থা করিয়া জমিতে বাজার সৃষ্টির করা হয়। নানাবিধ বিরক্তিকর কর বিলোপ করিয়া সারাদেশে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। দূর দূরান্তে নির্বিঘ্নে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দস্যু ডাকাতদের দমন করার চেষ্টা করা হয়। খাদ্য শস্যের উপরে অর্থকরী শস্যের প্রচলন করা হয়। এমনিভাবে মধ্যযুগীয় সামন্ত অর্থনীতিকে আধুনিক টাকা-অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়। কোম্পানীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ যায় নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে আধুনিক অর্থনীতির শুরু লক্ষ্য করা যায়।

অর্থনীতিকে আধুনিকিকরণের প্রচেষ্টার মধ্যে লুকায়িত ছিল ইংরেজের ঔপনিবেশিক প্রয়োজনীয়তা। এদেশে বৃটিশ দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করা ছিল এক লক্ষ্য। আরেক লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে বৃটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামালের জোগানদার করা। উভয় উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য দরকার ছিল টাকা-অর্থনীতির প্রচলন ও প্রসার।

বৃটিশ শাসনের প্রথম অর্ধশতাব্দী ছিল চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়কাল। পলাশীর পর-পরই শুরু হয় লাগামহীন শোষণের পালা। কোম্পানীর দদুল্যমান অর্থনৈতিক নীতি, কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, সম্পদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রতি বছর রাজস্ব বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রাকৃতিক

দুর্যোগ, বাংলার বাইরে রৌপ্য পাচার, দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থপ্রেরণ, নিলামে ভূমি বন্দোবস্ত প্রভৃতি কারণে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার ফলে কর্ণওয়ালিসের মতে বাংলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদ জংগলাকীর্ণ হইয়া পড়ে, আমদানী রপ্তানী ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। সব চাইতে দুর্দশাগ্রস্থ হইয়া পড়ে তাঁত শিল্প। বৃটেনের শিল্প বিপ্লবের দরুণ বিদেশে বাংলার তাঁত দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যায়। এমনকি অল্পকালের মধ্যে বাংলার আভ্যন্তরীণ বাজার পর্যন্ত বৃটিশ বস্ত্র দখল করিয়া নেয়। তাঁত শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে।

উনবিংশ শতকেব প্রথম হইতে অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়া উঠিতে শুরু করে। ১৮১৩ সন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার বিলুপ্ত করার পর দেশে প্রচুর বিদেশী পুজি বিনিয়োগ হইতে থাকে। নীল, চা, পাট, তামাক, প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের উৎপাদন ও শিল্পায়নে বৃটিশ শিল্পপতিরা আগাইয়া আসে। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য সুগম করার জন্য জল ও স্থল পথে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করা হয়। ষ্টিমার, রেলওয়ে, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি স্থাপনের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন জীবনের সূচনা হয়। বিংশ শতাব্দী নাগাদ পাট, চা, তামাক প্রভৃতি কৃষি শিল্প ছাড়াও বনজ শিল্প, খনিজ শিল্প, কুটির শিল্প, বস্ত্র শিল্প প্রভৃতির প্রচলন হয়। ফলে দেশের জায়গায় জায়গায় বন্দর ও শিল্প শহর গড়িয়া উঠে। অর্থনৈতিক জীবনে এই সব পরিবর্তন অবশ্যই বৃটিশ শাসনের বড় অবদান।

ইংরেজ শাসনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব পড়িয়াছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। মুগল যুগে খোলা রাজনীতির বালাই ছিল না। খোলা রাজনীতি ছিল না বলিয়া সেখানে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হইত ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে। সমস্যা সমাধানে, দাবী দাওয়া আদায়ে জনমতের বালাই ছিল না। জনমতের কোন প্রশ্নই উঠে না। সামন্ত সমাজের রাজনীতি ছিল নেহায়েতই আনুগত্যের রাজনীতি, তোষামোদের রাজনীতি। সেখানে একদল শাসক, আরেকদল শাসিত। শাসিতের পক্ষে শাসকগোষ্ঠীতে অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। সেখানে জীবনের গতিধারা নিয়ন্ত্রিত হইত জন্মের দ্বারা, কর্মের দ্বারা নয়। বৃটিশ শাসনের ফলে জন্মশক্তি দুর্বল হইয়া কর্ম-শক্তি সবল হইয়া উঠে। অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম রাখার জন্য

ইংরেজ সরকার দেশে একটি শাসক অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। তাহাদের নানা রকম লোভনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়া রাজা, নওয়াব, স্যার প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাহাদেরকে বৃটিশ রাজের খুটি হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই খুটি মাটি পায় নাই। ইহার কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ।

সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে পরিবর্তনের মহা যোগফল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব। প্রথম যুগে কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত বানিয়া, মুৎসদ্দী, কয়াল, পাইকার, দালাল, বেপারী প্রভৃতি শ্রেণী হইলেন বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রথম পুরুষ। সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে সেই আদি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে দাঁনা বাঁধিয়া উঠে। শিক্ষা ও সংস্কার নীতির ফলে সৃষ্টি হয় শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজসেবী প্রভৃতি শ্রেণী। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে উদ্ভব হয় বিচারক, উকিল, মোক্তার, মোহরার ইত্যাদি। ভূমি রাজস্ব সংস্কারের ফলে উদ্ভব হয় ভূমধ্যধিকারী, মধ্যস্বত্বাধিকারী, ইজারাদার প্রভৃতি শ্রেণী। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে উদ্ভব হয় ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় কর্মবৃদ্ধি ও শিল্পায়নের ফলে গড়িয়া উঠে এক বিরাট চাকুরী-জীবী শ্রেণী। উপরোক্ত প্রত্যেকটি শ্রেণী উপশ্রেণীর ছিল অনন্ত সমস্যা, দাবী দাওয়া। ঐ সব দাবী দাওয়া, সমস্যা সমাধাকল্পে গঠিত হয় সংগঠন। পেশাগত সাংগঠনিক তৎপরতা হইতে শুরু হয় রাজনৈতিক তৎপরতা, রাজনৈতিক সংগঠন। রাজনৈতিক সংগঠন হইতে শুরু হয় জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ এবং পরবর্তী সময়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ও বাংলাদেশের আবির্ভাব প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ও তৎপ্রসূত রাজনীতিরই প্রত্যক্ষ ফল।

নবম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম

দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। 'পাকিস্তান' নামকরণের সঙ্গে লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র চৌধুরী রহমত আলীর নাম বিশেষভাবে জড়িত। ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল। অবশ্য লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়, "ভৌগলিকভাবে সংলগ্ন এলাকা বা ইউনিটগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে চিহ্নিত করিয়া এমনভাবে গঠন করা উচিত যাহাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের ন্যায় যে সমস্ত অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যায় অধিক সেই গুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে একত্রীভূত করা যাইবে এবং তাহাতে অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি হইবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।"

উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে অঞ্চলগুলি যাহাতে দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, যোগাযোগ, আমদানী-রপ্তানী এবং প্রয়োজনবোধে অনান্য বিষয়সমূহে সর্বক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারে সেইভাবে একটি শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিবেশন কার্যনির্বাহক কমিটিকে ক্ষমতা অর্পণ করে। মূলতঃ এই প্রস্তাবে কনফেডারেশনের ভিত্তিতে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুইটি পৃথক রাষ্ট্র, একটি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং অপরটি পূর্বাঞ্চলে, অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্বার্থ সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মিঃ জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাই তিনি ১৯৪৬ সনের মুসলিম লীগের দিল্লী কনভেনশনে সুকৌশলে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন পূর্বক 'ষ্টেটস' এর স্থলে 'ষ্টেট' করিয়া এককেন্দ্রিক পাকিস্তানের কাঠামো গ্রহণ করেন। সেই কারণে এবং তৎকালীন রাজনীতিক ঘটনা প্রবাহে শেষ পর্যন্ত দুইটি ভূখণ্ডকে লইয়া একটি রাষ্ট্র পাকিস্তান জন্মলাভ করিল।

ভৌগোলিক দিক হইতে পাকিস্তানের সৃষ্টি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা; রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে ইহা এক অভিনব পরীক্ষা। ইহার দুইটি অংশ

পরস্পর হইতে পনেরশত মাইল বিদেশী এলাকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। শুধু ভৌগোলিক দিক হইতে অবাস্তব নয়, অন্যান্য দিক হইতেও যেমন, ভাষা, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, ঐতিহ্য এবং অর্থনীতি, দুই অঞ্চল পরস্পর হইতে পৃথক। একমাত্র ধর্ম ও বিদেশী ভাষা ইংরেজী ছাড়া আর কোন বিষয়ে তাহাদের কোন মৌলিক ঐক্য বন্ধন ছিল না। পাকিস্তানের এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সেই দিন অনেক রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন হইতে দুই অঞ্চলের মধ্যে অসম অর্থনীতি ছাড়াও জাতিগত, মানস, প্রকৃতিগত, সংস্কৃতিগত এবং ইতিহাসের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বাগুলি ক্রমশ প্রকট হইতে থাকে। ১৯৪৮ সনের প্রথম হইতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবহেলা ও প্রবঞ্চনা শুরু হয়। পাকিস্তানের পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই সত্যটি সুস্পষ্ট হইবে যে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিল ঔপনিবেশিক এবং সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক প্রবঞ্চনা ও নির্যাতনের এক করুণ ইতিহাস।

স্বয়ং পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস পান। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নেই সর্বপ্রথম সংঘাতের সূচনা হয় ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে। বিবেকহীন উক্তি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব হেতু জিন্নাহ এই সমস্যার সৃষ্টি করেন। বদরুদ্দিন উমর প্রণীত "পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" গ্রন্থে স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সনের ঘোষণাপত্রে বাংলাভাষাকে যে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণায় প্রতিশ্রুতি ছিল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে বাংলাভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী করেন তাহার উল্লেখ আছে। অতঃপর ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষা ব্যবহার সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলে ভাষার দাবী একটি সুস্পষ্ট আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।

১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে জিন্নাহ ঢাকা সফরে আসেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া তিনি মারাত্মক ভুল করিলেন। দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া জিন্নাহ ২১শে মার্চের জনসভায় এবং ২৪শে মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সমাবর্তন উৎসবে প্রদত্ত ভাষণে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করেন। বস্তুত: জিন্নাহ এই সময় বাঙ্গালী বিদ্বেষী পাকিস্তানী আমলাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। জিন্নাহর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র প্রতিনিধিদের নিকট হইতে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল। কারণ বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করিবার ইহাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। তারপর ছাত্ররা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উত্থাপন করে। ছাত্ররা তাহাদের দাবীতে অনড় ছিল। আন্দোলনের প্রথম স্তরেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাসে পূর্ববাংলা ব্যাবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক সরকারের কাজে বাংলাভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয। পরবর্তী তিন বৎসর মার্চ মাসে সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে সারা বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয়। ইতিমধ্যে প্রশাসন ক্ষেত্রে পাকিস্তানে অনেক রদবদল হয়। ১৯৪৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহর মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থানে গভর্ণর জেনারেল পদে অভিষিক্ত হন উর্দুভাষী বাঙ্গালী খাজা নাজিমউদ্দিন। নাজিমউদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল, ব্যক্তিত্ববিহীন রাজনীতিজ্ঞ। পূর্ব বাংলার স্বার্থের দিকে তাঁহার বিশেষ নজর ছিল না।

অত:পর ১৯৫০ সনে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের ভাবী সংবিধানের রূপরেখা হিসাবে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রণয়ন করে। এই রিপোর্ট মূলত: পূর্ব বাংলার স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ১৯৫১ সনের অক্টোবরে লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হইলে খাজা নাজিমউদ্দিন তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। সমস্যা সমাধান অপেক্ষা সমস্যা সৃষ্টির ব্যাপারে তাহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। ১৯৫২ সনের ৩০শে জানুয়ারীতে তিনি ঢাকায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে এক জনসভায় "উর্দুই হইবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" বলিয়া ঘোষণা করেন। আবার সংগ্রাম শুরু হইল-প্রদেশব্যাপী হরতাল, ধর্মঘট ও ছাত্রবিক্ষোভ। ১১ই ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশে প্রস্তুতি দিবস এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকাল হইতে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি হয়। কিন্তু ২১ তারিখে ঢাকার ছাত্ররা সংগঠিত ভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং প্রতিবাদ মিছিল বাহির করে। ছাত্ররা পরিষদ ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী গুলি চালায়। বহু ছাত্রজনতা হতাহত হয়। শহীদদের মধ্যে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসের ছাত্র আবুল বরকত অন্যতম ছিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালিত হয়। পরিষদের অভ্যন্তরে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে মুসলিম লীগ দলের একজন সদস্য দলত্যাগ ও অপরজন সদস্যপদ ত্যাগ করেন। সারা প্রদেশে মাতৃভাষার দাবীতে সর্বত্র গণবিক্ষোভ চলিতে থাকে। বহু ছাত্র শিক্ষক জননেতা গ্রেফতার হইলেন। সর্বত্র ধরপাকড় শুরু হয়। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার দাবীতে সেই দিনের বাঙ্গালীর আত্মত্যাগ যথার্থই অতুলনীয় ছিল। শেষ পর্যন্ত সরকার ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন যে তাহারা রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রাদেশিক পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন স্বয়ং বাংলাভাষাকে সরকারী ভাষা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী ছিল বাংলাদেশের প্রথম গণচেতনার সুসংগঠিত সফল গণ-অভ্যুত্থান ও পরবর্তী কালের শাসকচক্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

ইতিমধ্যে ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে এবং মুসলিম লীগ নেতাদের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের ও সরকারী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৯ সনে ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ বা জনগণের মুসলিম লীগ গঠন করেন। পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের মেরুদণ্ডবিহীন কার্যকলাপ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ও সামন্ত প্রভুদের জনবিরোধী কাজে বীতশ্রদ্ধ হইয়া এই অঞ্চলের বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃ আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। অল্পদিনের মধ্যে মাওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর যোগ্য নেতৃত্বে এবং ছাত্রসমাজের সক্রিয় সমর্থনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসাবে এই দল বাঙ্গালী মধ্যশ্রেণীর সংগ্রামী কণ্ঠস্বররূপে পরিগণিত হয়।

প্রশাসন বিভাগে অসমতা, দুর্নীতি, অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং সরকার ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে গণমন ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ হইতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পায়। যতই দিন যাইতেছিল ততই লীগ নেতৃবৃন্দ আমলাতন্ত্র ও সেনা বাহিনীর উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছিল। সেনাবাহিনীর সমর্থনে আমলা গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৩ সনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকে বরখাস্ত করেন। নূতন প্রধানমন্ত্রী হইলেন ওয়াশিংটনে

নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। দলীয় সমর্থনের অভাবে তিনি ছিলেন গভর্ণর জেনারেলের হাতের ক্রীড়নক। প্রকৃতপক্ষে এই সময় দেশের প্রশাসন ব্যাপারে বাঙ্গালীদের হাত ছিল অত্যন্ত সীমিত। পাঞ্জাবী মিলিটারী গোষ্ঠী এবং অমালারাই ছিল দেশের সর্বময় কর্তা। ইহারাই পাকিস্তানকে মার্কিন সামরিক জোটে ভর্তি করে। সেনাবাহিনী প্রধান আইউব খান এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তানে গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করেন।

বাঙ্গালী-গণমন তখন তিক্ততার চরমে উঠে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ বাংলাদেশে বিলম্বিত সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে। ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে নির্বাচন যুদ্ধে জয়লাভ কঠিন বিবেচনা করিয়া সরকারবিরোধী শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। ইতিমধ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-শ্রমিক পার্টি নামে একটি নূতন রাজনীতিক দল গঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত ছাত্র তরুণ এবং প্রগতিবাদীদের দাবীতে একটি সম্মিলিত ঐক্যজোট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাহাদের দাবীর ফলেই যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হয় ১৯৫৩ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর। যুক্তফ্রণ্টের নির্বাচন প্রতীক ছিল নৌকা ও ম্যানি-ফেষ্টো ছিল ঐতিহাসিক ২১-দফা। একুশ দফাতে তৎকালীন পূর্ব বাংলার সমগ্র নির্যাতিত এবং বিভিন্ন সংগ্রামী ও মধ্যশ্রেণীর অধিকার ও প্রয়োজন সংক্রান্ত দাবীকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল।

একুশ দফার প্রধান দাবীগুলি ছিল নিম্নরূপ:

১। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র দফতর এবং মুদ্রা ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয় প্রাদেশিক দায়িত্বে অর্পণ।

২। সেনাবাহিনীর পরিচালকমণ্ডলী এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতর করাচী হইতে পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরিত করণ এবং পূর্ববাংলায় অস্ত্র কারখানা স্থাপন প্রভৃতি।

৩। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসারণ।

৪। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী স্বত্বের উচ্ছেদ। বাড়তি জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন, খাজনার পরিমাণ হ্রাস, সার্টিফিকেট প্রথা রহিতকরণ ইত্যাদি।

৫। কৃষি সমবায় স্থাপন। জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করণ এবং খাদ্য সমস্যার সমাধান।

৬। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, পাটচাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান। ফটকা বাজারী বন্ধকরণ।

৭। পূর্ব বাংলার শিল্পায়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থার উন্নতি-সাধন।

৮। দুর্নীতি উচ্ছেদ।

৯। প্রশাসনযন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ। মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান। নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ। মোহাজের সমস্যার সমাধান।

১০। উচ্চপদস্থ এবং নিম্নসরকারী কর্মচারীদের বেতনের পুনর্বিন্যাস এবং তারতম্য হ্রাস।

১১। মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার অনূর্ধ্বে ধার্য করা।

১২। শ্রমিকদের অর্থনীতিক এবং সামাজিক অধিকার সমূহের নিশ্চয়তা বিধান।

একুশ দফা ছিল প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তিসনদ। প্রধানতঃ স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর ভিত্তিতেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন সহ সকল প্রাদেশিক মন্ত্রী এই নির্বাচনে পরাজিত হন। বাঙ্গালীর স্বাধিকার অর্জনের ইতিহাসে এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এই নির্বাচনেই পূর্ববঙ্গের জনগণ বাঙ্গালী হিসাবে আপন অস্তিত্বের প্রবল স্বাক্ষর উপস্থিত করিল। পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ৩০৯টির মধ্যে মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি। যুক্তফ্রণ্টের এই ঐতিহাসিক বিজয়কে দেশবিদেশে 'ব্যালট বাক্সে বিপ্লব' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের অভূতপূর্ব বিজয়কে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও আমলারা সহজে গ্রহণ করিতে পারে নাই। গণতন্ত্রের বিজয়ে তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের যোগসাজোশ ও গোপন অর্থ সাহায্যে বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চলে—আদমজী নগর, চন্দ্রঘোণায়—বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাধাইয়া নূতন মন্ত্রীসভাকে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা হইল। ইহা ছাড়া মুসলিম লীগ নেতারা এক

নূতন অজুহাত পাইল। তাহারা যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের কলিকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতার অপব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যহীন প্রমাণ করিবার প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববংগে ৯২-ক ধারা প্রবর্ত্তন করে। স্বৈরাতন্ত্রের প্রতীক কেন্দ্রীয় দেশরক্ষাসচিব ইস্কান্দার মীর্জা নূতন গভর্ণর হইয়া আসেন। পূর্ব বাংলায় আসিয়াই তিনি এখানকার রাজনীতিজ্ঞদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার শুরু করেন। মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য ও আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিব সহ বহু রাজনীতিক নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হন। স্বয়ং হক সাহেব নিজ ভবনে নজরবন্দী হইলেন। নির্বাচকমণ্ডলীর রায়কে এইভাবে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবে পূর্ববাংলার গণমনে একটু হুতাশা দেখা দেয়। এই ঘটনার অল্পদিনের মধ্যেই স্বৈরাচারী গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৫ সনের ২৫শে অক্টোবর গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাঁহার এই কাজ যে নেহায়েৎ অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হইয়াছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া গণপরিষদের সভাপতি মৌলভী তমিজউদ্দিন খান পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এই সময় ফেডারেল কোর্ট গভর্ণর জেনারেলকে নূতন গণপরিষদ গঠন করিয়া দেশের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য রুলিং প্রদান করেন।

অতঃপর বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তানে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে গভর্ণর জেনারেলের অনুরোধক্রমে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান দেশরক্ষা মন্ত্রী হন। এই মন্ত্রীসভার অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইস্কান্দার মীর্জা ও ডাঃ খান সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। এই মন্ত্রীসভাকে **Ministry of talents** বা গুণীদের মন্ত্রীসভা নাম দেওয়া হয়। সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীত্ব গ্রহণকে পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ অনুমোদন দিতে পারে নাই। তাহারা মনে করিল সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় যোগদান করা উচিত হয় নাই।

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য যেন গড়িয়া উঠে সেই জন্য বাঙ্গালীরা সর্বদা নিজেদের অধিকার ও প্রয়োজনবোধে স্বার্থত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ১৯৫৫ সনে পূর্ব বাংলাবাসীরা রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে তাহাদের

সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার ত্যাগ করিয়া জাতীয় পরিষদে উভয় অঞ্চলের সংখ্যা সাম্যনীতি গ্রহণ করে। এই সময় মারীতে নূতন সংবিধান প্রণয়নের জন্য এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য বাঙালীরা ঔদার্যের সঙ্গে সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করে। প্রতিদানে তাহারা আশা করিয়াছিল সারা দেশের চাকুরী-বাকরী, শিল্পবাণিজ্য, সেনাবাহিনী, স্বায়ত্ত্বশাসন প্রভৃতি বিষয় ছাড়াও সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। সংবিধানের ফর্মুলা লইয়া এই মীমাংসা হয়। কিন্তু এই সময় ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে লইয়া অগণতান্ত্রিক এক ইউনিট প্রথা চালু হয়।

ইতিমধ্যে মারীতে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এক বৈঠকে মিলিত হন। ইহাই দ্বিতীয় গণপরিষদের বৈঠক। এই বৈঠকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে আপোষ মীমাংসা হয়:

১। সারা পাকিস্তানে দুইটি প্রদেশ গঠন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা প্রবর্তন।

২। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন প্রবর্তন।

৩। দুই প্রদেশে সকল বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ।

৪। যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু করণ।

৫। বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দান।

কিন্তু সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক চক্রের ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চলিতে থাকার ফলে নেতৃত্বের পরিবর্তন হইল দ্রুত। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে বিদায় নিলেন। ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিকদলের সহায়তায় ও সমর্থনে আমলা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী নূতন প্রধানমন্ত্রী হইলেন। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রণ্টে ভাঙ্গন দেখা দেয়। যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতাদের সক্রিয় হাত ছিল। ফজলুল হক এইবার কোয়ালিশন সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হইলেন। এই কোয়ালিশন সরকার ১৯৫৬ সনে সংখ্যাসাম্য নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনা করে। এই সংবিধানে পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান হইল এবং সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইল কেন্দ্রে। স্বায়ত্তশাসন ও যুক্ত নির্বাচনের দাবী অগ্রাহ্য করা হইল। পাকিস্তান ইসলামিক রিপাবলিক নামে পরিচিত হইল। নূতন সংবিধানে সামরিক বাহিনীর সমর্থনে আমলারা

গভর্ণর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন। গণতন্ত্রের প্রতি প্রেসিডেণ্ট মির্যার কোন শ্রদ্ধা ছিল না। পাকিস্তানে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হউক ইহা মির্যার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি গণতন্ত্রের বিকাশকে ব্যাহত করিবার সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্রের পুরোভাগে ছিলেন।

ইতিপূর্বেই যুক্তফ্রণ্ট ভাঙ্গিয়া যায়। ফজলুল হকের সঙ্গে রাজনীতিক আতাতের ফলে অগণতান্ত্রিকভাবে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যুক্তফ্রণ্টের ক্ষুদ্র অঙ্গদলের নেতা হক সমর্থিত আবু হুসেন সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে দিয়া একটি মারাত্মক ভুল করেন। পরিষদে জনাব সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা আঁকড়াইয়া তিনি ১৬ মাস মন্ত্রীত্ব পরিচালনা করিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করেন। দেশে তখন দারুন খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। সরকার পক্ষীয় লোকদের দুর্নীতিতে অবস্থার অবনতি ঘটে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পরিস্থিতি গুরুতর বিবেচনা করিয়া শেষ পর্যন্ত আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬, গভর্ণর ফজলুল হক আতাউর রহমান খানকে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব দেন। আবু হোসেন মন্ত্রিত্ব পতনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। সেই জন্য ৫-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটি কোয়ালিশন গঠিত হয়। এই ঘটনার মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা রদবদল হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁহার অঙ্গদল হিসাবে কোয়ালিশনে যোগদান করে সীমান্ত প্রদেশের ডাঃ খান সাহেবের রিপাবলিকান পার্টি। এই দলের অধিকাংশ নেতাই মুসলিম লীগের প্রাক্তন সদস্য। প্রধানমন্ত্রী হইবার পর সোহরাওয়ার্দী তিনটি বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দেন। দেশে সাধারণ নির্বাচন, অর্থনীতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সুসম ব্যবহার এবং বিদেশে পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি। আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। তাই ক্ষমতাসীন হইয়া তাহারা দেশে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন এবং ১৯৫৬ সনের সংবিধান অনুসারে দেশে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই মন্ত্রিসভা মাত্র ১৩ মাস ক্ষমতায় ছিল। অবশ্য এই অল্পদিনের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী সারাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালান। তাঁহার অসাধারণ

ব্যক্তিত্ব, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মক্ষমতার বলে তিনি পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁহার বৈদেশিক নীতির ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এশিয়ায় পাকিস্তানের বন্ধু সৃষ্টির প্রয়াসে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের আমন্ত্রণে সেই দেশ সফর করেন এবং চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে পাকিস্তান সফরে আমন্ত্রণ করিয়া দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা করেন। কিন্তু তাঁহার মার্কিন ঘেষানীতির জন্য মিসরের প্রেসিডেণ্ট নাসের কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণকে তিনি সমর্থন দিতে ব্যর্থ হন। ফলে আরব বিশ্বে পাকিস্তানের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী বিশ্বজনমতকে পাকিস্তানের অনুকূলে আনিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সেই জন্য সোহরাওয়ার্দী দেশে বিদেশে পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম প্রধানমন্ত্রীরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সেতুবন্ধ, সংযোগ ও সংহতির প্রতীক। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল মহল প্রথম হইতেই সোহরাওয়ার্দীর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ও উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখে। এই স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ী ও আমলারা প্রেসিডেণ্ট মির্যার শরণাপন্ন হয় এবং তাহার সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

এই সময় বৈদেশিক নীতি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও ২১ দফার বাস্তবায়ন প্রভৃতি প্রশ্নে আওয়ামী লীগের দুই প্রধান নেতা সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে মতবিরোধ চরমে উঠে। মওলানা বিভিন্ন সভাসমিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নীতি ও কার্যক্রমের কঠোর সমালোচনা করিতে থাকেন। ভাসানী পাক-মার্কিন জোটের বিরোধী। পশ্চিম পাকিস্তানী কোন কোন নেতা আওয়ামী লীগ অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়া ভাসানীকে সমর্থন করে। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট মির্যার এই বিষয়ে যথেষ্ট হাত ছিল। ১৯৫৭ সনের প্রথম দিকে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর বিশেষতঃ বৈদেশিক নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাঁহার বিরোধিতা সত্ত্বেও কাউন্সিল অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব ও নীতির প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করা হয়। যথাসময়ে প্রধানমন্ত্রীর বৈদেশিক নীতি জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বৈদেশিক সম্পর্ক ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে

ভাসানীপন্থী ও আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী অনুসারীদের মধ্যে বিরোধের পরিণতিতেই ভাসানী আওয়ামী লীগের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ১৯৫৭ সনের জুলাই মাসে তিনি 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' নামে নূতন পার্টি গঠন করেন। 'ন্যাপ' গঠনে প্রেসিডেন্ট মির্যার হাত ছিল বলিয়া অনেকে সন্দেহ করে। এই দল স্বায়ত্ব শাসনের দাবীতে অটল থাকে। কেবলমাত্র বৈদেশিক দপ্তর, দেশরক্ষা এবং মুদ্রা—এই তিনটি বিষয় ছাড়া বাকী বিষয়গুলি প্রদেশের নিকট হস্তান্তরের দাবী করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ সমন্বয়ে গঠিত এক ইউনিট গঠনের বিরোধিতা করে। ন্যাপ পাকিস্তানের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণের জন্য জোর দাবী করে।

ভাসানীর আওয়ামী লীগ ত্যাগের পর এই দল কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সময় এক ইউনিট প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী মারাত্মক ভুল করেন। তিনি মির্যার কারসাজী বুঝিতে পারেন নাই। দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করিয়াই উহার সমর্থনে তাঁহার দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেন। ফলে প্রেসিডেন্টের ইঙ্গিতে রিপাবলিকান পার্টি এক ইউনিট প্রশ্নে সোহরা-ওয়ার্দীর প্রতি তাহাদের দলীয় সমর্থন প্রত্যাহার করে। সোহরাওয়ার্দী পার্লামেন্টে তাহার বক্তব্য পেশ করিতে চাহিলেন। কিন্তু মির্যা তাহাকে সেই সুযোগটি পর্যন্ত দিলেন না। প্রেসিডেন্টের অভিপ্রায় অনুসারে ১৯৫৭ সনের ১১ই অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করেন। অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মির্যা সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দেন। সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। মির্যা ইতিপূর্বে রিপাবলিকান ও মুসলিম লীগের মধ্যে আপোষ করাইয়া আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভার পতনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সোহরাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তাকে সহ্য করিতে পারেন নাই। নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প মির্যার আদৌও মনপুত ছিল না। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, নির্বাচনের পর তাঁহার প্রেসিডেন্ট হইবার সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল নহে কারণ আওয়ামী লীগ এই ব্যাপারে কোন আশ্বাস দেয় নাই। তখন তিনি সুকৌশলে নানা ওজর আপত্তি তুলিয়া নির্বাচনকে নস্যাৎ করিবার চেষ্টা চালান। মির্যা ছিলেন মনে প্রাণে আমলা। নেহায়েৎ ভাগ্যগুণে অগণতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়া তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়াছিলেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ছিল তাহার ক্ষমতারোহণের প্রধান অবলম্বন।

এই দিকে পূর্ব পাকিস্তানে তখন আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন। কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দীর সরকার যতদিন ক্ষমতায় ছিল প্রদেশে আতাউর রহমান খানের পক্ষে প্রশাসন চালান এবং এই অঞ্চলের দাবী দাওয়া আদায় ব্যাপারে অনেক সুবিধা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সহযোগিতায় বিদেশ হইতে খাদ্য সামগ্রি আনাইয়া জরুরী ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ক্ষমতাসীন হইয়া প্রাদেশিক সরকার ২১ দফা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি, নিরাপত্তা আইন এবং বিবিধ প্রতিক্রিয়াশীল কালাকানুন বাতিল করা হয়। পাকিস্তানে যাহাতে পূর্ণ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেইদিকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। প্রদেশে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। উপনির্বাচন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। এই উপনির্বাচনগুলিতে মাত্র একটি ছাড়া বাকী সবগুলিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। নির্বাচন যাহাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। সরকারী কর্মচারীদের রাজনীতিমুক্ত রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে সংসদের অধিবেশন ডাকা, বাজেট অনুমোদন ছাড়া খরচ না করা প্রভৃতি বিষয়ে আদর্শ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় রাখে। তাহা ছাড়া পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিতে থাকে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান যাহাতে তাহার ন্যায্য অধিকার পায় সেই দিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল। গঠনমূলক ক্ষেত্রে এই মন্ত্রীসভা যথেষ্ট অবদান রাখে এবং উন্নয়নমূলক নানা প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা পতনের প্রতিক্রিয়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতেও দেখা দেয়। এইখানে নাটকীয় পরিবর্তনের সূচনা হয়। আতাউর রহমান খান তখন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। গভর্ণর ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। যুক্তফ্রণ্ট ভাঙ্গনের পর হইতে আওয়ামী লীগের সহিত হক সাহেবের সম্পর্ক সৌহার্দাপূর্ণ ছিল না। এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাদের চক্রান্ত অনেকটা দায়ী। ইহাদের চক্রান্তে পূর্ব বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের মধ্যে অন্তঃকলহ দেখা দেয়। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান ও দলের শক্তিশালী সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে দলের নেতৃত্ব লইয়া বিরোধ স্পষ্ট হয়। এই সুযোগে পরিষদে জনাব আতাউর

রহমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই এই অজুহাতে হক সাহেব তাহার মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করেন এবং নিজ দলীয় আবু হুসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত রিপাবলিকান পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তাহারা হক সাহেবকে গভর্ণর পদ হইতে অপসারণ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী আবু হুসেন সরকারকেও বরখাস্ত করে। অতঃপর আওয়ামী লীগের পরামর্শক্রমে সুলতান উদ্দিন আহমদকে গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। জনাব আতাউর রহমান পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা নূতন সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। এই সময় প্রদেশে চোরা চালানী বন্ধ অভিযানকে কেন্দ্র করিয়া আতাউর রহমানের সঙ্গে হিন্দু সদস্যদের মতানৈক্য হয়। তাহারা আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বিরূপ হন। সরকার এবং বিরোধী-দলের রেষারেষি চরম পর্যায়ে পৌঁছে। প্রেসিডেণ্ট মির্যা গোপনে কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে সমর্থন করে। ফলে আবু হুসেন সরকার ও আতাউর রহমান খানের মধ্যে মন্ত্রীত্বের সংগ্রাম চরম আকার ধারণ করে। প্রদেশে ঘন ঘন মন্ত্রীসভার উত্থান ও পতন হয়। প্রশাসন ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতাহানী ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে।

প্রদেশের এই রাজনীতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া মির্যা পূর্ব বাংলায় প্রেসিডেণ্টের শাসন জারী করেন। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখিয়া দুই মাসের মধ্যে তিনি প্রেসিডেণ্টের শাসন তুলিয়া নেন। আতাউর রহমান খান পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন করেন। মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াই তিনি আইন পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। কৃষক-শ্রমিক দলভুক্ত স্পীকার আবদুল হাকিমের প্রতি আওয়ামী লীগের আস্থা ছিল না। ফলে স্পীকারের সঙ্গে তাহাদের প্রত্যক্ষ সংঘাত শুরু হওয়ায় তাহারা ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে স্পীকার নিযুক্ত করিয়া পরিষদের কাজ শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদল পরিষদে হট্টগোল আরম্ভ করে। উভয়পক্ষে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলীয় সদস্যরা ডেপুটি স্পীকারকে লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ধরনের কঠিন বস্তু নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বাধাদানের চেষ্টা করে। তাহাদের আক্রমণে শাহেদ আলী গুরুতরভাবে আহত হন। পরদিন হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গণতন্ত্রবিরোধী অশুভ শক্তিগুলি মির্যার নেতৃত্বে শক্তিসঞ্চয় করে।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা পতনের পর কেন্দ্রে স্বল্পকালের জন্য মুসলিম লীগ নেতা আই. আই. চুন্দ্রীগড় মন্ত্রীসভা গঠন করে। অতঃপর সোহ-রাওয়ার্দী যুক্ত নির্বাচন প্রথা বহাল এবং অনতিকালের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান-এই দুই শর্তে কেন্দ্রে রিপাবলিকান মন্ত্রীসভা গঠনে সমর্থন দেয়। এই মন্ত্রীসভা তাহাদের ওয়াদা অনুযায়ী ১৯৫৯ সনে ১৫ই ফেব্রুয়ারী দেশে সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করে। এইদিকে প্রেসিডেণ্ট মির্যা আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান দলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির জন্য তৎপর হইলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনকে নির্দেশ দিলেন আওয়ামী লীগকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদান করিতে হইবে। কিন্তু দফতর বণ্টন লইয়া উভয় দলের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ দফতর বণ্টনে বিশেষ সুবিধা করিতে না পাবায় মন্ত্রীসভা হইতে ইস্তাফা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশে মন্ত্রীত্ব সঙ্কট, আগামী সাধারণ নির্বাচন ও গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করিয়া তাহারা নুন মন্ত্রীসভাকে সমর্থন দিতে রাজী হইল। এই ঘটনার মাত্র পনর দিনের মধ্যেই পাকিস্তানে গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়। ডেপুটি স্পীকারের মৃত্যুতে পাকিস্তানী আমলা এবং সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের অজুহাত পায়। সেই অজুহাতে ৮ই অক্টোবর প্রেসিডেণ্ট মির্যা প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খানকে দেশে আইন ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রধান সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্র ও মন্ত্রীপরিষদ বাতিল এবং রাজনীতিক দলগুলির বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। তৎসঙ্গে শুরু হইল দীর্ঘ দশ বৎসরের স্বৈরাচারী শাসন। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিক দলগুলির অনৈক্যতা, দুর্নীতি ও তাহাদের প্রশাসনিক ব্যর্থতা জনগণকে হতাশ করিয়াছিল। দেশের রাজনীতিক সঙ্কট ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে দেশকে রক্ষা ও অরাজকতার অবসানের নামে নির্বাচনকে বানচাল করিবার ফন্দি হিসাবে ছিল সামরিক আইন জারী।

সামরিক সরকার পাকিস্তানকে তিন এলাকায় ভাগ করে—ক, খ ও গ জোন। পূর্ব পাকিস্তান হইল 'গ' এলাকা এবং এই অঞ্চলের সামরিক আইন পরিচালক নিযুক্ত হইলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল ওমরাও খান। প্রাদেশিক গভর্ণর সুলতানউদ্দিনের স্থলে নূতন গভর্ণর হইলেন পূর্ব বাংলার প্রাক্তন পুলিশ প্রধান জাকির হোসেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর জাকির হোসেন রাজনীতি করিবার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানের নিকট নির্বাচনের নমিনেশনের পদপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু আতাউর রহমান খান তাহাকে এই ব্যাপারে কোন সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে রাযী হন নাই। সেই জাকির হোসেন এখন গভর্ণর। তিনি রাজনীতিক নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন এবং সর্বত্র ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। শেখ মুজিব, আবুল মনসুর আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী সহ বহু নেতা, প্রশাসক ও পরিষদ সদস্যকে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়।

এই ঘটনার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট মির্যার ভাগ্য বিপর্যয় হয়। বহু উচ্চাশা করিয়া তিনি নির্বাচন বানচাল করিবার জন্য নিজের একান্ত বিশ্বস্ত সহচর সেনাপতি আইয়ুব খানকে দেশে গণতন্ত্র হত্যার কাজে গোপন ষড়যন্ত্র ও উৎসাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস সেই মির্যাকে মাত্র ২১ দিনের ব্যবধানে সমস্ত ক্ষমতাচ্যুত হইয়া দেশত্যাগ করিতে হইল। ২৭শে অক্টোবর আইয়ুব খান পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই সঙ্গে আরও ঘোষণা করা হয় তিনি প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসাবে বহাল থাকিবেন। ইহাকে আইয়ুব খান অক্টোবর বিপ্লব বলিয়া প্রচার করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৯৫৮-৬৮ সনকে দ্বিতীয় পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ক্ষমতা দখলের পরও স্বঘোষিত বিপ্লবের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার জন্য আইয়ুব খান উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। তিনি রাজনীতিক নেতাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেন এবং তাহাদের অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনয়ন করেন। সস্তা জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন লাভের জন্য তিনি কয়েকটি বিষয়ে নূতন পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেন :

১। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দোকানদার-ব্যবসায়ীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক করিবার ব্যবস্থা করেন।

২। দুর্নীতি দমনের নামে মারপিট ও গ্রেফতার করেন। এই উদ্দেশ্যে আইন জারী করিয়া প্রশাসনিক ও ব্যবসাক্ষেত্রে কিছু রদবদল করেন।

৩। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইলে তিনি সেনাবাহিনীতে ফিরিয়া যাইবেন এবং গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

জনগণ আইয়ুব খানের কার্যকলাপে ও প্রতিশ্রুতিতে সহজে বিশ্বাস করে ও তাঁহাকে সত্যিকার জনদরদী শাসক মনে করিয়া তাহার প্রতি আস্থা স্থাপন করে এবং এই বিপ্লবকে অভিনন্দন জানায়। পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম অবস্থায় তিনি কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন।

আইয়ুব খান সুচতুর রাজনীতিবিদ ছিলেন। ক্ষমতাসীন হইয়া তিনি ধীর পদক্ষেপে নিজ অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রথমে জনগণের কিছু আস্থা অর্জন করিয়া রাজনীতিক দলগুলির প্রতি আক্রমন চালান। তাহাদের কার্যকলাপ ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া ১৯৫৯ সনের ৭ই আগষ্ট দুইটি আদেশ জারী করেন:—(১) পোডো —(**Public Office Disqualification Order**) ও (২) এবডো—(**Elective Bodies Disqualification Order**)। এই আইন দুইটির শিকার হন দেশের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ। ইহার অল্পদিন পরেই ১৯৫৯ সনের ২৭শে অক্টোবর তাহার বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার নিজস্ব চিন্তাধারা ও বহুদিনের উদ্ভাবিত পরিকল্পনা পেশ করেন, যাহা মৌলিক গণতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। তিনি প্রচার করিতে থাকেন যে স্বল্প শিক্ষিত পাকিস্তানীদের জন্য পাশ্চাত্য সংসদীয় গণতন্ত্র অনুপযোগী। সেইজন্য তাহার পরিকল্পিত গণতন্ত্র সর্ব সাধারণের জন্য উপযোগী এবং ইহাতে জনগণ সহজে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। দুই অঞ্চলের জন্য ৪০,০০০ করিয়া মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হইবে। এই নির্বাচিত গণতন্ত্রীরা পুনরায় প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত করিবেন। অতঃপর ১৯৬০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বপ্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থাসূচক ভোটে তিনি পাকিস্তানের 'প্রথম নির্বাচিত' প্রেসিডেন্ট হইলেন। প্রেসিডেন্ট হইয়া আইয়ুব খান দেশের নানা সমস্যা দূর করিবার জন্য কয়েকটি কমিশন গঠন করেন। ইহাদের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক কমিশন, শিক্ষা, ভূমি সংস্কার এবং মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক আইন সংক্রান্ত কমিশন প্রধান। ভূমিরাজস্ব ও মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক বিষয় সংক্রান্ত সংস্কারে তাহার প্রগতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে নূতন শাসনতন্ত্র ও প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি, গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা ও অগণতান্ত্রিক মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে।

আইয়ুব খানের আসল উদ্দেশ্য ক্রমশঃ জনগণের নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে। ১৯৬১ সনে তিনি পূর্ব বাংলা সফর করেন। উদ্দেশ্য ছিল নূতন শাসন পদ্ধতির প্রতি পূর্ব বাংলার জনসাধারণের কি প্রতিক্রিয়া তাহা লক্ষ্য করা। ঢাকায় পদার্পণ করিয়া তিনি পূর্ব বাংলার সমস্যাবলীর ও অর্থনীতিক বৈষম্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তাহা প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেন। পূর্ব বাংলার এই সময় গভর্ণর ছিলেন জেনারেল আজম খান। তিনি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এই অঞ্চলের সমস্যা ও জনসাধারণের প্রতি তাহার আন্তরিকতা ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং জনগণের আস্থা, প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আইয়ুবের মত চতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না।

১৯৬১ সনের শেষের দিকে পূর্ব বাংলার সর্বপ্রথম সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যদিও তখন রাজনীতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৬২ সনের ২৪শে জানুয়ারীতে সোহরাওয়ার্দী ও বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দরা জনাব আতাউর রহমানের বাসভবনে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতে তাহাদের কর্মপন্থা লইয়া আলোচনা করেন। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের জন্য দলনির্বিশেষে সকলে এক আদর্শের ভিত্তিতে গণঐক্য ও গণ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ঘটনার মাত্র এক সপ্তাহ পরেই সোহরাওয়ার্দীকে করাচীতে নিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়। সোহরাওয়াদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইল তিনি বিদেশী অর্থানুকূল্যে দেশকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আইয়ুব খান তখন ঢাকা সফরে আসেন। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারকে কেন্দ্র করিয়া সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলায় আইয়ুব খান বিরোধী গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ছাত্র-জনসাধারণ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল। আইয়ুব খান তখন জননিরাপত্তা অর্ডিনেন্সের বলে অধিকাংশ নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টা করেন। যাহারা এই দমননীতির শিকার হইয়াছিলেন তাহারা হইলেন শেখ মুজিবর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), কফিলউদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদ ও কোরবান আলী প্রমুখ।

১৯৬২ সনের মার্চ মাসে আইয়ুব খান তাঁহার পরিকল্পিত শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। ইহা এক ব্যক্তির দেওয়া শাসনতন্ত্র। সুতরাং জনগণের উল্লেখ অবান্তর। এই শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল: সমস্ত ক্ষমতা

কেন্দ্রীভূত। দেশের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেণ্ট। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রে ও প্রদেশে পরিষদ থাকিবে। তাহাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। এই শাসনতন্ত্রে জনগণের প্রতি পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ পায়। জনগণের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের কোন অধিকার নাই। তথা-কথিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করিবে। এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা ছিল দেশে আইয়ুব খানের দুর্নীতির দোসর এবং ইহাদের মাধ্যমে তিনি দেশে নির্বাচনরূপ প্রহসন করিয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বিচার বিভাগের ক্ষমতাও খর্ব করা হয় এই শাসনতন্ত্রে। ইহা ছাড়া সেনাবাহিনীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার জন্য দেশের রাজধানী সামরিক বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি রাওয়ালপিণ্ডির সন্নিকটস্থ ইসলামাবাদে গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব বাংলার জনসাধারণ একনায়ক আইয়ুবের অগণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত শাসনতন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থানান্তর সহজে মানিয়া নিতে রাযী হইল না। শুরু হইল ছাত্র আন্দোলন ও ধর্মঘট। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তিন দফা দাবীর ভিত্তিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। এই আন্দোলনের দাবীগুলি ছিল নিম্নরূপ:

১। নূতন শাসনতন্ত্র বাতিল করিতে হইবে।
২। দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।
৩। সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে।

দেশের এইরূপ উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি থাকা সত্বেও আইয়ুব খান ২৮শে এপ্রিল ১৯৬২, পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করিলেন। নির্বাচনের একদিন পূর্বে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগে তিনি নাকি প্রতি মুহূর্তে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "আল্লাহ, যেই দেশে আমার ভোট নাই, সেই দেশে বাঁচার ইচ্ছা আমার নাই। আমাকে তুমি তুলিয়া নাও।" তাহার মৃত্যু বাংলার রাজনীতিক শূন্যতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী। তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের রাজ-নীতিক ইতিহাসের একটি মহাযুগের অবসান ঘটিল, যাহার বিস্তৃতি ছিল শতাব্দী ব্যাপী।

যাহা হউক আইয়ুব খানের এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে দেশের প্রগতিশীল রাজনীতিক দলগুলি নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে প্রতিক্রিয়া ও মুসলিম লীগ পন্থী যাহারা আইয়ুব খানের সামরিক বিপ্লবকে অভিনন্দন ও সমর্থন দিয়াছিল তাহারা সহজেই নির্বাচিত হইল। ইহাদের মধ্যে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, হাবিবুর রহমান, খান আবদুস সবুর, ফজলুল কাদির চৌধুরী, আবদুল মোনেম খান ও ওয়াহিদুজ্জামান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা পরবর্তীকালে আইয়ুব খানের মন্ত্রীসভার সদস্য হন। নির্বাচনের কিছুদিন পরই ১৯৬২ সনের ৮ই জুন আইয়ুব সামরিক শাসন রহিত ঘোষণা করিলেন। ঐ দিনই জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতি শপথ গ্রহণ করেন। এই সময় প্রেসিডেণ্ট এক নূতন অর্ডিনেন্স জারী করেন। তাহাতে বলা হয় যে, আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত দেশে রাজনীতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকিবে। দেশে ইসলামের আদর্শ ও পাকিস্তানের স্বার্থ ও সংহতি বিরোধী কোন রাজনীতিক দল থাকিবে না। ইহা ছাড়া 'এবডো' ও 'প্রডো' আইনে অযোগ্য ঘোষিত রাজনীতিজ্ঞরা কোন দল গঠন করিতে পারিবেন না।

দেশের এই রাজনীতিক সঙ্কটের মধ্যে পূর্ব বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ২৫শে জুন, ১৯৬২, সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। তাহাতে বলা হয়, এক ব্যক্তি প্রদত্ত (আইয়ুব খান) শাসনতন্ত্র গ্রহণযোগ্য নয় এবং গণপ্রতিনিধি কর্তৃক একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য প্রস্তাব করা হয়। এই বিবৃতি 'নয় নেতার বিবৃতি' নামে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই বিবৃতি ছিল তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিধ্বনি, তাহাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গঠনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা। সারা পূর্ববাংলায় এই বিবৃতি অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এই বিবৃতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন বাণী পাঠান হয়। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ইহার তীব্র সমালোচনা করে। গণস্বার্থবিরোধী পত্রিকা 'ডন' ও 'মর্নিং নিউজ' তাহাদের সম্পাদকীয়তে এই বিবৃতির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা আরম্ভ করে। সরকারী মহলে ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সরকারের প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ ৮ তারিখের বিবৃতির সমর্থনে ঢাকায় পল্টন ময়দানে এক জনসভা করেন। সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সমর্থন করে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন করাচীর কারাগারে। তিনি নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ইহার কিছুদিন পরেই সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পাইয়া ঢাকা আসেন। বিমান বন্দরে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি নয় নেতার সামিল, আমার নম্বর দশ।" তাঁহার আগমনে পূর্ব বাংলায় সর্বত্র গনমনে বিপুল সাড়া জাগে। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে জনসভায় তিনি সংঘবদ্ধ সংগ্রামের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৯৬২ সনের সেপ্টেম্বরে ছাত্ররা গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবীতে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং রিপোর্ট বাতিলসহ অন্যান্য কয়েকটি গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে আন্দোলন ও বিক্ষোভ মিছিল করে। ছাত্রদের এই প্রবল আন্দোলনের মুখে সেইদিন আইয়ুব খানের তখ্‌ত কাঁপিয়া উঠে। বাংলাদেশে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ইহাই প্রথম সফল গণঅভ্যুত্থান। ইতিমধ্যে আইয়ুব খান 'পলিটিক্যাল পার্টিজ অ্যাক্ট' নামে একটা আইন পাশ করেন। তাহাতে রাজনীতিক দলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুণরুজ্জীবিত হয়। এই আইনের আসল উদ্দেশ্য ছিল গণঐক্য ধ্বংস করা ও দল গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি করা।

স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খান 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ' বা কনভেনশন লীগ' নামে নূতন দল গঠন করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এই সময় সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে দল পুনরুজ্জীবনের বিরুদ্ধে একমত হয়; একটি দলহীন ঐক্য গঠনের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। কারণ, তাঁহারা অনেকেই আইয়ুবের কারসাজী বুঝিয়াছিলেন যে, পার্টি পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পার্টি চেতনা এবং রাজনীতিক রেষারেষি ও দলীয় কোন্দলের ফলে গণঐক্যে ফাঁটল দেখা দিবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ পূর্ব বাংলার মত রাজনীতিক চেতনা সম্পন্ন না হওয়ায় সেইখানে পার্টি পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে নেতৃবৃন্দ একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য 'রিভাইভাল' এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 'ননরিভাইভ্যাল' নীতি গ্রহণ করেন। সেখানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাত-ই-ইসলাম ও নেযামে-ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সময় সোহরাওয়ার্দী জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠন করেন। যাহার উদ্দেশ্য ছিল গণঐক্যের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জনস্বার্থ রক্ষা এবং

জাতীয় স্বার্থ সুদৃঢ় করা ইত্যাদি। ফ্রণ্টের প্রধান দাবী ছিল ১৯৫৬ সনের সংবিধানকে পুনর্বহাল করিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা সোহরাওয়ার্দীর সহিত আলাপ-আলোচনার পর জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে যোগদানেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের স্বপক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দী অক্টোবর মাসে ঢাকায় আসেন। ঢাকার পল্টন ময়দানে নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দান করেন। অতঃপর তিনি, শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান ও অন্যান্য নেতারা ফ্রণ্টের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করিয়া জনমনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগান। মওলানা ভাসানী এই সময় জেল হইতে মুক্তি পায়। প্রথমে তিনি **N. D. F.** কে স্বাগতম জানান। কিন্তু পরে **N.D.F.** এর বিরোধিতা শুরু করেন। পূর্ব বাংলার ভাগ্যাকাশে এই সময় দুষ্টগ্রহের মত আবির্ভূত হন আবদুল মোনেম খান। পূর্ব বাংলার দেশবরেণ্য প্রগতিবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়া তিনি আইয়ুবের প্রিয়পাত্র হন। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানী আজম খানের মত জনপ্রিয় গভর্ণরও মোনেম সবুর চক্রান্তেব শিকার হইয়া ১৯৬২ সনে মে মাসে বিদায় নিতে বাধ্য হন। আইয়ুব খান তাহাকে (মোনেম খানকে) প্রথমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও পরে গভর্ণব নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ সাতটি বৎসর এই ব্যক্তিব শাসনকালে পূর্ব বাংলার সকল প্রকার প্রগতিশীল রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিক আন্দোলনকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। জনগণের ন্যায্য অধিকাব ও দাবীকে দৃঢ়পদক্ষেপে পদদলিত করেন। বাংলার ইতিহাসে তিনি এক ধিকৃত ব্যক্তিত্ব।

ইতিমধ্যে সোহরাওয়ার্দী হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য যুরিখ ও বৈরুতে গমন করেন। কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য তিনি আর জীবিত অবস্থায় দেশে ফিরিয়া আসেন নাই। ১৯৬৩ সনের ৫ই ডিসেম্বর বৈরুতে এক হোটেল কক্ষে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী বাংলার এই নির্ভীক মহান জননেতার জীবনাবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের রাজনীতিক স্বাধিকার অর্জনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তাহার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে গণঐক্যে ফাটল ধরে, ফলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট দুর্বল ও ঐক্যবিহীন হইয়া পড়ে। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমে আওয়ামী লীগ এবং পরে ন্যাশনাল

আওয়ামী পার্টি পুনরুজ্জীবিত হয়। পার্টি পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের দুই প্রবীন নেতা আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমদের সহিত শেখ মুজিবের মতানৈক্য হয়। তাঁহারা এই সময় পার্টি পুনরুজ্জীবন সমর্থন করেন নাই। উভয়ই এন. ডি. এফ. এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন। যাহা হউক, ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী মাসে মওলানা তর্কবাগিশের সভাপতিত্বে শেখ মুজিবের বাস ভবনে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পার্টি পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওয়ার্কিং কমিটি আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক দাবী প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করে, যেমন: (১) দেশে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন; (২) আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব; (৩) পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করা; (৪) পাকিস্তানের নৌবাহিনীর সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা; (৫) রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি। কিন্তু পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগ জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বরং এন. ডি. এফ. এর একটি অঙ্গদল হিসাবে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল।

১৯৬৪ সন নির্বাচন প্রস্তুতির বৎসর। কারণ ১৯৬৫ সনে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন হইবে। বিরোধী দলগুলি এই নির্বাচনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন বোধ করিল। ঐ বৎসর জুলাই মাসে বিরোধী দলগুলি কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমউদ্দিনের বাস ভবনে এক বৈঠকে মিলিত হন। পাঁচটি দল এই বৈঠকে যোগদান করে। অবশেষে বিরোধী দলগুলি সর্বসম্মতিক্রমে একটি ৯ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নয় দফা কর্মসূচীকে তৎকালে অনেক সংবাদপত্র জাতীয় মুক্তি সনদরূপে অভিনন্দন জানায়।

এই নির্বাচনী জোটকে নাম দেওয়া হইয়াছিল সম্মিলিত বিরোধী দল (**Combined Opposition Party** সংক্ষেপে **C. O. P.**)। বিরোধী দলের পক্ষ হইতে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেণ্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য মনোয়ন দেওয়া হয়। যদিও তিনি রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না, পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়দে আজমের বোন হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী। তাহা ছাড়া তিনি নিজে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার একজন গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। জনগণকে তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার

ফিরাইয়া দিবার জন্যই তিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজী হইয়াছিলেন। সরকারী লীগ হইতে আইয়ুব খান পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হইলেন। সম্মিলিত বিরোধী দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল আজম খান। তিনিও আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন উৎখাত করিয়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন।

নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানেরই জয় হইল। কারণ আইয়ুব প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা সম্পূর্ণ আইয়ুবের করতলগত ছিল। তাহারা কায়েমী স্বার্থের বশবর্তী হইয়া নিজেদের বিবেককে বিসর্জন দিয়া পুনরায় তাহাদের প্রভুকে ভোট দেয়। তাহা ছাড়া সরকারী পক্ষ নির্বাচনের সময় প্রশাসন যন্ত্রকে অপব্যবহার, দুর্নীতি ও অসাধুতার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

ইতিমধ্যে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন মার্চ মাসে এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন মে মাসে ধার্য হয়। এই সময় বিরোধী দলের অনেক সদস্যই নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন বর্জন করিবার অভিমত প্রকাশ করে। কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে শেখ মুজিব নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত বিরোধীদল নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এন. ডি. এফ. ও কো. ও. পের সম্মিলিত ছয়দলের বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। কিন্তু ফলাফল পূর্ববৎ। কারণ সরকারী দল এইবারেও দুর্নীতি ও অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিরোধী দলগুলির মধ্যে C. O. P. দশটি, N. D. F. পাঁচটি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৬টি আসন লাভ করে। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে জয়লাভের পর ২৩শে মার্চ অর্থাৎ পাকিস্তান দিবসে আইয়ুব খান দ্বিতীয়বারের মত নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

অতঃপর ১৬ই মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৪৯টি আসনের মধ্যে সরকারী মুসলিম লীগ পায় ৬৬টি আসন, বিরোধী দল ২৫টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পায় ৫৮টি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারীদল স্বতন্ত্র সদস্যদের অনেককে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিয়া নিজেদের দলে আনিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করিলেও দেশের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয় নাই। গণ-অসন্তোষ ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে থাকে। সেই জন্য সুকৌশলে

আইয়ুব খান জনগণের আসু সমস্যা হইতে তাহাদের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হন। কাশ্মীর সমস্যা বহুদিনের একটি অমীমাংসিত সমস্যা। এই সময় কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দেশ বিভাগ হইতে এই সমস্যার উদ্ভব হয়। জাতিসংঘ গণভোটের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পক্ষে রায় দেয়। পাকিস্তান গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী সমর্থন করে। কিন্তু ভারত নানাভাবে এই দাবী অগ্রাহ্য করে এবং কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করিতে থাকে। ১৯৬৫ সনের আগষ্ট মাসে পাকিস্তান কাশ্মীরীদের সমর্থনে মোজাহিদ বাহিনী বা অনুপ্রবেশকারী পাঠায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শেষ পর্যন্ত উভয়দেশ বড় রকম যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে। ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করিয়া লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্যদের কৃতিত্বে লাহোর রক্ষা পায়। যুদ্ধে বাঙ্গালী সৈনিকরা শৌর্যবীর্যের নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে। ফলে এতকাল ধরিয়া বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভীরুতা ও কাপুরুষতার যে কুৎসা অপবাদ প্রচার করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সতেরদিন ব্যাপী এই যুদ্ধ চলে। অবশেষে জাতিসংঘের নির্দেশে যুদ্ধ বিরতি হয়। অতঃপর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিগিনের আমন্ত্রণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে সোভিয়েৎ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মিলিত হন এবং 'যুদ্ধ নয়" চুক্তি স্বাক্ষর করেন। শান্তিপূর্ণভাবে উভয়দেশ নিজেদের অমীমাংসিত সমস্যাগুলির সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু যুদ্ধের মূল কারণ কাশ্মীর সম্পর্কে কোন উল্লেখ ইহাতে নাই। এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১০ই জানুয়ারী, ১৯৬৬। যুদ্ধকালে দেশের জনগণ ঐক্য-বদ্ধভাবে সরকারকে সমর্থন করে। কিন্তু শান্তি চুক্তি পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই যুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্বভাবতঃ সেখানে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে তাই শান্তি চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্নরূপ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত অবস্থায় সমগ্র বহির্বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রতি-রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়িয়া না উঠায় প্রতি মুহূর্তে এখানে

নিরাপত্তা অভাব অনুভূত হয়। সেইজন্য এই অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ স্বাভাবিকভাবেই শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন জানায়। যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। খাদ্য সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে মৌজুত না থাকায় খাদ্য সঙ্কটের উপক্রম হয়। ফলে এই অঞ্চলের অর্থনীতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। সরকারী উপেক্ষার ফল জনগণের নিকট প্রকটভাবে ধরা পড়ে। এমতাবস্থায় যুদ্ধশেষে পূর্ব বাংলার সম্পদ অবাধে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষয় ক্ষতি পূরণের জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে। যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ ও পুনর্গঠন বাবদ ট্যাক্সের মোটা বোঝা পূর্ব বাংলার কাঁধে চাপান হয়। অথচ পাকিস্তানের জন্মলগ্ন হইতে এই অঞ্চল নানাভাবে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত। পশ্চিম পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক প্রবঞ্চনা ও বৈষম্য, সামাজিক শোষণ ও নিপীড়নের শিকারে পরিণত হয়। তাহা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যুদ্ধশেষে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার নানান ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে সর্বতভাবে। রবীন্দ্র সঙ্গীতকে বেতারে নিষিদ্ধ করা হয়। সরকারের এই হীন কারসাজীর বিরুদ্ধে দেশের জাগ্রত বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজ তীব্র প্রতিবাদ করে।

যুদ্ধশেষে পূর্ববাংলার জনমনে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর উদাসীনতা ও দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাধিতে থাকে। তৎসঙ্গে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবীও জোরদার হইতে থাকে। শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার জনগণের এই ধূমায়িত অসন্তোষের সদ্ব্যবহার করেন। এইদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুবের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পায়। সেখানে তাসখন্দ চুক্তি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। কারণ এই চুক্তিতে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের কোন উল্লেখ না থাকায় জনগণ ইহাকে অপমানজনক চুক্তি বলিয়া মনে করে। দেশের এই রাজনীতিক পরিস্থিতিতে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ ১৯৬৬ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স আহ্বান করেন। শেখ মুজিব প্রথমে এই সম্মেলনে যোগদানে অসম্মতি জানান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবর্গের অনুরোধে তিনি সম্মেলনে যোদগাম করেন। লাহোর সম্মেলন চলাকালে তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবী পেশ করেন। পরবর্তীকালে এই ৬ দফা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের

সনদরূপে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুস্পষ্ট পদক্ষেপ হিসাবে কাজ করে। পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ইহার বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার চালায়। লাহোর সম্মেলন ব্যর্থ হয়। সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য কোন কোন নেতা শেখ মুজিবকে দায়ী করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের জন্যই এই সম্মেলন সফল হয় নাই।

শেখ মুজিব তাঁহার বক্তব্যের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন: সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্ত শাসনের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে দেখা দেয়। দেশরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দাবী একান্ত বাস্তব ও অপরিহার্য। সেই বিষয়ে কাহারও দ্বিমতের অবকাশ নাই। তিনি আরও বলেন যে দেশরক্ষা এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন পাকিস্তানের জাতীয় সংহতিকে আরও শক্তিশালী করিবে।

১৯৬৬ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা কর্মসূচী অনুমোদন লাভ করে। ৬ দফা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরেই শেখ মুজিব ১৮ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা সহকারে 'আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা' কর্মসূচী জনগণের মধ্যে প্রচারার্থে পেশ করেন। প্রস্তাবগুলির সার নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুইটি বিষয় থাকিবে—প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাহাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

৩। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে।

এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

৪। সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সেই ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর একটি অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এই ভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

৫। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আদায়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে। এই অর্থে স্ব স্ব আঞ্চলিক সরকারের এখতিয়ার থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল সমানভাবে দিবে অথবা সংবিধানের নির্ধারিত হারে আদায় হইবে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানী রপ্তানীর অধিকার আঞ্চলিক সরকারের থাকিবে।

৬। বাংলাদেশের জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠন করা হইবে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আত্মনির্ভর হইবে।

শেখ মুজিবের ৬ দফা শোষিত ও নির্যাতিত বাঙ্গালীর নিকট তাহাদের ম্যাগনাকার্টা বা মুক্তি সনদরূপে সর্বত্র অভিনন্দন লাভ করে। আওয়ামী লীগ রাতারাতি জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

৬ দফা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার এবং দক্ষিণ-পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক দলগুলির তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। সরকার আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নানা দমননীতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দক্ষিণ পন্থী দলগুলি ছয় দফার নানা অপব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপে চিহ্নিত করিয়া জনমনকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পায়। তাহারা আওয়ামী লীগের নীতিকে জাতীয় সংহতির পরিপন্থীরূপে প্রচার করে। এমনকি মাওলানা ভাসানীর মত জননেতা ৬ দফার প্রতি সমর্থন দিতে ব্যর্থ হন এবং ৬ দফার বিরূপ সমালোচনা করেন। অবশ্য ন্যাপের নিজস্ব ১৪ দফা কর্মসূচীর মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনসহ অর্থনীতিক ও রাজনীতিক মুক্তির জন্য বিভিন্ন দাবী উত্থাপন করা হইয়াছিল। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছয় দফার বিরুদ্ধে সমা-

লোচনামুখর হইয়া উঠেন। তিনি শেখ মুজিব ও তাহার দলকে বিভেদকারী বলিয়া অভিহিত করেন এবং তাহাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ ও গৃহযুদ্ধের হুমকি প্রদান করেন। প্রেসিডেন্টের ইঙ্গিতে তাহার পুতুল গভর্ণর মোনেম খান শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের করিয়া তাহাদিগকে হয়রানী ও নির্যাতন করেন। শেষ পর্যন্ত ৮ই মে রাত্রে শেখ মুজিব ও তাহার কয়েকজন বিশিষ্ট সহকর্মীকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের বলে গ্রেফতার করা হয়। ৬ দফা সমর্থনকারী বিরোধী দলের অনেক নেতা ও কর্মীকে একই আইনে কারারুদ্ধ ও সরকারী নির্যাতনের শিকার হইতে হয়।

নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের সংবাদে ঢাকা শহরে দারুন ক্ষোভের সঞ্চার হয়। জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ ইহার তীব্র নিন্দা করেন। ১৩ই মে এই ঘটনার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হয়। অতঃপর ওয়ার্কিং কমিটি ৭ই জুন ৬ দফার দাবীতে সারা প্রদেশব্যাপী এক সর্বাত্মক হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ছয়দফার সঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রচারপত্রে সমকালীন দেশের বিভিন্ন সমস্যা, জনগণের দাবী ও শ্লোগান স্থান পায়। আওয়ামী লীগের ডাকে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। জনগণের বিপুল প্রস্তুতি, আয়োজন ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করিয়া গভর্ণর মোনেম খান সন্ত্রস্ত হন। তিনি দেশরক্ষা আইনে আটজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও বহু কর্মীকে গ্রেফতার করেন এবং অন্যান্যদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেন। জনগণের উদ্দেশ্যে তাহার ভাষণে তিনি বলেন: "অশুভ প্রচেষ্টার মোকাবেলার জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছেন।" ৬ই জুন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলাকালে বিরোধী ও স্বতন্ত্রদলীয় সদস্যরা প্রদেশব্যাপী ত্রাসের রাজত্বের প্রতিবাদে মোনেম খানের প্রতি দারুন অবমাননা প্রদর্শন করিয়া গভর্ণরের বক্তৃতা বর্জন করে। সরকারের নির্যাতন ও হুশিয়ার বাণীকে উপেক্ষা করিয়া ৭ই জুন সারা প্রদেশে হরতাল পালিত হয়। সর্বত্র কলকারখানা বন্ধ ও নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া পড়ে। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত হরতালকে সরকার সহ্য করিতে পারিল না। পুলিশ ও ই.পি.আর, বাহিনী ধর্মঘটি জনতাকে ছত্রভঙ্গ

করিবার জন্য বেপরওয়া গুলি চালায়। ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে ও প্রদেশের অন্যান্য স্থানে বহু লোক প্রাণ হারায়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যরা সরকারী হামলার তীব্র নিন্দা করে। তখন হইতে পূর্ব বাংলায় ৭ই জুন ৬ দফা ও স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতীক দিবস হিসাবে পালিত হয়।

ইতিমধ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। একদল মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে চীনের সমাজতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী, অপরটি মস্কো বা রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নীতির অনুসারী বলিয়া দাবী করে। শেষোক্তগণ ওয়ালীপন্থী নামে পরিচিত হয়। ওয়ালী পন্থীরা পূর্ব বাংলায় অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ৬ দফার প্রতি তাহাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। কিন্তু ভাসানী পন্থীরা ৬ দফার প্রতি তাহাদের নীতিতে অটল থাকে। এমন কি তাহারা ৭ই জুনের হত্যা-যজ্ঞের কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেন নাই। সরকারী দমননীতির ফলে আওয়ামী লীগ এই সময় নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় কাটায়। কারণ অধিকাংশ নেতাই তখন কারাগারে। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ব্যর্থ হওয়ার পর দেশের এই রাজনীতিক সংকটের দিনে পাঁচটি বিরোধীদল ৮ দফার ভিত্তিতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট নামে একটি ঐক্যজোট গঠন করে। তাহাদের কর্মসূচীতে ১৯৫৬ সনের সংবিধানের পুনরুজ্জীবন; প্রাপ্ত বয়স্কের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী ও ফেডারেল ধরনের শাসন ব্যবস্থা কায়েম; দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, মুদ্রা, ফেডারেল ফাইন্যান্স, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, আন্তঃ আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয় বাদে অবশিষ্ট সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব আঞ্চলিক সরকার সমূহের হাতে অর্পণ; দেশরক্ষা ব্যাপারে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলকে সমপর্যায় প্রস্তুত করা; নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব বাংলায় স্থানান্তর প্রভৃতি দাবী তাহাদের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জোটের অধিকাংশ নেতার প্রতি জনগণের বিশেষ আস্থা ছিল না, ফলে তাঁহাদের দাবীর পক্ষে দেশব্যাপী শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই।

অতঃপর আইয়ুব-মোনেম চক্র ১৯৬৭ সনের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব বাংলার কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাকিস্তান স্বার্থবিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনে। প্রকৃত পক্ষে ৬ দফা আন্দো-

লনকে নস্যাৎ করাই ছিল এই মামলার মুখ্য উদ্দেশ্য। সরকার এই ষড়যন্ত্রকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' বলিয়া অভিহিত করেন। ১৮ই জানুয়ারী প্রেসনোটে শেখ মুজিবকে এই মামলায় জড়ান হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে উক্ত ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা ও পরিচালনার অভিযোগ আনা হয়। ইহাকে 'পিণ্ডির ষড়যন্ত্র' আখ্যায়িত করাই যুক্তিযুক্ত হইবে কারণ সেখান হইতে এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। এক নম্বর আসামী শেখ মুজিব সহ মোট ৩৫ জনকে এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। ১১ জনকে রাজসাক্ষী হওয়ায় ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। গল্পের সারাংশ হইল এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভারতীয় যোগসাজোশে এবং ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করিয়াছে। এই মামলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিব সহ কয়েকজন সৎ সাহসী বাঙ্গালী অফিসারকে দেশের দুশমনরূপে প্রমাণ করিয়া তাহাদিগকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়া পূর্ব বাংলার স্বার্থ ও প্রগতিবাদী আন্দোলনকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করিয়া দেওয়া।

এই তথাকথিত মামলা বিচারের জন্য মে মাসে একটি স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। জুন মাসে বিচার শুরু হয়। বিচারের শুরুতে আসামীরা সকলে নির্দোষ বলিয়া দাবী করে। শেখ মুজিব ইহাকে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলিয়া মন্তব্য করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাহাদের উপর অমানুষিক ও বর্বরোচিত অত্যাচার করা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা গেল সম্পূর্ণ মামলাটিই ছিল একটি হীন ষড়যন্ত্র। এই মামলা সাজাইয়া আইয়ুব খান চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কারণ এই মামলার প্রতিক্রিয়া সরকার যাহা আশা করিয়াছিল, হইয়াছিল তাহার ঠিক উল্টা। বলা বাহুল্য যে প্রকৃতপক্ষে এই মামলা আইয়ুবের জন্য আত্মঘাতী হয় এবং ইহা তাঁহার পতন তরান্বিত করে। শেখ মুজিবকে এই মিথ্যা মামলায় জড়ানোর জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের মনে দারুণ ক্ষোভ ও অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠে। ছাত্ররা শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। সরকার এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য পুলিশ, ই.পি.আর ও সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন করে। ১৯৬৮ সনের শেষের দিকে এবং ১৯৬৯ সনের প্রথম ভাগে এই আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্রতর হয় এবং শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করে।

১৯৬৮ সনে আইয়ুব খান তাহার স্বৈরাচারী শাসনের দশ বৎসর পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যাহা উন্নয়ন দশক বা Decade of Development

নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার শাসনে দেশের উন্নতির স্মৃতি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। পূর্ব বাংলার জনগণ আইয়ুবের এই মহোৎসবে শরীক হইতে উৎসাহ বোধ করিল না। কারণ সরকারের নির্লজ্জ ও মিথ্যা প্রচারনার মাহাত্মে জনগণের মন আরও অতিষ্ট হইয়া উঠে। তাহারা ইহাকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা মনে করিল। তথা-কথিত উন্নয়ন দশকে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অর্থনীতিক উন্নয়নের বৈষম্য আরও প্রকট হইযা ফুটিয়া উঠে। জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে সরকার এই অর্থনীতিক বৈষম্যের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন হইতে এই বৈষম্যের সৃষ্টি এবং ক্রমশঃ ইহা বাড়িতে থাকে। ক্রমে ক্রমে পাকিস্তান ২২টি পরিবারের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। পাকি-স্তানের দুই অংশের মধ্যে অসম উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি পর্যন্ত এড়ায় নাই। বিদেশী গবেষকগণ কতৃক প্রদত্ত তথ্য এই বৈষম্যের করুণ চিত্রটি আরও প্রকট করিয়া ফুটাইয়া তোলে।

১৯৪৭ সনে করাচীতে নূতন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজধানী স্থাপিত হয়। ইহার উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয় ২০০ কোটি টাকা। পরে আইয়ুব খান রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ইসলামাবাদে এবং ইহার উন্নয়নের জন্য খরচ হয় ২০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী বলিয়া খ্যাত ঢাকার উন্নয়নের জন্য খরচ হয় মাত্র ২ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কার্যালয়, দেশরক্ষা সদর দফতর ও শিক্ষায়তন, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, বীমা করপোরেশন সমূহ, বৈদেশিক দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইত্যাদির ন্যায় সকল সরকারী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানাদির প্রধান কেন্দ্রগুলি অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে এক অংশের উপর অপর অংশ সুপরিকল্পিতভাবে প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের অগ্রগতিতে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানী স্কুল বয়সী ছাত্র সংখ্যা কিছুটা বাড়িল ও এক সচেতন নীতির মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। অথচ উপরোক্ত একই সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে শিশুদের স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৩৫০ ভাগ। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ সেই ক্ষেত্রে ২০ বছরে

ছাত্র সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে বাড়িয়াছে পাঁচগুন আর পশ্চিম পাকিস্তানে বাড়িয়াছে ৩০ গুণ।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পনর বছর পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব ঘাটতি ৬০ কোটি টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্বৃত্ত হয় ৩৮ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি ও অর্থনীতিক পরিকল্পনাই প্রধানতঃ ইহার জন্য দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকারের সুপরিকল্পিত নীতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইত। ফলে এই অঞ্চলের অর্থনীতিক উন্নয়নে অচলাবস্তার সৃষ্টি হয়।

গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যাপারে কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের ১৬টির মধ্যে ১৩টি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। কলম্বো প্ল্যান, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, কমনওয়েলথ্ সাহায্য ইত্যাদির অধীনে বিদেশে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণের জন্য যেই সব বৃত্তি দেওয়া হয় তাহার অধিকাংশ গিয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে।

বেসামরিক, সামরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকুরী ও নিয়োগের ব্যাপারে এই বৈষম্য যে আরও ব্যাপক ছিল নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বোঝা যায় :—

		পঃ পাকিস্তান	পূঃ পাকিস্তান
১।	কেন্দ্রীয় বেসামরিক চাকুরী	৮৪%	১৬%
২।	বৈদেশিক চাকুরী	৮৫%	১৫%
৩।	স্থলবাহিনী	৯৫%	৫%
৪।	নৌবাহিনী (কারিগরী)	৮১%	১৯%
৫।	নৌবাহিনী (অকারিগরী)	৯১%	৯%
৬।	বিমান বাহিনীর বৈমানিক	৮৯%	১১%
৭।	সশস্ত্র বাহিনী (সংখ্যায়)	৫০০,০০০	২০,০০০
৮।	পাকিস্তান এয়ার লাইন্স (সংখ্যায়)	৭,০০০	২৮০

সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা উন্নততর ছিল না।

১।	জনসংখ্যা	৫কোটি ৫০লক্ষ	৭ কোটি ৫০লক্ষ
২।	ডাক্তারের সংখ্যা	১২,৪০০	৭,৬০০
৩।	হাসপাতালের বেড সংখ্যা	১৬,০০০	৬,০০০

৪।	পল্লী-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩২৫	৮৮
৫।	শহর সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র	৮১	৫২

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন পরিসংখ্যানের সূত্র হইতে আইয়ুব শাসনে উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যের যে চিত্রটি উৎঘাটিত হইয়াছে তাহার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ

বিষয়	পঃ পাকিস্তান	পূঃ পাকিস্তান
বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা	৮০%	২০%
বৈদেশিক সাহায্য (মার্কিন সাহায্য ছাড়া)	৯৬%	৪%
মার্কিন সাহায্য	৬৬%	৩৪%
পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন	৫৮%	৪২%
পাকিস্তান শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন	৮০%	২০%
শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক	৭৬%	২৪%
গৃহ নির্মাণ	৮৮%	১২%

অর্থনীতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অংশের তুলনার মধ্য দিয়া পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ করিবার তথ্যটি নির্ভুলভাবে প্রমাণ হয়। অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিগুলি এমন ভাবে প্রণয়ন হইত যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তানকে শিল্পোন্নত করা যায়। তাহা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প পণ্যের জন্য একটি অধীন ও স্থায়ী বাজার হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবহার করা হইতেছিল।

দুই অঞ্চলের মাথাপিছু আয়ের পার্থক্যের মধ্যে এই বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ পায়। ১৯৫৯-৬০ সনে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে বেশী ছিল শতকরা ৩২ ভাগ। দশ বৎসর পর ১৯৬৯-৭০ সনে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে শতকরা ৬১ ভাগ বেশী।

আইয়ুব শাসনের এই উন্নয়ন দশক স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানীদের নিকট করুন উপহাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই উন্নয়ন দশক উৎসব আইয়ুবের পক্ষে মারাত্মক পরিণতির সূচনা করে। উন্নয়ন দশকের এই প্রবঞ্চনার সত্যটি প্রকাশ হইবার পর পূর্ব পাকিস্তানীদের ঘুম ভাঙ্গে। তাহারা তখন হইতে স্বাধিকার আন্দোলন ছাড়িয়া স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়।

শুরু হইল আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলন। মাওলানা ভাসানী এই গণ-আন্দোলনে শরীক হন। তিনি আইয়ুব সরকারের বিরোধিতা করা প্রতিটি জনগণের নৈতিক কর্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করেন। যেহেতু সরকার জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হইয়াছে সেইজন্য তিনি আইয়ুব খানের পদত্যাগ দাবী করেন। তিনি সরকারকে পূর্ব বাংলার সার্বজনীন দাবী স্বায়ত্বশাসন সহ, রাজবন্দীদের মুক্তি, সংবাদপত্রের জরুরী আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবী দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। দেশের বুদ্ধিজীবিরাও সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করে এবং জনগণের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করে।

১৯৬৮ এর ১৮ই নভেম্বর ছাত্ররা প্রদেশব্যাপী প্রতীক প্রতিবাদ দিবস পালন করে। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। সেখানে আইয়ুবের সুদীর্ঘ স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনমত ও তরুণ সমাজ বিক্ষুব্ধ ছিল। আন্দোলনের নেতা ছিলেন আইয়ুব কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের যুব শক্তিকে সংহত করিয়া আইয়ুব বিরোধী পিপল্‌স পার্টি গঠন করেন। ভুট্টোকে গ্রেফতার ও তাহার সভা-মিছিলের উপর গুলী বর্ষণের ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতাও বিক্ষুব্ধ হয়। তাহারা ২৯শে নভেম্বর বিক্ষোভ মিছিল করে। এই সময় সর্বদলীয় ছাত্র সমাজ আইয়ুব সরকারকে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য সকল বিরোধী রাজনীতিক দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানায়। আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এই ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দেয়। তাহারা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি নামে একটি ঐক্য ফ্রন্ট গঠন করে। ক্রমে এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু এই গণ-আন্দোলনকে সঠিক নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা এই ফ্রন্টের ছিল না। মওলানা ভাসানী এই সময় পল্টনের এক জনসভায় শাসক গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, তাহারা যেন লাহোর প্রস্তাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী স্বীকার করে; এই দাবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন চলিতে থাকিলে পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠন করিবে।

৭ই ডিসেম্বর রিক্সা চালকদের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে হরতাল পালিত হয়। হরতাল পালনকারীদের উপর সরকার

নির্মমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তাহার প্রতিবাদে ৮ই তারিখে মওলানা ভাসানীর আহ্বানে পুনরায় হরতাল পালন করা হয়। এই সময় মওলানা অত্যাচারী গভর্ণর মোনেম খানের বিরুদ্ধে জনগণকে ঘেরাও আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। সর্বত্র ঘেরাও আন্দোলন শুরু হয় এবং সামরিক আইন জারীর পূর্ব পর্যন্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলন চলিতে থাকে। ১৩ই ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের যৌথ উদ্যোগে দমননীতির প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান জানান হয়। সারা ডিসেম্বর মাস প্রদেশ ব্যাপী মিছিল, প্রতিবাদ ও হরতাল চলিতে থাকে।

ইতিমধ্যে আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ও মৌলিক অধিকার পুনঃরুদ্ধারের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ ৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন (Democratc Action Committee সংক্ষেপে 'ডাক')। এই সংগ্রাম পরিষদ দেশের সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান বয়কট করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৬৯ সনের জানুয়ারীতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুইটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য এই সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার সঙ্গে আওয়ামী লীগের ৬দফা সম্বলিত হইয়া পূর্ব বাংলার মুক্তি সনদরূপে পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে। ১১ দফা দাবীতে ১৮ই জানুয়ারী হইতে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। এইদিকে পুলিশী নির্যাতনও পূর্ণ মাত্রায় চলিতে থাকে। ২০শে জানুয়ারী ছাত্র বিক্ষোভের তৃতীয় দিবস। ঐ দিন ঢাকার ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের জুলুম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। ছাত্রদের এক মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলী চালান হয়। পুলিশের গুলীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হয়। ক্রমান্বয়ে এই ছাত্র আন্দোলন একটি গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত এই গণ-বিক্ষোভকে দমন করিবার জন্য শাসকগোষ্ঠী সামরিক বাহিনীকে তলব করে। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে গুলি চালাইয়া জনগণের এই দুর্বার আন্দোলনকে স্তব্ধ করিয়া দিতে সক্ষম হয় নাই। এই সময় পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনও শক্তিশালী হয়।

অবশেষে একনায়ক আইয়ুব বাধ্য হইয়া ফেব্রুয়ারীতে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। তিনি 'ডাকে'র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমস্যা আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শেখ মুজিব তখনও আগরতলা মামলায় আটক। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়া আলোচনা বৈঠক অনর্থক। এইদিকে মওলানা ভাসানী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। শেখ মুজিব প্যারোলে আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন। ইতিমধ্যে গণ-আন্দোলন আরও তীব্র হয়। আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ই ফেব্রুয়ারী বন্দী অবস্থায় কেন্টনমেন্টে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আর এক ধাপ আগাইয়া নেয়। জনতা সেই দিন এতই ক্ষিপ্ত হয় যে তাহারা মামলার প্রধান বিচারকের বাড়ীসহ কয়েকজন মন্ত্রীদের বাড়ী গাড়ী ও গণস্বার্থ বিরোধী পত্রিকা অফিস অগ্নিদাহ করে। পরদিন খবর পাওয়া যায় যে সৈন্যরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের রীডার ডঃ শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। তিনি তখন বিক্ষোভকারী ছাত্রদেরকে শান্ত করিবার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই সংবাদে সারা দেশে বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। অবস্থা আয়ত্তে আনা ও জনগণকে শান্ত করিবার জন্য তিনি কৌশলের আশ্রয় নেন। গণ-দাবীতে প্রথমে তিনি পূর্ব বাংলার ধিকৃত গভর্ণর মোনেম খানকে বরখাস্ত করেন এবং তৎস্থানে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ডঃ এম. এন. হুদাকে নিয়োগ করেন। শীঘ্রই তিনি দেশে জরুরী অবস্থা উঠাইয়া নিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অতঃপর জনগণের রোষ হ্রাস করিবার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান ঘোষণা করিলেন যে তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইবেন না।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হইতে মুক্তি লাভের পর শেখ মুজিবকে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে রমনার রেস কোর্স ময়দানে ২৩শে ফেব্রুয়ারী এক গণ-সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় শেখ মুজিবকে বাংলার নিপীড়িত জনগণের জন্য তাহার ত্যাগ ও ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেখ মুজিব তাঁহার বক্তৃতায় জনগণের

প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা ও অকৃত্রিম ভালবাসার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিবেন। তিনি বলেন ছাত্রদের ১১ দফা ও আওয়ামী লীগের ৬দফার ভিত্তিতে তিনি সমস্যা সমাধানে আগ্রহী। যদি তাহার উত্থাপিত দাবী অগ্রাহ্য হয় তাহা হইলে তিনি দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিবেন।

কিন্তু স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে সকল আলোচনা ব্যর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে গণঐক্য ফ্রন্টও ভাঙ্গিয়া যায়। ইতিমধ্যে গণ-আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অরাজনীতিক কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থা বিকল হইয়া পড়ে। দেশের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার শরণাপন্ন হন। ২৫শে মার্চ তিনি সমস্ত ক্ষমতা ইয়াহিয়া খানের নিকট হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ রাত্রে সারা দেশে দ্বিতীয় বারের মত সামরিক আইন জারী করেন। সঙ্গে সঙ্গে '৬২ সনের শাসনতন্ত্র ও জাতীয় পরিষদ বাতিল ঘোষিত হয়। তৎসঙ্গে দীর্ঘ দশ বৎসরের একনায়কত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অতঃপর শুরু হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তিম অধ্যায়ের নায়ক কলঙ্কিত ইয়াহিয়ার শাসনকাল। সুচতুর ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াই নূতন চাল চালিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন: দেশের রাজনীতিক ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে যত শীঘ্র সম্ভব দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে অনতিকালের মধ্যে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতি-নিধিদের দ্বারা একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা এবং নিয়মতান্ত্রিক ও গণ-সমর্থিত একটি সরকার গঠন করা যায়। জনগণ ইয়াহিয়ার বক্তব্যকে সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া মনে করে। আওয়ামী লীগের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২৮শে নভেম্বর তিনি ঘোষণা করিলেন যে আগামী ১৯৭০ সনের অক্টোবরে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে জনসংখ্যার ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হইবে। ইতিমধ্যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল ঘোষণা করেন এবং প্রদেশগুলিকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৭০ সনের প্রথম হইতে তিনি দেশে রাজনীতিক কার্যকলাপ বিধি ঘোষণা করেন ও মার্চ মাসের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও

নূতন শাসনতন্ত্রের মূলনীতি রচনা পদ্ধতি 'লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' (এল.এফ. ও) ঘোষণা করেন। নির্বাচিত গণপরিষদের উপর আদেশ থাকে যে অধিবেশনে বসার ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনার কাজ শেষ করিতে হইবে এবং তাহাতে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নিতে হইবে। অন্যথায় সংবিধান শুদ্ধ হইবে না এবং নব নির্বাচিত গণপরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং দেশে সামরিক শাসন বলবৎ থাকিবে। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ নেতাই এল. এফ. ও.র অগণতান্ত্রিক ও বাধ্যতামূলক বিধি সম্বন্ধে আপত্তি করেন। তাহারা নির্বাচিত গণপরিষদের সার্বভৌমত্বের দাবী করেন।

আওয়ামী লীগ তাহাদের ৬ দফার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিল। তাই তাহারা নিজস্ব ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া তাহারা কোন নির্বাচনী জোট গঠনে উৎসাহ দেখায় নাই। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে আওয়ামী লীগের ভিতরে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। অন্যান্য দলগুলি বিশেষতঃ মস্কোপন্থী ন্যাপ আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্যফ্রন্ট গঠনে বিশেষ আগ্রহী ছিল। কিন্তু ভাসানী পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে প্রথম হইতে নির্বাচন প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের স্বপক্ষে রায় দেয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থী দলগুলি একত্র হইয়া 'ইসলাম পছন্দ' নামক নির্বাচনী ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে।

৫ই অক্টোবর নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়। ইতিমধ্যে দেশে বন্যা দেখা দেয়। এই অবস্থায় অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর সরকার নির্বাচনের নূতন তারিখ স্থির করেন ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের।

এল.এফ.ও.র মূলনীতির সাথে আওয়ামী লীগের ৬ দফার বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান ও দক্ষিণ পন্থী রাজনীতিক দলগুলি আওয়ামী লীগের প্রচার কার্যে কোন বাধা সৃষ্টি করে নাই, কারণ তাহাদের ধারণা ছিল আওয়ামী লীগ কোন অবস্থাতেই পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না। তাহাদের ধারণা ছিল যে বিভিন্ন পার্টি কিছু কিছু আসন লাভ করিবে যাহার ফলে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কার্যকরী হইবে না এবং পশ্চিম পাকিস্তানী দলগুলির ইচ্ছানুযায়ী শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ থাকিবে।

১৯৭০ সনের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার আগেই ১২ই নভেম্বর রাতে পূর্ব বাংলার উপকূলে মানব ইতিহাসের বৃহত্তম প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এক ভায়বহ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আনুমানিক দশ পনের লক্ষ লোকের সলিল সমাধি হয়। তৎসঙ্গে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিরও ক্ষতি সাধন হয়। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে অগণিত মানুষের মৃত্যুর জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতা বহুলাংশে দায়ী ছিল। আবহাওয়া উপগ্রহ হইতে ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া সত্ত্বেও সরকার জন-সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন উদ্যোগ নেয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিল। প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী পাঠান বা তাহার বিলি ব্যবস্থার মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তাহারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ এতবড় দুর্ঘটনা সম্বন্ধে নীরব রহিলেন। পাকিস্তান সরকারের ঔদাসীন্য, অবিশ্বাস্য নিষ্ক্রিয়তা ও সদিচ্ছার অভাবের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে পাকিস্তানী শোষকশ্রেণী পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনের কোন মূল্য দেয় না। তাহারা এই দেশকে 'কলোনী' হিসাবেই গণ্য করে। সুতরাং পাকিস্তানের দুই অংশ কোন অবস্থাতেই এক থাকিতে পারে না। তাহাদের ধর্মভিত্তিক একজাতিত্বের ফাঁকা বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া গেল। আত্মচেতনা ও আত্মোপলব্ধিতে বাঙ্গালী মানসে নূতন দিগন্তের উন্মোচন হইল।

দেশের এই ভয়ানক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন নির্বাচন স্থগিত রাখিবার জন্য কোন কোন দলের পক্ষ হইতে দাবী উঠিলেও আওয়ামী লীগ কিন্তু আর এক মুহূর্তের জন্যও পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক শ্রেণীকে বরদাস্ত করিতে রাযী হইল না। শেখ মুজিব হুমকি দিলেন, নির্বাচন বন্ধ করিলে তিনি দেশে বিপ্লব শুরু করিবেন। অবশেষে ৭ই ডিসেম্বর বহুদিনের প্রতিক্ষীত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ সারা বাংলাদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন তাহারা লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদেও নির্বাচকমণ্ডলী এই দল সম্পর্কে অনুরূপ রায় দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে জয়লাভ করিল ভুট্টোর পিপল্‌স্ পার্টি। তাহারা ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসনে জয়যুক্ত হয়। দুইটি দলই আঞ্চলিক প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভ করে। তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ভুট্টো নিজেকে

সারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করেন। তিনি আওয়ামী লীগের ৬দফা স্বীকার করেন না এবং আওয়ামী লীগ ইহার দাবী সংশোধন না করিলে তিনি জাতীয় পরিষদ বর্জন করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। এই দিকে শেখ মুজিব ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে অটল রহিলেন, কারণ জনগণ তাঁহাকে ৬ দফা কর্মসূচীর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট রায় দিয়াছেন। ইতিমধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে ভুট্টোর দীর্ঘ আলোচনা হয়। সম্ভবতঃ সেইখানে চক্রান্তের নীলনক্সা প্রস্তুত হয়। ১৯৭১ সনের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক হয়। বৈঠকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে ১৪ই জানুয়ারী ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলিয়া অভিহিত করেন এবং তাহার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। কিন্তু জাতীয় পরিষদের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করিতে তিনি অসম্মত হইলেন। অতঃপর অনেক তাল বাহানার পর ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়া ঘোষণা করিলেন যে ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম বৈঠক বসিবে। ইহার পরই শুরু হইল ইয়াহিয়া-ভুট্টোর একাধিক গোপন বৈঠক ও ভোজ। এইদিকে লাহোরে ভারতীয় বিমান 'গঙ্গা' হাইজ্যাক ও ঢাকায় পরিকল্পনা অনুসারে সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, যাহাতে ওজুহাত দেখানো যায় যে দেশের পরিস্থিতি সঙ্কটময় এবং ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিবার মত পরিবেশ নাই। ইতিমধ্যে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভুট্টো দাবী করিলেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখিতেই হইবে। ভুট্টো হুমকি দিলেন তাহার দাবী অগ্রাহ্য হইলে তিনি খাইবার হইতে করাচী পর্যন্ত আগুন জ্বালাইবেন। পরদিন ১লা মার্চ, ১৯৭১, ইয়াহিয়া অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকিবে।

ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যে ১৯৬৯ সনের মত গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়। ঢাকা নগরী মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। এইবার স্বাধিকার বা সমঝোতা নয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। শেখ মুজিব এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। সেইখানে তিনি ইয়াহিয়া খানের এক তরফা হঠকারী ঘোষণার তীব্র নিন্দা করেন। সেইদিন তিনি জনগণকে

নূতন কর্মসূচী দিলেন। ২রা ও ৩রা মার্চ হরতাল। ৭ই মার্চ রমনার ময়দানে জনসভা। শেখ মুজিবের হরতালকে নস্যাৎ করিবার জন্য সামরিক প্রশাসক শহরে কারফিউ জারী করেন। কিন্তু উজ্জীবিত উত্তেজিত জনতা কারফিউ ভঙ্গ করে। সামরিক বাহিনী নির্বিচারে গুলী চালায়। বহুলোক হতাহত হয়। ঐ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে এক বিরাট ছাত্রসভা হয়। এই সভাতেই সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভাতেই সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ান হয়। সংবাদপত্রের উপর সেন্সারশীপ আদেশ জারী হইল। ৩রা মার্চ শেখ মুজিব জনগণকে এক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সেই দিনই ইয়াহিয়া খান ১০ই মার্চ শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট ও অচল অবস্থা নিরসনের জন্য ঢাকায় এক নেতৃসম্মেলন আহ্বান করেন। পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ প্রধান ইয়াহিয়া খানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'আমরা গণহত্যাকারীদের সঙ্গে বসতে চাইনা।' তিনি সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। অতঃপর ৬ই মার্চ ইয়াহিয়া ঘোষণা করিলেন ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিবে। ঐ দিন লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার নূতন গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাহার শপথ গ্রহণ পরিচালনায় অস্বীকৃতি জানাইলে গভর্ণর পদ শূন্য থাকে। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ। তিনি রেসকোর্স ময়দানে বাংলার জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে উদাত্ত আহ্বান জানান। তাঁহার ভাষণে তিনি বলেন, "এটা মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ১৫ই মার্চ শেখ মুজিব বাংলাদেশে অসামরিক প্রশাসন চালু করিবার জন্য ৩৫টি বিধি জারী করেন। ঐ দিন ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন। তারপর ১০ দিন ধরিয়া আলোচনার নামে চলে সময়ের অবক্ষয় ও প্রহসন। ভুট্টো এই ষড়যন্ত্রে শরীক হন। বলা বাহুল্য, এই সময় সামরিক বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমনের প্রস্তুতি নিতেছিল। অতঃপর প্রস্তুতি পর্ব সমাধা হইবার পর ২৫শে মার্চ রাত্রে ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং মধ্যরাত্রি হইতে শুরু হয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নির্মম গণহত্যা অভিযান। এই হত্যাভিযানের প্রধান শিকার হয় ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও বুদ্ধিজীবি সমাজ। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্যে

বেতার ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ এবং শেখ মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিযুক্ত করেন।

২৬শে মার্চ স্বাধীনতাকামী বাংগালীরা তাহাদের সকল নির্যাতন ও শৃঙ্খলবন্ধন চূড়ান্তভাবে ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প লইয়া সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করিয়া পাকিস্তানের কারাগারে আটক রাখা হইল। সারা বাংলাদেশে প্রতিরোধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার হইয়া উঠিল। ১৭ই এপ্রিল মুক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলার আম বাগানে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপত্র আনুষ্ঠানিক-ভাবে প্রচারিত হয় এবং মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ইহার পর শুরু হইল তীব্র গণযুদ্ধ। এই গণযুদ্ধে সর্বাত্মক সমর্থন ও সাহায্য দেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন বাংগালীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করে এবং পাকিস্তান সরকারকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার রাজনীতিক সমাধানের জন্য চাপ দেয়। বাংলাদেশের বহু জনগণ পাকিস্তানী বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের শিকার হয় এবং প্রায় এককোটি লোক উদ্বাস্তু হইয়া ভারতে আশ্রয় নেয়। বিশ্ব-বিবেক এই জঘন্য গণহত্যার তীব্র নিন্দা করে। ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে পাকিস্তানী হত্যাযজ্ঞ আর মুক্তি বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধ। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর সম্মিলিত কমাণ্ড বা মিত্রবাহিনী গঠিত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের বুকে জন্ম নেয় নূতন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

অতিরিক্ত পাঠের জন্য গ্রন্থপঞ্জী

এম. এ. রহিম: বাংলাব মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭—১৯৪৭), ঢাকা, ১৯৭৬

কালিপদ বিশ্বাস: যুক্ত বাংলাব শেষ অধ্যায়, ১৯৬৬

Campos : History of the Portuguese in Bengal, 1919.

S. P. Sen : French in India, First Establishment and Struggle, 1947.

Cambridge History of India, vols. V and VI.

A. Karim : Murshid Quli Khan and His Times, 1963.

C. R. Wilson : Early Annals of the English in Bengal, 1917.

P. E. Roberts : History of British India, 1952.

T.G.P. Spear : Oxford History of India, 1958.
India—A Modern History, 1961.

Majumdar, Raychaudhuri and Datta :
An Advanced History of India.

L. S.. S. O'Malley : Modern India and the West, 1941.

N. K. Sinha : Economic History of Bengal, 3 vols., 1956-63.

W.K. Firminger : An introduction to the Bengal portion of the Fifth Report, 1917.

F. D. Ascoli : Early Revenue History of Bengal and Fifth Report, 1917.

N. S. Bose : The Indian Awakening and Bengal, 1969.

Pradip Sinha : Nineteenth Century Bengal, 1965.

A.F.S. Ahmed : Social Ideas and Social Change in Bangal, 1815—1835.

Muinuddin Ahmad Khan : Fara'idi Movement, Karachi, 1965.

B.B. Misra : The Indian Middle Class—A History of their Growth in Modern Times

A. Aspinal : Cornwallis in Bengal, 1931

N. K. Sinha (ed.) : History of Bengal (1757-1905), Calcutta, 1967.

C.E. Buckland : Bengal Under Lieutenant Governors, 2 vols, 1901.

D.P. Sinha : The Educational Policy of the East India Company in Bengal, 1964.

R. C. Majumdar : Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century, 1960.

,, : History of Freedom Movement in India, 3 vols., 1962-64.

Shila Sen : Muslim Politics in Bengal (1937-1947), 1976.

Sumit Sarkar : The Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908), 1973'

Anil Seal : The Emergence of Indian Nationalism, 1968.

S. R. Wasti : Lord Minto and the Indian Nationalist Movement, 1964.

D.A. Low (ed.) : Soundings in Modern South Asian History, 1967.

Matiur Rahman : From Consultation to Confrontation : A Study of the Muslim League in British Indian Politics, (1906—12), 1970

Sufia Ahmed : Muslim Community in Bengal (1884-1912), 1974

J.H. Broomfield : Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal, 1968.

A.R. Mallick : British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1857), 1956.

B. N. Pandey : The Break-up of British India, 1969.

নির্দেশিকা